ছেলেমেয়ে মানুষ করা প্রসঙ্গে

মা-বাবার বই

ছেলেমেয়ে মানুষ করা প্রসঙ্গে

ছেলেমেয়ে মানুষ করা প্রসঙ্গে

মা-বাবার বই

সারা পৃথিবীতে শিশুরা ছবি আঁকে, এবং সর্বত্র তারা ভালোই আঁকে। তাদের অফুরন্ত কল্পনা শক্তি, নিরবচ্ছিন্ন আবিষ্কার এবং খাঁটি সরলতা বড়দের বিস্মিত করে।

কোন এক ব্যক্তি সুন্দর কথা বলেছেন: কেবল আমাদের, বড়দেরই মনে হয় যে শিশুরা ছবি আঁকার মাধ্যমে খেলছে, কিন্তু আসলে তারা কাজের মতো কাজই করছে। শিশুর রচনা — এ হচ্ছে শিল্পেরই অবিচ্ছেদ্য এক অংশ, যার আছে সমানাধিকার ও সমমূল্য।

আমাদের কর্তব্য হচ্ছে প্রতিটি শিশুর মধ্যে যে-সমৃদ্ধতম সম্ভাবনাসমূহ রয়েছে তার সর্বাধিক অভিব্যক্তি ও বিকাশ ঘটানো।

আপন জনগণের অতীতের শিল্পকলা নিয়ে গর্ববোধ করাই যথেষ্ট নয়, সেই অতীতের যোগ্য হওয়া উচিত, সেই অতীতে সেরা যাকিছু ছিল তা টিকিয়ে রাখা উচিত। শিশুকাল থেকে প্রত্যেকের মধ্যে সুন্দর জিনিস গড়ার, শিল্প সামগ্রী সৃষ্টির, আপন বাড়ি, আপন স্কুল, শহর ও মাতৃভূমিকে সুন্দর করে তোলার বাসনা জাগানো প্রয়োজন।

ছেলেমেয়ে মানুষ করা প্রসঙ্গে
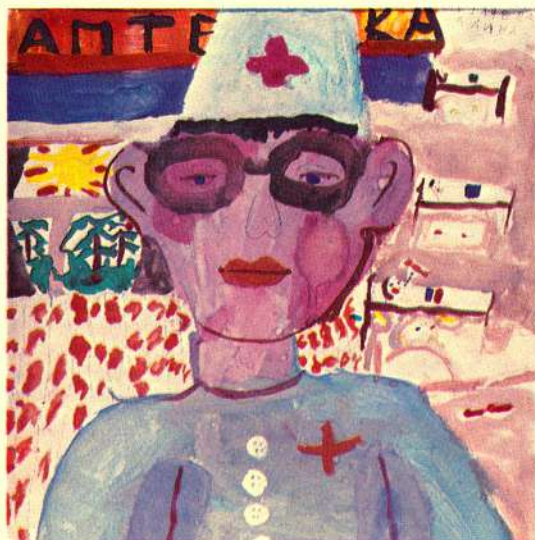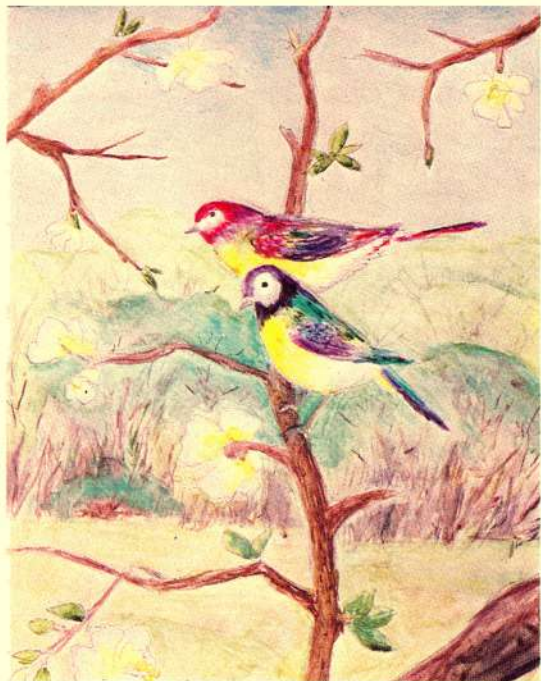
মা-বাবার বই

আপনাদের সন্তান
পারিবারিক সম্পর্ক
যৌবন

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

সূচি

সন্তান লালনপালনের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে

প্রথম অধ্যায়

আপনাদের সন্তান

দ্বিতীয় অধ্যায়
পারিবারিক সম্পর্ক

তৃতীয় অধ্যায়
যৌবন

প্রকাশকের মন্তব্য

এই বইটিতে প্রখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদরা বলছেন কীভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে গঠিত হয় পারিবারিক শিক্ষা ব্যবস্থা, পরিবারের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগানোর জন্য তাঁরা মা-বাবাদের উপদেশ ও পরামর্শ দিচ্ছেন। আশা করি, বইটি পড়ে ভারতীয় পিতামাতারা উপকৃত হবেন এবং এর অনেককিছুই তাঁদের কাজে লাগবে। এখানে পাঠকরা পাবেন নবজাতকের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য। লেখকরা আমাদের বলছেন যে মানুষের শিক্ষাদীক্ষা শুরু হয় তার জন্মের দিন থেকেই, এবং শিশুর জীবনের প্রতিটি পর্বে বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজন হয়।

বইটিতে জীবন থেকে গৃহীত উদাহরণের ভিত্তিতে বোধগম্য ভাষায় বর্ণিত হচ্ছে শিশুর জীবনের সবচেয়ে জটিল পর্বগুলো — বয়ঃসন্ধি কালগুলো। লেখকরা সবচেয়ে জটিল পরিস্থিতিতেও মা-বাবাদের স্থৈর্য বজায় রাখতে বলছেন, কেননা শিশুর চরিত্রে 'কাঠিন্য' প্রায়ই দেখা দেয় শারীরিক বাড়ের জন্য এবং দেহযন্ত্রে ঘটমান মনস্তাত্ত্বিক-দৈহিক পরিবর্তনগুলোর জন্য। এটা খুবই স্বাভাবিক যে বইয়ে সবচেয়ে টিপিক্যাল কিছু ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, তবে লেখকবৃন্দ পিতামাতাদের অতি অসাধারণ পরিস্থিতিতে প্রয়োগোপযোগী সঠিক কিছু শিক্ষা পদ্ধতিও বাতলে দিচ্ছেন। ছেলেমেয়ে মানুষ করার ক্ষেত্রে প্রধান শর্তটি হচ্ছে — শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা এবং পিতামাতার যুক্তিসঙ্গত স্নেহ-ভালোবাসা। লেখকরা পিতামাতাদের সর্ব প্রকার চরমাবস্থার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিচ্ছেন, — শিশুর প্রতি ভালোবাসা এবং কঠোরতা উভয় ক্ষেত্রেই চরমাবস্থা ক্ষতিকর।

শিক্ষাদীক্ষা — সে হচ্ছে জটিল ও বহুমুখী এক প্রক্রিয়া, যাতে মা-বাবাদের ছাড়াও অংশগ্রহণ করেন পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা, স্কুলে ও রাস্তাঘাটে শিশুদের চারিপাশের লোকেরা। তবে ছেলেমেয়ে মানুষ করার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকাটি হচ্ছে মা-বাবাদের। বইটি লেখা হয়েছে তাঁদের জন্যই।

সন্তান লালনপালনের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে

পিতামাতারা তাঁদের সন্তানদের জন্য কামনা করেন সুখের শৈশব। কিন্তু সুখের শৈশব বলতে আমরা কী বুঝি? আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের সুন্দর সুন্দর পোশাক পরাই, তাদের দেখি হাসিখুশি, প্রাণোচ্ছল। এ সবই ভালো, তবে এ হচ্ছে সুখের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র।

লোকে প্রায়ই বলে: অভাব-অনটন আর অকাল দুশ্চিন্তার মধ্যে যে-ব্যক্তি বড় হয়েছে সে শৈশব থেকে বঞ্চিত। কিন্তু অন্তহীন আলস্য, আমোদ-প্রমোদ ও আনন্দফুর্তির মধ্যে অতিবাহিত শৈশবকে কি আমরা সুখী বলে গণ্য করতে পারি? অনেকের কাছে নির্মেঘ ও নিশ্চিন্ত শৈশবই হচ্ছে সুখের শৈশব। তবে এমতাবস্থায় জীবন অসার হয়ে পড়ে। একমাত্র বুদ্ধি, মনোবল, অনুভূতি ও পেশীর সুসমঞ্জস প্রয়োগেই শিশু-সাবালক নির্বিশেষে মানুষকে বেঁচে থাকার প্রকৃত আনন্দ দিতে পারে। নূতনত্ব, বিস্ময়, কৌতূহল আর আবিষ্কারে ভরপুর ক্রীড়া ও শ্রম, জ্ঞান ও সৃজন, মেলামেশা ও গতি— এগুলোই হচ্ছে শৈশবের প্রকৃত ধর্ম। আর এই সমস্তকিছুতে সর্বক্ষণ শিশু ও কিশোরের সঙ্গে যদি তাদের স্নেহশীল পিতামাতা থাকেন তাহলেই আমরা সুখী শৈশবের কথা বলতে পারি।

বহু মা-বাবা এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে তাঁদের সন্তানের ভবিষ্যৎ বংশগতির দ্বারা আগে থেকেই পুরোপুরিভাবে নির্ধারিত। তাঁরা মনে করেন যে সন্তানেরা পিতামাতার কাছ থেকে পায় কেবল নিপুণতা আর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই নয়, নৈতিক চেহারাও। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে অনায়াসেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়: শিশু বিকাশ লাভ করে নিজে

নিজে, সে আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল নয়। তাকে কেবল স্বাস্থ্যবান করে তুললেই হল — বাকি সমস্তকিছু আপনা-আপনিই ঘটবে।

সততা, শ্রমশীলতা, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, মাতৃভূমি রক্ষার্থে আত্মোৎসর্গের মনোভাব — এই গুণাবলি নিয়ে কেউ জন্মায় না। তা অর্জিত হতে পারে একমাত্র সুশিক্ষার মাধ্যমেই। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যখন আমরা দেখি: ভালো মা-বাবার সন্তানরাও ভালো হয়, তখন এর কেবল একটি অর্থ হতে পারে: পরিবারে বিরাজ করছে অনুকূল নৈতিক পরিবেশ, ওখানে সযত্নে রক্ষা করা হয় ও ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সামাজিক নৈতিকতার উচ্চ মূল্যবোধ। আমরা অবশ্য এ কথাটি অস্বীকার করি না যে প্রত্যেক শিশুর মধ্যে কোন-না-কোন কিছুর প্রতি, যেমন গানবাজনার প্রতি, চিত্রকলা, বিজ্ঞান কিংবা প্রযুক্তির প্রতি একটা প্রবণতা থাকেই। কিন্তু মানুষের নৈপুণ্য, তার প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে কেবল সমাজে এবং সমাজেরই কল্যাণে। সমাজ এর জন্য ব্যবহার করে অতি ক্ষমতাধর একটি উপায় — শিক্ষাদীক্ষা আর লালনপালন।

অদূর অতীতেও কিছু সমাজবিজ্ঞানী নিপুণতার প্রশ্নটি এই ভাবে মীমাংসা করতেন: যে-সমস্ত লোকের শিক্ষা (মাধ্যমিক শিক্ষা, আর উচ্চ শিক্ষা হলে তো কথাই নেই) আছে তাদের তাঁরা নিপুণ, আর সময় সময় এমনকি প্রতিভাবান বলে গণ্য করতেন; কিন্তু যাদের কোন শিক্ষাদীক্ষা ছিল না তাদের তাঁরা অপারকদের দলে ফেলতেন। উপায়টি ছিল খুবই সহজ, কিন্তু অতি ভ্রান্ত। এমনও বহু বিজ্ঞানী ছিলেন যাঁরা প্রমাণ করতেন যে শিশুদের সবাই লেখাপড়া করতে — প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্যসূচি আয়ত্ত করতেও সক্ষম নয়। সেই ৩০-এর বছরগুলোতে সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালুকরণের অভিজ্ঞতাই দেখিয়ে দিয়েছে এই সমস্ত মনগড়া কথাবার্তার অযৌক্তিকতা। তরুণদের সবাই মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করতে পারে না বলে কোন কোন মহলে যে বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে আমরা তার সঙ্গেও একমত নই। আমাদের অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে প্রথম শ্রেণীতে গৃহীত ছেলেমেয়েদের সবাই সাফল্যের সঙ্গে স্কুলের পাঠ্যসূচি সমাপ্ত করতে সক্ষম।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে 'নিপুণতা' ও 'প্রতিভা' কথা দু'টির সামাজিক চরিত্র রয়েছে। 'প্রতিভাহীন' লোক সাধারণত হয় না, সে হচ্ছে অতি বিরল ব্যতিক্রম। কোন ব্যক্তি যদি সত্যিই অপটু হয়ে থাকে তাহলে তা ঘটে মা-

বাবার অসুখের দরুন, অত্যধিক মদ্যপানের ফলে, কিংবা শিক্ষাদানের অক্ষমতার জন্য। কেবল বিরল ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে যেকোন মানুষই কোন-না-কোন নৈপুণ্যের অধিকারী। পরিবার এবং স্কুলের কর্তব্য হচ্ছে সেই নৈপুণ্য আবিষ্কার ও বিকশিত করা।

মানুষ গড়া—সে হচ্ছে বহুমুখী এক প্রক্রিয়া। তবে এই প্রক্রিয়ার দু'টি দিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ: অনুভূতি আর হৃদয় গড়ে তোলা এবং বুদ্ধির উন্মেষ ঘটানো। এটা বলাই বাহুল্য যে দিক দু'টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওগুলোর মধ্যে পার্থক্য দেখা প্রয়োজন।

যে-প্রাণ ব্যতিরেকে মানুষ একটি দিনও বাঁচতে পারে না তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিশেবে প্রকৃত মানবিক নৈতিকতা গড়া—নিঃসন্দেহেই সে হচ্ছে কঠিনতম কর্তব্য।

আকাদমিশিয়ান পিওতর কাপিৎসা একবার বলেছিলেন যে ভালো নাগরিক হয়ে কেউ জন্মায় না, ভালো নাগরিক দীর্ঘ কাল ধরে গড়তে হয়। তাহলে নাগরিক গড়ার কাজে প্রধান জিনিসটি কী? নির্দিষ্ট অর্থে সক্রিয় জীবনযাত্রা এবং সামাজিক কর্তব্যের প্রতি সচেতন মনোভাবকে মানুষের শ্রম ও নৈতিক শিক্ষার ফল হিশেবে গণ্য করা যায়।

সর্বাঙ্গীণভাবে বিকশিত ব্যক্তির অপরিহার্য গুণটি হল শ্রমশীলতা। চরিত্রের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ গুণটি গড়তে গিয়ে একটি স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার মনে রাখা উচিত: কেবল হিতোপদেশ দিয়েই শ্রমশীলতা গড়া যায় না। সামর্থ্য মতো, স্কুলের কর্মশালায় কিংবা স্কুলের বাগানে শ্রম—এ হচ্ছে শিক্ষাদীক্ষার অপরিহার্য একটি শর্ত। এমন বহু ধরনের শ্রম আছে যা শিশুদের দেহযন্ত্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটায়, তাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ন করে এবং স্বাস্থ্য অটুট রাখে।

মানুষের সামাজিক সম্পর্কের চেয়ে তাদের শ্রম সম্পর্কই শিশু সহজে ও আগে উপলব্ধি করে থাকে। শ্রমে মেলামেশা—এ হচ্ছে মেলামেশার সারগর্ভ ও শিক্ষাদায়ক একটি রূপ। বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষার দ্বার উদ্‌ঘাটন করে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত রুশ শিক্ষাবিদ কনস্তান্তিন উশিন্‌স্কি বলেন: 'কেবল মানুষের বুদ্ধির বিকাশ ঘটানো এবং তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞান দানই শিক্ষার কাজ নয়, তার কাজ মানুষের মধ্যে জনকল্যাণকর শ্রমের তৃষ্ণাও জাগিয়ে তোলা যা ছাড়া তার জীবন সার্থক ও সুখী হতে পারে না... মানুষ যাতে অলঘু শ্রম আন্তরিকভাবে ভালোবাসতে পারে সেই

উদ্দেশ্যে সর্বাগ্রে তার মধ্যে জীবনের প্রতি অলঘু মনোভাব গড়া প্রয়োজন।'

শ্রম শিক্ষা একমাত্র তখনই সফল হতে পারে যখন শিক্ষাদীক্ষার সমস্ত ক্ষেত্র একসঙ্গে কাজ করে। আমাদের ধারণা মতে, লেখাপড়া এবং শারীরিক প্রস্তুতির সঙ্গে উৎপাদনশীল শ্রমের মিলন সাধন করা উচিত। এরূপ মিলনকেই আমরা সর্বাঙ্গীণভাবে বিকশিত মানুষ গড়ার একমাত্র উপায় হিশেবে বিবেচনা করে থাকি।

শ্রম শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে তার আরও একটি দিক ভুলে গেলে চলবে না: শিশুদের তাদের আপন জনগণের ঐতিহাসিক অতীতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। বৈষয়িক ও আত্মিক সংস্কৃতির ইতিহাসের উদাহরণের ভিত্তিতে শিশুদের মানুষ করা — এ হচ্ছে প্রকৃত শ্রম শিক্ষার অতি প্রয়োজনীয় একটি শর্ত।

আমরা শিশুদের জটিল অথবা সহজ যে-শ্রমেই আকৃষ্ট করি না কেন সর্বদা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ওই শ্রম যেন তাদের আনন্দ দেয়। বলাই বাহুল্য, শ্রমের প্রতি অনুরাগ না থাকলে শ্রমশীলতা গড়া যায় না। কিন্তু কীভাবে সে অনুরাগ গড়া সম্ভব? এ প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর রুশ কবি নিকোলাই নেক্রাসোভের একটা কবিতা স্মরণ করা যেতে পারে যাতে পিতা তাঁর ৫-৬ বছর বয়স্ক পুত্রকে বলছেন: 'ব্যস, এবার কাজে মন দাও তুমি, ভানিয়া। খেলাধুলো করেছ অনেক, লক্ষ্মীটি আমার!' পিতা কী দিয়ে ছেলের শ্রম শিক্ষা শুরু করেন? পিতা চেষ্টা করেন শ্রম যেন ভানিয়ার কাছে 'তার সুন্দর দিকটি' নিয়ে ধরা দেয়। সুন্দর দিক — কথাটি লক্ষ্য করুন! ভানিয়া যখন এই 'সুন্দর' দিকটি উপলব্ধি করল, তাকে দেখানো হল অন্য একটি দিক — 'শ্রম খেলা নয়...'

যেকোন শুভ কাজ শুরু করার উপযুক্ত সময় আছে। শিশুদের আমরা যত আগে থাকতে প্রকৃতি প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সজাগ করে তুলব, ততই সাফল্যের সঙ্গে আমরা আধুনিক কালের সবচেয়ে বড় একটা সমস্যা সমাধান করতে পারব। সমস্যাটি হচ্ছে — পৃথিবীর জীবন রক্ষা করা, তার সম্পদ বৃদ্ধি করা। যত কাল না ছেলেমেয়েরা নিজ হাতে বাগানে কাজ করতে, ফুলের চারা রোপণ করতে, গাছের যত্ন করতে, বনজঙ্গল ইত্যাদি রক্ষা করতে শিখছে তত কাল বড় বড় স্লোগান, বক্তৃতা আর বই কোন কাজ দেবে না।

আমাদের বড় ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গিয়ে আমরা পেশা নির্বাচনে তাদের সাহায্য না করে পারি না।

পেশা নির্বাচনের সময় তরুণরা যাতে ভুল না করে সে দিকে খেয়াল

রাখা খুবই প্রয়োজন। কিশোর-কিশোরীরা যদি বইপুস্তকের মাধ্যমে, শিক্ষার প্রযুক্তিগত উপায়াদির সাহায্যে, ভ্রমণ এবং হিতকর ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শিল্পকলা ও বৈষয়িক উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্রগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকে তাহলে তারা অধিকতর নির্ভুলভাবে ভবিষ্যৎ পেশা বাছতে পারবে। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কিশোরদের প্রস্তুত করে তোলার দায়িত্ব পরিবার এবং স্কুলের।

১৯৮৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে সাধারণ শিক্ষার ও পেশাগত শিক্ষার স্কুলসমূহে সংস্কার সাধন কল্পে যে-কর্মসূচিটি গৃহীত হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ ব্যাপারে সাহায্য করা। তাতে শ্রমশিক্ষার পদ্ধতিগুলো উৎকর্ষ লাভ করবে, তা স্কুলছাত্রদের বিভিন্ন রকমের পেশাগত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পরিচিত করবে এবং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটাবে। যেমন, ১৯৮৬ সাল থেকে শিশুদের স্কুলশিক্ষা আরম্ভ হবে ৬ বছর বয়স থেকে। তবে এই বইয়ে আমরা সংস্কারের ব্যবহারিক ফলাফল সম্পর্কে কোনকিছু বলতে পারছি না, কেননা তা এখনও অধীত ও সাধারণীকৃত হচ্ছে।

আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যদি নাগরিক দায়িত্ববোধ, মার্জিত রুচি ও শ্রমশীলতা গড়ে তোলা হয় তাহলে তারা নিঃসন্দেহেই জীবনে যোগ্য স্থান লাভ করতে পারবে,— তা স্কুল সমাপ্তির পর তারা যে-পেশাই বেছে নিক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না।

কনস্তান্তিন উশিন্স্কি একবার এরূপ একটি প্রশ্ন করেন: সন্তানদের জন্য পিতামাতাদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের মধ্যে সবচেয়ে সেরা কোন্টি? টাকাপয়সা ও ধনসম্পদ? না, মোটেই না,— স্পষ্ট জবাব দেন শিক্ষাবিদ। টাকাপয়সা উত্তরাধিকারীদের নষ্ট করে ছাড়ে। তাহলে হয়তো শিক্ষা? হ্যাঁ-ও এবং না-ও,— বলেন উশিন্স্কি। হ্যাঁ— যদি শিক্ষা শ্রমশীলতা গড়ে তুলে। না— যদি তা শ্রমশীলতা না গড়ে। সন্তানদের মধ্যে অসীম শ্রমশীলতা গড়া— এই-ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার। এবং তা উত্তরাধিকারীদের সুখের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্তও বটে।

প্রথম অধ্যায়

আপনাদের সন্তান

মানুষের জন্ম হল

কোন্ মা-বাবা চান না যে তাঁদের সন্তান সবচেয়ে বুদ্ধিমান, সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে উদার ও সবচেয়ে সাহসী হয়ে উঠুক, কোন্ মা-বাবা আশা করেন না যে লোকে তাঁদের ছেলে অথবা মেয়েকে শ্রমশীলতা আর কর্মজ্ঞানের জন্য শ্রদ্ধা করবে?

আমাদের সন্তানের সর্বাঙ্গীণ ও সুসমঞ্জস বিকাশ—এ হচ্ছে আমাদের আদর্শ, পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষাদীক্ষার আদর্শ। কিন্তু মা-বাবা ও শিক্ষকের কী পরিমাণ ধৈর্যপূর্ণ আর দক্ষতাপূর্ণ শ্রম নিয়োগ করা প্রয়োজন যাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা মানব সৃষ্ট মেধাগত, নৈতিক ও কান্তি সংস্কৃতির সমস্ত সম্পদ গ্রহণ ক'রে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারে?

সবারই জানা আছে যে মানুষ গড়ে উঠে ক্রিয়াকলাপে। শিক্ষাকার্যে, শ্রমে, খেলাধুলায়, মেলামেশায়, সৃষ্টিকর্মে ও ক্রীড়ায় বিকশিত হয় তার ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ।

আপনাদের সন্তান কী রকম হবে তা আপনাদের উপরই নির্ভর করে। উদারতার প্রথম শিক্ষা শিশু লাভ করে পরিবারে। এ ব্যাপারে তাকে শিক্ষা দেয় আপনাদের বিচারবিবেচনা ও আচরণ; বাড়িতে, কর্মক্ষেত্রে ও রাস্তাঘাটে মানুষের সঙ্গে আপনার ব্যবহার। পরিবার হচ্ছে এক ধরনের স্কুল যেখানে শিশু ভাবতে, অনুভব করতে ও মানুষের মধ্যে বাস করতে শেখে। আপন জনের কথা, হাসি, দৃষ্টি, ভঙ্গি, অন্যান্য লোকের প্রতি তার সম্পর্ক—শিশু এ সমস্তকিছুই অনুকরণ ও আয়ত্ত করে জগৎটাকে জানার সময়।

'শিক্ষণবিদ্যা যদি ষোলআনা মানুষ গড়তে চায় তাহলে সর্বাগ্রে তার মানুষকেও ষোলআনা জানা দরকার,'—বলেন কনস্তান্তিন উশিন্স্কি।

কিন্তু 'মানুষকে জানা', শিশুকে জানা বলতে কী বোঝায়?

আসুন, একই বয়সের তিনটি শিশুর দিকে লক্ষ্য করা যাক। তারা বালুর উপর খেলছে। ফ্যাকাশে-চুলো স্বাস্থ্যবতী লিজা নাকে দিয়ে শব্দ করতে করতে এক জায়গায় কিছুটা বালু জড় করল: 'আমি রাজ প্রাসাদ গড়ব।' ধীরস্থির ভোভা ডালপালা এনে বালুতে গাড়তে লাগল,—সে পার্ক তৈরি করছে। এমন সময় ছুটে এল মিশা: 'এই, তোরা এখানে কী করছিস? আমি দুশমন, এক্ষুনি তোদের উপর হামলা করব!' একটি ডাল দোলাতে দোলাতে সে লাথি মেরে প্রাসাদটি ভেঙে ফেলে। লিজা তো কেঁদে একেবারে অস্থির, আর ভোভা ধীরেসুস্থে ইতস্তত ছড়ানো ডালপালা জড় করে আবার আগের জায়গায় গাড়তে লাগল।

এবার যে-কথাটি প্রথমে মাথায় আসে তা হল—শিশু তিনটির মধ্যে কোন মিলই নেই! কিন্তু তা কি সত্যি? হ্যাঁ, তাদের যদি পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে তাদের মধ্যে ঠিকই কোন মিল দেখা যাবে না। একটি শিশু শান্ত স্বভাবের, অন্যটি গোলমেলে, দুরন্ত, তৃতীয়টি কাঁদুনে। কিন্তু আমাদের চার বছরের ছেলেমেয়েদের যদি অন্য বয়সের অর্থাৎ বয়সে এক-দুই বছরের ছোট ও বড় শিশুদের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে অন্য একটি ব্যাপার চোখে পড়বে—তারা কত সমান। তারা সবাই প্রায় একই রকম কথা বলতে পারে, কল্পনা করে, খেলাধুলো করতে ভালোবাসে, অকপট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। তার কারণটি হচ্ছে এই যে তারা বিকাশের একই ধাপে অবস্থান করছে।

হ্যাঁ, সমস্ত শিশু একই পথ অতিক্রম করে (স্থান ও কাল বিশেষে একটু উনিশ-বিশ অবশ্য হয়েই থাকে)। তা আমাদের সমস্ত শিশুর বিকাশের অভিন্ন নিয়মগুলো বোঝার সুযোগ দেয়। শিশুকে জানা—এর মানেই হচ্ছে সর্বাগ্রে ঠিক এই অভিন্ন নিয়মগুলো জানা, আর তারপর প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে আলাদাভাবে ওই জ্ঞান প্রয়োগ করা।

সেই জন্যই আমরা বইয়ের শুরুতে যে-প্রশ্নটি রাখছি তা হল কীসের দ্বারা শিশুর বিকাশের সাধারণ গতি নির্ধারিত হয় এবং ওই গতি কীসের উপর নির্ভরশীল।

শিশুর বিকাশ কীসের উপর নির্ভরশীল

মানব সমাজের বাইরে থেকে কি মানুষ হওয়া যায়? জোসেফ রেডিয়ার্ড কিপলিঙের 'মাউগ্লি' নামক কাব্য-রসাত্মক রূপকথাটি সবারই হয়তো জানা আছে। তার চেয়ে কম কাব্য-রসাত্মক, তবে রোমাঞ্চকর ঘটনা আর জটিল সব কৌশলে পূর্ণ টার্জানের কাহিনীটিও সম্ভবত কারো অজানা নেই। নেকড়ের দ্বারা লালিতপালিত মানব শিশু... বানর পোষিত মানব শিশু... নেকড়ের ঘ্রাণশক্তি ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, বানরের শক্তি ও চাতুর্যের সঙ্গে মানব বুদ্ধির সমন্বয়। দুঃখের বিষয়, এমনটা ঘটে কেবল রূপকথায়। জন্তু কর্তৃক শিশু হরণের প্রায় ৩০টি ঘটনা বিজ্ঞানের জানা আছে। ওগুলো মোটেই মাউগ্লি কিংবা টার্জানের কাহিনীর মতো নয়।

এরূপ একটা ঘটনার কথা পাঠকের হয়তো জানা আছে। তা ঘটেছিল ১৯২০ সালে। ঘটেছিল ভারতে। আর. সিং নামে জনৈক ব্যক্তি খবর পেলেন যে একটি গ্রামের কাছে অদ্ভুত দু'টি প্রাণী দেখা গেছে। ওগুলো দেখতে মানুষের মতো, কিন্তু চলাফেরা করে হামাগুড়ি দিয়ে। প্রাণীগুলোর পেছু নেওয়া হল। একদিন শ্রী সিং কয়েক জন শিকারীর সঙ্গে নেকড়ের গর্তের কাছে লুকিয়ে থেকে দেখতে পান কীভাবে মাদী নেকড়ে তার বাচ্চাদের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চাদের মধ্যে ছিল দু'টি মানব শিশু। উভয়ই মেয়ে। একটির বয়েস প্রায় ৫-৬ বছর, অন্যটির — ৩।

শ্রী সিং মেয়ে দু'টিকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। তিনি ওদের মানুষ করার চেষ্টা করলেন। তারা হামা দিয়ে ছোটাছুটি করত, লোকজন দেখলে ভয় পেত ও লুকিয়ে পড়ত, খ্যাঁক করত, রাত্রি বেলা নেকড়ের মতো আর্তনাদ করত। একদিন বড় মেয়েটি—নাম ওর কমলা—সুযোগ বুঝে উঠোনের

কুকুরগুলোকে তাড়িয়ে দাঁত দিয়ে হাড়টি তুলে নিল এবং এক পাশে সরে গিয়ে তা কামড়ে খেতে লাগল। ছোট মেয়েটি — ওর নাম অমলা — এক বছর বাদে মারা যায়। কমলা বেঁচে ছিল ১৫ বছর। ৯ বছরের মধ্যে তার নেকড়ের অভ্যাসগুলো কোন মতে ছাড়ানো গেল, তবে তাড়াহুড়ো থাকলে সে হামা দিয়েই চলত। কমলা মানুষের ভাষা আয়ত্ত করছিল খুবই কষ্টে। ১১ বছর বয়সে সে মাত্র ৩০টি শব্দ জানত এবং কেবল জীবনের শেষ দিকে ব্যাকরণ বুঝতে শুরু করেছিল।

তাহলে দেখাই যাচ্ছে, মানব সমাজের বাইরে মানুষের প্রকৃতি প্রদত্ত গুণাবলি বিকাশ লাভ করতে পারে না।

— কিছু বিদেশী মনস্তত্ত্ববিদ মনে করেন যে শিশুতে বীজেরই মতো জন্ম থেকে ভাবী মানুষের সমস্ত গুণ বিরাজ করে। সমাজই হচ্ছে সেই উর্বর জমি যেখানে এ বীজ অংকুরিত হয়ে উদ্ভিদে পরিণত হয়। যা-ই করুন না কেন চোরের ছেলে চোরই হবে।

— আসলে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উল্টো: শিশুই হচ্ছে সেই জমি যেখানে সমাজ মানবীয় গুণাবলির বীজ বপন করে। আমাদের মধ্যে প্রকৃত মানবিক যাকিছু আছে তা আপনা থেকে আসে না, আয়ত্ত করতে হয়, — বলেন সোভিয়েত মনস্তত্ত্ববিদ আ. ন. লেওন্তিয়েভ।

অত্যধিক নমনীয়তা, শেখার ক্ষমতা, নতুন বিষয় আয়ত্তের প্রায় অপরিসীম সম্ভাবনা — এগুলোই মানব মস্তিষ্কের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। জন্তুজানোয়ারের মস্তিষ্ক তা থেকে বঞ্চিত।

মানব মস্তিষ্কের সম্ভাবনা বিপুল, প্রায় অনন্ত। তবে এই সমস্ত সম্ভাবনা ব্যবহৃত হতে পারে বিভিন্নভাবে, এমনকি পশুর স্বভাব লাভের উদ্দেশ্যেও। তা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। শিশু যদি মানুষ হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য সে জীবন এবং শিক্ষাদীক্ষার মানবীয় পরিবেশের কাছেই ঋণী। এরূপ পরিবেশ মানব জাতির প্রত্যেক প্রতিনিধিকে জীবজন্তুর চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে উঠতে সাহায্য করে, মানবোচিত দক্ষতা আর গুণাবলি অর্জনের জন্য ভিত্তি গড়ে দেয়।

মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রতিভা পুরোপুরিভাবে 'বাস্তব রূপ' পরিগ্রহ করে মানুষের শ্রম সৃষ্ট বিষয়াদিতে। তা হচ্ছে বৈষয়িক সংস্কৃতির সম্পদগুলো — আমাদের চারিদিকের জিনিসপত্র, বাড়ি, গাড়ি, তা হচ্ছে আত্মিক সংস্কৃতির সম্পদ — ভাষা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা। প্রতিটি নতুন প্রজন্ম পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে অতীতে সৃষ্ট

সমস্ত ধনসম্পদ, প্রবেশ করে সর্বপ্রকার মানব প্রতিভা সমৃদ্ধ পৃথিবীতে।

আমাদের পেছনে রয়েছে মানব সমাজ বিকাশের বহু শতাব্দীর ইতিহাস। তা নির্ধারণ করে আমাদের দক্ষতা। এ ব্যাপারটি চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেন একজন প্রখ্যাত সোভিয়েত গণিতবিদ আন্দ্রেই কলমোগরোভ। তিনি বলেন যে বড় বড় কবির মতো ভালো কবিতা লিখতে পারে এমন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র 'প্রস্তুত করা যে-সমাজে কবিরা বাস্তবভাবে বিকাশ লাভ করছেন তার সাংস্কৃতিক জীবনের সমগ্র বিকাশের মডেল সৃষ্টি করার চেয়ে সহজ নয়'।

তার মানে, মানুষের উত্তরাধিকারের জীবতাত্ত্বিক সূত্রের স্থান নিয়েছে উত্তরাধিকারের সামাজিক সূত্র। জীবতাত্ত্বিক ও সামাজিক উত্তরাধিকার সূত্র শিশুর বিকাশে কী পরিমাণ অবদান রাখছে তা মাপা যায় না, উভয় সূত্রে সে ঠিক কতটা পাচ্ছে তা হিসাব করা যায় না। কেবল একটি জিনিস পরিষ্কার যে উত্তরাধিকারের সূত্রগুলো প্রকৃত পক্ষে মানুষের বিকাশে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে থাকে: জীবতাত্ত্বিক উত্তরাধিকার সূত্র সামাজিক উত্তরাধিকার সূত্রের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, আর সামাজিক উত্তরাধিকার সূত্র গড়ে মানুষের আচরণ, মানুষের মানসিক গুণ ও দক্ষতা।

শিশুর বিকাশে এই দুই ধরনের উত্তরাধিকারের ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় বহির্জগতের সঙ্গে মেলামেশার প্রধান উপায়সমূহ থেকে বঞ্চিত অন্ধ-বধির-মূক শিশুদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। শিক্ষাদীক্ষা থেকে বঞ্চিত এই শিশুরা কোন জিনিস নেয় না এবং স্পর্শ করে না। খেলনা কী জিনিস তা তারা জানে না এবং বুঝেও না। মেলামেশায় চাহিদা নেই। এরূপ ছেলেমেয়ের সমগ্র মনঃপ্রকৃতি সবচেয়ে সাধারণ দৈহিক চাহিদাসমূহ উপলব্ধির মধ্যে এবং ওই সমস্ত চাহিদা পূরণজনিত সাধারণ সন্তোষ ও অসন্তোষ উপভোগের মধ্যে সীমিত।

কিন্তু অন্ধ-বধির-মূক শিশুরা যখন শিক্ষা লাভ করতে শুরু করে? সাধারণ সুস্থ শিশু অনেককিছুই আয়ত্ত করে অন্যদের দেখে দেখে, বড়দের সঙ্গে দৈনন্দিন মেলামেশার প্রক্রিয়ায় সে অনেককিছু 'চুষে নেয়', সমস্ত ব্যাপারে সে তাদের অনুকরণ করে, জিনিসপত্র নিয়ে কাজকর্ম করতে শেখে। তবে অন্ধ-বধির-মূক শিশুর ক্ষেত্রে তা ঘটে না। উদ্দেশ্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যতিরেকে সে কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না, অন্তত প্রথম দিকে তো নয়ই। এমতাবস্থায় মানুষ গড়ার প্রক্রিয়াটি চলে গবেষকদের তত্ত্বাবধানে, তাঁদেরই চোখের সামনে। গোড়াতে চলে সবচেয়ে সাধারণ স্বাভাবিক চাহিদাগুলো পূরণের সঙ্গে জড়িত ক্রিয়াকলাপ আয়ত্তকরণের কাজ, এবং তা চলে মানবীয়

পদ্ধতিতে ওই উদ্দেশ্যে নির্মিত জিনিসপত্র ব্যবহারের সাহায্যে। তারপর শুরু হয় খোদ জিনিসপত্রের প্রতি, ওগুলোর গঠন ও উদ্দেশ্যের প্রতি আগ্রহ জাগরণ, অনুকরণ ও উপলব্ধি প্রক্রিয়ার আবির্ভাব, ধারণা সঞ্চয়করণ। এবং কেবল এর ভিত্তিতেই আরম্ভ হয় ভাষা — প্রথমে অঙ্গভঙ্গি আর আকারে-ইঙ্গিতের ভাষা, পরে মৌখিক ভাষা — আয়ত্তকরণের কাজ। সোভিয়েত ইউনিয়নে এরূপ ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয় বিশেষ স্কুলে। বোধশক্তি, স্মৃতিশক্তি আর মনন শক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়াকলাপ, ক্রীড়া, শ্রম আর শিক্ষা ক্রিয়াকলাপ আয়ত্তকরণের সঙ্গে সঙ্গে। ফলে — পূর্ণ স্বনির্ভরতা, চার শ্রেণীর শিক্ষা, উৎপাদনী পেশা। সম্ভাবনা অসীমিত। অন্ধ-বধির-মূক ওলগা স্কোরোখদোভা — একজন স্বনামধন্য বিজ্ঞানী, তিনি মনোবিজ্ঞানে পি-এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেছেন।

ঠিক কোন্ কোন্ সামাজিক প্রভাব কীভাবে শিশুর মানসিক গুণাবলি গঠন করে তা নিরূপণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা খেটে চলেছেন। এ হচ্ছে অতি কঠিন সমস্যা, এবং আজও তা সমাধান করা হয় নি। আপাতত আমরা যাকিছু ব্যাখ্যা করতে পারি না, তা না ভেবেই জীবতত্ত্বের উপর ছেড়ে দিই। 'ও জন্মেছেই ও রকম', 'ওর কোন শ্রুতিশক্তিই নেই', 'যেমন ঝাড় তেমনি বাঁশ' — এ ধরনের কথাবার্তা বলা এবং তদ্দ্বারা শিশুর জন্য নিজের দায়িত্ব প্রকৃতি মাতার উপর চাপিয়ে দেওয়া সবচেয়ে সহজ।

একমাত্র নৈরাশ্যবাদীরাই জীবতাত্ত্বিক উত্তরাধিকারিতার ভূমিকা বড় ক'রে দেখে। কিন্তু আমরা আশাবাদের পক্ষে। শিশুর সম্ভাবনা অফুরন্ত, এবং তা যথাসম্ভব পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত করতে তাকে সাহায্য করা — এ হচ্ছে মা-বাবাদের প্রধান কর্তব্য।

নবজাতকের লালনপালন

— শিশু মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ, ফরাসি বিজ্ঞানী জাঁ পিয়াজ লেখেন যে বড়দের পৃথিবীটি শিশুর কাছে অপরিচিত ও অজ্ঞাত। তাকে ধীরে ধীরে এই পৃথিবীর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়, শৈশবের মধুর স্বপ্ন ত্যাগ করতে হয় এবং পৃথিবী যেরূপ আছে ঠিক সেই ভাবেই তাকে গ্রহণ করতে হয়।

— একেবারে শুরু থেকে, জন্মের মুহূর্তে থেকে শিশু হচ্ছে সামাজিক প্রাণী, — বলেন সোভিয়েত গবেষকরা। — চেয়ে দেখবেন, কীভাবে দু' মাসের শিশু বড়দের দিকে তাকিয়ে হাসে। শিশুকে পূর্ব পুরুষদের অভিজ্ঞতা দানকারী লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা, তাদের সাহায্যে 'মানবীকৃত প্রকৃতি' লাভ — কেবল এ সবই তাকে

মানুষে পরিণত করে। এবং সে মানুষ হয় মোটেই তার 'প্রকৃতির' সঙ্গে বিরোধে নয়, পূর্ণ সঙ্গতিতে।

কেবল একটি মাত্র কোষ থেকে। মানুষের জন্ম—এ হচ্ছে প্রকৃতির সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপারগুলোর একটি। মাত্র ৫০ দিনের মধ্যে মানব ভ্রূণ সেই প্রধান পর্যায়গুলো অতিক্রম করে, যার জন্য প্রকৃতি ব্যয় করেছে পঞ্চাশ কোটি বছরেরও বেশি সময়। ওই ৫০ দিনে কেবল একটিমাত্র কোষ থেকে গঠিত হয় মস্তিষ্ক, যকৃৎ, বৃক্ক আর পঞ্জরের মতো জটিলতম যন্ত্রযুক্ত মানব দেহ। ...কোন ইলেকট্রনিক মাইক্রস্কোপই প্রাথমিক কোষে এই সমস্ত যন্ত্র তো দূরের কথা, এমনকি ওগুলোর কোন চিহ্নও আবিষ্কার করতে পারে না। আছে কেবল ভবিষ্যৎ দেহের প্রকল্প, আর সঠিকভাবে বললে, তার নকশা।

৪ মিলিমিটার আয়তনের অতি ক্ষুদ্র ভ্রূণের গভীরে এই বিস্ময়কর আত্মসৃষ্টি শুরু হওয়ার কেবল ২০ দিন বাদেই লাল একটি বিন্দু মিটমিট করতে আরম্ভ করে। এবার থেকে নারীর দেহে স্পন্দিত হতে থাকবে যুগপৎ দু'টি হৃদয়। মাতৃগর্ভে সন্তান তার বৃদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্তকিছুই পায়: নির্মাণ সামগ্রী, খাদ্য, অম্লজান, বহু রোগ-জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা। ৯ মাসের মধ্যে গর্ভে সঞ্চারিত ডিম্বকোষ রূপান্তরিত হয় গঠন ও ক্রিয়াকলাপের দিক থেকে অতি জটিল এক দেহে, যা রূপে রসে গন্ধে ভরা বহু-বিচিত্র এই বস্তু জগতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে সক্ষম।

জন্মের মুহূর্তে শিশুর মস্তিষ্কে থাকে ১৫০০ কোটি স্নায়ু-কোষ! আপনাদের মনেই আছে যে কেবল একটিমাত্র কোষ থেকে অল্প কালের মধ্যে গঠিত হয় এরূপ বিরাট একটা সংখ্যা! স্নায়ু-কোষ—এ হচ্ছে স্মরণ রাখতে, বিশ্লেষণ করতে, সংশ্লেষ ও সৃষ্টি করতে সক্ষম অতি জটিল এক বিদ্যুৎ-রাসায়নিক যন্ত্র-সমাহার। সঠিকভাবে বললে, স্নায়ু-কোষ সম্ভবত স্মরণ রাখতে সক্ষম, তবে বাদবাকি সমস্তকিছু করতে পারে কেবল কোষ-সমষ্টি, অর্থাৎ গোটা মস্তিষ্ক, এবং তা-ও অবশ্য শিক্ষাদীক্ষার পর। শুরু করতে হয় বস্তুর সবচেয়ে সাধারণ গুণগুলো নিরূপণ করার ক্ষমতা দিয়ে: কঠিন, তরল, ঠান্ডা, টক। ...এগুলো হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিক্ষার সবচেয়ে প্রথম উৎস।

যে-পরিবেশে শিশুর জঠরাভ্যন্তরীণ বিকাশ ঘটে তা বস্তুত তার স্নায়ু ব্যবস্থাকে জন্মের অনেক আগেই মায়ের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে প্রথম 'ছাপগুলো' পেতে সাহায্য করে। তা দৃষ্টিশক্তির ব্যাপারটি কেমন? ভ্রূণ তো আলোক রশ্মি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আলোর অভাব পূরণ করে

মস্তিষ্কের দর্শন ক্ষেত্রসমূহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ভারসাম্য যন্ত্র (Organ of equilibrium) থেকে আগত ইম্‌পাল্‌সগুলো। এই যন্ত্রটি খুবই তাড়াতাড়ি কাজ করতে শুরু করে এবং সন্তান অথবা মায়ের যেকোন রকমের নড়নচড়নের সময় উত্তেজিত হয়ে উঠে। তা নিজের ইম্‌পাল্‌স 'বিনিময় করে' তাতে অভাব অনুভবকারী দর্শন যন্ত্রের সঙ্গে। এই ভাবে, ভেস্টিবুল্যার যন্ত্র 'দু'জনের জন্য' কাজ করতে বাধ্য—গর্ভবতী নারীর যে সচল ও সক্রিয় জীবন যাপন করা উচিত এটা তারই একটি কারণ।

মস্তিষ্কের জঠরাভ্যন্তরীণ বিকাশ প্রক্রিয়ার আছে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য, সমস্ত পরবর্তী পর্যায়ে তাৎপর্যের দিক থেকে যার সমান কোনকিছু নেই। মস্তিষ্কের কাঠামো, তার সূক্ষ্মতম উপাদান ও যোগাযোগ গড়ে উঠে, এক দিকে, বংশগত (জেনেটিক) কর্মসূচি অনুসারে, আর অন্য দিকে—বহির্জগৎ থেকে রিসেপ্টর ক্যানেলগুলোর (পঞ্চেন্দ্রিয়) মাধ্যমে আগত তথ্য প্রবাহের অনিবার্য ও স্থায়ী প্রভাবের মধ্যে।

এই সম্প্রতি কালেও ভাবা হত যে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় কোন এক সীমানা অতিক্রম করে যা মূলত এক জগৎকে অন্য জগৎ থেকে আলাদা করে রাখে। কিয়ৎ পরিমাণে তা সত্য। কিন্তু সেই সঙ্গে শিশুর জীবন (এবং এমনকি 'শিক্ষাও') আরম্ভ হয় তার জন্মলগ্নের অনেক আগেই। শিশু যে সামান্য অভিজ্ঞতা নিয়ে এ পৃথিবীতে আসে তা কেবল দূর অতীতের অভিজ্ঞতাই নয়, বর্তমানেরও বটে। আজ ক্রমশই অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে এই অভিজ্ঞতা আমরা যা ভাবতাম তার চেয়ে ঢের বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। মা-বাবাদের এ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন — তা মূল্যবান এবং চিত্তাকর্ষক।

নবজাতক কী করতে জানে? আপনারা হয়তো বললেন: ও কিছুই জানে না, সবই শিখছে (আর সঠিকভাবে বললে শিখতে বাধ্য)। তবে আমরা প্রায়ই শিশুর আচরণের রহস্য উদ্‌ঘাটনে অক্ষম প্রতিপন্ন হই। না, নবজাতক মোটেই তেমন অসহায় নয় এবং তেমন সাধারণ কোনকিছুও নয়।

নবজাতক অসহায়, কিন্তু এ ব্যাপারটি শুনতে যতই অদ্ভুত লাগুক না কেন, তার এই অসহায়তা হচ্ছে মানব মস্তিষ্কের বিস্ময়কর সম্ভাবনাগুলোরই প্রত্যক্ষ পরিণাম। ক্ষুদ্র মোরগ ছানা অনায়াসে ডিমের খোলা ভেঙে বেরিয়ে আসে এবং জীবনের প্রথম মুহূর্তগুলো থেকেই স্বনির্ভরভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে পারে। একবার একটা পরীক্ষা চালানো হল।

ডিমের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা মোরগ ছানাকে আবার একটি কৃত্রিম ও পূর্বাপেক্ষা কম শক্ত খোলায় ঢুকিয়ে দেওয়া হল। অভিজ্ঞ মোরগ ছানাটির সহজেই নতুন কাজটি সম্পন্ন করার কথা। কিন্তু তা ঘটল না! এবার মোরগ ছানা এমনকি বেরিয়ে আসারও চেষ্টা করল না। তার সহজাত প্রবৃত্তি কেবল অনুরূপ একটি অবস্থাতেই তাকে সাহায্য করতে পারে। ঠিক এ ধরনের দ্বিতীয় অবস্থাটি—যা বংশগতির যন্ত্র দ্বারা আগে থেকে পরিকল্পিত নয়—তার পক্ষে মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়।

এমনই হচ্ছে সহজাত প্রবৃত্তির শক্তি। তা কঠোরভাবে প্রাণীর আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে। সহজাত প্রবৃত্তি চালিত হাজার হাজার মাছ তাদের পূর্ব পুরুষদের ডিম ছাড়ার জায়গায় যাওয়ার অদম্য বাসনা হেতু বাঁধের কাছে মারা যেতে পারে। ঝাঁক ঝাঁক পাখি প্রতি বছর দক্ষিণের দিকে সুদীর্ঘ ও ক্লান্তিকর যাত্রার সময় বহু কাল আগে লুপ্ত পর্বতগুলো ঘুরে উড়তে থাকে। ...অন্ধ সহজাত প্রবৃত্তি!

অবশ্য এ কথা বলা ঠিক হবে না যে মানুষ সহজাত প্রবৃত্তি থেকে পুরোপুরিভাবে বঞ্চিত। মানুষের আচরণের কিছু মুখ্য, জীবতাত্ত্বিক ধারা বংশগতভাবে পূর্বনির্ধারিত: যেমন, বংশ বৃদ্ধি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ, আত্মরক্ষা।...

নবজাত শিশুর মস্তিষ্কের বিস্ময়কর পূর্ণাঙ্গতার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে তা অনেকাংশে সহজাত প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত এবং শিক্ষা লাভের পক্ষে, স্বনির্ভরভাবে বিশ্বকে উপলব্ধির পক্ষে ও নিজস্ব অভিজ্ঞতা অর্জনের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। পরবর্তী কালে এই সমস্ত গুণের দ্বারাই নিরূপিত হবে শিশুর মনঃপ্রকৃতির সারগর্ভতা, তার বুদ্ধি, চরিত্র, বোধশক্তি, মানুষের প্রতি, শ্রমের প্রতি ও নিজের প্রতি তার মনোভাব।

জন্মের আগেই শিশু কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করে। তা তাকে গোড়ার দিকে নিকট ও দূর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উপহার হিশেবে প্রাপ্ত বংশগত কর্মসূচিটি বাস্তবায়নে সহায়তা করে। এই কর্মসূচির উপাদানগুলো হচ্ছে সেই সমস্ত সহজাত প্রবৃত্তি যার দ্বারা চালিত হয় দুনিয়ার সমস্ত প্রাণীর নবজাত সন্তানেরা।

এ কথাটি বলে রাখা উচিত যে নবজাতকের সমস্ত দক্ষতা বর্ণনা করা অসম্ভব। এর কোন কোনটি বিলোপ পায়, বাকিগুলো টিকে থাকে, উৎকর্ষ লাভ করে ও সারা জীবন মানুষের সেবা করে।

শিশুর চোখের উপর উজ্জ্বল আলো ফেলুন, এবং দেখতে পাবেন যে

তার চোখের পাতাগুলো মুহূর্তের মধ্যে বুজে যাবে। এর আগে শিশু কখনও নিজের উপর আলোর প্রতিক্রিয়া অনুভব করে নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ইতিমধ্যেই 'জেনে গেছে' যে চোখ বাঁচানো উচিত। হঠাৎ জোরে হাত তালি দিন—শিশু আঁতকে উঠবে এবং হাত দু'টো প্রসারিত করে দেবে, যেন সে বিপদের মুহূর্তে আপনাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে।

শিশু জানে কীভাবে খাদ্য 'জোগাড়' ও হজম করতে হয়, সে মাকে ক্ষুধা, ঠান্ডা ও ব্যথার কথা 'বলতে' পারে, সে হাত-পা নাড়াতে জানে (অবশ্য খুবই বিশৃঙ্খলভাবে)। এই সমস্ত অঙ্গ-সঞ্চালন শিশুর পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়: তা তার রক্তসংবহন প্রক্রিয়া উন্নত করে, হৃদয় ও ফুসফুসকে তালিম দেয়, তাকে নিজ দেহকে আয়ত্তে আনতে শেখায়। নবজাতক হাঁচি দিতে পারে, গিলতে জানে, স্বর ও জোর অনুযায়ী শব্দ চিনতে পারে, মিষ্টি ও টক এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝে। এবং সে অবশ্যই শিক্ষালাভে সক্ষম।

মায়ের ভালোবাসা প্রসঙ্গে। শিশুর স্বাভাবিক মানসিক বিকাশের পক্ষে মায়ের ভালোবাসার তাৎপর্য আর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বলতে গেলে ভালোবাসা আর আদর কথা দু'টির মধ্যে সীমা নির্ধারণ না ক'রে পারা যায় না। শিশুর প্রতি ভালোবাসা বা স্নেহ হতে পারে অপরিসীম, কিন্তু আদর অবশ্যই সীমিত করা প্রয়োজন। আমরা সন্তান লালনপালনের ব্যাপারে মোটেই অত্যধিক কঠোর ও সংযমী হতে বলছি না। আমরা কেবল এটাই বলতে চাইছি যে শিশু যে পৃথিবীতে এসেছে তাকে সে চেনে না। সে সতৃষ্ণায় লব্ধ জ্ঞান শুষে নেয় এবং তাকে নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়, আচরণের নিজস্ব কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করে। জীবনের প্রথম দিনগুলো থেকেই এই অভিজ্ঞতা যদি মায়ের নিরবচ্ছিন্ন আদর সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে, সমস্ত ইচ্ছা, আবদার আর জেদ মেনে নেওয়ার নিরন্তর প্রস্তুতি সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে জড়িত থাকে, তাহলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতেই হয়, পরবর্তী কালে জীবন শিশুর সামনে যে-সমস্ত দাবি হাজির করবে ওগুলোর সঙ্গে তার এরূপ ধারণার কোন সঙ্গতি থাকবে কি?

শিশুরা জন্মায় অসহায় হয়ে। কিন্তু তারা বিলাসে অভ্যস্ত আদুরে গোপাল আর আত্মপ্রেমী স্বার্থপর হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। অনিয়ন্ত্রিত ভালোবাসা ও মাত্রাতিরিক্ত আদরই তাদের এরূপ করে তুলে।

তবে গোড়া থেকেই যদি শিশু নিজের চেষ্টায় খেটেখুটে প্রতিটি

পদক্ষেপ করে এবং বড়রা যদি তার উপর ব্যক্তিত্ব বঞ্চিতকারী সাহায্যে চাপিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকে, তাহলে শিশুর নিজের জন্য ও সমাজের জন্য মূল্যবান গুণাবলি অর্জনের ব্যাপক সুযোগ-সম্ভাবনা দেখা দেয়।

মানুষ মাত্রেই—আর শিশুর তো কথাই নেই—ভালোবাসা প্রয়োজন। কিন্তু সে হতে হবে যুক্তিসঙ্গত ভালোবাসা, যা মানুষকে মহীয়ান করে।

মা ও শিশুর পারস্পরিক সম্পর্কের চরিত্র—সে হচ্ছে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগত সমস্যা। মায়ের প্রতি সন্তানের অনুরাগ শুরুতে গড়ে উঠে তার চাহিদা পূরণের জন্য মায়ের সঙ্গে মেলামেশার মধ্য দিয়ে। শিশুকে খাওয়ানো—এরও শিক্ষামূলক প্রভাব রয়েছে: খাওয়ানোর কাজ কীভাবে চলছে তার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে মায়ের প্রতি এবং বহির্জগতের প্রতি শিশুর মনোভাব।

সঠিক শিক্ষাদীক্ষা। ...শিশুর জীবনের প্রথম ৩-৪ সপ্তাহে এর কোন প্রকৃত তাৎপর্য আছে কি? শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে কোনকিছু বলার তো সময় এখনও হয় নি? না, সময় হয়ে গেছে। শিশু দেখতে ও শুনতে, রঙ ও রূপ, শব্দ ও সৌরভ চিনতে আর বুঝতে শেখে। শিশুর যদি ঘুম পুরো না হয়, এবং সে যদি ক্ষুধার্ত থাকে ও সেবাযত্ন না পায়, তাহলে এ বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে তার বেশ কষ্টই হয়। সেই জন্যই প্রথম দিনগুলো থেকেই নিদ্রা, আহার ও জাগ্রত থাকার সঠিক সময় নির্ধারণ করা প্রয়োজন—এটাই হচ্ছে নবজাতকের শিক্ষাদীক্ষা। কিছু কাল বাড়িতে ঘড়িই প্রধান কণ্ট্রোল প্যানেলের ভূমিকা পালন করে।

ধরুন, শিশুকে হামেশা নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে খেতে দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় সর্বাগ্রে সে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় যা সে লাভ করতে পারে প্রতিকূল অনুভূতি নিবৃত্তির ফলে এবং যা একই সঙ্গে তার মনে মায়ের রূপ ফুটিয়ে তুলে।

এ ছাড়া ধীরে ধীরে শিশুর মধ্যে সেই অভ্যন্তরীণ সক্রিয়তার উপশম ঘটে যা সর্বদা দৈহিক চাহিদা পূরণের আগে দেখা দেয়। অন্য কথায়, শিশুকে এভাবে খাওয়ালে তার মধ্যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়াস প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মিথ্যা এক ধারণা গড়ে উঠতে পারে। শিক্ষাবিদ আর পথ্যবিদরা মিছেই খাদ্য গ্রহণের নির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রস্তুত করেন নি, — তাতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচিত হয়েছে বিভিন্ন বয়সের শিশুদের শক্তি চাহিদা। এখানে এ কথাটি জোর দিয়ে বলা উচিত যে শিশুর ক্ষুধাবোধ আদৌ কোন প্রলয়ঙ্কর পরিস্থিতি অবতারিত করে না। জীব দেহ বাইরে

থেকে শক্তি লাভ ব্যতিরেকে আরও দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে। তাই শিশুর ক্ষুধার্ত চিৎকার ভবিষ্যতে পুষ্টিকর দ্রব্যের সম্ভাব্য অভাব সম্পর্কেই সতর্ক করে দেয়; এরূপে চিৎকার মোটেই বর্তমানের কোন ভয়ঙ্কর অভাবের সঙ্কেত নয়।

মা'র বেশি শোনা উচিত সন্তানের 'জোরালো কণ্ঠ' নয়, ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ শব্দ। সেটাই যুক্তিসঙ্গত। শিশু যেই মাত্র দৈনন্দিন রুটিনে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, অমনি সে অসময়ে খাবার চাওয়া ছেড়ে দেবে। শিশু যাতে স্বাস্থ্যবান ও সুশৃঙ্খল হয়ে উঠে এবং নিয়মশৃঙ্খলা ভালোবাসতে শেখে দৈনন্দিন রুটিন তার জন্য অপরিহার্য। এ ডাক্তারদের বানানো, একঘেয়ে কোন ব্যাপার নয়।

আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা। জীবনের প্রথম মাসগুলো থেকে নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্য গ্রহণ করা, জাগ্রত থাকা ও নিদ্রা যাওয়ার তাৎপর্য আছে কেবল শারীরিক বিকাশের দিক থেকেই নয়। জীবনযাত্রার সুবিন্যস্ত ও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা মস্তিষ্কের কাজ সুশৃঙ্খলিত করে, দেহযন্ত্রের সঠিক ক্রিয়াকলাপে সহায়তা করে।

— যখন বিজ্ঞান অনুসারে সন্তান মানুষ করা হয় তখন সমস্তকিছুই এত জটিল হয়ে উঠে যে মাথা ঘুরতে আরম্ভ করে।

— বিজ্ঞান জটিলতা সৃষ্টি করে না, তা জটিলতা আবিষ্কার করে এবং সমস্যার নির্ভুল সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করে। শিশুকে সাধারণ ও মামুলি প্রাণী বলে বিবেচনা করা অনুচিত — এতেই রয়েছে শিক্ষণবিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র।

— কিন্তু আমাদের দাদা-দিদিমারা তো সমস্ত ধরনের তত্ত্ব ছাড়াই আমাদের মানুষ করেছেন, এবং কাজটি মন্দ উতরায় নি। লালনপালনের ব্যাপারে আমরা কি এখন অত্যধিক বাড়াবাড়ি করছি না?

— অবশ্যই, লালনপালনের ফলাফল শতাংশেও প্রকাশ করা সম্ভব: কতজন লোক ভালো বেরিয়েছে। কিন্তু এ থেকে সেই সমস্ত মা-বাবাদের কী লাভ যাঁদের সন্তানের বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। বিজ্ঞানই ব্যক্তিগত শিক্ষাদীক্ষার অনেকগুলো সমস্যা সমাধান করতে সাহায্য করে, এবং তা 'আন্দাজের উপর' নয়, ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি সহকারে।

অন্য একটি উদাহরণ। মাতৃ স্তন্য থেকে দুধ পাওয়ার জন্য শিশুকে বেশ শক্তি নিয়োগ করতে হয়। বলা যেতে পারে যে সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার খাদ্য জোগাড় করছে। কখনও কখনও শিশু মায়ের বুক থেকে যথেষ্ট পরিমাণ দুধ না চুষলে তাকে বোতল দিয়ে খাওয়ানো হয়। নিপ্‌লটি এমনভাবে তৈরি যে তাতে ঠোঁট দিয়ে চাপ দিলেই মুখে দুধ পড়তে থাকে। শিশুর জন্য এ অনেক সহজ কাজ, এবং নিপ্‌ল চুষতে অভ্যস্ত হয়ে সে

স্তন্যপান একেবারেই ছেড়ে দেয়। এ কথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে যে ঠিক এই ভাবেই দেখা দেয় আলস্য। কিন্তু সত্যকে স্বীকার করতেই হবে! শিশু অধিকতর সহজ উপায়ে খাদ্য জোগাড় করতে ভালোবাসে, এবং এ নিয়ে ভাবা উচিত।

বলা যেতে পারে যে জীবনের প্রথম মাসগুলোতে শিশু পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগের সাধারণ কিছু নিয়ম আয়ত্ত করে। তাই এতে বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই যে একটি শিশুর জন্য তাকে বিছানায় শোওয়ানোর মানে হচ্ছে নিদ্রা এবং এর চেয়ে বেশি কিছু নয়; আর অন্যটির জন্য — তা হচ্ছে ঘুম পাড়ানোর আগে দোলানো, গান গাওয়া, মাথায়-পিঠে হাত বুলানো, কোলে নিয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদির সূচনা মাত্র। মা-বাবারা যদি বদ্ধমূল অভ্যাসগুলো বদলাতে চান, তাহলে শিশু চিৎকারের দ্বারা তার 'অধিকার' ফিরে পেতে চেষ্টা করবে। এবং একেবারে নাজেহাল হয়ে মা যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে কোলে না নিচ্ছেন, ততক্ষণ সে চেঁচাতেই থাকবে।

নবজাতকের সক্রিয়তা — এ কেবল বিকাশের প্রয়োজনীয় শর্ত, তবে আদৌ তার প্রধান উপাদান নয়। যে-ব্যাপারটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে শিশুর দৈহিক চাহিদাগুলো বহুবিচিত্র, অথচ ওই সমস্ত চাহিদা পূরণের উপায় খুবই সীমিত। এ হচ্ছে প্রথম প্রতিবন্ধক যা অতিক্রম করতে সময় লাগবে। কিন্তু অভিজ্ঞতাও তো নিজে থেকে সঞ্চিত হয় না। শিশুর মধ্যে তা গড়ে উঠে লালনপালন আর শিক্ষাদীক্ষার প্রক্রিয়ায়।

এই ভাবে, শিশু সক্রিয়তার অধিকারী, কিন্তু তা প্রয়োগের উপায় থেকে সে বঞ্চিত। তা তাকে এখনও শিখতে হবে। এখানেই আমরা আবিষ্কার করি নবজাতকের দ্বিতীয়, বিস্ময়কর গুণটি। ধরুন, সে মায়ের বুক থেকে দুধ খাওয়ার কাজে ব্যস্ত রয়েছে; — তার পক্ষে এ হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এমন সময় হঠাৎ টেবিল ঘড়িটি বেজে উঠল — এবং শিশু মুহূর্তের মধ্যে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। 'কী ব্যাপার? আমি এখন যা করছি তার সঙ্গে এই অপরিচিত শব্দটির কোন সম্পর্ক আছে কি? তা কোন বিপদের হুঁশিয়ারি নয় তো?'

এবার থেকে অপরিচিত সমস্তকিছু, আকস্মিক সমস্তকিছু তার মধ্যে এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন নির্ণায়ক প্রতিক্রিয়া। অদৃশ্য ও নতুন সমস্তকিছুতে মস্তিষ্কের এই চমৎকার প্রতিক্রিয়া ব্যতিরেকে কোন ধরনের শিক্ষালাভ অসম্ভব। বলা যায় যে শিশু কোনকিছু না জেনে চমৎকারভাবে নতুনত্বযুক্ত সমস্তকিছুই জানতে পারে। তবে নতুনত্বের প্রতি

নিষ্ক্রিয় প্রতিক্রিয়া অচিরেই নতুনত্বের সক্রিয় সন্ধানে পরিণত হয়। এ স্রেফ নির্ণায়ক প্রতিক্রিয়াই নয়, এ হচ্ছে নির্ণায়ক-গবেষণামূলক ক্রিয়াকলাপ। এখানেই সক্রিয়তার আসল প্রয়োজন রয়েছে, এবং এই সক্রিয়তা অতি শিগ্‌গিরই সামাজিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।

শিশু সর্বদা খাদ্যের মতো বহির্জগতের বিচিত্র প্রভাবেরও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। 'অনুভূতিমূলক ক্ষুধা' বলে একটা কথাও এমনকি রয়েছে। এর মানে হচ্ছে—দর্শনীয়, শ্রবণযোগ্য ও অন্যান্য ব্যাপারাদির অভাব। গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে 'অনুভূতিমূলক ক্ষুধা' শিশুর বিকাশের উপর অতি প্রতিকূল প্রভাব ফেলে। তাই বেঁচে থাকার জন্য কেবল এক অন্নজলই যথেষ্ট নয়, এবং এ কথাটি ছোটবড় সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জিত হয় বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যোগাযোগ গঠনের মাধ্যমে। কোন শব্দ শুনলে শিশু মাথা ও চোখ ঘোরায়; আলো নিজের দিক থেকে তার শ্রবণ শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে। ধীরে ধীরে দেখা দেয় বহির্জগতের সঙ্গে দৈহিক যোগাযোগের ব্যাপক ও বহুমুখ এক ব্যবস্থা, যখন প্রতিটি ইন্দ্রিয় বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তথ্য লাভ করতে পারে।

জীবনের প্রথম মাসের শেষ দিকে শিশু কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যের পরিমাণ বিপুল আকার ধারণ করে। এই সমস্ত তথ্যের সবটাই তার চাই: কেননা চলাফেরার জন্য, ছোটাছুটির জন্য এবং সর্বত্র বিদ্যমান থাকার জন্য তাকে কম ক'রে হলেও পারিপার্শ্বিক বিশ্বকে জানতেই হবে।

শিশুকে দেখতে, শুনতে ও অনুভব করতে শেখান! জীবনের প্রথম সপ্তাহগুলোতে শিশু দিনরাত ২৪ ঘণ্টার বেশির ভাগ সময়ই ঘুমিয়ে কাটায়। তবে তার মানে এ নয় যে বহির্জগতের সঙ্গে—যেখানে রয়েছে শিশুর পক্ষে অপরিচিত, চিত্তাকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ কতকিছু—পরিচিত হওয়ার জন্য তার মোটেই সময় থাকে না। জাগ্রত থাকার সময়ে—আর এ সময়ের পরিমাণ প্রতি সপ্তাহেই বাড়তে থাকবে—শিশুকে দেখতে, শুনতে ও অনুভব করতে শেখানো উচিত। কাল প্রবাহে সে অবশ্য নিজেই সমস্ত ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, তবে মা-বাবার সহায়তায় তার বিকাশ প্রক্রিয়া চলবে অনেক দ্রুত গতিতে।

আলোক শক্তি গ্রহণের ক্ষমতা শিশু পেয়ে থাকে জন্মসূত্রে। তবে জিনিসপত্র দেখা, ওগুলোর রঙ ও রূপ চেনা এবং দূরত্ব বোঝা — এ সমস্তকিছুই তাকে এখনও শিখতে হবে। কাজ তেমন সহজ নয়, যদি

মনে রাখা যায় যে প্রথম প্রথম শিশু অচল জিনিসপত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে অক্ষম, আর কম রঙচঙে বস্তু তার মধ্যে কোন দর্শন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না বললেই চলে। সুতরাং উপযুক্ত খেলনা কিনে কেবল খাটের উপর ঝুলিয়ে দিলেই চলবে না; খেলনাটি যাতে শিশুর মুখ থেকে ৫০-৭০ সেণ্টিমিটার দূরত্বের মধ্যে — অর্থাৎ দর্শনযোগ্য দূরত্বের মধ্যে — থাকে সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে শিশু তার জীবনের দশম দিনে কিছুক্ষণ ধরে ধীর গতিতে চলন্ত জিনিসের উপর নজর রাখতে পারে। দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ দিকে সময় সময় চলন্ত জিনিসটি থামানো যায় যাতে শিশু তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে শেখে। একই সঙ্গে শিশুকে দু'চোখ দিয়ে দেখতে শেখানো উচিত। এ জন্য খেলনা ঝোলানো দরকার কেবল অনুভূমিক রেখাতেই নয়, উল্লম্বভাবেও — তাতে তা কখনও শিশুর চোখের কাছে চলে আসবে, আর কখনও চলে যাবে দূরে। এ ব্যাপারে মনোযোগ না দিলে সে একই অবস্থায়, দেহভঙ্গি না বদলে, অনেকক্ষন ধরে জানলা কিংবা আলোর দিকে তাকিয়ে থাকবে। তা মাথার খুলির গঠন নষ্ট করতে এবং শিশুর মধ্যে জড়তা বা নিষ্ক্রিয়তা সৃষ্টি করতে পারে। আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই জড়তা শিশুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়ে অনেকাংশে তার ভবিষ্যৎ বিকাশ নির্ধারিত করবে।

শ্রবণ শক্তি বিকাশের জন্য এমন জিনিস ব্যবহার করা উচিত যা শব্দ করে। যেমন ঝুনঝুনি। শিশু কান পেতে শব্দ শুনবে এবং চোখ দিয়ে ঝুনঝুনির উপর নজর রাখবে। এই ভাবে শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের মধ্যে সহযোগিতা শুরু হয়। কিছু কাল বাদে সে অন্য দিকে তাকানোর উদ্দেশ্যে মাথা ঘোরাতে শিখবে: ওখানে কীসের শব্দ হচ্ছে? শিশুর সঙ্গে কথা বলা খুবই ভালো। তা ধ্বনি বোধের সূক্ষ্মতা বিকশিত করে এবং পরে তাড়াতাড়ি কথা বলা শিখতে সাহায্য করে।

শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করে বড়দের সঙ্গে, বিশেষত মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক। স্বাভাবিক কারণ হেতু মা ও সন্তানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠে। মা-ই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যাঁকে শিশু চিনতে শেখে। সত্যিই, এই কিছু কাল আগেও তার কাছে মায়ের কণ্ঠ, তাঁর মুখ অন্য কোন নারীর কণ্ঠ ও চেহারার চেয়ে মোটেই প্রিয়তর ছিল না। কিন্তু ২-৪ মাস পরে শিশু মাকে দেখলেই এবং তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেই আনন্দে হাত-পা নাড়াতে শুরু করে। সুতরাং, ওই বয়সে শিশু তুলনা করার অতি গুরুত্বপূর্ণ — আপাতত যত সাধারণই

হোক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না — একটা ক্ষমতা আয়ত্ত করে নেয়। মাকে চিনতে পেরে সে আমাদের কাছে প্রদর্শিত করে তার এবং সর্বদা তার সেবাযত্নে লিপ্ত নারীর মধ্যে বিদ্যমান যোগাযোগ উপলব্ধির ক্ষমতা। এ হচ্ছে শিশুর অন্যতম প্রথম ক্ষুদ্র 'আবিষ্কার', তার জাগ্রতমান চেতনার প্রথম অভিব্যক্তি। তবে নিজের মাকে চিনতে শুরু করার অনেক আগে শিশু অন্য লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করার সুস্পষ্ট আগ্রহ দেখায়। বড়দের কথাবার্তা, তাদের পরিবর্তনশীল মুখভাব এক মাসের শিশুর মনে বিপুল আনন্দের উদ্রেক করে, তাকে সজীব করে তুলে, হাত-পা নাড়াতে বাধ্য করে, তার মুখে মধুর হাসি ফুটিয়ে তুলে, তাকে মানুষের উপর দীর্ঘকাল দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে অনুপ্রাণিত করে। এ সমস্তকিছুই অনুকূল আবেগসমূহের প্রথম প্রকাশ, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার পর খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত প্রথম আনন্দ। অথচ এর আগে শিশু কেবল প্রতিকূল আবেগই দেখাত: খিদে পেলে চেঁচিয়ে কাঁদত, খাওয়ালে শান্ত হয়ে যেত এবং পেট ভরে গেলে বিশেষ কোন আনন্দ প্রকাশ করত না।

৫-৬ মাস বয়স নাগাদ শিশুর আবেগসমূহ বেশ বিচিত্র রূপ গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য লাভ করে।

শিশুর মনস্তত্ত্বের এই বৈশিষ্ট্যগুলো উপেক্ষা করা উচিত নয়। তার মধ্যে অনুকূল আবেগ — আর এর মানে হচ্ছে প্রফুল্লতা ও সক্রিয়তা — উদ্রেক করা ও টিকিয়ে রাখার পক্ষে উপযুক্ত যেকোন পরিস্থিতিই কাজে লাগানো প্রয়োজন। বড়দের সঙ্গে মেলামেশার মধ্য দিয়ে, খেলনা ইত্যাদি নিয়ে খেলাধুলার মধ্য দিয়ে শিশুর স্থায়ী আগ্রহ গড়ে উঠে।

মাঝেমধ্যে এমনও শিশু দেখা যায় যারা ৭-৮ মাস বয়সেও হামেশা বালিশ সজ্জিত খাটে বসে থাকে। তাদের কখনও খাট থেকে বার করা হয় না। এ ধরনের শিশুরা এরূপ অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। অথচ কয়েক মাস বাদেই তাদের স্বনির্ভরভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে হবে, কোথায় কী আছে তা দেখতে হবে, দৃঢ়তা, নিপুণতা আর নির্ভয়তা প্রদর্শন করতে চেয়ার-টেবিলে উঠতে হবে। রোঁয়া ভরা বালিশের চেয়ে অধিকতর ঘন জিনিসের সঙ্গে অপরিচিত শিশুর পক্ষে প্রথম বার টেবিল-চেয়ারের শক্ত কোণগুলোর মোকাবেলা করা কঠিনই হবে। সামান্যতম অকৃতকার্যতাও কোন ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের বাসনাকে দমিত করতে সক্ষম।

এই ভাবে জীবনের প্রথম মাসগুলো শিশুর স্মৃতিকে বহু জ্ঞানে পরিপূর্ণ করে রাখে, তার অনুভূতির জগৎকে বেশ জটিল করে তুলে এবং

তাকে বিচিত্র ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রস্তুত করে দেয়। যেই মাত্র সে চলাফেরা করতে পারবে এবং কথাবার্তা বলতে শেখে নেবে অমনি সে ওই সমস্ত ক্রিয়াকলাপে সক্ষম হয়ে উঠবে।

এক বছরের শিশুর প্রধান সাফল্যটি হচ্ছে এই যে তার মধ্যে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার চাহিদা, জ্ঞানার্জনের চাহিদা গড়ে উঠে। তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় তার আয়ত্তাধীনে, সে চলাফেরা করতে পারে, খেলনা নিয়ে নিপুণভাবে খেলাধুলা করে এবং ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করে। তার আচরণের এই সমস্ত উপাদানের — আপাত দৃষ্টিতে যা খুবই সাধারণ বলে মনে হয় — পেছনে লুক্কায়িত থাকে বিপুল মানসিক পরিবর্তন। শিশুর স্মৃতিতে সঞ্চিত থাকে নিকটতম সামগ্রীগুলোর অসংখ্য প্রতিরূপ ও তা সম্পর্কিত জ্ঞান; মিলিতভাবে কর্মরত ইন্দ্রিয়সমূহ ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করে; প্রথম কথাগুলো তা সংশ্লেষ করতে সহায়তা করে। দর্শন শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে, ভারসাম্য যন্ত্র আর 'পেশীতন্ত্রের অনুভূতির' নিয়ন্ত্রণাধীনে সম্পাদিত সমন্বিত ক্রিয়াকলাপ ও চলাচল পরিণত হয় 'সংকল্প' বাস্তবায়নের উপায়ে। শিশু ঝুনঝুনি ছুঁড়ে ফেলে এবং মেঝেতে তা পতনের শব্দের অপেক্ষায় থাকে। সে আগে থেকেই তার কাজের ফল জানে ও প্রত্যাশা করে (ভবিষ্যতে সর্বদা তা কি তার পক্ষে সম্ভব হবে?)। তার ইন্দ্রিয়সমূহ ও হাতগুলো বস্তু জগতের সঙ্গে পরিচিত, — ওই সমস্ত বস্তুর মধ্যেও মানব অভিজ্ঞতা পুঞ্জীভূত।

আমরা জানি না, ঝুনঝুনি উদ্ভাবন করতে মানবজাতির কত কাল লেগেছে। তবে আজ শিশু তা পাচ্ছে প্রস্তুত আকারে। ওই রকমই প্রস্তুত আকারে সে পাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের খেলনা ও ব্লক, গাড়ি ও বই, সঙ্গীত ও টেলিভিশন এবং অবশ্যই আচরণের নৈতিক আদর্শ।

শিশুর শারীরিক শিক্ষা। শিশুর লালনপালন ও শিক্ষাদীক্ষা কীরূপ হওয়া উচিত এই প্রশ্নটিকে ঘিরে তুমুল বাদানুবাদ কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। অনেকে মনে করেন যে জীবনের প্রথম বছরগুলোতেই শিশুদের শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক জীবনের ত্বরিত গতি চালু করা প্রয়োজন, এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে — প্রস্তুতি পর্ব দ্রুত অতিক্রম ক'রে মানুষের পরিপক্কতা নিকটস্থ করা, তার সমাজ সেবার সর্বোত্তম সময়টি কাছিয়ে আনা।

অন্যদের চিন্তাধারা এঁদের ঠিক বিপরীত। তাঁরা মনে করেন যে শিশুর শিক্ষাদীক্ষার কাজকে জটিল করে তোলা অনুচিত, কেননা তা শিশুর পক্ষে কষ্টকর এবং তার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

প্রথম দলের লোকেরা তাঁদের প্রস্তাবের সমর্থনে যে-যুক্তিটি হাজির করেন তা হল বিপুল পরিমাণ জ্ঞান, যা মানুষকে আয়ত্ত করতে হয় অপেক্ষাকৃত অনতিদীর্ঘ জীবনে, এবং শিশুর মস্তিষ্কের প্রায় অসীমিত সম্ভাবনা। দ্বিতীয় দলভুক্ত ব্যক্তিরা এই উপদেশ দেন যে মস্তিষ্ক ছাড়া শিশুর হৃদয় বলেও যে একটি জিনিস রয়েছে তা ভুলা উচিত নয়। তাঁদের মতে, অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক চাপের মধ্যে আশঙ্কিত হৃদয় দ্রুত কাজ করতে শুরু করে। তাঁরা আরও বলেন যে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে 'মধুর শৈশব' বলেও শিশুর একটি সময় রয়েছে এবং তা হ্রাস করা নিতান্তই অনুচিত।

তাহলে সত্য কোথায়? আমরা সেই সমস্ত পিতামাতাকে সমর্থন করি যাঁরা সারগর্ভ ও সঙ্গীতপূর্ণ বিকাশের দ্রুত গতির সঙ্গে আনন্দমুখর শৈশবের মিলন ঘটাতে চান।

সেই সঙ্গে আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে শৈশবের শারীরবৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক নিয়মানুবর্তিতার জ্ঞান শিশুর আবেগপূর্ণ, মেধাগত ও মাংসপেশীগত জীবনের শিক্ষাভিত্তিক পরিচালনা কার্য এমনভাবে উৎকর্ষিত করে তুলবে যাতে জীবনের প্রাথমিক, 'সুবর্ণ' সময়টি আরও সুন্দর ও মধুর হয়ে উঠবে। শিশুর স্কুল জীবনের প্রথম বছরগুলো জ্ঞানের আনন্দে, জীবন্ত প্রকৃতির জগতে গভীর ও সক্রিয় অনুপ্রবেশের আনন্দে, পুস্তক পাঠ ও সঙ্গীতচর্চার আনন্দে, খেলাধুলা ও সারগর্ভ ক্রিয়াকলাপের আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের শত শত গবেষণাগারে অতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে শিশুর মস্তিষ্ক, তার মানসিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যাবলি এবং অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির ক্রিয়াকলাপ।

হ্যাঁ, শিশুর সম্ভাবনা সত্যিই অসীম।

শিশুদের বিপুল সম্ভাবনার দিকে নজর দেওয়া যাক। এই সমস্ত সম্ভাবনা চোখে পড়ে প্রতি বার, যখনই জীবনের প্রথম মাসগুলো থেকে শিশুদের নির্দিষ্ট ধরনের সংকীর্ণমুখী শরীরচর্চায় লিপ্ত থাকতে হয় — তা হতে পারে সন্তরণ, ভারোত্তোলন কিংবা ব্যায়াম। সব ক্ষেত্রেই আমাদের অবাক করে সেই বিস্ময়কর দ্রুততা যার সাহায্যে অর্জিত হয় গতিসমূহের সহযোজনের পরিপূর্ণতা, অবাক করে গতিসমূহের যথাযথতা, শিশুর সহনশীলতা। এর কারণটি হয়তো এই যে জীবনের প্রথম বছরগুলোতে গতির মেকানিজম অন্তর্ভুক্ত হয় স্নায়বিক গঠনসমূহের পরিণতি লাভের প্রক্রিয়ায়, অভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলোর ক্রিয়াকলাপের অভিন্ন এক ব্যবস্থায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়ায়।

কিন্তু যদি তাই হয়, যদি জীবনের প্রথম বছরগুলো এমনকি অতি জটিল অভ্যাস আর দক্ষতা গঠনের পক্ষে এরূপ অনুকূলই হয়, তাহলে সতর্কতা অবলম্বন করা হয় কেন, সন্দেহ প্রকাশ করা হয় কেন? কারণ, সন্দেহ প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি থাকে।

যেমন, অল্প বয়সে শিশুদের অপরিমিতভাবে সাঁতার শেখালে তা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থান আর দৈহিক ব্যবস্থার ক্ষতি সাধন করতে পারে। হাজার হলেও তা প্রধানত মাটিতে চলাফেরা করার জন্যই উপযোগী। মাথার খুলি (কেবল সিস্টার্ন্ই নয়, মস্তিষ্কাধারও) তখনও পুরোপুরিভাবে শক্ত হয়ে উঠে না। এর ফলে খুলি অস্বাভাবিক এক আকার ধারণ করে, তার পাশগুলো চেপ্টা হয়ে যায়। দেহের খাড়া অবস্থায় চাপ সহনের পক্ষে উপযোগী অস্থির গঠনে এবং শ্রোণিচক্রের সংযোজনে ব্যতিক্রম দেখা দেয়।

এ ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ ও নির্দিষ্ট কোন পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হয় নি। সেই জন্যই বলা মুশকিল, শারীরিক ত্রুটিবিচ্যুতি ভবিষ্যতে কতটা সারানো যেতে পারে। তবে আজ আমরা এ কথা ভালোই জানি যে একেবারে শৈশবে গড়ে উঠা অভ্যাস, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং এমনকি কিছু কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও (আর শারীরিক বৈশিষ্ট্য হলে তো কথাই নেই) বিশেষ স্থায়িত্ব লাভ করে, এবং ওগুলোর পরবর্তী পরিবর্তন সাধন সহজ হয় না।

বিশেষজ্ঞরা বলেন যে বেশি শারীরিক চাপের দরুন (মাত্রাতিরিক্ত নয়, স্রেফ বেশি চাপের দরুন) এবং শিশুর খাদ্যে ক্যালসিয়ামের অভাব হেতু অস্থির প্যাথোলজিকেল কোমলতা দেখা দিতে পারে, তা থেকে এই খনিজ পদার্থের বিলুপ্তি ঘটতে পারে এবং অস্থি কলায় শূন্যতা সৃষ্টি হতে পারে।

শিশুর অস্থি ব্যবস্থার জন্য নির্দিষ্ট পরিপক্কতা প্রয়োজন। সে পরিপক্কতা আপনা থেকে আসে না, তা শিশুর জীবনযাত্রা আর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িত। অতিরিক্ত শারীরিক চাপ হেতু বর্তমানে ও ভবিষ্যতে যে-সমস্ত কুফল বা অকল্যাণকর পরিণতি দেখা দিতে পারে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কেবল চলন-যন্ত্রই নয়। মাংসপেশী বিকাশের ব্যাপারে অসাবধান হলে তা শিশুর মানসিক ক্রিয়াকলাপকেও প্রভাবিত করতে পারে।

শিশুর শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম পদ্ধতির বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটাও বলতে চাই যে শারীরিক চাপ ছাড়া, গতি ছাড়া, পোড় খাওয়ানো ছাড়া শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব নয়। বিংশ শতাব্দীর মানুষ আগের চেয়ে অনেক কম গতিশীল। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে 'অতিরিক্ত' চলাফেরা না ক'রে আমরা শারীরিক শক্তি বাঁচাই,

শরীর ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা হ্রাস করি, ভীষণ পরিশ্রমী হৃদয়কে রক্ষা করি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হাইপোডিনামিয়া মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। আধুনিক বিজ্ঞান তা প্রমাণ করে দিয়েছে।

ছোট ছোট শিশুরা হাইপোডিনামিয়া থেকে মুক্ত। নিজের ছট্‌ফটে ছেলের খাটের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেই তা বেশ ভালো বুঝতে পারবেন। খাটের মধ্যে তাকে বন্দিত্ব দশা ভোগ করতে হয় তার চলার অদম্য বাসনার জন্য। কিংবা শিশুদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে গেলে দেখতে পাবেন এমন বিপুল এক তৎপরতা যা ইচ্ছে করলেও আর বাড়ানো সম্ভব নয়। তাই একমাত্র তখনই ভয়ের কারণ থাকতে পারে যখন মা-বাবারা শিশুদের স্বাভাবিক সক্রিয়তা সীমিত করেন।

প্রকৃতি শিশুকে দান করে অফুরন্ত জীবনী শক্তি, উদ্যম ও সক্রিয়তা। সঠিক শারীরিক শিক্ষা পেলে, সর্বদা ব্যায়াম করলে এবং নিয়মিতভাবে পোড়ে খেলে ওই শক্তি, উদ্যম ও সক্রিয়তায় পার্থিব ধারণা মতে সবচেয়ে দীর্ঘ জীবনও কুলোবে। সেই জন্যই একেবারে ছেলেবেলা থেকে নিয়মিত শরীরচর্চার অভ্যাস গড়ে দেওয়া প্রয়োজন। এবং কেবল অভ্যাসই নয়, শরীরচর্চার প্রতি গভীর আগ্রহ আর ভালোবাসাও জাগিয়ে তোলা উচিত। তাহলেই শিশু বাধ্যবাধকতা ব্যতিরেকেই, নিজের উপর সামান্যতম বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকেই সুদীর্ঘ বছর শরীরচর্চার প্রতি এক স্বাভাবিক আসক্তি বজায় রাখতে পারবে।

তাহলে আপনারা, তরুণ মা-বাবারা, কি চান যে আপনাদের ছেলেমেয়েরা স্বাস্থ্যবান, শক্তিশালী ও শারীরিক দিক থেকে বিকশিত হয়ে উঠুক? কী দিয়ে শুরু করা যায়?

সর্বাগ্রে আপনাদের মনে রাখা উচিত শিশু যেন জীবনের প্রথম দিনগুলো থেকেই অবাধে নড়াচড়া করতে পারে—হাত-পা নাড়াতে পারে, হাত-পা ছুঁড়তে পারে, আর পরে হামাগুড়ি দিতে প্যারে। শিশু একটু বড় হলে বাধানিষেধ আরোপ করা এবং ডাকাডাকি-বকাবকি করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকবেন। অনেক মা-ই মনে করেন যে বাধানিষেধ আরোপ করলে ও ডাকাডাকি-বকাবকি করলে ছেলেমেয়েরা 'বাধ্য' হয়। কিন্তু সে হচ্ছে ভ্রান্ত ধারণা। 'ছোটাছুটি করিস না! লাফালাফি করিস না! একটু চুপ ক'রে বোস না-রে বাবা!' গুরুজনেরা অতি সদিচ্ছার বশবর্তী হয়েই সুস্থ শিশুর চলাফেরার স্বাভাবিক চাহিদাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, এ হচ্ছে তার জরুরী চাহিদা। তা দমানো অনুচিত।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে শিশুরা হাঁটা শিখতে না শিখতেই বিভিন্ন ধরনের বাধা অতিক্রম করতে কত ভালোবাসে। কখনও তারা সিঁড়িতে উঠে পড়ে এবং এমনকি ওখান থেকে লাফ দিতে চায়। কখনও কষ্টেসৃষ্টে চড়ে চেয়ারে, টুলে, টেবিলে।

এক নাগাড়ে অসংখ্য বার ওভাবে উঠা-নামা করতে পারে, এবং তাতে তারা মোটেই ক্লান্তি বোধ করে না। তা আপনাদের বিরক্ত করে, আপনারা ভয় পান যে শিশু পড়ে গিয়ে আঘাত পাবে। রাগবেন না এবং ভয় করবেন না। আর সবচেয়ে ভালো হয় যদি শিশুর নিরাপত্তার দিকে নজর রাখেন: তাকে একটু ধরে রাখুন, সোফাতে উঠতে সাহায্য করুন, পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সময় মতো ধরে ফেলুন—এ সমস্তকিছুই চমৎকার ও প্রয়োজনীয় ট্রেনিং!

আপনার সন্তান যত বেশি উদ্যমী, যত বেশি সক্রিয়, সেই 'রাসায়নিক গবেষণাগারটি' তত বেশি ভালো কাজ করে যা তার দেহযন্ত্রকে প্রয়োজনীয় সমস্ত পদার্থ জুগিয়ে থাকে। শিশুর দেহযন্ত্রে মেটাবলিজম প্রক্রিয়াগুলো বিশেষ প্রবল, কেননা পেশীর সক্রিয়তা—যা আমাদের সবার পক্ষেই উপকারী—শিশুদের পক্ষে খাদ্য, নিদ্রা ও তাজা হাওয়ার মতোই অতি প্রয়োজনীয়।

কিন্তু শিশুকে স্রেফ স্বাধীনতা দেওয়া, চলাফেরায় তার চাহিদা পূরণ করতে দেওয়া—এ হচ্ছে কাজের অর্ধেকটা। অন্যান্য শিক্ষার মতো শারীরিক শিক্ষাও হওয়া চাই সুচিন্তিত ও সুসংগঠিত।

দুধের শিশুর পক্ষেও ব্যায়াম অতি উপকারী। শিশু যদি সুস্থ হয় এবং ভালোভাবে বিকাশ লাভ করতে থাকে, তাহলে দু'মাস বয়স থেকেই ব্যায়াম শুরু করা যায়। ডাক্তার বা নার্স আপনাদের দেখিয়ে দেবেন কীভাবে ব্যায়াম ও অঙ্গমর্দন করতে হয়, এবং আপনারা অনায়াসেই অকঠিন এই টেকনিকটি রপ্ত করে নেবেন। ব্যায়াম করাবেন সতর্কতার সঙ্গে, শিশুর সঙ্গে মিষ্টি কথা বলবেন, সে যেন আনন্দিত হয়, হাসে, তার যেন ভালো লাগে। তখন গানের কোন বন্দোবস্ত থাকলে কিংবা নিজে গান গাইলে খুবই ভালো হয়। ব্যায়ামের সংখ্যা ও সময় নির্ধারণ করবেন ডাক্তার। গোড়ার দিকে ৫-৬ মিনিটই যথেষ্ট, পরে ধীরে ধীরে ১০-১৫ মিনিটে গিয়ে পৌঁছবে। ব্যায়াম করা উচিত খাদ্য গ্রহণের ঘণ্টা দেড়েক বাদে বা আধ ঘণ্টা আগে, সবচেয়ে ভালো—দিনের প্রথমাংশে। রাত্রিবেলা শিশুর জন্য ব্যায়াম নিষিদ্ধ: তা তাকে উত্তেজিত করে তুলে, ভালো ঘুম হয় না। ব্যায়াম শেষ হলে শিশুকে

যথারীতি কাপড়চোপড় পরিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেবেন, অন্তত আধ ঘণ্টা তার শান্তিতে বিশ্রাম করা দরকার। বাইরে ঠাণ্ডা থাকলে ব্যায়ামের পর ঘণ্টাখানেক না কাটলে শিশুকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবেন না।

দেখতেই পাচ্ছেন, কিছুই কঠিন নয়। তবে ব্যায়াম করা চাই নিয়মিতভাবে, প্রতি দিন এবং ক্রমশই তা জটিল করা উচিত। এমতাবস্থায় শিশুর মাংসপেশী আর গ্রন্থিগুলো মজবুত হয়, গতিতে সমন্বয় আসে। ফুসফুস ও হৃদয় চমৎকার বিকাশ লাভ করে, পাকস্থলী ভালো কাজ করে। ছোট ছোট ব্যায়ামবিদরা সাধারণত অধিক শান্ত হয়, তাদের গাঢ় ঘুম হয়, মনমেজাজ ভালো থাকে এবং ক্ষিধে পায়।

শিশুর এক বছর, দেড় বছর পূর্ণ হল। সে হাঁটতে শিখেছে, পায়ের উপর ঠিকমতো খাড়া থাকতে পারে, এমনকি দৌড়াদৌড়িও করে। এবার কেবল আপনার সাহায্য নিয়েই নয়, আপনার সাহায্য ছাড়াও তার হাত-পা নাড়ানো উচিত। দুই বছর পূর্ণ হওয়ার আগে শিশুরা অবশ্য মা-বাবার নির্দেশে ব্যায়াম করতে সক্ষম নয়। তাদের আগে থেকে দেখিয়ে দিতে হয় কীভাবে ও কী কী ব্যায়াম করা দরকার। তাদের কাছে ব্যায়াম হচ্ছে এক ধরনের খেলা, স্বভাবতই এর অন্য তাৎপর্য তারা বুঝতে পারে না। সেই জন্যই ব্যায়ামগুলোকে চিত্তাকর্ষক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করবেন যাতে প্রতিটি সঞ্চলন শিশুর পক্ষে বোধগম্য তাৎপর্য বহনকারী ক্রিয়াকলাপের এক-একটি অংশ হয়ে উঠতে পারে।

টুলের উপর বা টেবিলের এক প্রান্তে কোন খেলনা রাখুন, এবং তা নেওয়ার জন্য শিশুকে সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে দিন। অথবা মেঝেতে কিছু খেলনা ছড়িয়ে দিন ('আঃ, খেলনাগুলো কী অবাধ্য, পালিয়ে গেছে। ওগুলোকে ধরো তো, বাড়িতে নিয়ে এসো')। শিশু সানন্দে বার বার গুড়ি মেরে বসবে, খেলনাগুলো তুলতে থাকবে এবং আপনার কাছে ছুটে ছুটে আসবে।

মাটিতে বা মেঝেতে ৩০-৪০ সেণ্টিমিটার চওড়া ও ৩ মিটার লম্বা একটি পথ এঁকে দিন। তার উপর দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা ক'রে হেঁটে যাওয়া অথবা মেঝেতে ২৫-৩০ সেণ্টিমিটার দূরে দূরে রাখা লাঠির উপর দিয়ে চলা মোটেই সহজ নয়। দড়ির তলা দিয়ে হামা দিয়ে যাওয়া; কাঠ, বাক্স ও বেঞ্চি পেরিয়ে যাওয়া; সিঁড়িতে কিংবা গাছের গুঁড়িতে উঠে পড়া—এই সমস্ত ব্যায়াম শিশুর জন্য খেলাও বটে। 'ধরো ধরো', 'ঘোড়া ঘোড়া'—এ ধরনের ব্যায়াম ও খেলাধুলা খুবই চিত্তাকর্ষক।

এরূপ খেলাধুলোর আয়োজন করবেন ঘন ঘন, প্রতি দিন। সবচেয়ে ভালো সকাল বেলা — প্রাতরাশের ৩০-৪০ মিনিট পরে, অপরাহ্নে — ঘুমের পর এবং অবশ্যই বাইরে বেড়ানোর সময়!

শিশু বাধ্য হয়ে ক্ষুদে বৃদ্ধের মতো বড়দের হাত ধরে পথ চলছে — এরূপ দৃশ্য অতি দুঃখজনক। তার ছোটাছুটি ও খেলাধুলা করা দরকার, কেবল ঘুরে বেড়ানো তার পক্ষে যথেষ্ট নয়!

শিশু যখন ব্যায়াম ও খেলাধুল্য করে তখন আপনাকে কেবল নির্বাক দর্শক হলে চলবে না, খেলার সক্রিয় সাথী আর শরিকও হতে হবে।

...বাবা শিশুকে বগলে ধরে কয়েক বার তাঁর মাথার উপরে তুলবেন — প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে দ্রুত গতিতে। তখন শিশুর পিঠে ও ঘাড়ের পেশীতে চাপ পড়বে, মেরুদণ্ড সোজা রাখা অবস্থায় সে তার হাতগুলো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে অবশ্যই আনন্দ উপভোগ করবে, হাসবে। এরূপ ব্যায়ামের নিজস্ব নামও রাখা যেতে পারে। শিশু ব্যায়ামগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে সহজে সমস্ত খুঁটিনাটি মনে রাখতে পারবে।

'এসো, এবার উড়া যাক,' বলেন বাবা, এবং শিশু তা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দে লাফাতে শুরু করে, বাবার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উপরে 'উড়া' যায়। 'এসো তো দ্যাখি, এবার ডিগবাজি খাওয়া যাক...।' চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা শিশুকে পায়ের গোছ ধরে ধীরে ধীরে উপরের দিকে তোলা হয়। তখন তার মাথা আপনা থেকেই তার পিঠের দিকে চলে যেতে থাকে। মাথা শূন্যে উঠে গেলে সে হাত দু'টি নিচের দিকে বাড়িয়ে দেয় এবং মাদুরের উপর ভর দেওয়ার চেষ্টা করে। তারপর তার পাগুলো বিপরীত দিকে নামিয়ে দেওয়া হয় — এবং শিশু তখন উপুড় হয়ে থাকে। এরূপ ডিগবাজি গতির সমন্বয় সাধনের ক্ষমতা বিকাশে চমৎকার সাহায্য করে।

তিন বছরের বেশি বয়সের শিশুরা ঝুলন্ত অবস্থায় ব্যায়াম করতে পারে। ওই সমস্ত ব্যায়াম বিশেষ উপকারী: তা তাদের পিঠ ও হাতের পেশী মজবুত করে, ভারসাম্যতা বোধ গড়ে, তাদের সাহসী করে তুলে। আপনি নুইয়ে গিয়ে শিশুকে আপনার গলাটি জড়িয়ে ধরার সুযোগ দেন, তারপর আপনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেই সে শূন্যে ঝুলতে থাকে। শিশুকে কাঁধে ধরে ঘুরতে থাকুন। দু'বছর বয়স থেকে শিশুকে হাত ধরে তোলা যায়, আর চার বছর থেকে — প্রসারিত কিংবা আধা বাঁকানো হাতে মাটি থেকে সামান্য উপরে তুলে ঘোরানো সম্ভব।

শিশুরা দৌড়ে এসেও চক্কর খেতে পারে। এ কাজটি তাদের উৎরোয় খাসা। মা বা বাবার কাছ থেকে কিছু দূরে সরে গিয়ে শিশু তাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে ছুটতে থাকে। তখন তাকে বগলে ধরে নিয়ে কয়েকটি চক্কর দেওয়া যেতে পারে। শিশুকে এভাবে ঘোরানোর সময় তাকে উপরে-নিচে উঠানো-নামানো সম্ভব, অনুভূমিক অবস্থায় মাথার উপরও তোলা যায়।

শিশুর মধ্যে ছন্দবোধ, নির্দিষ্ট তালে ব্যায়াম করার ক্ষমতা এবং দ্রুত নতুন তালে চলে আসার নৈপুণ্য বিকশিত করার চেষ্টা করবেন। এর জন্য সেরা উপায় হচ্ছে—গান-বাজনার তালে তালে নৃত্য। শিশুরা নাচতে খুব ভালোবাসে, বিশেষ করে বড়দের সঙ্গে। এতে ক'রে তাদের সঙ্গীত শ্রবণের ক্ষমতা উৎকর্ষ লাভ করে, সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ গড়ে উঠে,—এই আগ্রহ স্বাভাবিক আকারে শিশুর মধ্যে দেখা দেয় জীবনের প্রথম বছরেই।

শিশুর ৩-৪ বছর পূর্ণ হলে তার খেলাধুলার সঙ্গে কিছু প্রাতঃকালীন ব্যায়াম যোগ করা উচিত। তা নিদ্রার পর দেহযন্ত্রকে সক্রিয় করে তুলে এবং শিশুকে শক্তি ও প্রফুল্লতা জোগায়। তদুপরি প্রাতঃকালীন ব্যায়াম তাকে শৃঙ্খলানিষ্ঠ করে, মানসিক স্থিরতা এনে দেয়—ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে এ গুণগুলো অপরিহার্য।

এখানে আরও একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কিছু কিছু অধীর মা-বাবা সঙ্গে সঙ্গেই অনুরূপ খেলাধুলা আর ব্যায়ামের ফল দেখতে চান। তাঁদের মোটেই তর সয় না। কিন্তু তাৎক্ষণিক 'বিস্ময়ের' অপেক্ষা করা উচিত নয়। তার চেয়ে বরং ধৈর্য ধরে থাকা এবং অটল হওয়াই অনেক শ্রেয়।

শিশুর মানসিক শিক্ষা। ত্বরান্বিত শারীরিক বিকাশের ফলাফল সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমরা অল্প বয়সের বিপুল সম্ভাবনাসমূহের সেরা ব্যবহারের খোদ ধারণাটি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি, কিন্তু স্বনির্ভর ও ঝুঁকিপূর্ণ পরীক্ষানিরীক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাই। একই কথা বলা যেতে পারে মানসিক শিক্ষার বিষয়ে। তার মানে আদৌ এ নয় যে আমরা অল্প বয়সী শিশুদের শিক্ষাদানের বিরোধী।

আমাদের জীবনের খোদ পরিবেশ, তার গতির ক্ষিপ্রতা, অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত বিকাশ অবশ্যই জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের সমস্যাবলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উদীয়মান পুরুষের মধ্যে ভবিষ্যৎ যেন আজই তার প্রতিনিধিদের গড়ছে। ঠিক সেই জন্যই পূর্বাভাস দানের সঙ্গে জড়িত পরীক্ষানিরীক্ষায় 'শিশু সমস্যাসমূহ'

এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এই সমস্যাসমূহের একটি হচ্ছে— কীভাবে আজকের শিশুদের, অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর নাগরিকদের লালনপালন করা ও শিক্ষাদীক্ষা দেওয়া উচিত।

বহু কাল আগেই লক্ষ্য করা গেছে যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব— মানুষের শৈশব সবচেয়ে দীর্ঘ। অপেক্ষাকৃতভাবে শিশুর স্বাবলম্বী হতে লাগে অনেক বছর। এ কী—অনতিক্রম্য স্বাভাবিক নিয়মানুবর্তিতা কিংবা হয়তো বড়দের রক্ষণশীলতা, যাঁদের অধিকাংশই আপন সন্তানসন্ততিদের ক্ষেত্রে লালনপালন আর শিক্ষাদীক্ষার সেই সমস্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকেন যা তাঁরা আয়ত্ত করেছিলেন নিজেদের মা-বাবার কাছে? প্রায়ই এ ধরনের লোক দেখা যায়—এবং এতে বিস্মিত হওয়ার মতো কিছু নেই—যাদের কাছে শিশুদের বিকাশের স্বভাবসিদ্ধ গতি খুবই সেকেলে এবং আধুনিক দাবিদাওয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিহীন বলে মনে হয়। তাদের মধ্যে সেই সমস্ত পিতামাতারাও রয়েছেন শিশুদের অসাধারণ সাফল্য সম্পর্কিত বিভিন্ন রোমাঞ্চকর সংবাদ যাঁদের কল্পনাকে একেবারে তোলপাড় করে দেয়। যেমন, জানা গেল যে ভোভা আর তানিয়া হাঁটতে শেখার আগে সাঁতার দিতে শিখে ফেলেছে, যা নাকি হচ্ছে ওদের বিস্ময়কর ক্রীড়া সাফল্যের প্রতিশ্রুতি স্বরূপ। কিংবা হঠাৎ সম্পূর্ণ আশ্চর্যজনক একটি খবর শোনা গেল: তিন বছরের কোরীয় ছেলে কিম ইউন ভান স্বচ্ছন্দে তিনটি ভাষায় কথা বলে, খুব ভালো দাবা খেলতে পারে এবং ইন্‌টিগ্র্যাল ক্যাল্‌কুলাস তার নখদর্পণে।...

— শিশুর মানসিক গঠনে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। তাকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে দিন, তাহলে সে নিজেই চারিদিকে যাকিছু তার কাছে বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক তা বেছে নেবে।

— 'নিজেই' কথাটি বলতে আপনি কী বোঝাতে চান? শিশু যে-সমস্ত সাধারণ সামগ্রী ব্যবহার করে তা মানুষের হাতে তৈরি। কেবল বড়রাই শিশুকে চামচ দিয়ে খেতে, ব্লক দিয়ে বাড়ি ইত্যাদি গড়তে শেখাতে পারে।

— মানলাম। কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রে শিশু ঠিক নিজেই নতুন, প্রয়োজনীয় ও চিত্তাকর্ষক কাজ শিখতে চেষ্টা করে। আমরা কিছুই তার উপর চাপিয়ে দিই না।

— তা কেবল 'প্রয়োজনীয়' এবং 'চিত্তাকর্ষক' কাজই শেখানো উচিত। এবং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে — প্রয়োজনীয়কে বেছে নিয়ে চিত্তাকর্ষক করে তোলা। এ কাজটি খোদ শিশুর উপর ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

হ্যাঁ, পৃথিবীতে সময় সময় এরূপ শিশুদের আবির্ভাব ঘটে যারা অতি

অল্প বয়সেই অসাধারণ মানসিক কিংবা শারীরিক ক্ষমতার অধিকারী। এ ধরনের ঘটনা থেকে এটাই বোঝা যায় যে শিশুদের বিকাশের যে-গতিতে আমরা অভ্যস্ত নীতিগতভাবে তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন গতিও সম্ভব।

কোরিয়ার সেই অসাধারণ ছেলে কিম ইউন ভানের কথাই ধরা যাক। আমরা জানি যে সে প্রথম কথাগুলো উচ্চারণ করতে আরম্ভ করে ৩ মাস বয়সে, হাঁটতে শুরু করে—৫ মাস বয়সে, নিজে বেড়াতে যেতে শুরু করে—৬ মাস বয়সে, আর ৭ মাস বয়সে লিখতে, পড়তে ও... দাবা খেলতে আরম্ভ করে। দ্বিতীয় বছরের গোড়াতে সে স্বচ্ছন্দে ইংরেজী বলতে আরম্ভ করে, তার এক মাস বাদে—জার্মান, এবং আরও দু'মাস পরে—চীনা ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। কিমের বয়স যখন দেড় বছর তখন পত্রপত্রিকায় তার আঁকা ছবি প্রকাশিত হতে লাগল, এবং ওগুলো সম্পর্কে যে-সমস্ত সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ছাপা হত শিশু শিল্পী তা আনন্দ সহকারে পড়ত। আড়াই বছর বয়সে কিম ডায়েরি লিখতে আরম্ভ করে। শ'খানেক পর্যটকের নতুন একটি দলের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ছেলেটি তার ডায়েরিতে লেখে: প্রতিদিন এখানে লোকজন আসছে। তারা হাজারো প্রশ্ন ক'রে আমায় ভীষণ বিরক্ত করে। আমার মাথা ধরে যায়। আমি সমস্তকিছু ঘৃণা করি। আমি কিছুই চাই না। আমার কেবল রঙিন পেন্সিল দরকার।'

এরূপ অনেক বর্ণনাই—যদিও তা তেমন অভাবনীয় নয়—দেওয়া যেতে পারে: যা-ই বলুন না কেন কিম হচ্ছে অসাধারণের মধ্যে অসাধারণ। এ ধরনের ব্যাপার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কিন্তু আপাতত কোন ব্যাখ্যা মিলছে না।

তা সত্ত্বেও আমরা একটা কথা যোগ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। প্রথম কথাগুলো উচ্চারণের কয়েক দিন আগে, অর্থাৎ ৩ মাস বয়সে, কিমের একসঙ্গে ১৯টি দাঁত উঠল! আমরা বলব, সে খুবই সুখের কথা। কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে—শিশুটি জটিল গাণিতিক সমস্যা সমাধানের সময় যে ডিফারেনশিয়াল ও ইনটিগ্র্যাল ক্যালকুলাস ব্যবহার করত ওগুলোর সঙ্গে উক্ত ঘটনাটির (অর্থাৎ দাঁত উঠার ব্যাপারটির) কী সম্পর্ক থাকতে পারে? তবে এখানে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করুন: অতি প্রতিভাবান অধিকাংশ শিশুরই অতি অল্প বয়সে দাঁত উঠে।

এ তথ্যটি খুব অল্প বয়সে শিশুর দক্ষতা বিকাশের কোন কারণ ব্যাখ্যা করতে পারে কি? অবশ্যই না। তবে নিঃসন্দেহেই তা ভাবনার খোরাক জোগায়।

মানুষের শারীরস্থান ও শারীরতত্ত্ব বিষয়ক যেকোন পাঠ্যপুস্তকে শিশুর

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও দেহযন্ত্র ব্যবস্থার পরিণতি লাভের মেয়াদ আর পরম্পরতা সম্পর্কিত তথ্যাদি পাওয়া যায়। এই সমস্ত তথ্য গৃহীত হয় হাজার হাজার শিশুকে গবেষণার ভিত্তিতে এবং সেই জন্যই তা টিপিকেল বলে বিবেচিত হয়। জানা আছে যে শিশুর অস্থি ব্যবস্থা কেবল ১২ বছর নাগাদ বড়দের অস্থির গঠন প্রণালীর পর্যায়ে পৌঁছে। দাঁত উঠার প্রক্রিয়াও চলে 'পঞ্জিকা মতে' — এক বছর পূর্ণ হওয়ার সময় শিশুর মুখে সাধারণত আটটি দাঁতই দেখা যায়। সময় মতো—অর্থাৎ যথেষ্ট সময়ানুবর্তিতার সঙ্গে—অন্যান্য শারীরস্থানীয় আর আঙ্গিক পরিবর্তনও ঘটে (যেমন, দেহ বাড়ে, বক্ষঃস্থল, মাথার খুলি ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আয়তন বৃদ্ধি পায়)। অনুরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় মস্তিষ্কের গঠনেও। নবজাতকের মস্তিষ্কের বা মগজের ওজন ২৫%, আড়াই বছর বয়সে—প্রায় ৭৫%, পাঁচ বছর বয়সে—৯০%।

এই ভাবে, শারীরস্থানীয় ও আঙ্গিক বিকাশ সম্পন্ন হয় নিজস্ব জীবতাত্ত্বিক ঘড়ি অনুসারে। অবশ্য এই ঘড়ি প্রতিবেশের প্রভাব অনুসারে ফাস্ট কিংবা স্লো-ও চলতে পারে। সাধারণত এই সমস্ত বিচ্যুতি, বলা যেতে পারে, 'পাঁচ মিনিটের সীমানার মধ্যে' থাকে। তবে কখনও কখনও, বিজ্ঞানে অজ্ঞাত কারণে, জীবতাত্ত্বিক ঘড়ি ভীষণ দ্রুত গতিতে চলতে আরম্ভ করে। চার মাস বয়সে শিশু হাসলে তার মুখে যদি শাদা দু' পাটি দাঁত দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে যে দেহের বৃদ্ধি ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণকারী অনেকগুলো ব্যবস্থায় (ওগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে—স্নায়ু ব্যবস্থা আর এন্ডোক্রিনিক ব্যবস্থা) বিপুল এক অগ্রগতি ঘটেছে। সম্ভবত তখন মস্তিষ্কেরও দ্রুত পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে।

তবে এখানে এ কথাটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভালো যে মস্তিষ্ক নিজে থেকে কোন মানসিক গুণ বা বৈশিষ্ট্যের জন্ম দিতে পারে না। এই সমস্ত গুণ বা বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠে কেবল শিশুর লালনপালন ও শিক্ষাদীক্ষার প্রক্রিয়ায়। কিম লিখতে-পড়তে শেখে ভীষণ অল্প বয়সে এবং অসম্ভব তাড়াতাড়ি—কিন্তু শিক্ষাদানকারী গুরুজনদের ছাড়া তার এই পারদর্শিতা মোটেই প্রকাশ পেত না। তবে মস্তিষ্কের আঙ্গিক পরিপক্কতার মাত্রার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে (এ সম্পর্কে প্রমাণ মেলে অকালজাত শিশুদের উপর পরিচালিত পরীক্ষানিরীক্ষা আর গবেষণায়) খোদ মানসিক বিকাশের গতি-প্রক্রিয়া (যদি প্রধান ফ্যাক্টরগুলো, আর সঠিকভাবে বললে লালনপালন ও শিক্ষাদীক্ষা, যথোপযুক্ত পর্যায়ে অবস্থান করে)।

শিশুর মস্তিষ্ক—এ কোন কম্পিউটার যন্ত্র নয়। তা কাজ করতে শুরু করে পুরোপুরিভাবে গঠিত হওয়ার অনেক আগে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বাভাবিক দৈহিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার উদ্দেশ্যে মস্তিষ্কের কিছুটা প্রস্তুতি থাকা দরকার।

পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে দেখা গেছে যে ইন্দ্রিয়সমূহের উপর বিভিন্ন প্রভাবের পরিমাণ ও প্রবলতা নিয়ন্ত্রণ ক'রে এই বিকাশের গতি বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস করা সম্ভব। বিশেষভাবে আমরা শিশুর উপর বহির্জগতের প্রভাবের চরিত্রের কথা বলতে চাইছি, এবং তার মধ্যে রয়েছে: আলো, শব্দ, তাপমাত্রা, বড়দের কথাবার্তা, অর্থাৎ জীবনের সেই সমস্ত পরিস্থিতি যা বড়রা শিশুর জন্য গড়ে দেয়। তার মানে কি এই যে শিশুকে যত বেশি সম্ভব অভিজ্ঞতা পেতে হবে? গবেষকরা এটাও প্রমাণ করেছেন যে পরিণতি লাভের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে অধিক পরিমাণ বাহ্যিক প্রভাব স্নায়ুকোষের হাইপারটেনশন এবং অন্যান্য অস্বাভাবিকতা ডেকে আনে। তবে কুফল সঙ্গে সঙ্গে দেখা না-ও যেতে পারে। এ কথা ভুলা উচিত নয় যে মস্তিষ্ক হচ্ছে মজবুত ও নির্ভরযোগ্য একটি 'মেশিন'। দৃঢ় জীবতাত্ত্বিক প্রতিরোধমূলক বাধাগুলো হাজার কোটি স্নায়ুকোষকে বহু ক্ষতিকর ফ্যাক্টর থেকে রক্ষা করে, প্রতিরক্ষামূলক দৈহিক মেকানিজমগুলো মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্যতা বজায় রাখে।

কিন্তু জীবনের সমস্ত পর্বে স্নায়ু ব্যবস্থা সমানভাবে অভেদ্য নয়। এমনও পর্ব আসে—ওগুলোকে সংকটময় পর্ব বলে অভিহিত করা হয়—যখন অতি অল্প হানিকর প্রভাব কিংবা এন্ডোক্রিনিক যন্ত্রগুলোর ক্রিয়াকলাপে সামান্যতম পরিবর্তনও অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করতে পারে। আমরা মোটেই এ কথা বলতে চাইছি না যে জীবনের প্রথম বছরগুলোতে শিশুর মস্তিষ্ক বিশেষ আহতিপ্রবণ এবং যেকোন অবিবেচিত পদক্ষেপ মর্মান্তিক পরিণাম ডেকে আনতে পারে। কিন্তু আসলে সমস্যাটি হচ্ছে এই যে বয়স্ক লোকের এবং এমনকি শিশুর মস্তিষ্কের কাজের উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আপন প্রতিরক্ষা শক্তির সাহায্যে 'ঘাত শোষণ' করতে, অর্থাৎ নেতিবাচক প্রভাব 'শুষে নিতে' পারে এবং কোন ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাবে না। শিশু তার অন্যান্য সমবয়সীদের মতোই জীবনযাপন করতে থাকবে, বেড়ে চলবে, নিজের 'আদর্শ আচরণ আর চমৎকার সাফল্যের' দ্বারা মা-বাবাকে আনন্দ দান করবে। কেবল অতি সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিই পরবর্তী কালে লক্ষ্য করবেন তার অসঙ্গত হাসি, রসিকতা ও সৌন্দর্যের প্রতি উদাসীনতা।

প্রাক্‌স্কুলবয়স্ক ছেলেমেয়েদের শিক্ষা পদ্ধতির 'উন্নতি সাধনের' ফলে কী পরিণাম দেখা দেয় বিজ্ঞানীরা আজ সে বিষয়েও অনেককিছু বলতে পারেন। ছোট্ট শিশুর স্মৃতি যখন অত্যধিক পরিমাণ বিভিন্ন তথ্যাদিতে পরিপূর্ণ থাকে, তখন সে অবশ্যই আপাত দৃষ্টিতে 'পণ্ডিত' হয়ে উঠে, যদিও তার সে পাণ্ডিত্য নৈতিক শক্তি ও আবেগপ্রবণতার অবলম্বন থেকে বঞ্চিত। বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার এ সমস্ত জ্ঞানের কোনরূপ সম্পর্কই থাকে না। তা সাধারণত শিশুর চালনকারী ও মানসিক ক্রিয়াকলাপের উপায়গুলো থেকে অনেক দূরেই থাকে। অথচ এই উপায়গুলোই শিশুর পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তা হচ্ছে তার পরবর্তী বিকাশের জন্য একমাত্র সম্পদ।

প্রথম বছর...
(বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে)

নিকিতিনরা হচ্ছেন আমাদের দেশের বিখ্যাত এক পরিবার। জীবনের প্রথম বছরে সন্তান লালনপালনের ক্ষেত্রে তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গেও পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

নিকিতিনদের পরিবারটি বড় — অবশ্য আজকালকার ধারণা মতে। তাঁদের সাত ছেলেমেয়ে। বন্ধুভাবাপন্ন, বিস্ময়কর এই পরিবারটি বহু পিতামাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিকিতিনদের বিষয়ে প্রায়ই কাগজেপত্রে লেখা হয়, রেডিও-টেলিভিশনে বলা হয়, তাঁদের নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করা হয়েছে, তাঁদের নিয়ে তর্কবিতর্ক করছেন বিজ্ঞানী আর বিশেষজ্ঞরা। এর কারণ হচ্ছে — সন্তান লালনপালনের ক্ষেত্রে নিকিতিনদের সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিসমূহ, যা প্রায় কুড়ি বছর ধরে তাঁরা তাঁদের পরিবার-গবেষণাগারে প্রয়োগ করে আসছেন।

আমাদের পাঠকরা সাগ্রহে নিকিতিনদের অভিজ্ঞতার কথা পড়বেন। আমরা সবাই তো চাই যে আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন খুব বুদ্ধিমান ও স্বাস্থ্যবান হয়, তারা যেন পড়াশোনায় ভালো হয় এবং জীবনে অনেক সাফল্য অর্জন করে। নিকিতিনরা দেখান শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের বিপুল সম্ভাবনা। এটাই হচ্ছে তাঁদের অভিজ্ঞতার সবচেয়ে মূল্যবান দিক।

পাঠকরা স্বভাবতই জিজ্ঞেস করবেন: এই সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা কি এখনই

ব্যবহার করা যায়? সম্ভবত এখন তা করাটা ঠিক হবে না, সময় হয় নি। অবশ্যাই নিকিতিনদের অনেক সাফল্য দৃষ্টিগোচর। তবে তাঁরা এমন এক চমৎকার স্বজ্ঞার অধিকারী, যার কল্যাণে বহু মারাত্মক ভুল এড়াতে পেরেছেন। যদি অন্ধবৎ তাঁদের অভিজ্ঞতা অনুকরণ করা হয় তাহলে বিপদ অনিবার্য। বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা গভীর মনোযোগ সহকারে নিকিতিনদের অভিজ্ঞতা অধ্যয়ন করবেন, এবং কেবল তারপরই নির্দিষ্ট কোনকিছু বলা সম্ভব হবে। লালনপালনের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত — আমাদের কাছে অতি ক্ষুদ্র ও অসহায় এক প্রাণী।

এখানে আমরা নিকিতিনদের একটা লেখা ছাপছি। আশা করি তা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

অসুখ করবে না! জীবন প্রতিদিনই আমাদের সামনে কোন-না-কোন সমস্যা হাজির করত (কখন একটু সময় হবে? কীভাবে ডায়াথেসিস থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়? কীভাবে অসুখবিসুখ এড়ানো যায়? ইত্যাদি) এবং আমাদের তা সমাধানের উপায় খুঁজতে বাধ্য করত। আমাদের আবিষ্কৃত উপায় এবং প্রচলিত ও ঐতিহ্যগত উপায়ের মধ্যে সর্বদা অনেক পার্থক্য থাকত। আমরা প্রথমে চলতাম হাতড়ে হাতড়ে, এবং সে জন্যই খুব সাবধানে, তারপর — অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে — ক্রমশই বেশি বুঝেশুনে আর সেই জন্যই অধিকতর সাহস ভরে। এই ভাবেই আমরা আমাদের ছোট ছেলেমেয়েদের হরেক রকমের প্রাকৃতিক প্রভাব — যেমন, তাপমাত্রার তারতম্য, রোদ, হাওয়া, শরতের ঠান্ডা বৃষ্টি কিংবা গ্রীষ্মের মুষলধারা — অনুভব করার সুযোগ দিতাম এবং তাতে তারা আনন্দ উপভোগ করত।

আর সমস্তকিছুই শুরু হয় অতি সাধারণভাবে: স্তন্যদানের সময় মায়ের পাশে শুয়ে থাকে ছোট্ট মেয়েটি এবং সে ভাবতেও পারে না যে তার ঠান্ডা পার্শ্বদেশ ও গোড়ালি — এ হচ্ছে অনেকগুলো আপদ এড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষেধ ব্যবস্থা। এভাবে চলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। আমরা সর্দিকাশিকে মোটেই ভয় করি না। পা ভিজে গেছে? ও কিছুই না, মুছে নিলেই হল। ফ্ল্যাটের ভেতর দিয়ে বায়ুস্রোত চলছে? চলুক, তাতেও আমাদের কোন ভয় নেই।

এখানে এই ব্যাপারটিই গুরুত্বপূর্ণ: দৃঢ় বিশ্বাস পরিণত হয় অসুখবিসুখের পথে বাধাদানের ভালো একটি উপায়ে। আগে আমরা তা কেবল অনুমান করতে পেরেছিলাম, তবে সঠিকভাবে জেনেছি খুবই সম্প্রতি:

একজন ডাক্তার আমাদের বলেন যে মানুষের স্বাস্থ্য এবং রোগের বিরুদ্ধে তার প্রতিরোধ ক্ষমতা নির্ভর করে যেমন তার মানসিক অবস্থার উপর তেমনি তার অসুখ করবে না এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের উপর। অনেক সময়ই দেখা যায় যে অসুস্থ অবস্থা কল্পনা প্রসূত ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয় এবং মানুষ সেই অবস্থাতে বিশ্বাস করে বলে তা ক্রমশই অধিকতর খারাপ হতে থাকে। আর ছোট ছেলেমেয়েদের মনে অসুখের ভয় ঢোকানো যায় খুবই সহজে।

কিন্তু অনেক স্নেহশীল মা আর দিদিমা কি জানেন যে তাঁদের ভয় আর চির আশঙ্কা ('এই ছোটাছুটি করিস না—পড়ে যাবি! জলে পা দিস না—অসুখ করবে! জানলা খুলিস না—সর্দি হবে! ঠাণ্ডা জল খাস না—গলা ব্যথা করবে!' ইত্যাদি) শিশুদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দেয় যে তাদের অসুখ হবেই। বলাই বাহুল্য, তারা অসুখে ভুগেও। তখন সম্ভাব্য সমস্ত 'সতর্কতা' অবলম্বন করা হয়: শিশুর যাতে সর্দিকাশি না হয় সেই জন্য তাকে বেশি কাপড়চোপড় পরানো হয়, এমনকি খোদ শিশুকেও সব সময় বলা হয় যে সে অসুস্থ এবং দুর্বল। অথচ সে হয়তো সুস্থ ও সবল; বিশ্বাস করুন, তা খুবই সম্ভব।

অনেক মা-বাবা তাঁদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রায়ই আমাদের কাছে আসেন। আমরা বড়রা যখন কথা বলি, তখন শিশুরা বেশ তাড়াতাড়ি আমাদের ক্রীড়া কক্ষে খেলাধুলা শুরু করে দেয়। ওই কক্ষটি আমরা নিজেরাই শিশুদের খেলাধুলার উপযোগী করে তুলি। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা দড়িতে ঝুলে, বড় মাদুরের উপর ডিগবাজি খায়, খুঁটি বেয়ে উপরে উঠার চেষ্টা করে। অচিরেই গরম জামাকাপড় পরিহিত বাচ্চাদের ঘাম ছুটতে শুরু করে, এবং তখন তারা আমাদের ছেলেমেয়েদের দেখে একটির পর একটি পোশাক খুলতে আরম্ভ করে। কাপড়চোপড় খুলে হালকা হয়ে তারা প্রীতিকর শীতলতা ও মুক্তির আনন্দ উপভোগ করে এবং ক্রমশই খেলায় মজে যায়। এমনকি এমনও ঘটেছে যখন ক্রীড়ামত্ত শিশুরা অর্ধনগ্ন অবস্থায় (!) আমাদের ছেলেমেয়েদের পেছন পেছন শীত কালের তুষারাচ্ছন্ন রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। এসব কাণ্ডকারখানা দেখে মা-বাবাদের তো মূর্ছা যাওয়ার মতো অবস্থা, কিন্তু শিশুদের কিছুই হল না। আমি পারব, আমার অসুখ করবে না—এরূপ দৃঢ় বিশ্বাসই হচ্ছে প্রধান জিনিস।

এখনকার কাজ এখনই করুন। কিন্তু অন্যান্য সমস্যাও রয়েছে, যেগুলোর

দিকে, দুঃখের বিষয়, কম মনোযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। 'পরে দেখা যাবে'—এই ভেবে মা-বাবারা সময় মতো ওই সমস্ত সমস্যা সমাধান করেন না, তাঁরা বলেন: 'আমাদের বাচ্চাটি এখনও ছোটে, আগে একটু বড় হোক!' এ হচ্ছে জীবনের প্রথম বছরে—হ্যাঁ হ্যাঁ, জীবনের প্রথম বছরেই—শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের সমস্যাবলি।

অবশ্য মা-বাবারা তা বুঝতে পারেন পরে—দু'তিন বছর বাদে, কিন্তু তখন জানা যায়: অনেককিছু ঠিক মতো করা হয় নি, ভুল সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে কিংবা যাকিছু বাদ পড়েছে তা পূরণ করা দরকার। যেমন, সবাই জানেন যে প্রথম বছরে নির্দিষ্ট সময় নাগাদ শিশুর বসতে, দাঁড়াতে, হামা দিতে ও হাঁটতে শেখা উচিত। এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা হয়, এবং 'যা করা উচিত' সে যদি তা ভালো মতো করতে না পারে তাহলে মা-বাবারা উদ্বিগ্ন হন। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা প্রায়ই শিশু যাতে নড়াচড়া কম করে তার জন্যও সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন: তাকে বেশি কাপড় পরান, অনেকখন বদ্ধ খাটে ধরে রাখেন, আর রাস্তায় বেরলে সব সময় তাকে ঠেলা-গাড়িতে বসে থাকতে বাধ্য করেন, মোটেই পা ফেলতে দেন না। শান্ত শিশু আনন্দিত করে ('ওকে নিয়ে কোন ঝামেলা নেই')। চঞ্চল শিশু আপদ বলে গণ্য হয় ('একটি মিনিটও বসতে দেয় না!')। এতে ক'রে সক্রিয় চলাচলে শিশুর স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ ও বিকশিত তো হয়ই না, বরং সেই চাহিদা যেন ভোঁতা হয়ে যায়, অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তাছাড়া জীবনের প্রথম বছরে প্রধানত খেয়াল রাখা হয় কেবল বাড় ও ওজনের দিকে এবং তা দেখে শিশুর শারীরিক বিকাশের মান যাচাই করা হয়। তার মাংসপেশীর দৃঢ়তা, তার সক্রিয়তা, নিপুণতা আর গতিভঙ্গির দিকে কেন যেন মোটেই মনোযোগ দেওয়া হয় না। শিশু স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর যখন তার ফ্ল্যাট ফুট, মেরুদণ্ডের বক্রতা, পেশী দুর্বলতা, মেদবহুলতা, দুর্বল হৃদয় ও অন্যান্য অপ্রীতিকর ব্যাপার ধরা পড়ে তখনই কেবল মা-বাবারা ভাবতে শুরু করেন: ছেলে যদি শরীরচর্চা ভালোবাসে না তাহলে কী করা? সে যদি এতই অপটু হয় তাহলে কী করতে হবে?

অথচ দেখা যায়, এই সমস্ত অপ্রীতিকর ব্যাপার আরম্ভ হয় ঠিক সেই বয়সে যখন কেউই—এমনকি মা-বাবাও—ওগুলোর কথা ভাবে না। তা শুরু হয় শিশুর জন্মের পর থেকে। এমনকি তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার অনেক আগে থেকেই!

বিশেষ কোন ব্যায়াম ব্যতিরেকে। কবে ও কীভাবে নবজাতকের শরীরচর্চা শুরু হবে? প্রথম দিনগুলোতে তাকে ছুঁতেও তো ভয় লাগে। যতটা ভাবা হয়ে থাকে শিশু তার চেয়ে ঢের বেশি মজবুত— এ জিনিসটি আমরা উপলব্ধি করেছি ধীরে ধীরে। দেখা গেল যে পেশীর বিকাশে বৃহৎ এক ভূমিকা পালন করে... হালকা পোশাক। শিশু যখন ঘুমায় না তখন সে হয় উলঙ্গ থাকে নয় তার গায়ে থাকে পাতলা একটা নিমা। তখন তার ঠাণ্ডা লাগে, এবং বেশি তাপ সৃষ্টির জন্য সে পেশীগুলোর উপর জোরে চাপ দেয়। ডাক্তাররা একে 'নবজাতকের পেশীর চাপাধিক্য' বলে অভিহিত করেন। আর শিশুকে তখন একটু গরম পোশাক পরালেই এই চাপ সঙ্গে সঙ্গেই হ্রাস পায় এবং পেশীগুলো শক্তিহীন হয়ে পড়ে। তার মানে, শীতলতার কল্যাণে প্রথম মাসে পেশীগুলোও তালিম পায়।

প্রথম দিনগুলো থেকে আমরা শরীরচর্চাও শুরু করি। আমাদের পরিবারে প্রথম 'কোচ' সর্বদা হতেন আমার স্ত্রী। তা বোধগম্য। মা ছাড়া আর কেউ শিশুর এত বেশি সেবাযত্ন করে না এবং মা-ই তাকে সবচেয়ে ভালো বুঝেন। সেই জন্যই তিনি সবার চেয়ে সঠিকভাবে শিশুর সম্ভাবনা ও বাসনা নির্ধারণ করতে পারেন। তবে আমি একেবারে শুরু থেকেই সব ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে চেষ্টা করি এবং ক্রমশই বেশি ক'রে 'কোচের দায়দায়িত্ব' গ্রহণ করতে থাকি। আমি কেবল কোচই ছিলাম না, আমি ঘরে এবং বাইরে খেলাধুলার উপযোগী বিভিন্ন জিনিস গড়তাম, পারিবারিক প্রতিযোগিতায় রেফারি হতাম এবং নিজেও তাতে অংশগ্রহণ করতাম। আর সময় সময় একেবারে ছোটদের জন্য ক্রীড়া সরঞ্জামে কিংবা গোটা এক ক্রীড়া সমাহারে পরিণত হতাম। জন্মের পর থেকে আমাদের ছেলেমেয়েদের শারীরিক বিকাশ সম্পর্কিত সমস্ত খুঁটিনাটি এবং সমস্ত সাফল্য, প্রতিটি নতুন পদক্ষেপ আমিই ডায়েরিতে লিখে রাখতাম।

এক কথায়, আমাদের পরিবারে শারীরিক শিক্ষা ছিল প্রধানত আমার দায়িত্ব। তবে আমরা সব ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করতাম এবং প্রত্যেকের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে আনন্দিত হতাম।

যেমন, একদিন আমার স্ত্রী লক্ষ্য করলেন যে শিশুকে যদি শক্ত করে ধরা যায় তাহলে সে যেন তার জবাবে পেশীগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি ক'রে স্প্রিংয়ের মতো হয়ে উঠে। কিন্তু যদি শিশুকে এক হাত থেকে অন্য হাতে রাখা হয় কিংবা বেশি কোমলভাবে এবং ভয়ে ভয়ে ঘোরানো-ফেরানো হয়

তাহলে তার দেহটি শক্তিহীন ও নিস্তেজই থেকে যায়। স্ত্রীর দেখাদেখি আমিও সাহসের সঙ্গে শিশুর সেবাযত্ন করতে লাগলাম এবং অচিরেই অনুভব করতে পারলাম কীভাবে সে দিনে দিনে মজবুত হয়ে উঠছে। দিনে বহু বার শিশুকে কোলে নিতে হয় ও ঘোরাতে-ফেরাতে হয়, এবং দীর্ঘতা, পৌনঃপুনিকতা ও সমস্ত পেশীর চাপের বিচারে এরূপ শরীরচর্চার সঙ্গে কোন বিশেষ ব্যায়ামের তুলনাই হয় না। ব্যায়ামের জন্য আলাদা কোন সময় নির্ধারণের প্রয়োজন নেই। কেবল লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে শিশুর সঙ্গে সতেজ আচরণ শিশু ও অন্যদের পক্ষে রুক্ষ, কটু ও অপ্রীতিকর ব্যাপারে পরিণত না হয়।

জন্মগত রিফ্লেক্স কীসের জন্য? অনেকগুলো জন্মগত গতিমূলক রিফ্লেক্স-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা তখনও অবগত ছিলাম না। আমরা লক্ষ্য করলাম যে জীবনের প্রথম দিন ও সপ্তাহগুলো থেকে শিশু কয়েক মুহূর্ত (বিশেষত স্তন্যপানের প্রাক্কালে) জোরে বড়দের আঙুল ধরে থাকে। আমরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম যে শিশু এমনকি একেবারে শুরু থেকেই মা কিংবা বাবার হাতের আঙুলগুলো ধরে ঝুলতে পারে।

আমরা নবজাতকের শক্ত মুঠোর মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে নিজেদের দিকে টানতাম। আমরা ভালোভাবে অনুভব করতাম সে কতটা জোরে তা ধরত। সাধারণত শিশুকে রিং দেওয়ার জন্য বলা হয়ে থাকে,— সে ওটা জোরে ধরে নিলে তা ধরে টানতে হয়। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে রিং খুব একটা নিরাপদ জিনিস নয়: অনুভব করা যায় না শিশু তা কতটা জোরে ধরেছে। অথচ আঙুল সঙ্গে সঙ্গেই তা অনুভব করে, এবং যেই শিশুর হাতগুলো শক্তিহীন হতে শুরু করে (প্রথমে ৫-১০ সেকেন্ড ধরে, এর পর ক্রমশই বেশিক্ষণ ধরে) অমনি তাকে সাবধানে শুইয়ে দেওয়া উচিত। এই ভাবে সহজেই নির্ধারণ করা যায় শিশুর শারীরিক সম্ভাবনা, তার হাতের দৃঢ়তা, এবং তাতে ক'রে প্রতি বার যখন সে বড়দের আঙুল ধরে তখন তাকে কতটা চাপ দেওয়া প্রয়োজন তা বোঝা যায়।

তাছাড়া অকস্মাৎ আমরা আরও একটি জিনিস আবিষ্কার করলাম। শিশুর মাথাটি নিজের কাঁধের উপর রেখে এক হাতে তার বুকের কাছে ধরে যদি অন্য হাতটি তার পায়ের গোড়ালির নিচে রাখা যায় তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গেই হাতের তালুতে পা দিয়ে ভর দেওয়ার চেষ্টা করে। এই ভাবে দেখা গেল যে 'ভর দেওয়ার রিফ্লেক্স' গড়ে উঠল এবং শিশু পা দু'টি সোজা

ক'রে দাঁড়িয়ে ওগুলোর উপর নিজের শরীরের সমগ্র ওজন রাখতে পারল। আমরা তখন বুঝতেই পারি নি যে ও-কাজ ক'রে আমরা শিশুর সহজাত রিফ্লেক্সগুলোই বিকশিত করছিলাম এবং আমাদের প্রতিটি স্পর্শ পরিণত হচ্ছিল নিরবচ্ছিন্ন ও ফলপ্রসূ ব্যায়ামে।

খাট থেকে লাফ! তিন মাস পূর্ণ হওয়ার পর—তখন শিশু জোরে বড়দের আঙুল ধরে দিব্যি ঝুলতে পারত (আমাদের ছেলে ভানিয়া একদিন ৪৩ সেকেন্ড ধরে ঝুলেছিল)—আমি আরও একটি 'ব্যায়াম' চালু করলাম। আমি শিশুকে আর তার বগলে ধরে খাট থেকে বার করতাম না; এর বদলে আমি এমনভাবে আমার হাত দু'টি তার দিকে বাড়িয়ে দিতাম যাতে বৃদ্ধাঙুলিগুলো ধরতে তার সুবিধা হয়। এ ছিল সংকেত—'জোরে ধরো!' শিশু সঙ্গে সঙ্গেই দু'হাত দিয়ে জোরে ধরত এবং আমি তাকে খাট থেকে বার করতাম। কোনরূপ অঘটন যাতে না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে আমি কখনও কখনও বাকি চার আঙুল দিয়ে শিশুর হাত ধরে রাখতাম।

তবে আমার স্ত্রী এ ধরনের 'সার্কাসী পদ্ধতি' (দিদিমার ভাষায়) ব্যবহার করতেন ক্বচিৎ। তিনি সাধারণত শিশুকে বগলে ধরেই খাট থেকে বার করতেন। কেন? তিনি মনে করতেন যে এই পদ্ধতিটি একটু রুক্ষ এবং তাঁর পক্ষে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু আমার 'বাজি' দেখতে তাঁর ভালোই লাগত। তাতে বাপ-বেটা দু'জনেই অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করতাম এবং উপকৃতও হতাম। আমি শিশুর প্রতি ক্রমশই অধিক আগ্রহ দেখাতে লাগলাম এবং তাতে ক'রে তার সঙ্গে মেলামেশার নিজস্ব একটি ভাষা খুঁজে পেলাম। আর আহ্লাদ, ভীরুতা ও নারীর রক্ষামূলক শিক্ষার কুফলগুলো এড়ানোর জন্য শিশুর পক্ষে এই 'পুরুষের' ভাষার প্রয়োজনও ছিল। আমরা অবশ্য তা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি নি। তবে ভেতরে ভেতরে অনুভব করতাম যে শিশুর প্রতি বিভিন্ন আচরণ তার কোন ক্ষতি করবে না, বরঞ্চ তাতে তার মঙ্গলই হবে। এটা সত্যি যে আমার নতুন যেকোন 'উদ্ভাবনকে' আমার স্ত্রী কখনও কখনও সন্দেহের চোখে দেখতেন ('বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে না তো?'), তবে তাতে কোন সংঘর্ষ বাধত না: আমরা নিজেরাই তো দেখতে পেতাম যে মা ও বাবা উভয়ের সঙ্গেই শিশুর ভালো লাগত। আর আমাদের পক্ষে এটাই ছিল সবচেয়ে প্রধান জিনিস।

খাট থেকে বার করার এই অভিনব পদ্ধতিটি রপ্ত হওয়ার পর আমি নতুন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করলাম। এবার আমি শিশুর দিকে কেবল

একটি হাত (প্রায়ই বাঁ হাত) বাড়াতাম এবং তাকে তর্জনী ও কনিষ্ঠা দিয়ে বাকিগুলো তালুতে বাঁকিয়ে রাখতাম। এতে ক'রে দ্বিতীয় হাতটি দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য ব্যবহার করা যেত।

কালক্রমে এই 'ব্যায়ামটি' পরিণত হয় প্রকৃত 'সার্কাসী বাজিতে': শিশু প্রথমে খাটের ভেতরে পায়ের উপর খাড়া হত, আর তারপর গুড়ি মেরে বসে উপরের দিকে লাফাত। আমার হাত ও তার পাগুলো কাজ করত একসঙ্গে, সমান তালে, এবং মনে হত যে শিশু নিজেই খাট থেকে লাফ মেরে আমার হাতে উঠে পড়ছে। এই পদ্ধতিটি আমাদের ছেলেমেয়েদের খুব পছন্দ হয়েছিল এবং ৫-৬ বছর বয়স অবধি আমি কেবল এভাবেই তাদের কোলে নিতাম।

আর এবার গণে দেখুন, দিনে কত বার তিন-চার-পাঁচ মাস বয়সের শিশুকে খাট থেকে বার করতে হয় এবং খাটে রাখতে হয়? ১০-১৫-২০ বার! সাধারণত এ ছিল কেবল বড়দের 'কাজ', তবে তাতে শিশুরও ভালো ট্রেনিং হত: তার সারা শরীরে চাপ পড়ত, এবং তাতে বিকশিত হত কেবল হাতেরই নয়, পিঠ, বুক আর পেটেরও পেশীগুলো।

প্রথম ক্রীড়া সরঞ্জাম। শিশুর এরূপ পদ্ধতি খুব ভালো লাগে, তার হাতগুলো তাড়াতাড়ি মজবুত হয়ে উঠে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে সে বার বার তাকে আঙুল দিতে অনুরোধ করে, সে বার বার আঙুল ধরে বসতে, উঠতে ও ঝুলতে চায়। তাতে কী মজা, সে সারা দিন ওভাবে লাফালাফি করতে পারে! কিন্তু... বড়দের অবস্থাটা কী হবে? নিরুপায় হয়ে আমি একটি ফন্দি আঁটলাম: খাটের সঙ্গে এমনভাবে একটি দণ্ড বেঁধে দিলাম যাতে শিশু শুয়ে শুয়ে তার নাগাল পেতে পারে। এই ভাবে তিন মাস বয়সে আমাদের কন্যা উপহার হিশেবে পেল 'হরিজণ্টাল বার'। সেটাই ছিল বিশেষ করে তার জন্য নির্মিত প্রথম ক্রীড়া সরঞ্জাম। তার ঠেলা-গাড়িতেও আমি অনুরূপ একটি বার তৈরি করে দিই। প্রথমে আমরা শিশুকে দণ্ডটি ধরতে সাহায্য করতাম, আমাদের হাতের তালু তার পায়ের তলায় রাখতাম যাতে সে ঠেস দিতে পারে, বসতে ও উঠতে সাহায্য করতাম, এবং সে অনেকখন — যতক্ষণ না তার আশ মিটত — বসে ও দাঁড়িয়ে থাকতে পারত। সে (আর পরে বাকি সব ছেলেমেয়েরাও) বেশি মজা পেত তারই আবিষ্কৃত এক ব্যায়ামে — দণ্ডটি ধরে এমনভাবে টানাটানি করত যে ঠেলা-গাড়িটা এদিকে-সেদিকে প্রচণ্ড দোল খেতে আরম্ভ করত। তা শিশুকে

কী অপরিসীম আনন্দ দান করত! কিন্তু চারিপাশের লোকজনের ভয় আর উদ্বেগও কম ছিল না:

— কে কবে দেখেছে যে তিন মাসের বাচ্চা দাঁড়াতে পারে, এবং তার উপর আবার দোলও খাচ্ছে, অথচ পা দু'টি এখনও দুর্বল, বেঁকে যেতে পারে।

অনেকেই লক্ষ্য করত না যে পাগুলোকে সাহায্য করছে শিশুর হাত ও পিঠ, এবং তার ওজন বণ্টিত হচ্ছে শরীরের সমস্ত পেশীতে। তাতে ভয়ের কোন কারণ তো ছিলই না, বরং তা অস্থিপঞ্জর আর পেশী ব্যবস্থার সঠিক বিকাশে সহায়তা করত। আমাদের ছেলেমেয়েদের হাত-পা কেবল তাড়াতাড়ি মজবুতই হয় নি, সেগুলো সুঠাম আর শক্তিশালীও হয়ে উঠে।

হামাগুড়ি দিয়ে লাভ কী? শিশুর তার খাটটি পুরোপুরি চেনা হয়ে গেছে। এবার সে মেঝেতে নরম মাদুরের উপর নতুন এলাকা চেনার প্রথম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে — শিশু হামা দিতে শুরু করেছে। আমরা খুব তাড়াতাড়িই (যেই মাত্র শিশু তা করতে সমর্থ হল) তাকে মাদুর থেকে মেঝেতে চলে যেতে এবং ঘরময় ঘুরে বেড়াতে দিলাম। এই 'মুক্তি' গতি বিকাশের পক্ষে খুবই ফলদায়ক ছিল। সর্বাগ্রে সে হচ্ছে বিপুল (শিশুর পক্ষে!) ব্যবধান, যা তাকে অতিক্রম করতে হত, এবং রান্নাঘরে মা'র কাছে কিংবা কাজের ঘরে বাবার কাছে যেতে হলে তার হাত, পা ও হৃদয়কে খুব খাটতে হত। অপরিসর খাটের মধ্যে থাকার সঙ্গে বাইরে হামা দেওয়ার কোন তুলনাই হয় না। আর ওই দরজা ক'টি, যেগুলোর হাতল কেন যেন এত উপরে, শত চেষ্টা করলেও কিছুতেই খুলতে চায় না। আর কাদের এই বড় বড় পাগুলো, যা পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে কিংবা পথের উপর দাঁড়িয়ে আছে, — তা ধরে খাড়া হওয়া যায় কি? চারিদিকের সমস্তকিছুই যেন গড়া হয়েছে দানবদের জন্য! বলটি যতই ধরার চেষ্টা কর না কেন, কিছুতেই কাবু করা যায় না — ছোট্ট হাত থেকে ফসকে যায়। চেয়ারটি যতই ঠেল না কেন, পথ থেকে সরবেই না। এরূপ নতুন, অপরিচিত ও অবোধ্য পরিস্থিতিতে ছোট্ট মানুষটির পক্ষে সবই কঠিন।

তবে সম্ভবত এই সমস্ত বাধাবিপত্তিই হচ্ছে বিকাশের সবচেয়ে শক্তিশালী উৎস। আর মা-বাবা ভাইবোন পাশে থাকলে তো কথাই নেই — তাঁরা সব সময়ই প্রেরণা দেন, এবং তখন শিশু বিস্ময়কর দৃঢ়তা ও তার বয়সের পক্ষে অবিশ্বাস্য অটলতার সঙ্গে সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে চেষ্টা করে।

এরূপে পরিস্থিতিতে বড় ভাইবোন পরিবেষ্টিত হয়ে আমাদের ছোট সন্তানেরা তাড়াতাড়ি স্বচ্ছন্দে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে শুরু করে।

স্বভাবতই কনিষ্ঠ সন্তানেরা জ্যেষ্ঠদের তুলনায় বেশি সুযোগসুবিধা পেত: আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়ছিল, নতুন নতুন ক্রীড়া সরঞ্জাম দেখা দিচ্ছিল, কনিষ্ঠদের প্রত্যেকের ছিল অধিক সংখ্যক 'শিক্ষক' — অর্থাৎ বড় ভাইবোনেরা। তা খুবই লক্ষণীয়ভাবে শিশুদের বিকাশকে প্রভাবিত করে এবং তাদের হামাগুড়ি দেওয়ার পদ্ধতিতে প্রতিফলিত হয়। আমরা এমনকি স্বকীয় একটি 'ডায়াগ্রাম'ও প্রস্তুত করলাম: প্রথম সন্তান হামা দেওয়ার সাধারণ পদ্ধতি প্রয়োগ করত — 'ছয় বিন্দুতে' মেঝের উপর ভর দিত: দুই হাত, দুই হাঁটু আর দুই পায়ের আঙুলগুলো দিয়ে। দ্বিতীয়টি হামা দিত কেবল এক বাঁ হাঁটু ব্যবহার ক'রে, আর অন্য পা'টি খাড়া রাখত, অর্থাৎ সে 'পাঁচ বিন্দুতে' ভর দিত। আর বাকি ছেলেমেয়েরা খুবই তাড়াতাড়ি 'চার পায়ে' ভর দিয়ে চলতে আরম্ভ করেছিল, অর্থাৎ হাঁটু দিয়ে মেঝে স্পর্শ না ক'রে তারা কেবল হাঁটতই না, ছোটাছুটিও করত। হামাগুড়ি দেওয়ার এই পদ্ধতিসমূহ যদি তুলনা করা যায় তাহলে এমনকি কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও বুঝতে পারবেন যে শেষ পদ্ধতিটিই সর্বোৎকৃষ্ট — তাতে অনেক দ্রুত চলাচল করা যায়, তবে তা প্রচুর নিপুণতা, শক্তি ও সহিষ্ণুতা দাবি করে। এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে কেবল তৎপর, শক্তিশালী ও মজবুত শিশু।

অনেকে মনে করে যে হামা দেওয়া শিশুর গতি বিকাশে খুব একটা জরুরী প্রক্রিয়া নয়। এমনও ছেলেমেয়ে আছে যারা হামা না দিয়েই মানুষ হয়, এবং তারা অন্যদের চেয়ে মন্দ চলে না। তবে আমরা মনে করি যে হামাগুড়ি দেওয়া হচ্ছে শিশুর সর্বাঙ্গীণ তালিমের পক্ষে ভালো এক ব্যায়াম, ভবিষ্যৎ চলাফেরার চমৎকার প্রস্তুতি এবং হাতগুলো দৃঢ় করার অপূর্ব এক উপায়।

হাঁটতে এবং... পড়তে শিখছি। প্রথম পদক্ষেপ — তা সবাইকে কত আনন্দ দেয়। শিশু ও মা-বাবারা সমানভাবে সে আনন্দ উপভোগ করেন। এবং সেই সঙ্গে কত আশঙ্কা... বিশেষ ভয় থাকে মা আর দিদিমাদের: হঠাৎ যদি পড়ে যায়?

আমাদের ছেলেমেয়েরা কী নিপুণতার সঙ্গে পড়তে পারে এবং কী সুন্দরভাবে নিজের দেহ সামলাতে পারে! বহু বার তা লক্ষ্য করে আমরা

স্মরণ করতে চেষ্টা করেছি: এ সমস্তকিছু কী ক'রে সম্ভব? আমরা তো তাদের তা শেখাই নি।

বড় কথা, আমরা তাদের কোন প্রয়াসেই বাধা দিতাম না! খুবই অল্প বয়সে তাদের মেঝেতে হামা দিতে ছেড়ে দিয়ে, স্বনির্ভরভাবে ঘরে ঘরে 'ভ্রমণ করার' সুযোগ দিয়ে আমরা শিশুকে কোনকিছুতে ভর ক'রে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াতে এবং তারপর... ধপ ক'রে পড়ে যেতে কোনক্রমেই নিষেধ করতে পারতাম না, — করলে তা খুবই অনুচিত হত । শিশুরা কোনকিছু ধরে উঠার চেষ্টা করে একবার নয়, দু'বার নয়, অসংখ্য বার। তাদের অনেক প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয় — তারা পড়ে যায়। আমাদের ছেলেমেয়েরা একেবারে শুরু থেকেই খুব নিপুণতার সঙ্গে পড়ত। সে ছিল এক মজার ব্যাপার। পেছন দিকে টললে শিশু সহজেই নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা মেঝেতে বসে পড়ত, আর সামনের দিকে টললে হাত ছড়িয়ে দিয়ে পড়ে হামা দেওয়ার অবস্থান নিয়ে থাকত। হাতগুলো মজবুত হলে তা শিশুর ভার সামলাতে পারে এবং তাতে কপাল বা নাক মেঝে অবধি পেঁছিতে পারে না। আমাদের সন্তান পড়ে গেলে প্রায় ক্ষেত্রেই ভয় পাওয়ার ফুরসৎ পেত না এবং তারপরও দিব্যি ঘুরে বেড়াত — যেন কিছুই ঘটে নি। শিশু ও আমরা কেউই এই সমস্ত পতনের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করতাম না। সে ব্যাপারে আমাদের কোন আশঙ্কাও ছিল না। তবে একবার সত্যিই ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম।

ন' মাসের ছেলে আলিওশাকে আমরা একবার দিদিমার কাছে রেখে কোথাও চলে গিয়েছিলাম। সারা দিন সে দিদিমার কাছেই ছিল। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বরাবরকার মতো কোনরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করেই তাকে ঘরের মাঝখানে মেঝের উপর রাখলাম। ঠিক তখনই আমরা অসাধারণ একটি দৃশ্য দেখতে পেলাম। আমাদের আলিওশা কয়েক পা এগিয়ে থেমে গেল এবং পেছন দিকে টলে পড়তে লাগল। কিন্তু পড়ছিল সে অদ্ভুতভাবে, সোজা হয়ে ও মাথাটি পেছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে, এবং সেই জন্য মেঝের উপর পড়ে যাওয়াতে তার মাথায় ভীষণ চোট লাগল। কী ব্যাপার? আমরা বুঝতেই পারছিলাম না তার পড়ার নৈপুণ্য কোথায় গেল।

পরদিন সকালে দিদিমা যখন এলেন তখনই 'রহস্য' উদ্ঘাটিত হল। আলিওশা তখন কেবল হাঁটতে শুরু করেছিল। দিদিমার ভয় হচ্ছিল যে সে পড়ে যেতে পারে। তাই সারা দিন তিনি শিশুর পেছন পেছন চলেন এবং হাত দিয়ে তার মাথার পশ্চাৎ ভাগটি ধরে রাখেন। আলিওশা

পেছন দিকে সামান্য টলতেই দিদিমার হাতে তার মাথা ঠেকত। ব্যস, আঘাত থেকে রক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তনের পক্ষে একদিনই যথেষ্ট ছিল, — আলিওশা দিদিমার পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে গেল। আর এর ফলে মাথার পশ্চাৎ ভাগে চোট লাগল ও ফুলে উঠল। এই ঘটনাটি থেকে আমরা আবারও উপলব্ধি করলাম যে অনুরূপ 'সহায়তা' থেকে বিরত থাকাই উচিত।

পরে আমরা বহুবার দেখেছি, আমাদের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন সংকটপূর্ণ মুহূর্তে (হোঁচট খেয়ে, পা পিছলে ও টাল সামলাতে না পেরে) পড়ে গিয়েও কোন আঘাত পায় নি। তা আমাদের বিস্মিত ও আনন্দিত করত।

সবকিছুর মূলে — গতি। শিশুদের জন্য সমস্তকিছু করতে গিয়ে, অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের গতির জন্য পরিবেশ গড়তে গিয়ে এবং তাদের যত ইচ্ছা চলাফেরা করার সুযোগ দিয়ে আমরা এ কথাটি কখনও ভাবি নি যে তদ্দ্বারা আমরা কেবল শিশুদের পেশীগুলোই বিকশিত করছি না, তাদের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গও দৃঢ় করে তুলছি।

শিশু যদি ছোটাছুটি করে তাহলে স্বভাবতই তার হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি পায় এবং সে গভীর ও ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলে। তার কারণটি হচ্ছে এই যে দৌড়ানোর সময় পেশীগুলো প্রচুর খাটে, আর ওগুলোকে সাহায্যকারী হৃদয়, ফুসফুস ও অন্যান্য ব্যবস্থাকেও তখন সেই অনুসারে নিজের উৎপাদনশীলতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হয়। তার মানে, যে-শিশু বেশি ছোটাছুটি করে সে দৈহিকভাবে সুবিকশিত, তার অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গও খুব মজবুত হয়। তাই শিশুকে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান দেখতে হলে তাকে শারীরিক দিক থেকে যথাসম্ভব ভালোভাবে বিকশিত করা উচিত।

আমরা আরও জানতে পারলাম যে সক্রিয় শারীরিক ক্রিয়াকলাপ শিশুদের মানসিক বিকাশেও সহায়ক হয়।

এই ভাবে, জীবনের প্রথম মাসগুলোতে শিশুকে খাটের মধ্যে লেপ-কম্বল দিয়ে মুড়ে না রেখে যদি তার সমস্ত অব্যবহৃত রিফ্লেক্স (যা তিন মাস পরে আর থাকে না) কাজে লাগানো ও বিকশিত করা যায় তাহলে শিশু কেবল শারীরিকভাবে নয়, মানসিকভাবেও সাফল্যের সঙ্গে বিকাশ লাভ করতে থাকবে। সম্ভবত, হাঁটা, সাঁতার দেওয়া ও 'ব্যায়াম' করার কাজ রপ্ত করার সময় পরিণতি লাভ করে কেবল মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কিছু বিভাগই নয়, অন্যান্য সমস্ত বিভাগও। আর হয়তো বা এই বয়সে গতি আয়ত্ত করাটাই হচ্ছে শিশুদের মানসিক কাজকর্মের অন্যতম প্রধান রূপ?

কিন্তু মানুষের জীবনের প্রথম বছরে বিশ্বকে উপলব্ধির মহান প্রক্রিয়াও শুরু হয়। ওই সময় শিশু কী শেখে এবং কীভাবে তা শেখে তার উপর অনেককিছুই নির্ভর করে।

শিশুর দক্ষতা — প্রকৃতি প্রদত্ত গুণ নয়। আমরা যখন প্রথম পিতামাতা হলাম তখন আমরা এমনকি ভাবতেও পারি নি যে শিশুর জীবনের প্রথম বছরটি হচ্ছে বিকাশের জন্য তার সমস্ত সম্ভাবনা, তার সমস্ত দক্ষতা অঙ্কুরিত হওয়ার বছর — তা যেন মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের সূচনা ক্ষেত্র। এ কি অত্যুক্তি নয়? শিশুর জীবনের কেবল প্রথম বছর নিয়েই তো কথা — ও আর এমন কী বড় কথা! না, অত্যুক্তি নয়! এখন আমরা নিশ্চিতভাবে জানি: শিশুর দক্ষতার বিকাশ, এমনকি তার চরিত্রের বিকাশ অনেকাংশে নির্ভর করে জীবনের প্রথম বছরে সে কী জ্ঞান লাভ করে তার উপর, সে কীভাবে ওই জ্ঞান লাভ করে তার উপর এবং বড়রা তার সঙ্গে মেলামেশার কী পদ্ধতি অনুসরণ করেন তার উপর। বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ফলাফলের দিক থেকে অনেককিছুই এখনও অব্যাখ্যাত ও অপ্রত্যাশিত থেকে যাচ্ছে!

কোলে কিংবা খাটে? প্রশ্নটি খুবই সহজ মনে হতে পারে: শিশুকে কোলে রাখা উচিত কিংবা সব সময় তাকে খাটে শুইয়ে রাখা উচিত? অধিকাংশ পাঠকই বলবেন: শিশুকে বেশি কোলে নেওয়া অনুচিত — কোলে থেকে থেকে একবার অভ্যাস হয়ে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। এবং হয়তো ঠিকই বলবেন — শিশুকে কোলে কোলে রেখে কেবল তারই চিত্ত বিনোদন করলে এমনটা যে ঘটবে তাতে অসম্ভব কিছু নেই। কিন্তু আমরা, স্বীকার করছি, একেবারে প্রথম মাস থেকেই আমাদের ছেলেমেয়েদের ঘন ঘন কোলে নিতাম। আমার স্ত্রী শিশুকে কোলে নিয়েও কাজ করতেন, এতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কখনও তিনি শিশুর পিঠ ধরে তাকে কাঁধে ঠেস দিয়ে রাখতেন, কখনও তাকে নিজের হাঁটুতে উপুড় করে রাখতেন, আর কখনও তাকে ধরে রাখতেন সাধারণভাবে, অর্থাৎ যেমন ক'রে সবাই ধরে, তবে কেবল একটি হাত দিয়ে (অন্য হাতটির প্রয়োজন ছিল বিভিন্ন কাজের জন্য)।

এ সমস্তকিছুর পেছনে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল না: আমার স্ত্রী স্রেফ এটাই অনুভব করতেন যে শিশুর তাঁর সঙ্গে থাকতে ভালো লাগত।

মা'র কোলে থাকাটা আরামদায়ক নয় (মা যখন এক হাতে কোন রকমে শিশুকে ধরে অন্য হাতে রান্না করছেন বা বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছেন তখন আরামের প্রশ্নই উঠে না), তবে অধিকতর নির্বিঘ্ন ও চিত্তাকর্ষক: শিশু যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে মাথা ঘোরায়, কৌতূহলের সঙ্গে চারিদিকে তাকায়। তার চোখে পড়ে রঙবেরঙের বাসনপত্র, বিচিত্রবর্ণ কাপড়, খোলা বই কিংবা খসখসে খবরকাগজ — জিনিস কি আর কম আছে! তখন মা আবার তার সঙ্গে কথাও বলেন, বিভিন্ন জিনিসের নাম করেন: 'এক্ষুনি চামচে, কাপ আর রুটি নিচ্ছি... ওখানে, ওই তাকের উপর কী আছে?' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এটা গুরুত্বপূর্ণ কিংবা গুরুত্বপূর্ণ নয়? তা আমরা জানতাম না, তবে আমরা প্রায়ই ছেলেমেয়েদের কোলে নিতাম। আমরা এমনকি লক্ষ্য করলাম যে এরূপ 'ভ্রমণের' পর শিশু খাটেও সাগ্রহে এবং অনেকখন ধরে খেলাধুলা করত। শিশু কোলে অভ্যস্ত হয়ে যাবে বলে আমাদের যে ভয় ছিল তখন তা আর থাকল না।

নিজের সন্তানসন্ততি হলে লোকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক রাস্তার ছেলেমেয়েদের মনোযোগ সহকারে দেখতে শুরু করে, এমনকি তাদের সঙ্গে নিজের ছেলেমেয়েদের তুলনাও করে। আমরাও হয়তো ওই একই কারণে একবার এরূপ একটি ব্যাপার লক্ষ্য করলাম (নিজেরাও দেখবেন!): হাতে-ঠেলা গাড়িতে বসে থাকা কিছু শিশুর দৃষ্টি উদাসীন, অলস, কেমন যেন অনুজ্জ্বল। তা যেন জীবনে বীতশ্রদ্ধ ও অবসাদগ্রস্ত বৃদ্ধদের দৃষ্টি। তারা চারিদিকে তাকায় না, কিছুই তাদের বিস্মিত ও আনন্দিত করে না। তাদের পেট ভরা, তারা চলাফেরা করে কম, কৌতূহলী নয়।

ব্যাপারটি আমাদের খুবই অবাক করল: আমাদের ছেলেমেয়েদের বেলা এমনটা কখনও লক্ষ্য করি নি। সমস্তকিছুই সর্বদা তাদের মনে আগ্রহ সঞ্চার করত। এর কারণটি কী? হয়তো কোন জন্মগত মানসিক দক্ষতার প্রভাব? আমরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নি।

সাম্প্রতিক কালে মনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে জীবনের প্রথম মাসগুলোতে শিশু অনেককিছুই পেয়ে থেকে স্রেফ তার চারিপাশের জিনিসপত্র নিরীক্ষণ ক'রে। তখন এমনকি তাকে পাশ ফিরিয়ে কিংবা উপুড় করে শুইয়ে রাখলেও সে চারিদিকে যাকিছু ঘটছে তার অনেকটাই দেখতে পায়। আর এরূপ অবস্থায় সে বেশ আগে মাথাও সোজা করে রাখতে শেখে, অর্থাৎ শারীরিকভাবে মজবুত হয়ে উঠে।

শিশুকে কি কোলে নেওয়া উচিত কিংবা তাকে কেবল খাটে শুইয়ে রাখা ও ঠেলা-গাড়িতে নিয়ে বেড়ানো উচিত — এই 'সাধারণ' প্রশ্নটি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে গিয়েই আমরা উপরে উল্লিখিত বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলোর সাক্ষী হলাম।

সাবধান: পদে পদে বিপদ! শিশু বড় হচ্ছে। সে ইতিমধ্যে বসতে শিখেছে, নিজে নিজে উঠতে ও হামা দিতে পারে, প্রথম পদক্ষেপ করছে। ওই সময় তাকে (নিরাপত্তার জন্য!) খাটে কিংবা ঘরের অন্য কোন নিরাপদ স্থানে 'বন্দী' করে রাখা হয়। কিন্তু আমরা শিশুদের যথাসম্ভব বেশি স্বাধীনতা এবং ক্রিয়াকলাপের সুযোগ দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলাম। তাই আমরা আমাদের বাচ্চাদের সারা বাড়িতে 'ভ্রমণ করতে' ছেড়ে দিতাম, নিজ হাতে জগৎটাকে স্পর্শ করে দেখার সুযোগ দিতাম। ছোট্ট মানুষটির যাত্রাপথে কত বিপদআপদ রয়েছে। একটু অমনোযোগী হলেই সে টেবিলের কোণে ধাক্কা খেয়ে কপালে চোট পেতে পারে; ছোট্ট টুলটি ধরে টান দিতে না দিতেই তা পড়ে যেতে পারে অন্য হাতের আঙুলের উপর। জিনিসপত্র চেতনাহীন ও খুবই নির্মম, — একটি ভুলের জন্যও ক্ষমা করে না, সাজা দেয়, এবং সময় সময় কঠোরভাবে, খুব ব্যথা লাগে। এমতাবস্থায় কী করা? সারা দিন 'ভ্রমণকারীর' পেছনে পেছনে থাকতে হবে? সমস্ত বিপজ্জনক জিনিস সরিয়ে ফেলতে হবে? প্রতিটি ধারাল কোণ বালিশ দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে? না, আমরা সমস্যাটি অন্যভাবে সমাধান করি। আমরা শিশুকে বিপদের সঙ্গে পরিচিত করতে লাগলাম, যাতে সে নিজেই সে সম্পর্কে সতর্ক থাকতে শেখে।

আমরা, উদাহরণস্বরূপ, ঘরের বিভিন্ন জায়গায় শিশুর নাগালের মধ্যে বিভিন্ন জিনিস ও খেলনা রেখে দিতাম, যাতে সে সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে — জিহ্বা দিয়ে চেটে, দাঁত দিয়ে কামড়ে ও কোথাও আঘাত ক'রে — ওগুলো গবেষণা করে দেখতে পারে।

যেমন ধরুন, টেবিলের উপর একটি মগ রয়েছে, যেন কেউ ভুলে রেখে দিয়েছে। জিনিসটি কী দশ মাসের মেয়ের তা জানা আছে, সে ওটা থেকে দুধ বা জল খেয়েছে। শিশু নির্ভয়ে মগটি নিজের দিকে টানে এবং — কী দুর্ভাগ্য! — তা থেকে জল ছিটকে পড়ে সোজা তার পেটে, জামাপেণ্ট ভিজে যায়। কিন্তু এ থেকে শিক্ষা হবে: এরূপ দু'-তিনটা 'দুর্ঘটনার' পর সে টেবিল থেকে কেবল মগই নয়, অন্যান্য জিনিসও নেবে না।

আমাদের উপস্থিতিতে ছেলেমেয়েদের আমরা ছুঁচ, সেফ্‌টি পিন, কাঁচি ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হওয়ারও সুযোগ দিয়েছি। ...যেমন, মা সেলাই করছেন, আর শিশু তাঁর পাশে বসে চীর, সুতোর রিল ও বড় বড় বোতাম নিয়ে খেলছে। এমন সময় ছুঁচও তার হাতে (অবশ্য মা'র সাহায্য ব্যতিরেকে নয়) পড়তে পারে। আর কখনও কখনও মা এমনকি ইচ্ছে ক'রে নির্দিষ্ট এক জায়গায় চক্‌চকে একটি সেফটি পিন রাখেন, যাতে শিশু তা দেখতে পায়। শিশু অবশ্যই ওটার দিকে এগিয়ে যাবে, নিতে চাইবে।

— এই, এই, — বলছেন মা, — ব্যথা পাবি!

কিন্তু তা সত্ত্বেও শিশু সেফটি পিন নিল, — অবশ্য সামান্য ভয়ের সঙ্গে; আর মা তার হাতটি ধরে বলেন:

— ব্যথা, ব্যথা লাগছে! — এবং ধীরে ধীরে সেফটি পিন দিয়ে তার আঙুলে সামান্য খোঁচা দেন। — অ্যাঁ, কেমন?

শিশু ভ্রূকুটি করে, সত্যিই তার সামান্য ব্যথা লাগে, এবং সে ভয়ে হাতটি সরিয়ে নেয়। আর দু'-তিন বার এরূপ 'শিক্ষার' পর সে নিজেই ছুঁচ বা সেফটি পিন দেখিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলতে থাকে 'আ, আ!'।

আগুন শিশুদের ভীষণ আকৃষ্ট করে। তারা দু'হাত দিয়ে যেকোন আগুন ধরতে প্রস্তুত — হোক তা দিয়াশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি কিংবা লাল টকটকে কয়লা তাতে কিছু এসে যায় না। তাদের কাছে সব আগুনই সুন্দর! আর চক্‌চকে কেটলি, ইস্ত্রি — ওগুলোর দিকে হাত না বাড়িয়ে কি আর পারা যায়।

লুকিয়ে রাখা উচিত? কিন্তু তাহলে ওগুলো আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে: নিষিদ্ধ ফল সর্বদাই মিষ্ট। তাই আমরা ছেলেমেয়েদের এমনভাবে কেটলি-ইস্ত্রি ইত্যাদি ধরতে ও ছুঁতে দিই, যাতে তাদের হাত পুড়ে না যায়, তবে যেন একটু যন্ত্রণা অনুভব করে। এবং সর্বদা হুঁশিয়ার করে দিই: 'এই! ব্যথা পাবি, গরম!' কিন্তু এর পর কিছুই লুকিয়ে রাখি না: নিজেই দ্যাখুক, তা সত্যি কি মিথ্যা। ফলে কিছুকাল পরে 'এই! ব্যথা পাবি!' বললেই যথেষ্ট হয়, শিশু তখন কথায় বিশ্বাস করে, হয়তো মনের দুঃখে কেঁদেও ফেলতে পারে। তবে আসল কথা, সে নিজে ক্রমশই সতর্ক ও মনোযোগী হয়ে উঠে। সর্বপ্রকার বিপদের বিরুদ্ধে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিরক্ষা, — এমনকি বড়দের সর্বোত্তম অছিগিরিও এর কাছে হার মানে।

অনেকেই বলে: 'বুদ্ধিমান পিতামাতারা মাঝেমধ্যে ছোট বাচ্চাদের আঙুল পোড়াতে দেন।'

দুনিয়াকে চিনে নিজে নিজে। বাদবাকি — নিরাপদ — জগতের সঙ্গে শিশু পরিচিত হয় নিজে। সে যদি নিজে কোনকিছু ভেবে বার করতে পারে তাহলে আমরা তাকে সাহায্য করার জন্য ছুটি না, সে যদি কোন কাজে ব্যস্ত থাকে তাহলে আমরা তার ওই কাজে বাধা দিই না। শিশুদের, এমনকি একেবারে ছোট শিশুদেরও, সুদীর্ঘ একাগ্রচিত্ত ক্রিয়াকলাপের ক্ষমতা আমাদের একাধিক বার বিস্মিত করেছে।

আমার স্ত্রীর ডায়েরিতে লেখা আছে: 'আজ ওলিয়ার এগারো মাস পূর্ণ হল, এবং সে তার গবেষণা ক্ষমতার দ্বারা আমায় অবাক করল। আমি নিচু একটি টুলের উপর গামলায় কাপড় কাচছিলাম, আর ওলিয়া এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুদ্‌বুদ এবং পেন্সিল দিয়ে বিভিন্ন রকমের খেলা করছিল। কখনও পেন্সিলকে সাঁতার দিতে ছেড়ে দিচ্ছিল, কখনও তা দিয়ে বুদ্‌বুদ ধরছিল ও দেখছিল কীভাবে ওগুলো ভেঙে যাচ্ছে, কখনও মেঝেতে জমা জল সংগ্রহ করছিল। ...সময় সময় আমি কেবল তার দিকে তাকাচ্ছিলাম ও অবাক হয়ে বলছিলাম: 'কী সুন্দর! কী বুদ্ধিমতী মেয়ে তুই, ওলিয়া!' — এবং সে আবার খেলায় মেতে উঠছিল, অতি গুরুত্বপূর্ণ কীসব জিনিস আবিষ্কার করছিল ও আমায় তার আনন্দের ভাগ দিচ্ছিল...'

পরে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে শিশুদের যা বেশি প্রয়োজন তা হচ্ছে অছিগিরি নয়, কৌতূহল। যতই সময় যায়, সে প্রয়োজনীয়তা ততই বাড়তে থাকে।

মনস্তত্ত্ববিদরা লক্ষ্য করেছেন যে দশ মাস বয়সে বিকাশের মানে যে-অদৃশ্য পার্থক্য থাকে তা দ্রুত বেড়ে চলে এবং স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় বিপুল আকার ধারণ করে: কোন কোন ছেলেমেয়ে বিকশিত, বুদ্ধিমান, তাদের উপস্থিত বুদ্ধি আছে, পড়াশোনায় ভালো, আর কোন কোন ছেলেমেয়ে কিছুতেই বুঝতে পারে না শিক্ষক তাদের কাছ থেকে কী চাইছেন।

স্কুলে ভর্তি হওয়ার বয়স অবধি শিশুরা এত বিভিন্ন হয়ে যায় কেন? পিতামাতারা, এবং সর্বাগ্রে মায়েরা, তাদের নিয়ে কী করেন? মনোবিজ্ঞানীরা বিশেষ এক কর্মসূচি প্রস্তুত ক'রে সেই সমস্ত পরিবারে গবেষকদের পাঠালেন যেখানে দশ মাস বয়সের শিশুরা আছে। দেখা গেল যে কোন কোন মা (এবং এঁদের সংখ্যাই বেশি) সততার সঙ্গে ও সযত্নে তাঁদের সন্তানদের

দেখাশোনা ও রক্ষা করেন, ওদের বিচিত্রবর্ণ ও নিরাপদ খেলনা পরিবেষ্টিত ক'রে খাটের মধ্যে ধরে রাখেন। এমতাবস্থায় মা নিশ্চিন্তে নিজের কাজকর্ম করেন, তাঁর এরূপ কোন ভয় থাকে না যে শিশু কোথাও আঘাত পাবে, কোনকিছু নিয়ে নেবে বা নষ্ট করে ফেলবে। কিন্তু এ হেন পরিস্থিতিতে শিশু কয়েদীর মতো থাকে — সে লোকের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পায় না, তার ক্রিয়াকলাপের পরিধি সীমিত থাকে।

তবে কয়েকজন মা তাঁদের সন্তানদের ঘরময় হামা দিয়ে বেড়ানোর সুযোগ দিতে সাহস পেলেন। এমতাবস্থায় তাঁরা কিন্তু সংসারের কাজকর্ম ফেলে রাখতেন না এবং শিশুদেরও চিত্ত বিনোদন করতেন না, প্রয়োজন হলে তাঁরা বাচ্চাদের সর্বদা 'পরামর্শ' দিতেন ও সাহায্য করতেন। শিশু পেত 'গবেষণার বিপুল ক্ষেত্র' এবং বিভিন্ন গুণসম্পন্ন প্রচুর জিনিসপত্র। আর সেই সঙ্গে তার ছিল মায়ের সঙ্গে মেলামেশা করার অনেক সম্ভাবনা, — মা তাকে কখনও নিজের কাছে ডাকতেন, পরামর্শ দিতেন, সাফল্যের জন্য তার প্রশংসা করতেন, কঠিন কাজে সমর্থন জোগাতেন, তার সঙ্গে কথা বলতেন কিংবা তার মেজাজ ভালো রাখার জন্য স্রেফ হাসতেন। এই ভাবে এখানে শিশু ছিল স্বাধীন গবেষক এবং সর্বদা তার পাশে ছিলেন বিজ্ঞ ও শুভাকাঙ্ক্ষী এক পরামর্শদাতা। বিজ্ঞানীরা এ সব ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন: এই শিশুরা তাদের খাটে-বসে-থাকা সমবয়সীদের তুলনায় কত দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। পরবর্তী কালেও তারা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রাক্তন 'কয়েদীদের' অনেক ছাড়িয়ে যায়।

ছয় মাস থেকে সহায়ক। আমরা বিজ্ঞানী-মনস্তত্ত্ববিদদের এসব পরীক্ষানিরীক্ষার কথা তখনও জানতাম না এবং নিজেদের ক্রিয়াকলাপে আমরা পরিচালিত হই কেবল শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের দ্বারাই নয়, সাধারণ প্রয়োজনীয়তার দ্বারাও। আমরা যখন নতুন বাড়িতে উঠে আসি তখন আমাদের প্রথম ছেলের বয়স ছিল মাত্র পাঁচ মাস। আমি স্কুলে শ্রম-শিক্ষকের কাজ করতাম, এবং সকাল বেলা ব্যস্ত থাকতাম, আর আমার স্ত্রী ছিলেন গ্রন্থাগারের পরিচালিকা, তিনি কাজে যেতেন সাধারণত সন্ধ্যা বেলা, তাই বড়দের কেউ-না-কেউ হামেশাই বাড়িতে থাকত। কিন্তু বাড়িতে সব সময়ই এত বেশি কাজ থাকত যে ছেলেটির দিকে কোন মনোযোগ দেওয়ার ফুরসৎ মিলত না। তবে আলিওশা কিন্তু প্রত্যেক কাজেই আমাদের 'সাহায্য' করত। মা যখন বাসনপত্র ধুতেন, সে রান্নাঘরের

প্রায় সমস্ত জিনিস তার ঠেলা-গাড়িতে তুলে নিত। কখনও কখনও মা তাকে বাঁ হাতে ধরে কেবল এক ডান হাত দিয়ে রান্নাঘরের সমস্ত কাজকর্ম সারতেন। কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না: আমার দু'হাতেরই প্রয়োজন হত, কেননা হাতুড়ি, রেঁদা আর করাত দিয়ে কাজ করতে গেলে এক হাত সব সময় যথেষ্ট নয়। আমি শিশু সমেত ঠেলা-গাড়িটি আমার কাজের জায়গার কাছাকাছি রাখতাম, এবং বাপ-বেটা দু'জনেই কাজে লেগে যেতাম: আমি হাতুড়ি দিয়ে পেরেক মারতাম — সে ব্লকের উপর ব্লক দিয়ে ঠুকত। আমি স্ক্রু ড্রাইভার বা সাঁড়াশি দিয়ে কাজ করতাম — ছেলে রঙবেরঙের তারের ফেটি নিয়ে খেলত। আনন্দের কথা যে আলিওশা ছ'মাস বয়স থেকে সানন্দে হামা দিত, আর সাড়ে আট মাস বয়সে হাঁটতে শুরু করেছিল। তখনই আমি তার 'গতিশীলতা' পুরোপুরিভাবে কাজে লাগালাম — সঙ্গে সঙ্গেই তাকে মেঝেতে ছেড়ে দিলাম। ওখানে ছিল বিভিন্ন ধরনের খেলনা আর নির্মাণ সামগ্রী, রঙবেরঙের ব্লকপূর্ণ বাক্স, ছোটবড় নানান ধরনের বলে পরিপূর্ণ বালতি। এ সমস্তকিছুই তাকে খুব আকৃষ্ট করত এবং সে তা নিয়ে বিভিন্নভাবে খেলত। কিন্তু এই সমস্ত খেলনায় তার আধ ঘণ্টার বেশি কুলোত না। পরে আলিওশা হামা দিয়ে আমার কাছে চলে আসত, আর আমি তখন ব্যস্ত থাকতাম পেরেক মারার কিংবা রেঁদা করার কাজে। সে হাত বাড়াত হাতুড়ির দিকে। নিরুপায় হয়ে হাতুড়ি ছেলেকে দিয়ে দিতে হত, তবে সব সময় তা সম্ভব ছিল না, তাছাড়া হাতুড়িটিও ছিল তার পক্ষে বড়। তাই অচিরেই আমি তার জন্য বেশকিছু খেলনা হাতিয়ার কিনে আনলাম, এবং আলিওশা মহা আনন্দে তার ছোট হাতুড়ি দিয়ে সামনে যা পেত তা-ই ঠুকে বেড়াত। সে বাক্স কিংবা কৌটো থেকে পেরেক বার ক'রে আমায় দিতে ভালোবাসত। তবে মেঝেতে ছড়ানো পেরেক জড় করতে ও তা বাক্সে বা কৌটোতে রাখতে তার আরও বেশি ভালো লাগত। এ ধরনের কাজে সে অনেকখন মজে থাকতে পারত। আমি এরূপ এক 'সহায়ক' পেয়ে অবশ্যই সন্তুষ্ট ছিলাম। তার প্রশংসা করতে কখনও ভুলতাম না। এমনকি প্রয়োজন না থাকলেও আমি তার জন্য কাগজে পেরেক ছড়িয়ে দিতাম।

সামান্য শরীরচর্চা করলে মন্দ হয় না। আলিওশা যখন নিজের পায়ের উপর খাড়া হতে লাগল এবং দেয়াল ধরে ধরে চলার চেষ্টা করতে শুরু করল, আমি তখন ঘরের ভেতরে ছোট্ট একটি হরিজণ্টাল বার তৈরি করে

দিলাম, আর পরে কয়েকটি রিঙও ঝুলিয়ে দিলাম (মেঝে থেকে মাত্র ৮০ সেণ্টিমিটার উঁচুতে)। ধীরে ধীরে দেখা দিল দড়ি, লাঠি, সিঁড়ি। মেঝে থেকে উঠে হরিজণ্টাল বার ধরে দাঁড়িয়ে আলিওশা আনন্দে হাসত। পায়ের উপর যখন ভরসা কম তখন অতিরিক্ত একটি ঠেক থাকলে এরূপ ছোট্ট শিশুর কত ভালো হয় — সে যেন সোনায় সোহাগা আর কি!

এবার আলিওশা কেবল টেবিল-চেয়ার-টুল-সোফা আর বাবার হাতিয়ার পত্র 'অধ্যয়ন' করেই ক্ষান্ত ছিল না, সে নিজের জন্য 'শরীরচর্চার ব্যবস্থাও' করল। প্রথমে প্রথমে সে কেবল রিঙ ধরে ঝুলে থেকে হাসত এবং প্রশংসা লাভের আশায় আমাদের দিকে তাকাত, আর পরে এমনকি তাতে দোলতেও শুরু করল।

হাতে সময় থাকলে মাঝেমধ্যে আমিও হরিজণ্টাল বার অথবা রিঙগুলোর কাছে যেতাম এবং ছেলেকে সঙ্গ দিতাম। তাতে বাপ-বেটা দু'জনেই খুব আনন্দ পেতাম।

যখন প্রাচুর্য পরিণত হয় অভাবে। নিজের কাজকর্মের জন্য সময় করে নেওয়া এবং সেই সঙ্গে ছেলেমেয়েদেরও একা না রাখার ব্যাপারে আমাদের দৈনন্দিন প্রচেষ্টা শিক্ষাগতভাবে খুবই যুক্তিসঙ্গত ও ফলপ্রসু প্রমাণিত হয়েছিল: বিচিত্র ক্রিয়াকলাপের জন্য শিশুদের ছিল ব্যাপক সম্ভাবনা, এবং তারা বড় হচ্ছিল স্বনির্ভরভাবে (বড়দের নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে বহুক্ষণ নিজেরাই খেলতে পারত), তারা হয়ে উঠছিল উদ্যোগী (নিজেরাই সানন্দে বিভিন্ন কাজ, ব্যায়াম আর খেলা উদ্ভাবন করত), মিশুক (সমবয়সী ও বড়দের সঙ্গে সহজে মিশতে পারত) এবং কৌতূহলী (সমস্তকিছুর প্রতি তাদের আগ্রহ বছর বছর কেবল বেড়েই চলছিল)।

কয়েক বছর আগে আমাদের কাছে এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন। তিনি অভিযোগ করছিলেন যে দু' বছরের ছেলেকে নিয়ে একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন।

— যাকিছু দরকার সবই করলাম, কিন্তু ছেলেটা কেমন যেন নিস্তেজ, সব ব্যাপারে উদাসীন। আমাতেও তার কোন প্রয়োজন নেই। ভাবলে ভীষণ কষ্ট হয়! ও হয়তো বিকাশের ব্যাপারে পিছিয়ে আছে...

— আপনি কোথায় কাজ করেন? — আমাদের কেউ একজন জিজ্ঞেস করল তাঁকে। — বাড়িতে ছেলের সঙ্গে কতক্ষণ থাকেন?

— সকাল থেকে সন্ধে অবধি। ওর জন্য আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি,

ভেবেছিলাম স্কুলে ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত চোখে চোখে রাখব এবং স্কুলের জন্য ভালো মতো প্রস্তুত করে তুলব।

আমরা যখন মা ও ছেলেকে দেখলাম তখন সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম যে মা রুটিন মাফিক প্রতি সেকেন্ডে শিশুকে 'পালন ক'রে' (সময় মতো বেড়াতে নিয়ে যান, খাওয়ান, ছবি ইত্যাদি দেখিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেন) তাকে স্বনির্ভরভাবে জগৎকে চেনার জন্য একটি মিনিটও দেন না — তার জন্য সমস্তকিছু তিনি নিজেই করে দেন; তাছাড়া খাদ্য, সেবাযত্ন, রুটিন আর বেশি জ্ঞান দিয়ে তাকে একেবারে বিরক্ত করে তুলেন। আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি, কীভাবে মা 'অত্যধিক মাত্রায়' ছেলেকে শিক্ষাদান করছেন, এবং সবাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে শিশুর যা দরকার তা হল — একজন সদাব্যস্ত শ্রমশীলা মা, বেকার মা নয়।

সম্প্রতি আমরা জানতে পারলাম যে এখন ওই মহিলার দুই সন্তান এবং তিনি একটি স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। আর তাঁর বড় ছেলে ঠিক মতোই বিকাশ লাভ করছে।

তাড়াহুড়ো করে কী লাভ? সমস্তকিছু বিশদভাবে বলার পরও লোকে আমাদের এরূপ প্রশ্ন করে। বিশেষত মায়েরা:

— অবাক কান্ড! — বলেন তাঁরা। — জন্মের পরই দাঁড়াতে, হাঁটতে, সাঁতার দিতে, কথা বলতে, গান গাইতে এবং এমনকি প্রায় বই পড়তেও শেখানো হচ্ছে, — এরূপ বাচ্চাদের দেখলে কষ্ট হয়! কিন্তু এ ছাড়াও তো লোকে মানুষ হচ্ছে।

অবশ্যই মানুষ হচ্ছে, কিন্তু...

সমস্ত ধরনের শিক্ষাই শুরু হয় একেবারে শৈশব থেকে। ঠিক তখনই — জীবনের প্রথম দিনগুলো থেকে — শিশু মাতৃভাষা রপ্ত করতে শুরু করে।

আমরা কি কখনও ভাবি যে আমাদের অবোধ সন্তানকে মিষ্টি কথা বলে, তাকে গান শুনিয়ে আমরা তাকে কথা বলতে ও ভাষা বুঝতে শেখাচ্ছি? না, সেটাই রীতি, সবাই তা করে। তাছাড়া শিশুদের সঙ্গে আদর ক'রে কথা বলতে এবং তাদের গল্প ও গান শোনাতে ভালো লাগে। শিশুদেরও তাতে আনন্দ হয়, তারা কৌতূহলী হয়ে উঠে। তখন কেউই ভাবে না যে আমরা তাড়াহুড়ো করছি, শিশুর উপর বেশি চাপ পড়ছে এবং তা তার পক্ষে কঠিন, ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। তারপর এমন এক মুহূর্ত আসে যখন শিশু — এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই — নিজে প্রথম কথাটি উচ্চারণ

করে। খুবই সহজ! কিন্তু আমরা যদি শিশুর সঙ্গে কম কথাবার্তা বলি তাহলে ব্যাপারটি মোটেই সহজ হয় না। সঙ্গে সঙ্গে তার বিকাশে বাধা পড়ে।

যারা খুব দেরিতে ভাষা শিখতে আরম্ভ করে এবং যাদের নির্দিষ্ট ভাষায় কথা বলার সুযোগ খুবই কম তারা অতি কষ্টে ভাষা রপ্ত করে (কিংবা একেবারেই রপ্ত করে না)। কখন শুরু করা উচিত ও কীভাবে তা করা উচিত — ঠিক এই জিনিসটাই নির্ধারণ করে মাতৃভাষা আয়ত্তকরণের সফলতা। বাদবাকি দক্ষতার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি যে ঠিক অনুরূপ তা কি কেউ অস্বীকার করবেন?

তাই একেবারে শৈশবে — 'সমস্ত সূচনার সূচনাতে' — মা-বাবারা সময়ের কীরূপ ব্যবহার করছেন তার উপরই অনেকাংশে নির্ভর করবে তাঁদের সন্তানের ভবিষ্যৎ বিকাশ।

মাকে ছাড়া চলে না। একদা পার্কে আমরা এরূপ একটি হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য লক্ষ্য করি। বেঞ্চিতে বসে কথাবার্তা বলছেন দুই তরুণী মহিলা। এক মহিলার কাছে হেলেদুলে বার বার আসছে বছর দুয়েকের এক শিশু, তাঁর হাঁটুতে ঘেঁষছে, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলে যাচ্ছে অন্যান্য শিশুদের কাছে বালুর স্তূপে। মহিলাটি তাকে কিছুই জিজ্ঞেস করেন না, স্রেফ ছেলের মাথাটিতে একটু হাত বুলিয়ে দেন, কানে কানে কী বলেন, এবং সে — যেন শীতল জল খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ ক'রে — আবার খেলতে চলে যায়। ছেলেমেয়েদের কেউ তাকে বিরক্ত করছিল না, বালুর স্তূপ থেকে সে মাকে ভালোই দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও বার বার মা'র কাছে আসছিল। সে আসছিল মায়ের স্পর্শ লাভ করার জন্য, তাঁর হাত ও হাঁটুর উত্তাপ অনুভব করার জন্য — এ ছাড়া সে কিছুতেই নিশ্চিন্তে খেলতে পারছিল না।

মাকে স্রেফ দেখারই নয়, তাঁকে কাছে ও শারীরিকভাবে অনুভব করারও এই বাসনাটি আমাদের সন্তানদের মধ্যে আমরা, দুঃখের বিষয়, সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কার করতে পারি নি। কেবল কালক্রমেই আমরা বুঝতে পারি যে সর্বদা মাকে দেখার ইচ্ছা, তাঁকে পাশে অনুভব করার কিংবা অন্তত পক্ষে তাঁর কণ্ঠ শোনার বাসনা — এ মোটেই জেদ নয়। প্রথম দিকে আমার স্ত্রীও নিজের অন্তরের কথা শুনতেন না, শাশ্বত 'সত্যে' বিশ্বাস করতেন: বাচ্চাটাকে লাই দিও না, নতুবা একেবারে ঘাড়ে চেপে বসবে (মনে আছে: শিশু কোলে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আর রক্ষে থাকবে না)।

প্রথম সন্তানকে একেবারে শুরু থেকেই তিনি প্রশ্রয় না দেওয়ার চেষ্টা করেছেন: কাঁদলে কাছে আসতেন না — আগে কান্না বন্ধ করুক; বিছানায় শুইয়ে দিয়েই চলে যেতেন — নিজে ঘুমাক; ঘুম পাড়ানো, গান শোনানো — না না, ওসব মোটেই চলবে না, অভ্যস্ত হয়ে যাবে...

কিন্তু লাভটা কী হল? ডায়াথেসিসের দরুন সে ঘুমাতে পারত না, রাত্রে প্রায়ই কাঁদত, আর মা নিজের 'অটলতা দেখাতে গিয়ে' কিছুতেই ছেলেটিকে কোলে নিতেন না... কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেই নিজেকে নাজেহাল করে ছাড়লেন। 'এটা করতে নেই,' 'ওটা ঠিক নয়' — অবশেষে নিরাশ হয়ে এই সমস্ত 'সদুপদেশে' আর কান না দিয়ে ছেলেটিকে নিজের পাশেই শোয়ালেন। শিশুর জীবনের ছ'মাসের মধ্যে সেটাই ছিল প্রথম রাত্রি, যখন মা ও সন্তান উভয়েরই ভালো ঘুম হয়েছিল। এর পরের রাতগুলোও আমাদের কাছে আর সমস্যা হয়ে দেখা দিল না।

ঠিক এই ঘটনাটির পরই আমরা তাকে এমনকি দিনের বেলাও ঘন ঘন কোলে নিতে লাগলাম, আর পরে বাদবাকি সন্তানদের সঙ্গেও আমরা অনুরূপ আচরণ করি। বাড়িতে দিদিমারা আমায় সময় সময় 'গাছ' বলে অভিহিত করতেন, কেননা কাজ থেকে এলেই সব ছেলেমেয়ে আমার গায়ে ঝুলতে শুরু করে দিত, আর যারা নিজে ঝুলতে পারত না তাদের আমিই তুলে নিতাম এবং অনেক-অনেকখন ধরে তাদের হাতে-কাঁধে-কোলে নিয়ে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতাম কিংবা তারা সবাই ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সঙ্গে খেলাধুলা করতাম। না, এ আমাদের কাছে কোন কষ্টকর ব্যাপার ছিল না। আমরা লক্ষ্য করেছি ছেলেমেয়েরা তাতে কত আনন্দ পেত এবং আমাদের বড়দেরও ভালো বই খারাপ লাগত না। সেই জন্যই আমরা কিছু বাধানিষেধ লঙ্ঘন করেছি বলে দুঃখিত হই নি।

এখন পত্রপত্রিকায় প্রায়ই দেখতে পাই যে আমাদের 'যুক্তিহীন' ক্রিয়াকলাপ ক্রমশই অধিক সমর্থন ও অনুমোদন লাভ করছে। বোঝা গেল যে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে শারীরিক যোগাযোগ শিশুর মধ্যে নিরাপত্তা বোধ গড়ে তুলে এবং স্বাভাবিক মানসিক বিকাশের পক্ষে তা খুবই অপরিহার্য।

দাদু ও দিদিমার প্রয়োজন আছে। শিশুরা ভাষাগত ও আবেগগত আদানপ্রদানের চাহিদাও অনুভব করে। এ ব্যাপারে দাদু-দিদিমাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য, কেননা মা-বাবারা তাঁদের সদা ব্যস্ততার জন্য

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খুব একটা মেলামেশা করার সুযোগ পান না। জ্যেষ্ঠ সন্তানদের সঙ্গে আমরা দীর্ঘ সময় ধরে অনেক কথাবার্তা বলতাম, এবং এর ফলে তাদেরও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধ্বনি ও শব্দাংশ উচ্চারণ করার ইচ্ছে হত। এ কাজে দিদিমারা আমাদের বিশেষ সাহায্য করতেন, — তাঁরা তখন আমাদেরই সঙ্গে বাস করতেন। ছেলেমেয়েরা বছর নাগাদ অনেককিছু বুঝত, এমনকি দশ-বারোটি সাধারণ শব্দও উচ্চারণ করতে পারত। এক কথায়, তারা স্বাভাবিকভাবেই বিকাশ লাভ করছিল।

তবে মধ্যম সন্তানদের বেলা বিকাশের গতি মন্থর হয়ে যায়: আমরা আশা করেছিলাম যে সবই আপনা থেকে ঠিক হয়ে যাবে এবং সর্বদা ব্যস্ত থাকাতে লক্ষ্যই করি নি যে তারা কথাবার্তায় পিছিয়ে পড়ে। সকাল কিংবা দুপুরের খাবারের পর আমরা ছোট ছেলেমেয়েদের বড়দের সঙ্গে (২-৪ বছরে বড়) খেলতে ছেড়ে দিতাম। বড়দের খেলাধুলা ও কাজকর্মে ছোটরাও সমানে সমানে অংশগ্রহণ করতে পারত: টেবিলের তলায় গড়া বাড়িতে মিলেমিশে 'বাস করত,' খাটিয়া দিয়ে তৈরি পাহাড় থেকে গড়িয়ে নিচের দিকে নামত। বড় ছেলেমেয়েরা জানত যে ছোটটি কথা বলতে পারে না এবং তাতে তারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল — তাকে যে কথা বলতে শেখানো উচিত সেটা তারা বুঝত না। ছোটটি কেবল একটি অনির্দিষ্ট ধ্বনিই উচ্চারণ করত — 'ই', এবং সে তা ব্যবহার করত জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সবাই তাকে বুঝত।

আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে আমাদের মধ্যম ছেলেমেয়েরা দেড় বছর বয়সেও এক বছরের বাচ্চার চেয়ে কম কথা বলত। তাদের কথা বলতে শেখাতে পরে আমাদের খুবই কষ্ট হয়েছিল। ভুল সংশোধনের জন্য প্রচুর শক্তি ও সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল।

শেষ কন্যাসন্তান লুবাশার জন্মের পর আমাদের বাড়িতে বাস করতে লাগলেন আমার বাবা। ছোট্ট নাতনীটিকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। তিনি তার সঙ্গে অনেক কথা বলতেন, তাকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন, তাঁরা একসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ছবি দেখতেন, যার ফলে আমাদের লুবাশা দেড় বছর বয়সেই অনেককিছু বলতে পারত।

দুধের কাপ ফেলে দিয়েছে? ফেলে দেওয়া দুধের ঘটনা স্মরণ ক'রে লোকে সময় সময় আমাদের জিজ্ঞেস করে:

— অনুরূপ অবস্থায় এখন আপনারা কীরূপ আচরণ করতেন?

আমরা উত্তর দিই: তা নির্ভর করে অনেককিছুর উপর।

ব্যাপারটি যদি অপটুতা ও অসাবধানতা বশত ঘটে থাকে এবং তদুপরি শিশু যদি নিজেকে বিব্রত ও দোষী বোধ করে, তাহলে শাস্তি দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। এমতাবস্থায় সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে বলা উচিত:

— হায় হায়, দুধ পড়ে গেছে? ও কিছু না, বসো, মেঝেটা মুছো। এক্ষুনি আরও দুধ ঢেলে দিচ্ছি। তাহলে কাপটি এবার কোথায় রাখি, যাতে আবার পড়ে না যায়?

শিশু যদি কাপটি একটু সরাতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে হঠাৎ ফেলে দেয় এবং সেজন্য নিজেই দুঃখিত হয় তাহলে আমরা তাকে সান্ত্বনা দেব, দুধটা মুছে ফেলতে সাহায্য করব, আবার তার কাপে দুধ ঢেলে দেব এবং কীভাবে ও কোন্ দিকে কাপ সরাতে হয় তা শিখিয়ে দিতে চেষ্টা করব। তাকে নিজেকে দিয়েই সে কাজ করাব।

এমনটাও ঘটতে পারে: শিশু একেবারে ঢুলে পড়ছিল, ফলে সে কাপটি ধরে রাখতে পারে নি। এমতাবস্থায় তাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া ও মেঝেটা মুছে ফেলা উচিত হবে এবং তার ঘুম ভাঙলে ঘটনাটির কথা স্মরণ না করলেই ভালো হবে। এমন ভান করা উচিত যেন কিছুই ঘটে নি।

কিন্তু যদি আপনার সন্তান জেদ ধরে: 'দুধ খাব না, চা খাব!'—এবং কাপটি ঠেলে মেঝেতে ফেলে দেয় ও তার উপর আবার ঠোঁট ফুলিয়ে বসে, তাহলে একটু রাগ করলে কোন ক্ষতি হবে না। এমতাবস্থায় তাকে নিজেদের সঙ্গে বসতে না দেওয়া এবং পরবর্তী খাবার অবধি আর কোনকিছু খেতে না দেওয়াই সঙ্গত হবে। এখানে কাপ নিয়ে কথা হচ্ছে না, কুআচরণ নিয়ে, এবং তা বরদাস্ত করা খুবই অনুচিত!

আমরা কেবল কয়েকটি সম্ভাব্য ঘটনার কথা বললাম। তবে বাস্তব জীবনে প্রতিটি ঘটনা সম্পূর্ণ আলাদা এবং তাতে কীরূপ প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত সে সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট পরামর্শ দেওয়া সম্ভব নয়।

এটা করা উচিত, আর এটা করা অনুচিত। কিন্তু এমনও অনেক ব্যাপার আছে যেগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট মতামত থাকা চাই। অচেনা জিনিস ও সম্পর্কের জগতে শিশুর সঠিক ধারণা গড়ার পক্ষে তা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

একটা ঘটনার কথা বলি। একবার আমার স্ত্রী বাড়িতে নিমন্ত্রিত

অতিথিদের একজনের সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন। তাঁর হাঁটুর উপর বসে ছিল আট মাস বয়সের ছেলে। কথাবার্তা তখনও শেষ হয় নি, কিন্তু বাচ্চাটি আর কিছুতেই বসে থাকতে চাইছিল না। তখন মা তার চিত্ত বিনোদনের জন্য তাকে হাতের ঘড়িটি দেখালেন এবং ওটা তার কানের কাছে ধরে রাখলেন: 'শুনছিস, কেমন টিক-টাক করছে!' শিশুটির ভীষণ কৌতূহল হল। সে বেল্ট ধরে ঘড়িটি টানল, খুলতে চেষ্টা করল। আর মায়ের এ দিকে এত গুরুত্বপূর্ণ আলাপটি শেষ করতেই হবে—নতুবা পেটের ভাত হজম হবে না। তিনি একটুও না ভেবে ঘড়িটি খুলে ছেলেকে দিয়ে দিলেন: নে খেল গে! কথাবার্তা মঙ্গল মতো শেষ হলে তাঁর ঘড়ির চিন্তা হল: কীভাবে তা ফেরৎ পাওয়া যায়। কিন্তু ছেলে কিছুতেই ঘড়ি দিতে চাইছিল না—তার খেলা তখনও শেষ হয় নি।

— ঘড়ি নিয়ে খেলতে নেই।—রেগে যান মা।—দে বলছি।

— কিন্তু তুমি তো নিজেই ওকে ঘড়িটা দিয়েছ, আর তার মানে ওটা নিয়ে খেলা যায়,—বললাম আমি।—ও এখন এভাবেই বুঝবে: অনুচিত মানে উচিত। তুমি সবই গুলিয়ে দিয়েছ।

সত্যিই ছেলে যাতে আর কখনও ঘড়ি না নেয় এবং বুঝতে পারে যে ওটা ধরা নিষেধ সে জন্য আমাদের বেশ লড়তে হয়েছিল তার সঙ্গে।

তখন থেকে আমরা 'এটা করা বারণ', 'এটা করা ঠিক নয়', 'এটা নিষেধ' ইত্যাদি কথাগুলো বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতাম। সর্বাগ্রে তা ব্যবহারে একটা শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করি। বুঝতে পারলাম: যদি কোনকিছু করা উচিত নয় তাহলে তা অনুচিত হওয়া উচিত একেবারে শুরু থেকে এবং সর্বপ্রকার দ্বিধা ব্যতিরেকে। যেমন, ঘড়ি, টাইপ রাইটার, টেপ রেকর্ডার, টেলিভিশন ইত্যাদিতে—অর্থাৎ যে-সমস্ত জিনিস সহজে নষ্ট হয় তাতে হাত দেওয়া নিষেধ! চামচ-কাঁটা ইত্যাদি মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলা, দিদিমাকে বা অন্য কাউকে — এমনকি তামাসা করেও — গালে চড় মারা, বেড়ালের লেজ ধরে টানা—নিষেধ! এবং এই কথাটি উচ্চারণ করা উচিত কঠোর স্বরে, কোন শর্ত ও ব্যাখ্যা ছাড়া।

কিন্তু—এবং এটাও গুরুত্বপূর্ণ—বাধানিষেধ বেশি হওয়া উচিত নয়, যথাসম্ভব কম হলেই ভালো। শিশু সব সময়ই যদি শুনে 'এটা করবি না, ওটা করবি না,' এবং প্রতিবার বাধানিষেধ লঙ্ঘনের জন্য যদি সে কঠোর শাস্তি পায়, তাহলে তা হয় তাকে ভীত করবে নয় তার মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জাগিয়ে তুলবে। প্রতিটি 'নিষেধেই' অসন্তোষ দেখা দেয়, কারণ নিষেধ

মানেই কোন বাসনা পূর্ণ করতে না পারা, আর তা সর্বদাই দুঃখজনক, অপমানকর, তা ভবিষ্যতের জন্য কোন আশা রাখে না।

আমরা তা এড়াতে চেষ্টা করি। ছেলেমেয়েদের কোনকিছু করতে বারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তাদের বুঝিয়ে দিই কী করা উচিত ও সম্ভব! যেমন, ভাত ফেলা অনুচিত, তবে বল ফেলা সম্ভব; বেড়ালকে ব্যথা দেওয়া অনুচিত, তবে তার গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দেওয়া সম্ভব; ঘড়ি ধরা নিষেধ, তবে চাকা কিংবা বাক্স নেওয়া সম্ভব; আজ দিদিমার কাছে যাওয়া যাবে না, তবে কাল যাওয়া সম্ভব। তাহলে শিশুর আশা থাকে, কাজের সম্ভাবনা সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা জাগে। তখন সংঘর্ষ, জেদ আর ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। শিশু যেন তখন তার চারিপাশের জগতে দিক নির্ণয়ের জন্য একটি কম্পাস খুঁজে পায় এবং সে অধিকতর শান্ত ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে।

প্রাক্-স্কুলবয়স্ক শিশুর মানসিক বিকাশের সূচক

আপনাদের সন্তান বড় হচ্ছে। আপনারা নিশ্চয়ই তার বিকাশের দিকে সব সময় নজর রাখেন, তার সাফল্যে আনন্দিত হন, তার অকৃতকার্যতায় দুঃখ পান। আপনারা চান, আপনাদের সন্তান যেন কেবল স্বাস্থ্যবানই নয়, বুদ্ধিমান আর মেধাবীও হয়ে উঠুক।

জন্মের পর মুহূর্ত থেকেই আপনারা শিশুকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল পর্যন্ত শিক্ষাকার্য চালানো যেতে পারে কী জিনিস নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় তা দেখানোর মাধ্যমে, খেলাধুলার প্লট বাতলে দেওয়ার মাধ্যমে, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে, ছবি আঁকার কাজে এবং ব্লক দিয়ে ঘরবাড়ি ইত্যাদি নির্মাণে সহায়তা দানের মাধ্যমে। কিন্তু পরে এমন এক সময় আসে যখন শিশুর সর্বাঙ্গীণ মানসিক বিকাশের জন্য সুসম্বদ্ধ ও সাধারণীকৃত জ্ঞান অপরিহার্য হয়ে উঠে।

শিশুদের মনন নির্দিষ্ট, যদি তাদের দেওয়া হয় নির্দিষ্ট, অসংলগ্ন ও বিচ্ছিন্ন জ্ঞান। কিন্তু যদি জ্ঞান দেওয়া হয়ে থাকে আলাদা আলাদা জিনিসের বিষয়ে নয়, সাধারণতম সম্পর্ক আর নিয়মানুবর্তিতার বিষয়ে, তাহলে প্রাক্-স্কুলবয়স্ক ছেলেমেয়েরা তা কেবল আয়ত্ত করতেই শুরু করে না (অন্ততপক্ষে ৫ বছর থেকে), নিজেদের বিচার-বিবেচনায় তা ব্যবহার করতেও শেখে। তাদের আগ্রহের পরিধি বিস্তৃত হয়, মনন অধিকতর সাধারণীকৃত,

গভীর ও যুক্তিসঙ্গত রূপ লাভ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাক্‌স্কুলবয়স্ক ছেলেমেয়েদের পদার্থবিদ্যা, জীবতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র এবং এমনকি ভাষাতত্ত্বের মতো বিজ্ঞানগুলোর বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান দানের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হচ্ছে। যেমন, শিশুরা পরিচিত হচ্ছে জড় পদার্থের গতির নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে, জীবন ধারণের উপর প্রাণী দেহের গঠনের নির্ভরতার সঙ্গে, এক ও বহু সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে, গোটা ও অংশ সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে। কিন্তু এরূপ শিক্ষাকার্য যাতে শিশুর স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত না ক'রে তার মনন শক্তির বিকাশ ঘটায় সেই উদ্দেশ্যে তা পরিচালিত হওয়া উচিত বিশেষ ধরনে—খেলাধুলার মাধ্যমে, বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে, ওগুলোর ছবি আর মডেল নিয়ে শিশুদের নিজস্ব কার্যকলাপের মাধ্যমে।

একটি প্রশ্ন সব মা-বাবাকেই সর্বদা চিন্তিত করে—তাঁদের সন্তান তার বয়সোপযোগী বিকাশ লাভ করছে কি, তা পরীক্ষা করা সম্ভব কি? কিন্তু শিশু হয় বিভিন্ন ধরনের। পরিবার হয় বিভিন্ন ধরনের। তাদের জীবনযাত্রার পরিস্থিতিও বিভিন্ন ধরনের। শিশুদের মানসিক বিকাশের মান নির্ধারণের জন্য অভিন্ন কোন সুপারিশ দেওয়া-ও কঠিন, কেননা ওই মানসিক বিকাশেরও অভিব্যক্তি ঘটে বিভিন্নভাবে। জ্ঞান কিংবা অভিজ্ঞতার খোদ পরিমাণ বিকাশের সূচক বলে গণ্য হতে পারে না।

খোদ জ্ঞান যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শিশু সেই জ্ঞান কতটা কাজে লাগাতে পারে, কীভাবে সে তা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের সময় প্রয়োগ করতে পারে। কবিতা বা গল্প বোঝার মান, তার ঘটনাবলির অর্থ ও যৌক্তিকতা বিকৃত না ক'রে স্বনির্ভরভাবে সারাংশ বলতে পারা পাঠটি মুখস্থ করার চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক সেই ভাবেই যেকোন ব্যাপারের সংখ্যাগত দিকের অভিব্যক্তি হিশেবে সংখ্যা বোঝা, সহজতম অঙ্ক করতে পারা এবং বিশেষ ক'রে নিজে নিজে কোনকিছুর হিসাব করতে পারা (পাঁচের মধ্যে হলেও ক্ষতি নেই) 'অসীমতা' অবধি গণনার চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তবে এরূপ সূচকও যথেষ্ট অনির্দিষ্ট—সমস্তকিছুই নির্ভর করে পরীক্ষার জন্য কোন্ গল্প বেছে নেওয়া উচিত তার উপর, সংখ্যার সঙ্গে কীভাবে শিশুর পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া হয় তার উপর...

প্রাক্‌স্কুলবয়স্ক শিশুর অনুসন্ধিৎসা ও মানসিক সক্রিয়তার মাত্রা—তার মানসিক বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সূচক। তবে এই মাত্রাটি নিরূপণ করা মোটেই সহজ নয়। কৌতূহল সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছার

পক্ষে কেবল প্রদত্ত প্রশ্নের সংখ্যাই যথেষ্ট নয়। প্রশ্নে প্রশ্নে বিভেদ থাকে। অনেক সময় শিশু প্রশ্ন করে এই জন্য নয় যে সে সত্যিই কোনকিছু জানতে আগ্রহী, প্রশ্ন করে স্রেফ বড়দের মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে, তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য।

— সর্বপ্রকার শিক্ষাদানের মানেই হচ্ছে শিশুমনে আমাদের বাঁধাধরা চিন্তাধারা, আমাদের নতুনত্ব-বর্জিত বিশ্ববীক্ষা বদ্ধমূল করে তোলা। সে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড। অথচ এই স্ট্যান্ডার্ডই সৃজনী শক্তি ধ্বংস করে।

— তাহলে আপনি একটি পথ বাৎলে দেবেন?

—শিশু নিজেরটা নিজেই সৃষ্টি করুক।

—নিজেরটা? তা কী দিয়ে? কোন্ সামগ্রী দিয়ে? কেবল শিক্ষাই জ্ঞান দান করে, মনন ও ক্রিয়াকলাপের পদ্ধতি জোগায়, যার সাহায্যে নতুন কোনকিছু গড়া সম্ভব হয়।

— তার মানে আপনি আবার সেই স্ট্যান্ডার্ডের পক্ষে?

— না। আমি তা এড়ানোর পক্ষে। কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড এড়াতে পারেন একমাত্র তিনি যিনি তা রপ্ত করেছেন। যে স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে কিছুই জানে না তার করারও কিছু নেই।

শিশুর নিজস্ব বিচারবিবেচনায় মানসিক সক্রিয়তার প্রকাশ সম্পর্কে বললে এ কথাটি উল্লেখ করতে হয় যে এখানেও দুটো জিনিস পার্থক্য করা উচিত—কিছু কিছু শিশু খুব বেশি বকবক করে এবং কিছু কিছু শিশু পারিপার্শ্বিক ব্যাপারাদি অনুমান করতে প্রয়াসী হয়, যাকিছু জানে তার সঙ্গে এই সমস্ত ব্যাপারাদির তুলনা করতে চেষ্টা করে। এমতাবস্থায় যদি শিশুর বিচারবিবেচনা প্রায়ই ভুল হয়, যদি তা অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত করে তাহলেও কোন ক্ষতি নেই—সে এখনও খুব কম জানে এবং স্বাধীনভাবে কল্পনা করতে খুব বেশি অভ্যস্ত। আসল হচ্ছে সিদ্ধান্ত নয়, বোঝার প্রচেষ্টা। একই কথা বলা চলে শিশুর 'পরীক্ষানিরীক্ষার' বিষয়ে: খোদ 'আস্বাদন' করার প্রচেষ্টা, পরীক্ষা করে দেখার প্রচেষ্টা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার।

শিশু যখন খেলা করে তখন লক্ষ্য করা উচিত তার চিন্তাভাবনা কতটা সমৃদ্ধ ও বিচিত্র, চারিপাশের জীবন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সে সহজে তার খেলায় রূপায়িত করতে পারে কি না, খেলনা ও অন্যান্য জিনিস সে কীভাবে ব্যবহার করে।

যে-সমস্ত শিশুর মানসিক বিকাশের মান নিম্ন তাদের খেলাধুলা বৈচিত্র্যহীন, তারা সর্বদা একই ধরনের জিনিসপত্র নিয়ে খেলা করে (যেমন,

গাড়িটি আগে-পিছে নিয়ে যায়, পুতুলগুলোকে 'খাওয়ায়' ও 'ঘুম পাড়ায়')। শিশু ভালোভাবে বিকাশ লাভ করলে সে খেলার রকম রকমের প্লট গড়ে, কেবল খেলনাই ব্যবহার করে না, হরেক রকমের জিনিসও সানন্দে ব্যবহার করে (ব্লক, পেন্সিল, চেয়ার ইত্যাদি), এবং ওগুলোর উপর ক্রীড়াসুলভ তাৎপর্য আরোপ করে। শিশুর চিন্তাধারা যথেষ্ট স্থায়ী, তা খোদ খেলাধুলোর মধ্য দিয়ে বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠে।

শিশুদের ছবিগুলোর স্বকীয়তা আমাদের আকৃষ্ট করে। তারা জিনিসের আকার ও আয়তন ফুটিয়ে তুলতে পারে না। প্রায়ই সত্যের বিরুদ্ধে চলে— এক রঙের পরিবর্তে অন্য রঙ ব্যবহার করে, যে-রঙ সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয় সেটা দিয়েই আঁকে। কিন্তু সেই সঙ্গে শিশুদের ছবিতে থাকে ব্যঞ্জনার নিজস্ব বিশেষ উপায়, এবং শিশু কীভাবে জগৎকে উপলব্ধি করে (বিশেষত যখন আমরা কেবল প্রস্তুত ফলই নয়, ছবি সৃষ্টির খোদ প্রক্রিয়াটিও দেখতে পাই) ছবি সে বিষয়ে অনেককিছু বলতে পারে। এখানে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে শিশু যেন আগে থেকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গড়ে তুলে—সে কী আঁকতে চায়, কীভাবে আঁকতে চায় আগে তা ঠিক করতে পারা চাই, এবং তারপরই সে যেন ধীরে ধীরে তার পরিকল্পনাটিকে বাস্তব রূপ দান করে। খেলার সময় যেমনটি লক্ষ্য করা যায় ঠিক সেই ভাবে ছবি আঁকার প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা পরিবর্তিত ও সমৃদ্ধ হতে পারে। কিন্তু পরিকল্পনা যদি আপন অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে এবং শেষ অবধি টিকে না থাকে তাহলে ভাবতে হবে যে ব্যাপার-স্যাপার খুব একটা ভালো নয়। এটা মনে রাখা উচিত যে শিশু প্রায়ই আঁকার সময় কোন কাহিনী বলে কিংবা খেলা করে, যাকিছু সে আঁকে কথা অথবা অঙ্গভঙ্গির দ্বারা তাকে পূর্ণতা দান করে। স্বভাবতই, এমতাবস্থায় ছবি হতে পারে সঙ্গতিহীন, এবং অন্য কেউ তা বুঝতে না-ও পারে। তাতে আশঙ্কার কোন কারণ নেই। আপনার কেবল মনে রাখা দরকার যে এটা স্রেফ দাগ আর রেখার কোন আপতিক ভিড় নয়, শিশুর জন্য ওগুলোর নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, তা তার জানা জিনিস আর ঘটনাবলি রূপায়িত করে।

ব্লক দিয়ে ঘরবাড়ি ইত্যাদি নির্মাণের কাজ শিশুর মানসিক সক্রিয়তার কাছে বিশেষ দাবি হাজির করে। খেলাধুলা এবং চিত্রাঙ্কনের মতো এখানেও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গড়ে উঠে ও মূর্ত রূপ লাভ করে। বিশেষ বিন্যাস অনুসরণ না করেও ছবি আঁকা চলে, কিন্তু ঘরবাড়ি ইত্যাদি নির্মাণের কাজে কঠোরভাবে পরম্পরতা মানতে হয়, নতুবা ঘরবাড়ি ভেঙে পড়বে। সেই

জন্যই ঘরবাড়ি নির্মাণের প্রক্রিয়ায় নিজস্ব ক্রিয়াকলাপ পরিকল্পনের দক্ষতা প্রকাশ পায়। তাছাড়া নির্মাণকার্য প্রায়ই খেলার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়: শিশুরা পুতুলের জন্য বাড়ি আর গাড়ির জন্য গ্যারেজ গড়ে। তাদের মানসিক বিকাশের মান এ ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় নির্মাণের আয়তন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে—গ্যারেজটি এমনভাবে গড়তে হবে যাতে সত্যিই তাতে খেলনা-গাড়ি প্রবেশ করতে পারে।

সমস্ত প্রাক্‌স্কুলবয়স্ক ছেলেমেয়ে তাদের সর্বপ্রকার আচরণ আর ক্রিয়াকলাপে সমানভাবে তাদের মানসিক দক্ষতা প্রদর্শন করে থাকে এমনটা ভাবা ভুল হবে। কোন কোন শিশু খেলাধুলা আর চিত্রাঙ্কন বেশি ভালোবাসে, কোন কোন শিশু ভালোবাসে নির্মাণকার্য, কোন কোন শিশু পছন্দ করে গাড়ি, আর অন্যদের আকৃষ্ট করে জীবজন্তু ও উদ্ভিদ জগৎ। তা নির্ভর করে অনেকগুলো কারণের উপর, এবং প্রধানত লালনপালনের পরিবেশের উপর। তাই যার যে-ক্ষেত্রের দিকে বেশি টান সর্বাগ্রে সে-ক্ষেত্রেই তার মানসিক বিকাশের সম্ভাবনা খোঁজা উচিত।

এ ব্যাপারটিও মনে রাখা উচিত যে শিশুদের আগ্রহ এবং বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াকলাপ আয়ত্তকরণের মাত্রা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে। অনুসন্ধিৎসা সম্পর্কে, খেলাধুলা, চিত্রাঙ্কন আর নির্মাণকার্যের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গঠন ও বাস্তবায়নের দক্ষতা সম্পর্কে ইতিপূর্বে যাকিছু বলা হয়েছে তা প্রধানত ৫-৬ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের বেলাই বেশি প্রযোজ্য, তবে অধিকতর মৌলিক বা প্রাথমিক আকারে এই সমস্ত গুণ আগেও—৩-৪ বছর বয়সে—প্রকাশ লাভ করতে পারে। মানসিক গুণাবলি গঠনের সঠিক বয়স সম্পর্কে কোনকিছু বলা খুবই কঠিন, কেননা সমস্ত শিশুর বিকাশের গতি সমান হয় না।

এখানে নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন দেখা দেয়: বিকাশের গতি মানসিক ক্ষমতার সূচক হিশেবে বিবেচিত হতে পারে কতটা? সচরাচর এই গতির উপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তার পেছনে যুক্তিও থাকে, বিশেষত যখন শিশুর বিকাশে বিলম্ব লক্ষ্য করা যায়—সে ঠিক সময়ে প্লটযুক্ত খেলা শুরু করে না, বিষয়ভিত্তিক চিত্রাঙ্কনের দিকে মন দেয় না, অতি সাধারণ গাণিতিক ব্যাপারাদিও রপ্ত করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য শিশুর থেকে পিছিয়ে থাকলে তা অবশ্যই মা-বাবার মনে কিছুটা আশঙ্কার উদ্রেক করবে। কারণগুলো থাকতে পারে যেমন লালনপালনের পরিবেশ ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে (শিক্ষাকার্যে অবহেলা), তেমনি

মস্তিষ্ক ও স্নায়ু ব্যবস্থার ত্রুটির ক্ষেত্রে (মানসিক অনগ্রসরতা, শ্রবণ শক্তিতে গোলযোগ ইত্যাদি)।

অনেক শিশুর অতি অল্প বয়সে বিকাশ ঘটে, তারা অন্য শিশুদের যথেষ্ট ছাড়িয়ে যায়। এ ব্যাপারগুলোর তাৎপর্য নির্ধারণ মোটেই সহজ নয়। দেখা যায় যে কোন কোন শিশু ৩ বছর বয়সেই পড়তে ও গণতে পারে, তাদের মধ্যে বয়সানুপযোগী বিভিন্ন আগ্রহ দেখা দেয়,—যেমন, তারা যান্ত্রিক ব্যাপারাদি, গণিতশাস্ত্র, ভূগোল ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে। তারা এই সমস্ত ক্ষেত্রে দ্রুত সাফল্য লাভ করে: স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই তারা স্কুল পাঠ্যসূচির অন্তর্গত বহু বিদ্যা অর্জন করে ফেলে। এরূপ ছেলেমেয়ের মা-বাবারা প্রায়ই দিশেহারা হয়ে পড়েন। শিশুর স্বাস্থ্যহানি হতে পারে এই ভেবে অনেক মা-বাবা অকাল বিকাশের গতি রোধ করতে চেষ্টা করেন। আর কোন কোন মা-বাবা ঠিক উল্টো কাজ করেন—আপন সন্তানকে প্রতিভাশালী করে তোলার মধুর আশায় তাঁরা তার অকাল বিকাশে সর্বপ্রকার তৎপরতা দেখান। তবে এমনও মা-বাবা আছেন যাঁরা সমস্তকিছু 'নিয়তির হাতে' সঁপে দেন।

আমরা এখন 'শিশু প্রতিভা' বিষয়ক প্রশ্নটি আলোচনা করতে যাচ্ছি না। শুধু এটাই উল্লেখ করব যে বিকাশের অসাধারণ দ্রুত গতি মা-বাবাদের যেন চিন্তিত না করে। একমাত্র একটি ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা উচিত, এবং তা হল—অনুরূপ পরিস্থিতিতে অতি সম্ভাব্য একমুখিনতা, বাদবাকী সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষতি ক'রে কেবল কোন একটি ক্ষেত্রে শিশুর প্রস্থান। আরও একটা কথা সর্বদা মনে রাখা দরকার—অত্যধিক প্রশংসার দ্বারা শিশুকে যেন প্রশ্রয় দেওয়া না হয়, তাকে যেন জাঁক ক'রে লোকের সামনে দেখানো না হয়। অন্যথায় শিশুর মধ্যে অতিরিক্ত আত্মমর্যাদা, দম্ভ আর স্বার্থপরতা যে দেখা দেবেই তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর পূর্বাভাসের কথা বললে তা হতে পারে বিভিন্ন রকমের। কোন কোন ক্ষেত্রে বিকাশের দ্রুত গতি সত্যিই অসাধারণ প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে, আর কখনও কখনও (এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা-ই ঘটে) এই গতি পরবর্তী কালে মন্থর হয়ে আসে ও শিশু হয়ে উঠে খুবই সাধারণ, তবে তার মানসিক বিকাশের সাধারণ মান যথেষ্ট উচ্চই থেকে যায়।

— বাড়ার প্রক্রিয়াসমূহ কি আমাদের জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক সুপারিশের উপর নির্ভর করে? ৩০০ বছর আগে শিশুরা যেমন ভাবে বাড়ত এখনও ঠিক সেই ভাবেই বাড়ছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে...

— হ্যাঁ, বাড়ার প্রক্রিয়াসমূহকে প্রভাবিত করতে আমরা অক্ষম। তবে বাড়ার কারণগুলো গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা বেশ সাফল্য অর্জন করেছি।

শিশুর বিকাশের অতি উচ্চ গতি চারিদিকের লোকজনের কাছে প্রায়ই এক রকমের বিস্ময়কর ব্যাপার বলে মনে হয়। শিশু কীভাবে লিখতে-পড়তে শেখে, গণিতশাস্ত্র ইত্যাদি রপ্ত করতে আরম্ভ করে তা তাদের কাছে রহস্যই থেকে যায়। কিন্তু আসলে এ সমস্তকিছু শেখান বড়রাই। প্রায়ই তাঁরা এ কাজটি করেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অনিয়মিতভাবে এবং নিজেদের অজ্ঞাতসারে। অবশ্য এটা ঠিক যে বিভিন্ন শিশুর বিদ্যাভ্যাসের মানও বিভিন্ন, তাই এক শিশু যা ইশারাতেই বুঝতে পারে অন্য শিশুর পক্ষে তা আয়ত্ত করার জন্য সুদীর্ঘ প্রয়াসের প্রয়োজন হয়।

এই ভাবে, অনুসন্ধিৎসা, মানসিক সক্রিয়তা, 'বাল্যকালীন' ক্রিয়াকলাপের প্রধান প্রধান ধরনগুলো আয়ত্তকরণের মান এবং বিদ্যাভ্যাসের মাত্রা প্রাক্-স্কুলবয়স্ক শিশুর মানসিক বিকাশের মুখ্য সূচক হিশেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে এ কথাটি সর্বদা মনে রাখা উচিত যে শিশুর মানসিক বিকাশ লালনপালন আর শিক্ষাদীক্ষার পরিবেশের উপর খুবই নির্ভরশীল, এবং এই পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বিকাশেরও পরিবর্তন ঘটে। সমস্ত সুস্থ শিশুর মানসিক বিকাশের বিপুল পরিমাণ সম্ভাবনা রয়েছে এবং মা-বাবার কর্তব্য হচ্ছে—সর্বতোপায়ে তা কাজে লাগাতে সাহায্য করা। তবে তা করতে গিয়ে বিকাশের সেই সামঞ্জস্য নষ্ট করলে চলবে না যা শিশুকে সর্বাঙ্গীণভাবে বিকশিত মানুষ হয়ে উঠার সুযোগ দান করে।

মা-বাবারা পরামর্শ চাইছেন

মা-বাবারা হাজারো রকমের প্রশ্ন করেন। কীভাবে শিশুকে পড়তে শেখানো যায়? শিশু জিদি হলে কী করা উচিত? কেন সে কারো কথা শুনে না? এবং এ ধরনের আরও অসংখ্য প্রশ্ন করেন। এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে খোদ শিশুর সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা পরিচালনার প্রয়োজন হয়। কেবল এর পরই বলা যেতে পারে, নির্দিষ্ট শিশুর ক্ষেত্রে শিক্ষার কোন্ পদ্ধতিটি বেশি উপযোগী, প্রতিটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কীভাবে একগুঁয়েমির

সঙ্গে লড়া উচিত (তা সত্যিই একগ্রুঁয়েমি কি না সেটাও দেখা চাই—অনেক সময় মা-বাবারা তা ঠিক ধরতে পারেন না), কেন অবাধ্যতা দেখা দিল।

আমি এ বিষয়েই বলতে চাই। আমি কয়েকটি নিত্যনৈমিত্তিক প্রশ্ন বেছে নিয়েছি,—বহু মা-বাবাই এ ধরনের প্রশ্ন নিয়ে আমার কাছে হাজির হয়েছেন। কিছু পরীক্ষানিরীক্ষার ভিত্তিতে আমি দেখাতে চেষ্টা করব আমরা কীভাবে কাজ করি, কী কী পরামর্শ দিয়ে থাকি, সন্তান লালনপালনের ক্ষেত্রে কী কী ভুলভ্রান্তি বেশি লক্ষ্য করা যায় এবং তা সংশোধনের কী কী উপায় রয়েছে।

একটি ছেলের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। তার বয়েস প্রায় তিন বছর। সে কথা বলতে পারত না। তার নাম—ইউরা, আর তার মায়ের নাম—নাতাশা।

— ইউরা সমস্তকিছুই বোঝে,—বলেন নাতাশা।—তবে সে সামান্য জিদি, তাকে যা করতে বলা হয় সর্বদা সে তা করে না। সে সবকিছুই বোঝে, তা তার চোখ দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু কোন কথাই বলে না। সে অবশ্য বোবা নয়। তার সব কথাই নিজের, শিশুর ভাষা আর কি। জুতো—তার ভাষায় 'টি-টি', এবং ছবিও—'টি-টি'...

— বুঝলাম,—বললাম আমি।—তাহলে দেখা যাক কী ব্যাপার,—এবং আমি ইউরার কাছে গেলাম।

প্রথমে আমি যা দেখব তা হচ্ছে—ছেলেটির বিকাশের সাধারণ মান। ইউরা হয়তো কথা বলছে না এই জন্য যে সে তার বয়সোপযোগী যথেষ্ট বিকশিত নয়। এমতাবস্থায় মা-বাবাকে উপদেশ দিতে হবে সর্বাগ্রে ভাষা বিকাশের ব্যাপারে নয়, মনন ও বোধ শক্তি গঠনের ব্যাপারে। এ ছাড়া ভালোভাবে ভাষা আয়ত্ত করা অসম্ভব।

বাক্‌শ্রুতিও পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এমনও ঘটে যে শিশু ভাষার বিভিন্ন ধ্বনির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে না: সে কণ্ঠস্বর শুনছে, কিন্তু আলাদা আলাদা শব্দ বা কথা বুঝতে তার কষ্ট হচ্ছে। বাক্‌ত্রুটির এ কারণটি লক্ষ্য করা যায় প্রায়ই। এমতাবস্থায় বিশেষ ধরনের শিক্ষা বা ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন হয় এবং এ কাজে সহায়তা করতে পারেন কেবল বিশেষজ্ঞ—বাক্‌ত্রুটিবিদ। নিউরোলজিকেল গোলযোগ দেখা দিলেও বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। তবে নিউরোপ্যাথোলজিস্ট ইউরার এরূপ কোন ত্রুটিবিচ্যুতি খুঁজে পান নি।

অনেক সময় শিশু কথা বলতে পারে না এই জন্য যে তার সঙ্গে কেউ কথা বলে না, তার প্রতি কম মনোযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু ইউরার ক্ষেত্রে এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই: নাতাশা চাকরি করেন না, তিনি সব সময়ই ছেলের সঙ্গে। তাছাড়া আছেন বাবা, দুই দিদিমা, এক দাদু— মেলামেশার সুযোগের অভাবের বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠে না। এটা অবশ্য সত্যি যে বেশি মেলামেশাও সব সময় ভালো নয়। এমনও দেখা যায় যে শিশুর সঙ্গে কথা না বলেই তাকে চমৎকার বোঝা যায় এবং সেই জন্য মা-বাবা ও আত্মীয়স্বজনরা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন বোধ করেন না।

এ সবই হচ্ছে প্রকল্প। তবে এবার কাজে হাত দেওয়া যাক। প্রথমে পরীক্ষা করব মনন ও বোধ শক্তি, অর্থাৎ আমরা যাকে অনির্দিষ্টভাবে 'বিকাশের সাধারণ মান' বলে অভিহিত করে থাকি সেই জিনিসটি। আমার অত্যধিক স্ফীত ব্যাগটি থেকে বেরিয়ে এল ব্লক, গাড়ি, পুতুল, পুতুলের আসবাবপত্র আর বাসনকোসন। ইউরা সঙ্গে সঙ্গে তার খেলনা ঘোড়া থেকে নেমে আমার কাছে ছুটে এল।

সে চমৎকার খেলে। পুতুলটিকে চেয়ার-টেবিলে বসায়, খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়। ট্রাকে ক'রে ব্লকগুলো নিয়ে যায় এবং তারপর ওগুলো খালাস ক'রে বাড়ি গড়ে। জগৎ সম্পর্কে তার ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক। সে জানে, ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কীরূপ ব্যবহার করতে হয়, গাড়ি চালাতে পারে।

খেলতে পারা—এ হচ্ছে মানসিক বিকাশের মানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক। তবে অন্যান্য সূচকও আছে। ব্যাগ থেকে বার করলাম মাত্রিওশকা পুতুলটি—ওর ভেতরে একটির মধ্যে অন্যটি ক'রে আরও কয়েকটি কাঠের পুতুল। ইউরা সাগ্রহে দেখছে কীভাবে আমি পুতুলটি খুলছি। বড় মাত্রিওশকা থেকে বেরিয়ে এল ছোট একটি মাত্রিওশকা। ওটা খুললে ভেতরে দেখা যায় আরও একটি মাত্রিওশকা—কিছুটা ছোট। ইউরা তো আনন্দে একেবারে আত্মহারা। সমান আনন্দের সঙ্গে সে নিরীক্ষণ করে চতুর্থ ও পঞ্চম মাত্রিওশকার আবির্ভাব। খোলার কাজ শেষ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে: ইউরা সবগুলো মাত্রিওশকা আবার ঠিকমতো রাখতে পারবে কি? এবং কাজটি সে কীভাবে করবে—মাত্রিওশকাগুলো কি ঠিক মাপ অনুযায়ী সাজাবে কিংবা ছোট মাত্রিওশকার অর্ধাংশের ভেতর বড়গুলো ঢোকাতে চেষ্টা করবে?

ইউরা অনেকখন লক্ষ্যনিষ্ঠভাবে খাটল। প্রায়ই সে ভুল করছিল, পুতুলগুলো ঠিক মাপ অনুযায়ী সাজাচ্ছিল। এ কাজে সে পরিচালিত হচ্ছিল

যুক্তির দ্বারা। শেষ পর্যন্ত সে সমস্ত মাত্রিওশকা দিয়ে একটি পুতুল গড়তে সক্ষম হল। তাতে কোন ভুল ছিল না।

তারপর দেখতে চাইলাম, সে অন্য একটি কাজ কেমন ক'রে সম্পন্ন করে: আমি তাকে চাক্তি দিয়ে পিরামিড গড়তে বলি। কাজটি চমৎকার উৎরাল।

মানসিক বিকাশের সাধারণ মান পরীক্ষার কাজ শেষ। ইউরা তাতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হল। সমস্ত ফলাফল আমি লিখে রাখি বিশেষ একটা খাতায়।

এবার শ্রবণ শক্তি পরীক্ষার পালা।

— আমায় খরগোশটা দাও তো দেখি!—নির্দেশ দিই আমি। ইউরা খেলনার বাক্স থেকে খরগোশ নিয়ে এল।

— ওটা জায়গায় রেখে দাও।—সে কিছুটা অবাক হয়, তবে খরগোশটি ফের বাক্সে রেখে দেয়। আমি সামান্য সরে গিয়ে নিচু গলায় বলি:

— ভালুকটি নিয়ে এসো।

খেলার উদ্দেশ্য হচ্ছে—অদ্ভুত এই কাকুটি যা করতে বলছেন তা মনোযোগ দিয়ে শোনা। ইউরা সানন্দে ভালুকটি নিয়ে এল।

— জায়গায় নিয়ে রেখে দাও। এবার গাড়িটি নিয়ে এসো। নিয়ে যাও।

এখন আমি ঘরের বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে কথা বলি। ইউরা নির্ভুলভাবে আমার নির্দেশ পালন করে যায়। তার মানে, ইউরার বাক্‌শ্রুতি ঠিকই আছে। এবার কেবল একটি প্রকল্প বাকি রইল। তা পরীক্ষা করতে হবে ছেলেকে দেখে নয়, মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। আমি এভাবে আলাপটি শুরু করি:

— অনেক সময় শিশুরা কথা বলে না স্রেফ এই জন্য যে তারা কথা বলার প্রয়োজন বোধ করে না।

— 'প্রয়োজন বোধ করে না', তার মানে?

— আপনারা সম্ভবত ইউরা কোনকিছু না বললেও বুঝতে পারেন সে কী চাইছে।

— হ্যাঁ, আমরা সর্বদাই তাকে বুঝি,—বলেন নাতাশা।—বাইরের লোকেদের বুঝতে কষ্ট হয়, কিন্তু আমরা তার সব শব্দই জানি। প্রায়ই সে কিছুই বলে না — স্রেফ হাত দিয়ে দেখায়। তাতে না বোঝার কী আছে?

— কিন্তু আসল গলদটি তো এখানেই। তা ও অনর্থক চেষ্টা করতে

যাবে কেন? ইউরার স্বভাবের ছেলেমেয়েদের আচরণই এরূপ হয়। তাদের কাছে প্রধান হচ্ছে বড়দের সঙ্গে মেলামেশা নয়, ক্রিয়াকলাপ: খেলাধূলা, ব্লক দিয়ে বাড়িঘর ইত্যাদি নির্মাণ। অর্ধেক কথা থেকে বক্তব্য বুঝতে পারে অনেক ছেলেমেয়েই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশই সময় মতো কথা বলতে আরম্ভ করে। শিশু সাধারণত কেবল কোন খেলনাই পেতে চায় না, সে বড়দের সঙ্গে আলাপও করতে চায়, তাদের কোনকিছু বলতে চায়। আর ইউরা হচ্ছে কাজের লোক, সে অত সব লিরিকের ধার ধারে না। সেই জন্যই সে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করে না: খেলায় অঙ্গভঙ্গি আর আকার-ইঙ্গিতেই কাজ চলে যায়।

এবার প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। আমি ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করি কীভাবে শিশুকে 'না বোঝা' উচিত, লোকে প্রায়শ যে-সমস্ত ভুল করে থাকে তা দেখিয়ে দিই।

শিশুর সঙ্গে কখনও এরূপ কঠোর সুরে কথা বলা উচিত নয়: 'তুই ঠিক ক'রে বল তোর কী চাই, তাহলেই তোকে তা দেব। এখন যেভাবে বলছিস ওভাবে বললে কিছুই পাবি না।' নিজের ওই 'বুঝি না' কথাটি নিয়ে জিদ ধরে শিশুকে ক্ষুব্ধ করা অনুচিত। যদি দেখেন যে সে এক্ষুনি কে'দে ফেলবে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে 'অনুমান করা' উচিত: 'আচ্ছা, তুই চাস যে আমি তোকে বই পড়ে শোনাই?' এখানে আসল জিনিসটি হচ্ছে বিচক্ষণতা, মাত্রাবোধ। শিশু দেখুক যে তাকে আপনি বুঝতে চান, কিন্তু বুঝতে পারছেন না।

ছ'মাস কেটে যাওয়ার পর আমি আবার ইউরার বিষয়ে শুনলাম। তখন নাতাশা একবার আমাদের ইনস্টিটিউটে এসেছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি:

-- ইউরার খবর কী?

— এখন অনর্গল কথা বলে, এমনকি থামানো যায় না।

— আমার পরামর্শ মতো সবকিছু করেছেন?

— হ্যাঁ, আমরা খুব চেষ্টা করেছি আপনার পরামর্শ মতো চলতে। তবে সত্যি বলতে কি, সব সময় তা হয়ে উঠে নি।

এরূপই হচ্ছে সেই ছেলেটির কাহিনীর শুভ পরিণতি, যে কথা বলতে পারত না। তাহলে এবার আমি অন্য একটি কাহিনীতে চলে আসছি। তা মিশা নামের এক ছেলের কাহিনী। আমাদের আলোচ্য বিষয়: কেন তাকে স্কুলে দেওয়া হয় নি।

মিশার বয়স—ছ' বছর চার মাস। মা-বাবা কিছুতেই ঠিক করতে পারছেন না, তাকে এ বছর স্কুলে ভর্তি করা উচিত কিংবা আগামী বছর অবধি অপেক্ষা করলেই ভালো হবে (সোভিয়েত ইউনিয়নে ছেলেমেয়েরা স্কুলে ভর্তি হয় সাধারণত সাত বছর বয়সে।—অনুঃ)। অথচ তাড়াতাড়ি একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার—সামনেই সেপ্টেম্বর মাস, স্কুল শুরু হয়ে যাবে।

আমি মিশার বাড়িতে গেলাম। সর্বাগ্রে তার মা-বাবাকে জিজ্ঞেস করি:

— মিশাকে আপনারা আগে থেকে আমার কথা বলেন নি তো?

— না। আপনিই তো বলেছিলেন ওকে কোনকিছু বলার দরকার নেই। কেবল এই এক্ষুনি, যখন সে জিজ্ঞেস করল কে টেলিফোন করছে, আমি তাকে বোঝাই যে আমাদের বাড়িতে একজন কাকু আসবেন, যিনি পরে তার সঙ্গে একটু কথা বলবেন। আরও বলেছি যে আপনাকে ভয় করার কোন কারণ নেই।

কাজটি ভালো হয় নি। মিশা তো বোঝে যে যদি বলা হয় 'ভয় করিস না' তার মানে ভয়ের কারণ রয়েছে। যখন বাড়িতে ডাক্তার আসেন এবং গলার ভেতর ঠান্ডা একটি চামচ ঢুকিয়ে দেন তখনই এরূপ বলা হয়। কিংবা যখন কোন বড় ও রাগী কুকুর ঘেউ ঘেউ করে (চারিপাশের সবাই ভাবে যে কুকুরটা কামড়ায় না, কিন্তু তাহলে কীসের জন্য ও রকম ভয়ঙ্করভাবে ঘেউ ঘেউ করছে?)। মা-বাবারা 'ভয় করিস না' বলেন যখন তাঁরা ঘণ্টাখানেকের জন্য কোথাও যেতে চান। কিংবা যখন ঘরে আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে ঘুমাতে বলেন।

মা দু'বার ছেলেকে ডেকে বললেন: 'মিশা, তুই আসছিস না কেন বাবা?' মিশা ঘরে এলে আমি বুঝতে পারলাম যে সে দৃঢ় প্রতিরোধ দানে প্রস্তুত।

— আমি কাকুর সঙ্গে কথা বলব না,—সাহসের সঙ্গে বলে সে চৌকাঠ থেকে।

— ও আমায় সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিল যে আপনার সঙ্গে কোন কথা বলবে না,—সন্তোষের সঙ্গে জানান লেনা, অর্থাৎ মিশার মা।

— অবশ্যই বলবে না,—আমি মেনে নিই।—তবে কিনা মিশা ও আমার জন্য তার চেয়েও বেশি মজার ব্যাপার রয়েছে। তাই না, মিশা?

সে সামান্য অবাক হয়, তবে প্রলোভনে পড়ে না।

— আমি দিদিমার সঙ্গে খেলতে চাই,—বলে সে।

আমি উদ্যোগটি লুফে নিই:

— মিশা, জানিস আমি কী ঠিক করেছি? আয়, দিদিমার বদলে আমি তোর সঙ্গে খেলি। তা কী দিয়ে খেলব?

— সৈনিক দিয়ে,— বলল সে, কিন্তু তখনও বুঝতে পারে নি যে এ কথাটি বলে সে দিদিমার পরিবর্তে আমায় গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে। তাকে এ বিষয়ে ভাবতে দেওয়া উচিত হবে না।

— যা, সৈনিকগুলোকে নিয়ে আয়,— আমি দাবি করি।— ওগুলো কোথায়? এখানে? এটা সম্ভবত মেজর? বাঃ, মেজরটি কিন্তু খাসা। আয় ওকে বাহিনীর পুরোভাগে রাখি।

সামরিক ক্রিয়াকলাপ অল্পক্ষণ চলল। আমি বুঝতে পারলাম যে ও প্লট বিকাশ করতে সক্ষম, প্রয়োজনীয় খেলনা সহজেই খুঁজে পায়। আমি আর খেলায় আগ্রহী নই।

— ও কীভাবে গণে তা একটু দ্যাখুন,— বলেন মা।

— তা ও কীভাবে পড়ে?

মা পরীক্ষার এরূপ পদ্ধতি দেখে অবাক। তিনি সংশয়াপন্নভাবে জবাব দেন:

— আমি মনে করি ভালোই পড়ে।

— আমি ভালো পড়তে পারি,— মাকে সমর্থন করে মিশা।

আর আমি বলি:

— তাহলে পরীক্ষা করার দরকার নেই। জানি আপনি ও মিশা আমায় ঠকাবেন না। আমি এবার দেখতে চাই ও কেমন ছবি আঁকে,— এবং আমি সরাসরি মিশাকে বলি:— মিশা, আমার জন্য ভালো একখানি ছবি আঁকতে পারিস?

ছবিটি মন্দ উৎরাল না। আঁকা বস্তুগুলোর রূপে ও আকারে কোন ভুল নেই। রেখাগুলো স্পষ্ট ও দৃঢ়। দেখাই যাচ্ছে যে সমস্তকিছু চলছে পরিকল্পনা অনুসারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিস্ময়কর এক অমনোযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। আমি বিশেষভাবে মিশাকে বলেছিলাম সে কেমন ছবি আঁকতে পারে আমায় তা দেখাতে। সে হয়তো এ ধরনের পরীক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি জিজ্ঞেস করি:

— আচ্ছা, তুই আরও সুন্দর ক'রে আঁকতে পারিস? তোর এই ছবিটি খুব একটা ভালো হল না।

মিশা রাগ ক'রে ছবিখানি ছিনিয়ে নেয় এবং বলে যে আর আঁকবে

না। বড়দের মন্তব্যে এর্‌প প্রতিক্রিয়া কোন কাজ দেবে না। আমি তা খাতায় লিখে রাখি।

এবার মনন শক্তি পরীক্ষা করার পালা। আমি মিশাকে ছোটবড় বিভিন্ন আকারের কিছ্‌ ছড়ি সাজাতে দিই। সাজাতে হবে দৈর্ঘ্য অন্‌সারে: সবচেয়ে লম্বাটি থেকে সবচেয়ে ছোটটি অবধি:

— ওগ্‌লো সাজিয়ে কী হবে?

আমি ব্যাখ্যা করি যে সে এ কাজটি করতে পারবে কি না আমি তা দেখতে আগ্রহী: জানা দরকার সে ভাবতে পারে কি না।

— পারি,— দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে সে জবাব দেয়।— আমি ওটা করতে পারব।

এ কথাটি বলার পর ম্‌হ্‌র্তেই সে সৈনিকগ্‌লো দিয়ে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করল। আমি রাজী হই না এবং তাকে স্কুল-স্কুল খেলতে বলি।

— স্কুলে যেমন সবাই কাজ করে তুই সেই ভাবে কাজ করতে পারিস?

সে বলে যে পারে। কিন্তু ছড়িগ্‌লো সাজাতে চায় না। সে স্কুলে পড়াশোনা করতে পারবে বলে আমি সন্দেহ প্রকাশ করি: স্কুলে মাস্টার যা বলেন তা-ই করতে হয়। তাতে কোন কাজ হয় না। তখন আমি বললাম যে এই ছড়িগ্‌লো হচ্ছে সৈনিক, আর মেজরটি লক্ষ্য রাখবে তারা যেন লম্বাই অন্‌যায়ী সারি বেঁধে দাঁড়ায়। সে ব্যাপারই আলাদা! মিশা সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে যায়।

আমার হাতে দেওয়ার মতো আরও কিছ্‌ কাজ আছে যা দিয়ে মনন শক্তি, বোধ শক্তি ও একাগ্রতা পরীক্ষা করা যায়। মিশা সব কাজই ভালো করে। কিন্তু প্রতি বারই কাজ আরম্ভ করার আগে তাকে অনেকখন ধরে রাজী করাতে হয়। সে ওই সব 'স্কুলের য্‌ক্তির' ধার ধারে না মোটেই। খাতায় লিখে রাখি: 'কাজ ভালোবাসে কেবল খেলার আকারে।'

মানসিক বিকাশের কথা বিচার করলে মিশাকে স্কুলে ভর্তি করা যেতে পারে। কিন্তু সে লেখাপড়া করতে পারবে না — এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

মা-বাবা মনোযোগ সহকারে সমস্ত পরীক্ষা লক্ষ্য করেন। পাশের ঘরে ঢোকার সময় মিশার বাবা আমায় জিজ্ঞেস করলেন:

— তা কী বলেন, স্কুলে দেওয়ার সময় হয়েছে?

— না, এ বছর থাক। তবে তাকে কিন্ডারগার্টেনের প্রস্তুতি গ্র্‌পে ভর্তি করতে পারলে খ্‌বই ভালো হত। ওখানে সবই চলে সংগঠিত ও

সুশৃঙ্খলভাবে। মিশা কাজ করতে ও বড়দের নির্দেশ পালন করতে শিখবে। তাতে খেলা থেকে শিক্ষায় আসতে সহজ হবে।

— আমরাও এ সমস্তকিছু ভেবেছি। তবে আমাদের বিচারবিবেচনা ছিল সামান্য অন্য ধরনের। আমরা চাইছিলাম, সে যেন সমবয়সীদের দলে অভ্যস্ত হয়, তার বন্ধুবান্ধব হয়।

আমি বাপের সঙ্গে একমত:

— হ্যাঁ, সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

— আর বাড়িতে তার সঙ্গে আমাদের কী করা উচিত?

— বিশেষ কোন ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন নেই। আগে যা করতেন এখনও তা-ই করুন। তাকে বই পড়ে শোনাবেন, তার সঙ্গে ছবি আঁকবেন, খেলবেন।

— কিন্তু আপনিই তো বলছেন যে ওর খেলার অভ্যাস ছাড়ানো দরকার।

— মোটেই না। তাকে কেবল খেলতেই নয়, কাজ করতেও শেখানো উচিত। প্রাপ্ত ফলাফলের প্রতি আগ্রহ গড়া দরকার। যেমন, ছবি আঁকার কথাই ধরুন। খোদ প্রক্রিয়াটি ওর ভালো লাগে, কিন্তু ফলের ব্যাপারে — অর্থাৎ প্রস্তুত ছবির ব্যাপারে সে নিরাসক্ত।

— আমরা এখানে কী করতে পারি?

— সর্বদা লক্ষ্য রাখবেন ছবি ভালো কিংবা খারাপ উৎরাল। খারাপ হলে ভুল দেখিয়ে দেবেন। ভালো ছবিগুলো দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখবেন, যাতে মিশা ব্যাপারটি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়, যাতে সে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আঁকে, — যেমন, ঘর সাজানোর জন্য, কাউকে উপহার দেওয়ার জন্য। আঁকা খারাপ হলে আবার ঠিক করে আঁকতে শেখাবেন।

— আরও একটি ব্যাপার আপনায় বলতে চাই, — আলাপে যোগ দিলেন মা। — মিশা সব সময় নিজের প্রতি মনোযোগ দাবি করে। আপনিই তো দেখলেন এক্ষুনি তিন বার ও এ ঘরে উঁকি মারল। অথচ আমি তাকে বলেছি সে যেন বাধা না দেয়, কারণ আমাদের একটি জরুরী বিষয়ে কথা বলার প্রয়োজন আছে। আপনার উপস্থিতিতে সে বেশ শান্ত, তবে অন্যান্য সময়ে যদি অনেকখন তার দিকে নজর দেওয়া না হয় তাহলে একেবারে দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে যায়। এমতাবস্থায় কী করা উচিত?

— আমি যা বুঝতে পারছি, মিশার প্রতি অত্যধিক মনোযোগ দেওয়া হয়, এবং সে তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে এই অভ্যাস ছাড়ানো

দরকার। সে বুঝতে শিখুক যে বড়দেরও নিজের নিজের কাজ রয়েছে। আপনারা যখন ব্যস্ত থাকেন, তখন তাকে বুঝিয়ে বলবেন যে এখন তার সঙ্গে খেলতে পারবেন না, পরে খেলবেন। তাকে বলতে পারেন: 'যা, এবার নিজে খেল', তবে খেলা শুরু করবেন দুজনে, একটি প্লট বাত্‌লে দেবেন, যাতে সে পরে নিজেই তা বিকশিত করে তুলে। যদি সে এসে আপনাদের ডাকে, তাহলে মিনিট খানেকের জন্য নিজের কাজ ছেড়ে উঠবেন এবং তাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন: 'তুই যে বলেছিলি নিজেই খেলবি', তখন তাকে খেলার অন্য কোন প্লটও বাত্‌লে দেবেন। অবশ্য সর্বদাই ঝগড়া এড়ানোর চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু সমস্তকিছু সত্ত্বেও যদি মিশা জেদ করতে আরম্ভ করে কিছুতেই তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ছুটবেন না। সে যদি বুঝে ফেলে যে কান্নাকাটিই হচ্ছে মনোযোগ আকর্ষণের শ্রেষ্ঠ উপায়, তাহলে কান্নাকাটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হবে। এর ফলে শেষ পর্যন্ত প্রকৃত স্নায়বিক রোগও দেখা দিতে পারে।

আমি চলে গেলাম। আমার কাজ শেষ: আমি মা-বাবাকে দেখিয়ে দিলাম যে এখনও মিশার স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় হয় নি — তার জন্য সে প্রস্তুত নয়। খুবই ভালো যে তাঁরা নিজেরাই সেটা লক্ষ্য করেছিলেন। এবার তাঁরা ছেলেকে স্কুলের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

পরের কাহিনীটির এরূপ নাম রাখা যেতে পারে — 'ইলিয়া এবং সঠিক বিজ্ঞান'। ইলিয়া হচ্ছে সাড়ে পাঁচ বছর বয়সের শিশু প্রতিভা। সে চমৎকার পড়ে, গণে, লেখে, জটিল নকশাদি বোঝে — যেমন, ইলেক্ট্রিক সার্কিটের নকশায় সে দেখিয়ে দিতে পারে কোথায় সমান্তরাল সংযোগ আর কোথায় পারস্পরিক সংযোগ। কিন্তু সে নিজে পেণ্ট পরতে পারে না এবং এটাই ছিল একমাত্র কারণ যার জন্য তার মা-বাবা আমার সঙ্গে দেখা করেন।

আমি ঘরে ঢুকে দেখি যে ইলিয়া রূপকথা পড়ছে। পড়ছে সে অনায়াসে, ঠোঁটগুলো প্রায় নড়ছে না। আমার দিকে তার কোন খেয়ালই নেই। আমি পাশে বসলাম এবং তার পড়া শেষ হলে আমায় বইখানি একটু দেখতে দিতে বললাম। বইয়ের নায়কদের বিষয়ে সে আমার প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে পারছিল না।

তার মানে, ইলিয়া রূপকথার বিষয়বস্তু বুঝে নি, যদিও সে বিপুল আগ্রহের সঙ্গে পড়েছে। এখানে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। ইলিয়ার বয়সের ছেলেমেয়েরা জটিল বই পড়ার সময় প্রায় কখনই বিষয়বস্তু বোঝার চেষ্টা

করে না। তারা কেবল আলাদা আলাদা কিছু বাক্যের অর্থ বোঝে, এবং সেটাই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

ঠিক আছে, বই পড়ার ব্যাপারে সবই পরিষ্কার। এবার অন্যকিছু দেখা যাক। আমি ব্যাগ থেকে একটা মাত্রিওশকা পুতুল বার ক'রে ইলিয়াকে দিলাম।

— এটা কী জানিস?

— মাত্রিওশকা, — সংক্ষেপে জবাব দেয় সর্বজ্ঞ ইলিয়া। সে মাত্রিওশকাটি খুলে আবার তা সংগ্রহ করতে চেষ্টা করে। চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। আমি নিজে মাত্রিওশকাটি সংগ্রহ করে তাকে বলি:

—নে, এবার তুই আবার খুল। কিন্তু খোলার সময় খেয়াল রাখিস কীভাবে তা গঠিত, যাতে পরে ঠিকমতো জোড়া লাগানো যায়।

আশ্চর্যের বিষয়, আমার এরূপ নির্দেশ কাজ দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ব্যাপারটিই বদলে ফেলল। দ্বিতীয় বার ইলিয়া কাজটি সম্পন্ন করে নির্ভুলভাবে। তার মানে, প্রথম বার অকৃতকার্যতার কারণটি ছিল এই যে সে জিনিসটা মোটেই পরীক্ষা করে দেখে নি।

এবার বার করলাম ছড়িগুলো — তা দৈর্ঘ্য অনুযায়ী একটার পর একটা করে সাজাতে হবে। মাত্রিওশকা সংগ্রহ করার চেয়ে এ কাজটি অধিকতর কঠিন: পুতুলগুলোর বেলা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে একটি অন্যটিতে ঢুকছে কি না। কিন্তু ছড়িগুলো যেভাবেই সাজানো যায় না কেন সেভাবেই ভালো দেখায়। কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হলে স্পষ্ট বোঝা চাই — দৈর্ঘ্য অনুযায়ী সাজানোর মানেটা কী। তবে দেখা গেল যে ইলিয়ার পক্ষে ব্যাপারটি একেবারে জলের মতো সহজ। এক মিনিট বাদেই সঠিক সারিটি প্রস্তুত হয়ে গেল: সবচেয়ে ছোট ছড়িটি, তারপর একটু বড়টি, এর পর তার চেয়ে সামান্য বড়টি — এবং এই ভাবে সবচেয়ে বড় ছড়িটি অবধি। আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে সে কাজটি ভালোই বোঝে।

তারপর এল পিরামিড গড়ার পালা। ইলিয়া তা গড়ে নির্ভুলভাবে। তবে একটা অসুবিধা আছে: সে চোখে দেখে চাক্তিগুলোর আকার ও আয়তন নির্ধারণ করতে পারে না। চাক্তিগুলোর মধ্যে কোন্‌টি বড় ও কোন্‌টি ছোট তা বোঝার জন্য তাকে একটি চাক্তির উপর অন্যটি রাখতে হয়। 'আকার ও আয়তন বোধে অসুবিধা আছে' — আমি খাতায় লিখে রাখি।

পিরামিড গড়ে ইলিয়া নিজে থেকেই চাক্‌তিগুলো গণতে শুরু করে। গণায় কোন ভুল হয় না।

আমি ইলিয়াকে একটু চাঙ্গা হয়ে নিতে বলি। আমরা কয়েকটি মিনিট শরীরচর্চা ক'রে কাটাই। ইলিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে আমি এমন সব কসরৎ দেখাই যা তাকে করতে হবে। তা হচ্ছে সঞ্চালনের সমন্বয় পরীক্ষার জন্য কিছু সংখ্যক ব্যায়াম। শেষ পর্যন্ত খাতায় লিখতে হয়: 'সঞ্চালন সমন্বয়ের ক্ষমতা মোটেই বয়সোপযোগী নয়'।

ইলিয়ার সামনে তিনখানি পিচবোর্ড পড়ে আছে। ওগুলোর একটিতে আঁকা আছে কুকুরের মাথা ও সামনের পা দু'টো, অন্যটিতে — ধড়, তৃতীয়টিতে — লেজ। পিচবোর্ডগুলো একত্র করলে আস্ত একটি কুকুর তৈরি হবে। আমি জিজ্ঞেস করি: এটা কী।

— কুকুর, — মাথার সঙ্গে লেজ জুড়ে দিয়ে বলে ইলিয়া। প্রাপ্ত ফলে সে সন্তুষ্ট। আমি ছবিটি তার কাছ থেকে নিয়ে ঠিক করে সাজাই। তারপর আবার বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দিই। কুকুরটি দেখতে কীরূপ হওয়া উচিত তা লক্ষ্য ক'রে ইলিয়া এবার অধিক প্রত্যয়ের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করে। অচিরেই সে ছবির প্রতিটি অংশের জন্য স্থান খুঁজে পেল।

এবার দেখা দরকার ইলিয়া কেমন আঁকে, কীভাবে খেলে, — এ হচ্ছে শিশুর ক্রিয়াকলাপের মুখ্য ক্ষেত্র। যে-আলমারিটিতে ইলিয়ার খেলনাগুলো রয়েছে তা খুলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করি:

—কোন্ খেলনাগুলো আমরা নেব?

—জানি না।

আমি কয়েকটা খেলনা নিয়ে জিজ্ঞেস করি ওগুলো দিয়ে কী খেলা যায়। ফের 'জানি না'। পুরো খেলাটাই এই ভাবে চলে। ইলিয়ার খেলতে ভালো লাগে, কিন্তু সে নিজে কোনকিছু ভেবে বার করতে পারে না। সে হয় আমি যা করি ঠিক তা-ই করে কিংবা বিশদ নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে। আমার দিকে তাকিয়ে রয়, যেকোন নির্দেশ পালনে প্রস্তুত। কিন্তু কল্পনা ব্যতিরেকে কোন খেলা যে খেলাই নয়!

আমি আবার ব্যাগের ভেতরে হাতটি গলিয়ে দিই। কাগজ ও পেন্সিল বার ক'রে ইলিয়াকে একটি মানুষ আঁকতে বলি। ইলিয়া অল্পক্ষণ ভেবে জানায়:

— মাথা গোল... — এবং গোল মাথা আঁকে।

— এবার চোখ... — বৃত্তের ভেতরে দু'টি বিন্দু দেখা দেয়।

— গলা, — নিজের কাজের উপর মন্তব্য করে যায় ইলিয়া। — ধড়টি ডিমের মতো... হাতগুলো... পা... ব্যস!

সরাসরিই বলব, মানুষের ছবিটি খুব একটা উৎরাল না। চোখযুক্ত ছোট্ট একটা মাথা, কিন্তু নাকমুখ নেই; গলাটি ভীষণ সরু; ধড় বিশাল (মোটেই ডিম্বাকার নয় যেমনটি বলেছিল ইলিয়া, বরং অনেকটা সমকোণী); হাত-পা — ঠিক চারটি কাঠি আর কি, আঙুল নেই। চার বছর বয়সের শিশুর পক্ষে এরূপ ছবি মন্দ হত না। তবে সাড়ে পাঁচ বছর বয়সে শিশুর মানুষের নাক, মুখ, আঙুল ও পোশাকের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভোলা উচিত নয়। তাছাড়া ইলিয়া কিন্ডারগার্টেনে যায়, আর ওখানে ছবি আঁকার কাজ শেখানোর জন্য বিশেষ ক্লাস আছে।

এবার খতিয়ান করা যাক। মনন শক্তি খুবই ভালোভাবে বিকশিত। তবে বোধ শক্তি অনুন্নত — তা আঁকা ছবি দেখলে এবং কাটা ছবিগুলো সাজানোর ধরন দেখলেই বোঝা যায়। গতি বোধ তেমন আশাপ্রদ নয়। খেলা সম্পূর্ণ অবিকশিত।

মেলামেশা করার আগ্রহ অনুপস্থিত। মা-বাবার কথা শুনে বুঝতে পারলাম যে কিন্ডারগার্টেনে কারো সঙ্গে ইলিয়ার ভাব নেই ('ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কী রকম মেলামেশা করে?' — আমার এ প্রশ্নে বাবা জবাব দিলেন: 'আমি যতটা দেখেছি তাতে মনে হয় কারো সঙ্গে সে মেলামেশা করে না। সময় সময় কোন শিশু তার কাছে আসে, তাকে একটু আঘাত করে এবং ফের চলে যায় — এ তো আর মেলামেশা নয়')। খেলার সময় পুতুলের সঙ্গে কথা বলে না, দুই পুতুলের সংলাপ অনুকরণ করতে পারে না।

নতুন জিনিসের প্রতি সে প্রায় উদাসীন। আর এর মানে হচ্ছে, বহির্জগতের প্রতি আগ্রহ কম। জিনিসের প্রতি আগ্রহ জাগে একমাত্র তখনই যখন শিশু তা নিয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করে।

চিন্তাভাবনা করলে গতি বিকশিত হয় না, অথচ ইলিয়া কেবল চিন্তাভাবনাই করে। সে চলাফেরা করে না, কোন কাজ করে না। এ জন্যই বোধ শক্তি অনুন্নত।

মা-বাবার সঙ্গে আলাপ শুরু হয়।

—আমার মনে হয় আপনারা ইলিয়াকে খুব বেশি শিখিয়েছেন এবং 'শিশুসুলভ' ক্রিয়াকলাপের দিকে খুব কম মনোযোগ দিয়েছেন, — শুরু করলাম আমি। — ধীরে ধীরে সে নিজেই বুঝে নিয়েছে যে পড়া, গণা ও নকশা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার; আর খেলাধুলা, ছবি

আঁকা, বিভিন্ন জিনিস নিয়ে কাজ করা — মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেই জন্যই তার ক্রিয়াকলাপও বিকশিত হয় নি। আর তারপর সবকিছু অনেকটা এ রকম: ক্রিয়াকলাপ না থাকলে পারিবেশের মধ্যে স্থিতিবোধ হ্রাস পায়, বোধ শক্তি পিছিয়ে থাকে, গতি বিকশিত হয় না। ফলে মেলামেশা করতেও অসুবিধা হয়। অন্যান্য শিশুদের যাকিছু আকৃষ্ট করে ইলিয়া তা জানে না এবং পারেও না। আর সে যাকিছু জানে ও পারে তা তাদের আকৃষ্ট করে না। তার মানে হচ্ছে এই যে সে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের কাছেও কোনকিছু শিখতে পারছে না: কিছু পেতে হলে মেলামেশা তো করতে হবে।

ইলিয়ার বাবা লেওনিদ মনোযোগ সহকারে আমার কথা শুনলেন, তবে তাঁর চোখেমুখে গভীর অসম্মতির ভাব।

— কিন্তু খেলা আর ছবি আঁকার প্রতি যদি ইলিয়ার প্রবণতা না থাকে? সঠিক বিজ্ঞানের প্রতি যদি তার জন্মগত প্রবণতা থাকে?

আমি বলি যে আমার মতে পাঁচ বছর বয়সে শিশুকে সঠিক বিজ্ঞানের ব্যাপারে অনুপ্রেরণা দেওয়া উচিত নয়। তবে খেলার প্রতি প্রবণতা — এমনকি তা খুব ক্ষীণ হলেও — বিকাশ করার চেষ্টা করা উচিত। ধরুন, ইলিয়া একদিন বিজ্ঞানী হবে। কিন্তু বিজ্ঞানীর কি কল্পনার প্রয়োজন নেই? আর পারিপার্শ্বিক জগতের প্রতি আগ্রহ, পর্যবেক্ষণশীলতা?

লেওনিদ মাথা নাড়েন।

— আপনারা কি মনে করেন যে ইলিয়া যদি পঠিত বিষয় না বুঝে পড়তে থাকে, গণতে থাকে এবং অনুমান গড়তে থাকে তাহলে এ সমস্তকিছু বিকাশ লাভ করবে? — বলি আমি। — আমার মনে হয় যে এর জন্য প্রয়োজন সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস — ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ, খেলা, ছবি আঁকা, ব্লক দিয়ে ঘরবাড়ি ইত্যাদি নির্মাণ। ঠিক এখানেই শিশুর সামনে উপস্থিত হয় বিমূর্ত নয়, বাস্তব সমস্যা; এখানে তার কল্পনা শক্তির প্রয়োজন হয়, সে চারিদিকের জগৎটাকে উপলব্ধি করতে শুরু করে। শিশুকে পড়তে ও গণতে শেখানো সবচেয়ে সহজ। সে তা শিখবেই — এ ছাড়া গতি নেই। স্কুলে দশটি বছর তাকে তা-ই শেখানো হবে। তবে স্বনির্ভরভাবে দুনিয়াকে চিনতে শেখানো দরকার এখনই — পরে দেরি হয়ে যাবে।

আমি কয়েকটি উপায় বাতলে দিই; বলি কীভাবে ইলিয়াকে খেলতে, ব্লক দিয়ে গড়তে, পেণ্ট পরতে ও হাত ধুতে শেখানো দরকার। এ ছাড়া

আমার আর করার কিছু নেই। বাদবাকী সমস্তকিছু নির্ভর করছে কেবল মা-বাবার উপর।

নিনার সঙ্গে আমি স্কুলে পড়েছি। সে আমায় অনুরোধ করল তার মেয়েটিকে দেখতে। লেনার বয়স ন' বছর হতে চলেছে, সে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। সম্প্রতি তার উপর খুব চাপ পড়েছে, সে নার্ভাসনেস-এ ভুগছে। পড়াশোনা ও হোম-টাস্ক ঠিক মতো করতে না পারলে ভীষণ উদ্বিগ্ন, এমনকি ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়ে। একদিন শিক্ষিকা কাঠের স্কেল নিয়ে আসতে বললেন, আর নিনা লেনার জন্য কিনল প্ল্যাস্টিকের স্কেল। তখন লেনার কান্না কে দেখে — সারাদিন ক্ষোভোন্মত্ত ছিল। সব সময় উদ্বেগ থাকে: 'এটা করে উঠতে পারব না, ওটা শেখা হবে না।' উদ্বেগ থাকে, কিন্তু পড়ে না (ব্যাপারটি লক্ষ্য করার মতো, সঙ্গে সঙ্গে খাতায় লিখে রাখি)।

নিনার কথা শেষ হলে আমি তাকে প্রশ্ন করতে শুরু করি। লেনা পড়াশোনায় কেমন, বাড়িতে পড়া তৈরি করতে কত সময় ব্যয় করে, ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে, শিক্ষিকার সঙ্গে সম্পর্ক কীরূপে, স্কুলের প্রতি কী মনোভাব। জানতে পারলাম যে লেনা পড়াশোনায় খুবই ভালো। গত বছর সে ছিল ক্লাসের সেরা ছাত্রী, এখন ছেলেদের কেউ তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। ক্লাসে বন্ধুবান্ধব অনেক। শিক্ষিকাকে সে নিষ্পাপ প্রাণী বলে গণ্য করে। স্কুল ভালোবাসে। এক কথায়, আদর্শ মেয়ে।

— স্কুল ছাড়া আর কোথাও যায়? সঙ্গীত কিংবা ক্রীড়া চক্রে, অথবা অন্য কোথাও?

— না, কেবল ইংরেজী শিক্ষার গ্রুপে আর ফিগার স্কেটিংয়ে।

— তা কম নয়। তোমার যদি অত্যধিক চাপের ভয় থাকে, তাহলে অতিরিক্ত একটা কিছু বাদ দিলেই পারে।

— আরে কী বল! লেনা কিছুতেই তাতে রাজী হবে না।

প্রাথমিক আলাপ শেষ। এবার পরীক্ষা শুরু করতে হবে। তবে এর মধ্যেই কমপক্ষেও দু'টি প্রকল্প হাজির করা যায়। প্রথমটি — স্নায়বিক অতিচাপ। সেটা যদি থাকে তাহলে তা শ্রান্তির মাত্রা, মনোযোগ কেন্দ্রীকরণ ও বণ্টনের ক্ষমতা প্রদর্শনকারী কাজগুলো সম্পাদনের ফলাফলের উপর নিশ্চয়ই প্রভাব ফেলবে।

লেনার নার্ভাসনেস-এর অন্য সম্ভাব্য কারণটি — ক্লাসে নিজের অবস্থার জন্য অসন্তোষ। আগে সে ছিল প্রথম ছাত্রী, আর এখন অন্য একজন সে

স্থান দখল করে নিয়েছে — এ ব্যাপারটি হয়তো তার মধ্যে তীব্র আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তার মানে, আলাপ করতে হবে স্কুলের বিষয় নিয়ে। সংঘর্ষের উৎস যদি এখানে থাকে, তাহলে এরূপ আলাপে প্রকাশ পাবে উত্তেজনা, হয়তো বা কোনকিছু বলার ব্যাপারে পূর্ণ অনিচ্ছা।

লেনা নিজের ঘরে বসে ছবি আঁকছে। দরজায় ঠোকা দিয়ে আমি ভেতরে ঢুকলাম। প্রথমে অনতিবৃহৎ একটা ভূমিকা — আলমারির বইগুলোর বিষয়ে, লেনার আঁকা ছবির বিষয়ে কথাবার্তা বলি। তারপর প্রয়োজনীয় আলাপ শুরু করতে কষ্ট হয় না।

— এই আঁকার কাজ কি তোদের স্কুলে দেওয়া হয়েছে? ক্লাসে তোরা কী আঁকিস?

— কখনও পাতা, কখনও ডাল। আগের ক্লাসে গ্রীষ্মকাল এঁকেছি।

— তা তুই কেমন এঁকেছিস?

— খুব একটা ভালো হয় নি।

— কেউ তোর চেয়ে ভালো এঁকেছে?

— হ্যাঁ, মিশা — ও আমার সঙ্গে একই বেঞ্চিতে বসে। তার ছবিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল গ্রীষ্মকাল, আমার ছবিতে তা বোঝা যাচ্ছিল না।

— মিশা পড়াশোনায় ভালো?

— হ্যাঁ। পরীক্ষায় কখনও খারাপ নম্বর পায় না।

— তোদের ক্লাসে সবচেয়ে ভালো ছাত্র কে?

লেনা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়:

— আন্দ্রেই গাভ্রিলভ। সে সব সময় সবার চেয়ে বেশি নম্বর পায়।

— আর তুই?

— আমি সব সময় ভালো নম্বর পাই না। — তার কণ্ঠে ধ্বনিত বেদনা আমার কাছে অনেকটা কৃত্রিম ঠেকল।

— তা তুই কেবল ভালো নম্বর পেতে চাস?

— অবশ্যই চাই। — বোঝাই যাচ্ছে এরূপ প্রশ্ন করলে শিষ্ট মেয়েকে কীভাবে উত্তর দিতে হয় তা সে ভালোই জানে।

স্কুল সম্পর্কে আলাপ চলে আরও কিছুক্ষণ। লেনা সানন্দে এ বিষয়ে কথা বলে। সামান্যতম উত্তেজনাও নেই। এ ক্ষেত্রে তার সমস্তকিছুই সম্ভবত ঠিক আছে। অসন্তোষজনক কোন ব্যাপার থাকলে তা অনেক আগেই প্রকাশ পেত। তাহলে ব্যাপারটা কী — স্নায়বিক শ্রান্তি? তবে চেহারা দেখে তা মনে হয় না। মেয়েটি সে নাদুসনুদুস, আদৌ রোগা নয়। কিন্তু সবই তো

ঘটে। আমি শ্রান্তি এবং মনোযোগ নিয়ে পরীক্ষা চালালাম। ফল মিলল চমৎকার। নিনাকে উদ্বিগ্নকারী লক্ষণগুলোর উৎসটি তাহলে কোথায়?

আমি ভিন্ন এক পদ্ধতির আশ্রয় নিলাম। লেনাকে বলি যে তার স্মৃতি শক্তি পরীক্ষা করব — দেখব, সে কত রকমের লোকের কথা স্মরণ করতে পারে। আর খেলাটি যাতে জমে উঠে তার জন্য সে যাদের কথা স্মরণ করবে তাদের সবাইকে নতুন ও সুন্দর একটি বাড়িতে থাকতে দেব (আমি কাগজে বড়, লাল একটি আয়তক্ষেত্র আঁকলাম)। অবশ্য প্রথমে সেই বাড়িতে থাকতে দেওয়া হল খোদ লেনাকে (আয়তক্ষেত্রের ভেতরে লিখলাম: 'লেনা')। তবে সে যদি কাউকে নিজের বাড়িতে থাকতে দিতে না চায়, তাহলে তাকে অন্য একটি বাড়িতে নিয়ে যাব (লাল আয়তক্ষেত্রের কাছে আঁকলাম কালো একটি আয়তক্ষেত্র)।

লেনা সোৎসাহে বাসিন্দা দিয়ে বাড়িগুলো ভরে দেয়। ছেলেমেয়েরা সাধারণত আপন মা-বাবাদের নাম করে সবার আগে। কিন্তু লেনা তার মা-বাবার কথা স্মরণ করল সব শেষে। তাঁদের কথা সে বলে এমনকি তার বন্ধুদের মা-বাবাদেরও পরে। মজার ব্যাপার বৈকি!

আমি একখানি ছবি বার করি যাতে আঁকা আছে এক মহিলা ও ছোট্ট এক মেয়ে। তারা পরস্পরের দিকে মুখ করে পাশাপাশি বসে আছে। মহিলার হাতে বই, মেয়েটির হাতে পুতুল।

— এবার তুই গল্প বলবি। এই ছবিটি দেখে কোন একটি কাহিনী রচনা করতে চেষ্টা কর। বল, এখানে কী আঁকা আছে, কে কী করছে। আগে কী ঘটেছিল, পরে কী ঘটবে, যাদের এখানে আঁকা হয়েছে তারা কী ভাবছে, কী অনুভব করছে — সমস্তকিছু বল, যাতে একটি চিত্তাকর্ষক গল্প তৈরি হয়।

লেনা বলে, যে সে গল্প বানাতে জানে না। অনেকখন ধরে তাকে সাধতে হল, তবে শেষ পর্যন্ত গল্প বলতে আরম্ভ করল:

— মেয়েটির নাম কাতিয়া। আর ইনি গালিনা ভাসিলেভনা। গালিনা ভাসিলেভনা — কাতিয়ার মা। গালিনা ভাসিলেভনা ও কাতিয়া দুপুরের খাবার খেয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। কাতিয়া পুতুল নিয়ে খেলছে, আর গালিনা ভাসিলেভনা বই পড়ছেন। পরে কাতিয়া আর পুতুল নিয়ে খেলতে চাইল না — তার বিরক্তি ধরে গেল। সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অন্য ঘরে গিয়ে সে-ও একখানি বই নিয়ে পড়তে লাগল। তারা অনেকখন বসে বসে পড়ল। ব্যস শেষ।

আমি জিজ্ঞেস করি:

— শেষ? আর তারপর কী হল?

— তারপর গালিনা ভাসিলেভনা বই রেখে কাতিয়াকে অংক করতে দিলেন। কাতিয়া অংকটি করল। গালিনা ভাসিলেভনা বললেন যে সবই ঠিক আছে। পরে তারা হাত ধুয়ে খেতে বসল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে কাতিয়া আরও একটু পড়ে ঘুমাতে গেল। গালিনা ভাসিলেভনা লিখতে লাগলেন এবং পরে শুয়ে পড়লেন।

পরবর্তী ছবিতে আঁকা আছে এক ছেলে। সে বাড়ির চৌকাঠে বসে আছে।

— ছেলেটির মন খারাপ, — বলে লেনা। — সে পথ হারিয়ে পুরনো একটি বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে। বাড়িতে কেউ নেই। সে বিষণ্ণ মনে চৌকাঠে বসে পড়ল।

গল্পের শেষে ছেলেটি মঙ্গল মতো বাড়ি ফিরল এবং মাকে বলল কীভাবে সে পথ হারিয়ে ফেলেছিল (মজার কথা: মা তাতে কানই দিলেন না)। তারপর সে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

তৃতীয় ছবিতেও একটি ছেলে যার সামনে রয়েছে একটা বেহালা। গল্প শুরু হয়:

— বাড়িতে কেউ ছিল না। ছিল কেবল ভাসিয়া। সে কার একটা বেহালা দেখতে পেল এবং ওটা নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করল। সে ভালোই বাজাচ্ছিল, তবে পরে তার বিরক্তি ধরে যায়। বেহালাটি রেখে দিয়ে মন খারাপ ক'রে ওটার কাছে বসে পড়ল।

পরে মা এলেন। ভাসিয়া তাঁকে দেখায়, সে কেমন বেহালা বাজাচ্ছে, এবং মা বলেন: 'ভালোই বাজাচ্ছিস, তবে পরের বার অনুমতি নিতে ভুলিস না।' পরদিন বাবার ইচ্ছে হল ভাসিয়াকে বেহালা বাজাতে শেখান। ভাসিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ও-কাজ চমৎকার উৎরাল, এবং বাবা যখন এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করলেন ভাসিয়া তাঁকে বলল আগের দিন কী ঘটেছিল।

— তখন বাবা বললেন: 'ঠিক আছে। কিন্তু পরের বার অনুমতি ছাড়া পরের জিনিসে হাত দিবি না। যা, এবার একটু বেড়িয়ে আয়।' — এই ভাবে লেনা তার কাহিনী শেষ করে।

আমি তাকে আরও কয়েকটি ছবি দিলাম, কিন্তু নীতিগতভাবে নতুন কোনকিছু আবিষ্কার করতে পারলাম না। তবে যা জেনেছি তা-ই যথেষ্ট। গল্পগুলো খুব ঝরঝরে, পারম্পরিক। ঘটনাগুলো যুক্তিভিত্তিক। প্রাথমিক

সিদ্ধান্ত এরূপ: বিকাশের মান অতি উচ্চ। কিন্তু তা আমি আগেই জানতাম। অন্যান্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে কথিত কাহিনীগুলোর সারমর্ম বিশ্লেষণ করতে হবে। তাতে প্রতিফলিত হয় শিশুর জীবনের অভিজ্ঞতা, তার অন্তর্জগৎ। লেনা যদি জানত না বিষণ্ণতা কী জিনিস, তাহলে তার নায়করাও মন খারাপ করত না (ছবিগুলোতে ইচ্ছাকৃতভাবেই মুখের ভাব অস্পষ্ট করা হয়েছে)।

সর্বাগ্রে প্রশ্ন জাগে মা-বাবার সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে। 'মা কাতিয়াকে অঙ্ক করতে দিলেন', 'বাবা ভাসিয়াকে বেহালা বাজানো শেখাতে লাগলেন' — এ হচ্ছে একটি দিক। 'মা বলেছেন যে অনুমতি ছাড়া পরের জিনিস নিতে নেই', পরে একই কথা বলেছেন বাবা — এ হচ্ছে অন্য দিক। লেনার সমস্ত গল্পে হয় মা-বাবারা সন্তানদের শিক্ষা দেন, নয় তাদের 'মানুষ করেন'। তার গল্পগুলোতে আদানপ্রদান ও মেলামেশার অন্য কোন উপায় নেই। যেমন, ছেলেটি মাকে বলছে কীভাবে সে পথ হারিয়ে ভীষণ ভীত হয়ে পড়েছিল। আর মা তাকে জবাবে বলছেন: 'ঠিক আছে, খেতে বস।' মা ও মেয়ে বিশ্রাম করছেন। মা নিজের কাজে ব্যস্ত (বই পড়ছেন), মেয়ে নিজের কাজে (পুতুলের সঙ্গে খেলছে)। অথচ ছবিতে মহিলা ও মেয়েটি বসে আছে পাশাপাশি — পরস্পরের দিকে মুখ করে। তাই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে অধিকাংশ ছেলেমেয়ে ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে বর্ণনা করে: মা মেয়েকে বই পড়ে শোনাচ্ছেন। অথবা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন, বইয়ের দিকে তাকাচ্ছেন না।

সুতরাং অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে মা-বাবার সঙ্গে লেনার প্রকৃত মানসিক যোগাযোগ খুবই সামান্য। তাতে লেনা কি সন্তুষ্ট? মনে হয় না: তার নায়করা প্রায়ই মন খারাপ করে ও বিষণ্ণতা বোধ করে।

আমাদের হাতে মালমসলা এবার যথেষ্ট। গল্পগুলো অধিক বিশদভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই। খতিয়ান করার চেষ্টা করা যাক।

প্রকটিত শ্রান্তি নেই। শিক্ষা ক্ষেত্রে সংঘর্ষ নেই। লেনা জানে, লোকের সঙ্গে কীভাবে কথাবার্তা বলতে হয়, এবং সমস্তকিছু দেখে মনে হয়, আচার-ব্যবহারে সে খুবই চেষ্টা করে 'লক্ষ্মী মেয়ে হতে'। তাহলে ভালো ও শিষ্ট এক মেয়ে কীভাবে নিজের প্রতি মা-বাবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে, যদি সে সেই মনোযোগের অভাব অনুভব করে? জিদ করা অনুচিত — সে তা জানে। সরাসরি মা'র কাছে গিয়ে বলবে: 'জানো মা, আজ আমার মনটি কেন যেন ভীষণ খারাপ, তুমি আমার সঙ্গে একটু বসো।' না,

তা সম্ভব কেবল যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকলে। আর যদি অন্যভাবে বলে: 'জানো মা, আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে যে আমি কবিতাটি মুখস্থ করতে পারব না!' এমতাবস্থায় মা হয়তো সত্যিই সহানুভূতি দেখাবেন, মেয়েকে সান্ত্বনা দেবেন।

অবশ্য এটা মনে করা যায় না যে লেনা জেনেশুনে এ সমস্তকিছু করেছে। মা-বাবার মনোযোগ ও আন্তরিকতার অভাব সে অবশ্যই উপলব্ধি করে না। তবে শিশুর যদি কোন প্রবল চাহিদা থাকে, তাহলে সে অচেতনভাবে আচরণের এমন সব রূপ খুঁজে পায় যা অন্তত আংশিকভাবেও সেই চাহিদা পূরণ করতে সাহায্য করে।

'রোগ' নির্ণয় করা গেল। এবার তা নম্রভাবে 'রোগীকে' জানিয়ে দিতে পারলেই হয় (এ ক্ষেত্রে 'রোগী' — লেনার মা-বাবা, যাদের চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে)।

মা-বাবা: নিনা — পেশায় রসায়নবিদ, তার স্বামী ইগর — পদার্থবিদ। তারা ভালো ও বুদ্ধিমান লোক, এবং সবচেয়ে বড় কথা — তারা খুব মিশুক। তারা দু'জনে স্পষ্টতই মেয়েকে অত্যন্ত ভালোবাসে।

আমি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি:

— আচ্ছা, বল তো, লেনার সঙ্গে তোমরা সাধারণত কী নিয়ে কথাবার্তা বল? কখনও তার স্কুলের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে কথা হয় কি?

— না, — একটু ভেবে বলল ইগর। — স্কুলের কাজকর্ম ও নিজেই চমৎকার সামলাতে পারে।

নিনা যোগ করে:

— স্কুলে ওর সমস্তকিছুই ঠিক আছে। তাই সে নিয়ে আলোচনা করতে হয় না। তবে সম্প্রতি ওর কেমন এক আচরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে... আর ওর বন্ধুদের বিষয়ে ওর সঙ্গে কোনকিছু বলতে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে।

— আর নিজেদের কাজকর্মের বিষয়ে তোমরা ওকে কখনও কোনকিছু বল?

— অবশ্যই না।

— আর বই সম্পর্কে, ফিল্ম সম্পর্কে কথাবার্তা হয়?

বিরতি। তারা স্মরণ করছে। পরে ইগর মাথা নেড়ে বলে:

— সাধারণত হয় না। ফিল্মের বিষয়ে নিনা আর আমি কথা বলি নিজেদের মধ্যে। আমার মনে হয়, লেনার তা খুব একটা ভালো লাগবে না।

-- আচ্ছা, কিন্তু তবুও তোমরা কী নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বল?

— গত বছর লেনা ফিজিক্স নিয়ে ভীষণ মেতে উঠে, — সজীব হয়ে যায় নিনা। — তুমি বিশ্বাস করবে না, তাতে অনেকগুলো ব্যাপার ও মন্দ বোঝে না।

নিনা ও ইগর একে অন্যকে বাধা দিয়ে হুড়োহুড়ি ক'রে বলতে আরম্ভ করে কীভাবে লেনা অনেকগুলো জটিল জিনিস রপ্ত করেছে।

— তাহলে দেখা যাচ্ছে, লেনার সঙ্গে তোমাদের মেলামেশা কেবল বিজ্ঞান চর্চার মধ্যেই সীমিত?

— ওকে আমরা খুব কম সময়ই দিতে পারি, — অভিযোগ করে নিনা। — ইচ্ছে হয় অন্তত এই সময়টুকুও যেন ফলদায়ক হয়।

আমার আর প্রশ্ন নেই। এবার আমি বুঝলাম, কীভাবে বুদ্ধিমান, মিষ্টি, মিশুক এবং খুবই স্নেহশীল মা-বাবা তাদের মেয়েটিকে অতি সাধারণ আন্তরিকতা থেকে বঞ্চিত করতে পারে।

শেষ কাহিনীটি হচ্ছে মারিনার বিষয়ে। জীবনের প্রথম চারটি বছর মারিনা কাটায় 'নাদিয়া দিদিমার' গ্রামে। তার মা-বাবা — আনিয়া ও ভলোদিয়া আমার পুরনো বন্ধু। উভয়েই কাজ করে। তারা ভেবেছিল যে ছোট শিশুটিকে তারা সামলাতে পারবে না। পরে ভলোদিয়া নতুন চাকরিতে ঢুকল, আরও পড়াশোনা ক'রে পি-এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করল, ফ্ল্যাট পেল। তখনই আমি মারিনাকে প্রথম দেখি।

জানলার কাছে চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে রোগা এক মেয়ে। তার কানগুলো লম্বা, চোখ দু'টি ধূসর।

— এই হল মারিনা, — বলল আনিয়া। — আমাদের মেয়ে। আর ইনি সাশা কাকু। মারিনা, কাকুকে নমস্কার বল।

মারিনা আগের মতোই চুপচাপ বসে থাকে।

— সব সময় এভাবে। গুম হয়ে বসে থাকে। জান, আমার মনে হয় ওর সব ঠিক নয়... — আনিয়া বিহ্বলভাবে নিজের মাথাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল। — কী করি বল?

মারিনা খুব সহজেই আমার সঙ্গে মিশতে পারল। আনিয়া তা আশা করে নি। আর সত্যি কথা বললে, আমার পক্ষেও তা ছিল এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। মারিনা সানন্দে আমায় দিদিমার বাড়ির গল্প বলল। আমায় শোনাল সে কীভাবে দিদিমার সঙ্গে আলু রোপণ করত ('আমরা এই ভাবে

আলু ধরতাম' — 'আর তারপর?' — 'পুঁতে দিতাম' — 'কোথায়?' — 'মাটিতে')। পরে সে আমায় বলল তার হাঁটুতে কীভাবে আঁচড় লেগেছে: 'আমি পড়ে গিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি ছুটেছিলাম কি না।' আমি সহানুভূতি জানালাম, উপদেশ দিলাম ভবিষ্যতে যেন ভালো ক'রে দেখে পায়ের তলায় কী আছে। এক কথায়, অচিরেই আমাদের মধ্যে ভদ্র আলাপ জমে উঠল, যদিও মারিনার কথাগুলো ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। দেখা গেল যে সে কথাবার্তা ভালোই বলে, সবই বোঝে এবং তেমন একটা লাজুক নয়। তার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা উঠতেই তার জড়তা প্রায় পুরোপুরিভাবে দূর হয়ে গেল। তবে শিগগিরই কথাবার্তা শেষ হয়ে যায় এবং সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। আমি জিজ্ঞেস করলাম:

— আচ্ছা মারিনা, আমি তোর খেলনাগুলো দেখতে পারি?

মারিনা সজীব হয়ে উঠল, নিয়ে এল বিশাল এক দোলনা এবং আমায় জানাল: 'এটা দোলনা'। তাতে খরগোশকে বসিয়ে দোলাতে লাগল। অনেকখন ধরে দোলাতে থাকল। খরগোশটি জ্যান্ত হলে এতক্ষণে তার মাথা-ঘোরা শুরু হয়ে যেত। অবশেষে আমি বললাম:

— আয়, অন্য কোনকিছু খেলা যাক।

মারিনা তর্ক করল না, সে খরগোশটিকে নিয়তির হাতে ছেড়ে দিয়ে অন্য ঘরে ছুটে গেল। ফিরল বিরাট একটি পুতুল নিয়ে, — ওটা তার নিজের সমান। সম্ভবত, আনিয়া ও ভলোদিয়া ভেবেছিল যে খেলনা যত বড় ততই ভালো। তবে পুতুলটি সত্যিই ভালো ছিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম:

— এটা তোর মেয়ে, অ্যাঁ?

— না।

— তাহলে কে?

— পুতুল।

— আয়, ওকে ঘুম পাড়াই।

মারিনা পুতুলটিকে পাগুলো উপরের দিকে ক'রে ধরল। পুতুলটি অস্পষ্ট একটি শব্দ করল। সে ওটার বোজা চোখে আঙুল দিয়ে টিপে আমায় জানাল:

— পুতুল ঘুমাচ্ছে।

— কিন্তু তোকে কি ওভাবে ঘুম পাড়ানো হয়?

মারিনা হেসে ফেলল এবং পুতুলটিকে লম্বা ক'রে শোয়াল।

— এবার ঠিক আছে। তবে জানিস, আমরা আরও একটা কাজ করতে ভুলে গেছি। তোর কী মনে হয়?

মারিনা বুঝল না, স্রেফ কাঁধ ঝাঁকাল (মজার কথা, কবে সে মায়ের এই অঙ্গভঙ্গিটি রপ্ত করেছে?)।

— আচ্ছা বল্ তো, জুতো পরে ঘুমানো যায়?

সে মাথা নাড়ল এবং পুতুলের পা থেকে জুতো জোড়া খুলে ফেলল। পরে একটু ভেবে মোজাও খুলে নিল। আমার নির্দেশে সে পুতুলটিকে বিছানায় শুইয়ে দিল। এবার আমি বললাম:

— ও এখন ঘুমাক, আর আমরা অন্য কোন কাজে মন দেব। তোর বাবা বলেছে যে তোর নাকি খুব সুন্দর কিছু গ্লাস আছে। বাবাকে ওগুলো আনতে বলা যাক, কেমন?

ভলোদিয়া বাধ্যের মতো চেয়ার ছেড়ে উঠল এবং গ্লাসগুলো নিয়ে এল। ওগুলো একটির মধ্যে একটি ক'রে রাখা যায়। আমি কেবল তিনটি গ্লাস নিলাম: সবচেয়ে বড়টি, সবচেয়ে ছোটটি ও মাঝারিটি। বাকীগুলো লুকিয়ে ফেললাম। মেঝের উপর রাখলাম সবচেয়ে বড় গ্লাসটি; ওটার উপর মাঝারিটি, আর সবচেয়ে উপরে — ছোটটি। পরে নিজের এই গঠনটি ভেঙে মারিনাকে গড়তে বললাম। সে সঙ্গে সঙ্গে কাজটি করে ফেলে। তখন আমি বাকী গ্লাসগুলো বার করে উঁচু এক মিনার গড়লাম। মারিনা তা ভেঙে ফেলল এবং নিজে গড়তে লাগল। সে মিনারটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারল না, তবে তার প্রয়াস ছিল যথেষ্ট সুবিবেচিত ও লক্ষ্যনিষ্ঠ। বার কয়েক সে সমস্তকিছু শুরু করে একেবারে গোড়া থেকে। নিচে প্রতি বারই রাখত সবচেয়ে বড় গ্লাসগুলোর একটি, পুরো সময় ধরে একবারও সে বড় গ্লাস দিয়ে ছোট গ্লাস ঢাকার চেষ্টা করে নি। নতুন খেলাটি তার খুব মনে ধরেছে দেখে আমি তাকে সামান্য সাহায্য করতে লাগলাম। শিগগিরই আমরা অতি সুন্দর একটি মিনার গড়ে ফেললাম।

আমি ভলোদিয়াকে গ্লাসগুলো সরিয়ে রাখতে বললাম। মারিনাকে কাগজ ও পেন্সিল দিয়ে বললাম কোনকিছু আঁকতে। সে তাড়াতাড়ি সারা কাগজে কী সব আঁকাবাঁকা টান দিয়ে খুব খোশ মেজাজে কাগজটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

আমি বললাম:

— ধন্যবাদ। কী এঁকেছিস?

মারিনা সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে:

— ছবি।

— তা ছবিতে কী আছে? বাড়ি? বন? কাকু?

মারিনা নেতিবাচকভাবে মাথা নাড়াল। অবশেষে সে আবার বলল:

— ছবি।

আমি প্রস্তাব দিলাম:

— তা তুই একটি গাছ আঁকতে চেষ্টা কর।

মারিনা হেসে ফেলল। সে কোন জিনিস আঁকতে পারে এরূপ ধারণা সম্ভবত তার কাছে অদ্ভুত ঠেকছিল। তখন আমি একটি মানুষ এঁকে তাকে জিজ্ঞেস করলাম:

— এটা কী?

— কাকু, — না ভেবে জবাব দেয় মারিনা।

— এরূপ আরও একটি কাকু আঁক, — আমি প্রায় জোর করেই তার হাতে পেন্সিলটি ধরিয়ে দিই।

প্রথম বারের মতো এবারও মারিনা সারা কাগজ আঁকাবাঁকা টান দিয়ে ভরে দিল। আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি কাকু, তখন সে অসহায়ভাবে বলল:

— না।

— তাহলে কী?

— ছবি।

— তা কাকু কোথায়? ও রকম একটা কাকু আঁকতে পারবি? — এবং ফের আমি আমার আঁকা লোকটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলাম।

মারিনা কখনও বলে না: 'পারব না,' 'জানি না,' 'ইচ্ছে নেই'। এ ব্যাপারটি আমায় অবাক করল। সে বুঝতে পারছিল না আমি তার কাছ থেকে কী চাইছি। সে বুঝে উঠতে পারছিল না যে সে নিজে কোনকিছু আঁকতে পারে। সে সম্ভবত আমার ছবির সঙ্গে নিজের আঁকাটি মোটেই মিলিয়ে দেখে নি। বড়রা কোনকিছু আঁকতে পারে — তা সে অবশ্যই জানত। কিন্তু নিজে যে কিছু একটা আঁকার চেষ্টা করবে সে কথা তার মাথায়ই আসছিল না।

আমি মারিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম পুতুলের দিকে:

— ওই দ্যাখ, আমাদের পুতুলের ঘুম ভেঙেছে। ওকে কাপড় পরিয়ে দে।

সে পুতুলটিকে জামাকাপড় পরাতে লাগল, আর আমরা বড়রা চলে গেলাম রান্নাঘরে। আনিয়া অস্বাভাবিক শান্তভাবে চেয়ারে বসে থাকে,

পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে কোনকিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছিল না। আমিও তাড়াহুড়ো করছিলাম না: বসে আমার খাতাটি দেখছিলাম।

তাহলে ব্যাপার-স্যাপার হচ্ছে এরূপ। খেলার ক্ষমতা দুই বছরের শিশুর সম পর্যায়ে। সাড়ে চার বছর বয়সে এমনটি ঘটে থাকে কেবল শিশু মানসিক দিক থেকে অবিকশিত হলে কিংবা সেই সমস্ত শিশুর ক্ষেত্রে যাদের সঙ্গে কেউ কখনও খেলে নি। আঁকার কাজে মারিনার কোন দক্ষতাই নেই। সেটাও মানসিক দিক থেকে অবিকশিত শিশুদের বৈশিষ্ট্য। স্বাভাবিক শিশুর বেলা এমনটি ঘটতে পারে একমাত্র তখনই যদি কেউ কখনও — এমনকি আকস্মিক, অবহেলাভরেও — তাকে আঁকতে শেখায় নি।

তবে মারিনা কথাবার্তা বেশ ভালো বলে। সে যে মানসিক দিক থেকে অনগ্রসর নয় তা তার গ্লাসের খেলা দেখেই বোঝা যায়। গ্লাসগুলো দিয়ে মিনার গড়ার সময় সে কাজ করে সুচিন্তিতভাবে এবং ওগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধিতে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে নি। ক্রিয়াকলাপের প্রতি তার আছে স্থায়ী আগ্রহ। খেলার সময় ও মিনার গড়ার সময় সাফল্যের সঙ্গে সে বড়র সহায়তা কাজে লাগিয়েছে। তার মানে, আসল কারণটি হয়তো গভীর শিক্ষামূলক অবহেলায়।

— কী, ব্যাপার-স্যাপার একদম খারাপ? — নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল ভলোদিয়া।

— হ্যাঁ খারাপ, তবে তারও চেয়ে মারাত্মক ঘটনা ঘটে। বিকাশের মান প্রায় আড়াই বছরের শিশুর সমান। তবে আমার মতে, মানসিক অনগ্রসরতা নেই। মনে হচ্ছে, সবকিছুই শিক্ষামূলক অবহেলার ফল।

— বুঝলাম না। মানসিক অনগ্রসরতা আছে কি নেই?

— জন্মসূত্রে মস্তিষ্ক বিকৃতিকেই মানসিক অনগ্রসরতা বলা হয়। তা চিকিৎসা করে সারানো যায় না। আর শিক্ষামূলক অবহেলা — সে হচ্ছে সাময়িক ব্যাপার। শিশুকে নিয়ে ভালো ক'রে খাটলে তা পুরোপুরিভাবেই দূর করা সম্ভব। তবে খাটতে হবে প্রচুর।

— তার মানে, মারিনার সবকিছুই স্বাভাবিক? — মনে একটু শক্তি পেল আনিয়া। — তা ঠিক?

— তোমাদের কাছে আরও কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপার জানার পরই সঠিকভাবে বলতে পারব।

— আমি তো তোমায় সবকিছুই বলেছি। মারিনা থাকত ওর দিদিমার কাছে... আর ঠিক ক'রে বললে, ভলোদিয়ার মাসির কাছে। নাতনী-দিদিমা

দু'জনে সবজি ভুঁইয়ে কাজ করত, সারা দিন তাজা হাওয়ায় — আমরা ভাবতাম, তা মারিনার স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভালো।

— অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলত?

— না, খুব একটা খেলত না। তাছাড়া কাছাকাছি কোন ছেলেমেয়েও ছিল না, তাই সব সময় দিদিমার সঙ্গেই থাকত।

— আর দিদিমা কি মারিনার সঙ্গে খেলতেন?

— খেলতেন — এমনটা বলা যায় না, তবে এটা ঠিক যে ওকে খুব ভালোবাসতেন, — বলল ভলোদিয়া। — সর্বদা ওকে মাতিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। যখন কাপড় কাচতেন, তখন মারিনাকেও একটা গামলা দিতেন, আর ও তাতে কীসব ন্যাকড়া ধুত।

— কেউ তার সঙ্গে খেলত না, কেউ তাকে পুতুল নিয়ে খেলতে শেখায় নি?

— তা আবার কী ক'রে শেখানো যায়? আমি মনে করি, তা শিশুরা নিজেরাই শেখে।

— নিজেরা তা শিখতে পারে না। শেখাতে হয়, ঠিক যেভাবে আমি আজ শিখিয়েছি। ঠিক আছে, এবার বল তো, মারিনা কখনও নিজ হাতে পেন্সিল ধরেছে?

তারা তা জানত না। অবশ্য মারিনাকে তারা রঙ উপহার দিয়েছে, কিন্তু সে তা দিয়ে কোনকিছু আঁকে নি... তাকে কখনও বই পড়ে শোনানো হয় নি ('আমাদের নাদিয়া দিদিমা চোখে খুব একটা ভালো দেখেন না, তাঁর পক্ষে বই পড়া কষ্টকর,' — ব্যাখ্যা করে ভলোদিয়া)। মোটের উপর আমার ধারণাই ঠিক হল। মেয়েটিকে মোটেই খেলতে ও আঁকতে শেখানো হয় নি। অন্যান্য ছেলেমেয়ের কাছ থেকে সে কিছু গ্রহণ করতে পারে নি, কারণ প্রায় কারোর সঙ্গেই মেলামেশা করে নি। এবার আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলাম যে মারিনা শিক্ষামূলক অবহেলার দরুনই এত পিছিয়ে আছে। আমার প্রাথমিক সুপারিশগুলো ছিল এরূপ।

আমি খেলা বিকাশের দিকে আসল মনোযোগ দিতে বললাম। তাছাড়া, গ্লাস নিয়ে খেলা দরকার, মাত্রিওশকা, পিরামিড ও নির্মাণ সেট কেনা উচিত। তবে এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে বিভিন্ন পরামর্শই যথেষ্ট নয়। মারিনার জন্য খেলাধুলা ও শিক্ষার সুপরিকল্পিত একটা ব্যবস্থা প্রস্তুত করতে হবে। শিক্ষামূলক অবহেলা জনিত দোষত্রুটি দূর করা যায়, তবে তার জন্য প্রচণ্ড খাটুনি প্রয়োজন। অন্যথায় কোন ফল মিলবে না, তার অবস্থা হবে মানসিক

দিক থেকে অবিকশিত শিশুর মতো: সে সাধারণ স্কুলে পড়াশোনা করতে পারবে না, কখনও সর্বাঙ্গীণভাবে বিকশিত মানুষ হতে পারবে না। শৈশবের ভুল পরে সংশোধন করা সম্ভব নয়। তা এখনই সংশোধন করা উচিত, নতুবা দেরি হয়ে যাবে।

কিন্ডারগার্টেনের সাধারণ কর্মসূচি দিয়ে মারিনার কোন লাভ হবে না। ওটা তার উপযোগী নয়। চার বছরের শিশুর জন্য নির্ধারিত কাজ সে সম্পন্ন করতে পারবে না, আর তাকে দু' বছরের শিশুর কাজ দিলেও চলবে না। দুনিয়া সম্পর্কে তার ধ্যানধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন, দুই বছরের শিশুর লক্ষ্য ও আগ্রহ তার লক্ষ্য ও আগ্রহের সঙ্গে মিলবে না। আর তার মানে, মারিনার জন্য বিশেষ একটা ব্যবস্থা বা কর্মসূচি প্রস্তুত করা প্রয়োজন। কিন্তু কেবল একটা পরীক্ষাই এ ব্যাপারে যথেষ্ট নয়। কয়েক বার তার সঙ্গে বসে খেলতে হবে, দেখতে হবে কীভাবে সে নতুন বিষয় আয়ত্ত করে।

মারিনার সঙ্গে আমাদের প্রচুর খাটতে হয়েছে। দুঃখের বিষয়, সে সম্পর্কে বিশদভাবে বলা সম্ভব নয়। সে ছিল তিন বছর জুড়ে অতি শ্রমসাধ্য ও সুদীর্ঘ এক কাজ। কাজের বেশির ভাগই করতে হয় মা-বাবাকে, তবে আমায়ও বেশ অংশ নিতে হয়েছে। ফলে মারিনা সময় মতো স্কুলে ভর্তি হল, তবে তার সাফল্য মোটেই চমকপ্রদ নয়। তাই বড়াই করার কিছু নেই। তবে আমার মনে আছে, আমি যখন মারিনাকে প্রথম দেখি তখন সে কীরূপ ছিল। মনে পড়ে তার মায়ের বিহ্বলতা ও আমার সংশয়ের কথা — এ শিক্ষামূলক অবহেলা কিংবা মানসিক অনগ্রসরতার ফল?.. আমি মনে করি যে অর্জিত সাফল্য মোটেই সামান্য কিছু নয়। মারিনা নিজের বিকাশে তিন বছরের মধ্যে যে-পথ অতিক্রম করেছে সে পথ শিশুরা সাধারণত অতিক্রম করে পাঁচ বছরে। সে এখন সাধারণ স্কুলে পড়ে। সেটা কি সৌভাগ্য নয়?

শেষ কাহিনীটিও এবার শেষ হয়ে গেল। পাঁচটি শিশু — পাঁচটা বিভিন্ন সমস্যা।

এ হচ্ছে সন্তান লালনপালনের সময় সচরাচর যে-সমস্ত ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে তার কিছু নমুনা। এ ধরনের আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। তবে আমি আশা করি যে প্রদত্ত অল্প সংখ্যক উদাহরণই সন্তান লালনপালনের ক্ষেত্রে মা-বাবাদের যথেষ্ট সাহায্য করবে। সর্বদাই যে নিজের ভুলে শিখতে হবে এমনটা বলা চলে না, পরের ভুলেও শেখা যায়।

বাড় ও বিকাশ। এই ধারণা দু'টি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। বাড় — এ হচ্ছে পরিমাণগত বৃদ্ধি, আর বিকাশ বলতে বোঝায় মানুষের দেহযন্ত্র ও শরীরের গুণগত রূপান্তর।

শিশু কীভাবে বাড়ে সে রহস্য লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা তার গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। অস্থি ব্যবস্থাই শিশুর শরীরের বয়সগত পরিবর্তন ঘটায়, এবং শরীরের দৈর্ঘ্য নির্ধারিত হয় তার অস্থি পঞ্জরের আয়তনের দ্বারা। বিকশিত হয়ে ও আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে অস্থি পঞ্জর পেশী, শিরা আর স্নায়ুগুলোকে 'নিজের দিকে টানে' এবং বাড়তে বাধ্য করে। এখানে এটা উল্লেখ করা দরকার যে পেশীগুলো শরীরের চলন সক্রিয়তা বজায় রাখে, শিরাগুলো কলাসমূহকে পুষ্টিকর পদার্থ জোগায় আর স্নায়ুগুলো বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও দেহযন্ত্র ব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। খোদ এই সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর ব্যবস্থাও আয়তনে বর্ধিত হয়।

শিশুর বাড়ার প্রক্রিয়ায় তার দেহযন্ত্রে কেবল পরিমাণগতই নয়, গুণগত পরিবর্তনও ঘটে। পুরনো হয়ে যাওয়া কলা আর কোষগুলোর স্থান গ্রহণ করে নতুন কলা ও কোষ। কেবল স্নায়ু কোষগুলোই পুনর্স্থাপিত হয় না।

বাড় — এ কোন নিত্যনৈমিত্তিক প্রক্রিয়া নয়, পর্বভিত্তিক প্রক্রিয়া। সে প্রক্রিয়া চলে নির্দিষ্ট পর্বগুলোতে, এবং তারপর তা বন্ধ হয়ে যায়। জীবনের প্রথম মাসগুলোতেই শিশু সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ে, এর পর বাড়ার প্রবলতা লক্ষ্য করা যায় ৬-৭ বছর বয়সে এবং তারপর ১৩-১৪ বছর বয়সে। বাড়ার প্রক্রিয়া ঋতুগুলোর দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয়। একটা নিয়মানুবর্তিতা রয়েছে (এবং আপনারা নিজেরাও নিশ্চয়ই তা লক্ষ্য করেছেন): শিশুর শরীরের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় সাধারণত গ্রীষ্মের মাসগুলোতে, আর ওজন বাড়ে শীতকালে।

পর্বভিত্তিক বিকাশের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে শিশুর শরীরের বিভিন্ন অংশ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গও বিকাশ লাভ করে অসমানভাবে।

জীবনের প্রথম বছরগুলোতে অধিকতর দ্রুত বাড়ে ধড় এবং শিশুদের তখন 'খাটো-পা' দেখায়। তথাকথিত বয়ঃসন্ধি কালে ঘাড় ও হাত-পা লম্বা হয়। তবে এই সমস্ত সাময়িক অসামঞ্জস্য খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, তাতে চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

নির্দিষ্ট পর্বে মেয়েরা লম্বায় ছেলেদের ছাড়িয়ে যায়। মেয়েদের যৌন পরিণতি আসে ছেলেদের চেয়ে এক-দুই বছর আগে। মেয়েদের অস্থি ব্যবস্থা বিকশিত হয় আগে। কিন্তু মেয়েদের বাড় যখন বন্ধ হয়ে যায় ছেলেরা তখনও হরদম বাড়তে থাকে।

সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখা উচিত যে বাড়ার প্রক্রিয়াটি সব শিশুর ক্ষেত্রে এক নয়। প্রতিটি শিশু বিকাশ লাভ করে তার নিজস্ব 'নকশা' আর 'ড্রাফ্‌ট' অনুযায়ী। সাধারণ সূচকগুলো থেকে সামান্য এদিক-সেদিক হলে চিন্তার কোন কারণ নেই, — এরূপ ব্যতিক্রম মোটেই কোনরূপ প্যাথোলজির লক্ষণ নয়। যে-শিশু এখন ঠিক মতো বাড়ছে না সে পরে কোন এক সময়ে লম্বায় এমনকি তার সমবয়সীদেরও ছাড়িয়ে যেতে পারে, আর কোন লম্বা শিশুর বাড়ার গতি পরবর্তী কালে একেবারে মন্থর হয়ে আসতে পারে। কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে আপনার সন্তান বাড়ার ব্যাপারে তার সমবয়সীদের থেকে অনেক পিছিয়ে আছে তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন। মনে রাখা উচিত যে বিকাশের কিছু ত্রুটির ক্ষেত্রে কেবল অবিলম্বে আরব্ধ চিকিৎসাই ফল দিতে পারে। ভুল শোধরানো খুবই কঠিন, আর সময় সময় একেবারেই অসম্ভব।

আপনি জিজ্ঞেস করবেন, কিন্তু এক বয়সের ছেলেমেয়েদের বাড়ে কখনও কখনও এত তফাৎ দেখা যায় কেন? অন্য কথায় — বাড়ার প্রক্রিয়া কীসের দ্বারা পরিচালিত হয়, তা কোন্ কোন্ নিয়মের অধীন?

বাড় নির্ভর করে যেমন বংশগত কারণসমূহের উপর, তেমনি জীবনধারণের পরিস্থিতির উপরও, যার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে খাদ্য।

— আহার এবং জীবনের পরিবেশ নিঃসন্দেহেই বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রক্রিয়াগুলোকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তবে প্রত্যেক শিশুর দেহযন্ত্র বিকশিত ও 'গঠিত' হয় নিজস্ব, তার বংশগত কর্মসূচিতে নির্ধারিত নকশা অনুসারে। কিন্তু লোকে যতটা ভাবে বংশগত যোগাযোগ ততটা সোজা ব্যাপার নয়। যেমন, বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে লম্বা ছেলেমেয়ের মা-বাবারা সর্বদাই লম্বা হয় না। তাছাড়া আধুনিক ছেলেমেয়েদের বৃদ্ধির উপর অ্যাকসেলেরাশন প্রক্রিয়াগুলোরও প্রভাব রয়েছে।

— তাহলে আগেকার দিনে অ্যাকসেলেরাশন কি ছিল না?

— মাফ করবেন, কিন্তু আমরা কথা বলছি বিভিন্ন বিষয়ে। দীর্ঘকায় লোক সব কালেই ছিল, তবে গোটা একটি পুরুষের ত্বরিত বিকাশ — সে হচ্ছে মানবেতিহাসে অস্থায়ী এক ব্যাপার, যদিও অতীতেও তা ঘটেছে। আজ অবধিও তার কারণটি পুরোপুরিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় নি।

— উঃ, এই লম্বুদের নিয়ে আর পারা গেল না! দেখতে ওরা একেবারে বড়দের মতো, কিন্তু কথাবার্তা আর আচার-ব্যবহারে অনেক ছেলেমানুষি ভাব থাকে...

— হ্যাঁ, অ্যাকসেলেরাশন হচ্ছে খুবই জটিল এক প্রক্রিয়া এবং সর্বদা তা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই অনেক সময় জীবতাত্ত্বিক, মানসিক ও সামাজিক পরিণতির সঙ্গে কিশোর-কিশোরীদের দ্রুত বৃদ্ধির কোন সঙ্গতি থাকে না।

দেহযন্ত্রের আসল নির্মাণ সামগ্রী' হচ্ছে প্রোটিন ও খনিজ পদার্থ যার প্রধান অংশ ব্যবহৃত হয় অস্থি পঞ্জরের দ্বারা। 'নির্মাণ' প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে ভিটামিন ও অন্যান্য বহু পদার্থ। ক্রমবর্ধমান দেহযন্ত্র যেন এসব পদার্থের অভাব অনুভব না করে।

শিশুর জীবনযাত্রারও বৃহৎ তাৎপর্য রয়েছে। শিশুর বয়স ও স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানসিক ও শারীরিক চাপ, বিশ্রাম ও নিদ্রার রুটিনের পরিবর্তন ঘটানো উচিত।

মানব দেহের ভাস্কর হচ্ছে গতি। হাইপোডিনামিয়া বাড়ার প্রক্রিয়াকে রোধ করে রাখে, সেই জন্যই খোলা বাতাসে ছোটাছুটি ও ব্যায়াম করা শিশুর দৈনন্দিন জীবনের নিয়মে পরিণত হলে খুবই ভালো হয়।

জলবায়ুকে শিশুর বাড়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ একটি বাহ্যিক কারণ হিশেবে বিবেচনা করা হত। বহু কাল ধরে লোকে মনে করত যে দক্ষিণের দেশসমূহে শিশু পরিণতি লাভ করে অনেক তাড়াতাড়ি। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে বাড়ার প্রক্রিয়ার উপর সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণসমূহের তুলনায় জলবায়ু ও ভৌগোলিক পরিস্থিতির প্রভাব অতি নগণ্য। অনুকূল সামাজিক পরিস্থিতি যেকোন জলবায়ুতে ও ভৌগোলিক পরিবেশে, এমনকি সবচেয়ে জটিল প্রাকৃতিক পরিবেশেও বাড়ার আর বিকাশের প্রক্রিয়া স্বাভাবিক করে তুলতে পারে।

তথাকথিত কিশোর বয়সটি সব দিক থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ। ওই বয়সে ছেলেমেয়েরা দ্রুত বাড়তে আরম্ভ করে এবং তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানের প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন তারা নিজের উপর খুবই জটিল ও অনেকাংশে অজ্ঞাত এক প্রক্রিয়ার প্রভাব অনুভব করে। প্রক্রিয়াটির নাম -- অ্যাকসেলেরাশন। এই পরিভাষাটির মাধ্যমে আমরা শিশুদের ত্বরান্বিত মানসিক, শারীরিক বিকাশ বোঝাতে চাইছি।

অ্যাকসেলেরাশনের মধ্য দিয়ে অন্যান্য পরিবর্তনও সাধিত হয়, — যেমন, বাড়ার প্রক্রিয়ার গতিবৃদ্ধি ঘটে, পরিণতিপ্রাপ্তির বয়স নাগাদ দেহ পূর্বাপেক্ষা বৃহৎ আকার ধারণ করে।

বাইরের পরিবেশ সন্তোষজনক না হলে বাড় ও বিকাশের গতি মন্থর হয়। বাইরের পরিবেশ ভালো হলে প্রকৃতি বাড়, বিকাশ আর যৌন পরিণতির প্রক্রিয়াসমূহ ত্বরান্বিত করে।

আমরা বলি যে বয়ঃসন্ধি কালকে প্রায়ই ঝুঁকির বয়স বলে অভিহিত করা হয়। অ্যাকসেলেরশনের ব্যাপারটি সেই ঝুঁকির মাত্রা বৃদ্ধি করে। সেই জন্যই দ্রুত মানসিক ও শারীরিক বিকাশ প্রাপ্ত কিশোরদের মা-বাবাদের সর্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন — কিশোরের স্বাস্থ্য ও আত্মিক জগতের প্রতি তাঁদের অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত। এর যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে বয়স সম্পর্কিত দু'টি ধারণা বিদ্যমান: শিশুর কালানুক্রমিক (দলিলগত) বয়স এবং জীবতাত্ত্বিক বয়স, যা শিশুর প্রকৃত শারীরিক বিকাশ প্রদর্শন করে। অধিকাংশ দেশে জীবতাত্ত্বিক বয়স নির্ধারণের মানদণ্ড হচ্ছে তথাকথিত পঞ্জরগত বা অস্থিগত বয়স (তা নির্ণয় করা হয় গড়পড়তা বয়সগত ও যৌন নর্ম বা মানগুলোর সঙ্গে শিশুর অস্থি পঞ্জর শক্ত হওয়ার মাত্রা তুলনার মাধ্যমে)। শিশুদের একাংশের এই সমস্ত বয়সে মিল থাকে, তবে একই বয়সের অধিকাংশ শিশু জীবতাত্ত্বিক বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করে।

তরুণরা বাড়ার ব্যাপারে পিছিয়ে থাকলে এবং তরুণীরা খুব বেশি বেড়ে গেলে তা তাদের মনঃপ্রকৃতিকে আহত করে। দুঃখের বিষয় মা-বাবারা এমন ক্ষেত্রে সর্বদা সঠিক আচরণ করতে সক্ষম হন না।

আপনাদের ছেলে বা মেয়েকে তাদের বাড়ার বৈশিষ্ট্য যত বেশি চিন্তিত করে, তাদের এই সত্যটি বোঝাতে ততই বেশি চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা প্রয়োজন: খুব বেশি খাটো কিংবা অত্যধিক লম্বা চেহারা কোন খুঁত বলে বিবেচিত হতে পারে না এবং মানুষের দোষগুণ মাপা হয় সেণ্টিমিটার দিয়ে নয়। মা-বাবাদের একান্ত কর্তব্য হচ্ছে তরুণ কিংবা তরুণীর মনে তাদের উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় জাগানো, একমাত্র তাহলেই তারা সর্বাধিক পূর্ণরূপে তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও দক্ষতা কাজে লাগাতে পারবে।

এ সমস্তকিছু আরও বেশি আবশ্যকীয় এই জন্য যে চিকিৎসকদের হাতে আপাতত 'বাড় বর্ধক' কিংবা 'বাড়রোধী' কোন ওষুধ নেই। লোকে অনেক সময় হর্মোন্যাল হস্তক্ষেপের জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু তা অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার।

শরীরচর্চা আর খেলাধুলা চিরকাল বাড় ও বিকাশ প্রক্রিয়ার খুব ভালো সহায়ক হিশেবে গণ্য হয়ে আসছে। শরীরচর্চা আর খেলাধুলা শিশুর

গড়ন ঠিক করে, বাড়ার প্রক্রিয়ার গতি নির্ধারণ করে, শরীরের সমস্ত অনুপাত উন্নত করে, অনেকগুলো দৈহিক ব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপে সক্রিয়তা এনে দেয়।

তাই প্রত্যেক সুস্থ স্কুলছাত্র যাতে সপ্তাহে ২-৩ বার দেড়-দু' ঘণ্টা সময় খেলাধুলায় ব্যয় করে সেদিকে খেয়াল রাখা খুবই বাঞ্ছনীয়।

তবে আপনারা যদি নিজের সন্তানের পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী কোন ক্রীড়া বাছতে এবং চাপের মাত্রা নির্ধারণ করতে চান তাহলে আপনাদের ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত।

শিশুর বাড়ার সমস্ত পর্বে তার খাদ্য ও জীবনধারণের ব্যবস্থা যথাসম্ভব সঠিকভাবে সংগঠিত করা উচিত। তাতে প্রয়োজনীয় সমস্তকিছুই থাকতে হবে, এবং অতিরিক্ত কোনকিছু বর্জনীয়। মালী যেমন গাছের সেবাযত্ন করে এবং তাকে সোজা হয়ে সবচেয়ে ভালোভাবে বাড়তে সাহায্য করে, ঠিক তেমনি শিশুর জন্য সেরা পরিবেশ গড়ে দিয়ে (বিশেষত তার দ্রুত বাড়ার পর্বগুলোতে) আমরাও কোন-না-কোন ভাবে তার বংশযন্ত্রে লুক্কায়িত সম্ভাবনাসমূহের পূর্ণ প্রকাশ ঘটতে সহায়তা করতে পারি।

শিশুর খাদ্য প্রসঙ্গে

'শিশুর খাদ্য' কথাটির সঙ্গে জড়িত রয়েছে মা-বাবাদের হাজারো প্রশ্ন। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে — কী ধরনের আহার সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত? সংক্ষেপে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া মুশকিল। তবে সঠিক আহারের প্রধান নীতিটি হচ্ছে এরূপ: খাদ্যের সঙ্গে শিশু যেন তার দেহযন্ত্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত পদার্থ পেয়ে থাকে।

প্রধান 'নির্মাণ সামগ্রী' হচ্ছে প্রোটিন। খাদ্যে ওগুলোর অভাব থাকলে শিশুর শারীরিক বিকাশ ও বাড়ের গতি মন্থর হয়ে আসে, তার কর্মক্ষমতা ও রোগাক্রান্ত না হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়, দেহযন্ত্রের স্নায়বিক-মানসিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি মন্থর হয়ে যায়।

প্রোটিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জোগানদার হচ্ছে মাংস, মাছ, ডিম, দুধ, পনির, রুটি, আলু, শিম, ডাল ইত্যাদি। শিশুর খাদ্যে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত প্রোটিনের অর্ধেকটা হতে হবে পশুজাত। ৭ বছর অবধি বয়সের শিশুদের দিনে খাওয়া উচিত ৬০০ মিলিলিটার দুধ, আর স্কুলছাত্রদের খাওয়া উচিত অন্ততপক্ষে ৫০০ মিলিলিটার।

দেহযন্ত্রের প্রধান শক্তি সামগ্রী হচ্ছে চর্বি, কার্বোহাইড্রেট (কম মাত্রায়— প্রোটিন)। দেহযন্ত্রের বিভিন্ন ব্যবস্থার স্বাভাবিক কাজের জন্যও তা অপরিহার্য।

কার্বোহাইড্রেট থাকে উদ্ভিজ্জ খাদ্যে — চিনিতে, রুটিতে, শাকসবজিতে, ফলে...

ব্যবহার্য চর্বির এক-তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত উদ্ভিজ্জ, আর দুই-তৃতীয়াংশ — পশুজাত চর্বি।

মানুষের অল্প পরিমাণ ভিটামিন প্রয়োজন — মাত্র ১০০-১৫০ মিলিগ্রাম। কিন্তু তা ব্যতিরেকে বাঁচা অসম্ভব। ভিটামিন 'নির্মাণকার্য' এবং দেহযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের প্রক্রিয়াগুলো নিয়ন্ত্রণ করে, সংক্রমণের বিরুদ্ধে তার প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিনগুলো হচ্ছে: A, B_1, B_2, B_6, B_{12}, C, D, PP। দেহযন্ত্রে এগুলোর অভাব থাকলে স্কার্ভি, রাখিটিস, নিক্টালোপিয়া (রাত্রান্ধতা) ইত্যাদির মতো গুরুতর রোগ বিকাশ লাভ করে। ভিটামিনের উৎস হচ্ছে কেবল ফলমূল আর শাকসবজিই নয়, বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক খাদ্যদ্রব্যও।

দেহযন্ত্রের অস্থি আর কলা নির্মাণ ও গঠনে বৃহৎ এক ভূমিকা পালন করে খনিজ পদার্থগুলো। তা ফেরমেণ্টেশন প্রক্রিয়ায় ও দেহযন্ত্রের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য প্রক্রিয়ায়ও অংশগ্রহণ করে থাকে। খনিজ পদার্থগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে — পটাসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, আইওডিন, ফ্লুরাইন, কোবল্ট। এগুলোর প্রতিটি দেহযন্ত্রে নিজের বিশেষ বিশেষ 'কাজ' সম্পন্ন করে। বিভিন্ন ধরনের খনিজ লবণ থাকে মাংস, মাছ, যকৃৎ, মগজ, দুধ, ডিম, ছানা, পনির, সবজি, দানাশস্য, শিম জাতীয় শস্য, মাশরুম, বাদাম, চা ইত্যাদিতে।

মানুষের দেহযন্ত্রের ৬০ শতাংশ গঠিত জল থেকে। জল ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব। স্কুলছাত্রের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই-আড়াই লিটার তরল পদার্থ গ্রহণ করা উচিত।

শিশুর আহারে নির্দিষ্ট পরিমাণে ও বিন্যাসে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য অন্তর্ভুক্ত হওয়া চাই। চর্বি ও কার্বোহাইড্রেটের সঙ্গে প্রোটিনের সবচেয়ে অনুকূল অনুপাত হচ্ছে এরূপ — ১:৪:১। তবে প্রচুর শক্তিক্ষয়ের পর্বে (পরীক্ষার সময়, প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতির সময়) স্কুলছাত্রের আহারে তা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এরূপ বিন্যাসে — ১:৪·৫ (অথবা ৫):১।

'জ্বালানি' হিশেবে খাদ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় ক্যালোরিতে। ক্যালোরির আধিক্য দ্রুত ওজন বাড়ায় এবং এমনকি মেদবৃদ্ধি ঘটায়।

কিন্তু আপনারা বলবেন, শিশুদের বয়স তো বিভিন্ন এবং প্রত্যেক শিশুর রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। ঠিক কথা, তা অস্বীকার করা যায় না।

যুক্তিসিদ্ধ আহার — সে নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত ও সুচিন্তিত আহার। শিশুর খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করার সময় সর্বাগ্রে খেয়াল রাখা হয় শিশুর বয়সের দিকে, তার বাড়ের গতি ও ওজনের দিকে, চলন সক্রিয়তার দিকে, দেহযন্ত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যাবলির দিকে এবং অবশ্যই রুচির দিকে। এমনকি ঋতু ও জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য, জাতীয় ঐতিহ্য ইত্যাদির কথাও ভাবতে হয়।

শিশুর খাদ্য গ্রহণের সঠিক ব্যবস্থাটি কীভাবে সংগঠন করলে সবচেয়ে ভালো হয়?

দিনের বিভিন্ন সময়ে শিশুর দেহযন্ত্রের জন্য চাই বিভিন্ন খাদ্য। তা শারীরবিজ্ঞান দ্বারা সত্যাখ্যাত। সকালে ও দুপুরে শিশু সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। তখন তার প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য দরকার। স্নায়বিক সক্রিয়তা উদ্রেক ক'রে তা দেহযন্ত্রের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। নিদ্রা যাওয়ার আগে হালকা আহার প্রয়োজন, কেননা দেহযন্ত্রের উপর প্রোটিন আর চর্বির অত্যধিক চাপ পড়লে তা স্নায়ু ব্যবস্থাকে উত্তেজিত করে তুলবে, যার ফলে সময় মতো ঘুম আসবে না।

শিশুকে চার বার খাওয়ানো উচিত: সকালে, দুপুরে, বিকালে এবং রাত্রে। কম ক্ষুধাবশত যে-সমস্ত ছেলেমেয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাবার খায় না তাদের ৫-৬ বার খেতে দেওয়া যেতে পারে, তবে প্রতিবারই অল্প পরিমাণে। খাবারের ফাঁকে ফাঁকে তাদের অন্য কোন খাদ্য দেওয়া উচিত নয়।

প্রাক্‌স্কুলবয়স্ক ছেলেমেয়েদের সারা দিনে শক্তি ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় সমান, তাই তাদের জন্য খাদ্যের পরিমাণও কমবেশি সমানই হয়। সারা দিনে খাদ্যের মাধ্যমে তারা যে-ক্যালোরি পায় তার প্রায় ২৫ শতাংশ থাকে প্রাতরাশে, ৩০ শতাংশ — দুপুরের খাবারে, ২০ শতাংশ — বিকালের খাবারে আর ২৫ শতাংশ — রাত্রের খাবারে।

স্কুলছাত্রদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি একটু অন্য রকম: প্রথম প্রাতরাশে থাকে দিনের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ ক্যালোরির প্রায় ২৫ শতাংশ, দ্বিতীয় প্রাতরাশে — প্রায় ১৫ শতাংশ, দুপুরের খাবারে — ৩৫ শতাংশ, রাত্রের খাবারে — ২৫ শতাংশ।

যুক্তিসিদ্ধ ও নিয়মিত আহার কেবল শিশুর সঠিক বিকাশেই সহায়তা করে না, তার মানসিক ক্ষমতাকেও প্রভাবিত করে।

— আমার কিন্তু মনে হয়, সর্বাগ্রে অসুস্থ ছেলেমেয়েদেরই খাদ্য গ্রহণের নিয়মগুলো কঠোরভাবে মানা উচিত। যেমন ধরুন, সেই সমস্ত ছেলেমেয়ে যারা মেদবৃদ্ধিতে ও ক্ষুধামান্দ্যে ভুগছে।

— না, আপনার সঙ্গে মোটেই একমত নই। আহারের বিজ্ঞানসম্মত নিয়মাবলি উপেক্ষা ক'রে প্রথমে শিশুর স্বাস্থ্য ভেঙে দিয়ে পরে তা ওই সমস্ত নিয়মের সাহায্যে পুনরুদ্ধার করার পেছনে কোন যুক্তি নেই। মেদবৃদ্ধি ও ক্ষুধামান্দ্যের মূলে রয়েছে আহারের সাধারণ নিয়মাবলি লঙ্ঘন। মেদবৃদ্ধি ঘটে অতিভোজন আর কম চলাফেরার দরুন। শিশুকে জোর করে খাওয়ালে, ঘন ঘন আহারের নিয়ম ভঙ্গ করলে এবং সর্বদা একই রকমের খাবার দিলে প্রায়ই ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয়।

— তার মানে, কোন মাঝামাঝি উপায় অবলম্বন করাই সবচেয়ে ভালো?

— সবচেয়ে ভালো হয় যদি সর্বদা আহারের নিয়মাবলি মেনে চলা যায়। দেহযন্ত্রের 'ভাঙন' এড়ানো উচিত, তা মেরামত করার অপেক্ষায় থাকা উচিত নয়।

জন্মের পর থেকেই শিশুকে আহারের সময় ও নিয়ম মানতে শেখানো উচিত। তাহলে পরবর্তী কালে তা পরিণত হবে তার জীবনের নিয়মে এবং দেহযন্ত্রে গড়ে উঠবে, প্রখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী ইভান পাভলোভের ভাষায়, 'অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াসমূহের সুসংগঠিত ও সুস্থির এক ব্যবস্থা'।

তথাকথিত বয়ঃসন্ধি কাল পিতামাতাদের জন্য সব দিক থেকে অনেক ঝামেলা নিয়ে আসে। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কিশোরদের দেহযন্ত্রের পুনর্গঠন আর বাড়ার জটিল প্রক্রিয়াগুলো প্রবল মেটাবলিজম ডেকে আনে। আপনাদের লক্ষ্য রাখা উচিত, ওই সময় আহার যেন একই সঙ্গে সাধারণ ও সমৃদ্ধ হয়, খাদ্যের সঙ্গে যেন দেহযন্ত্রে প্রয়োজনীয় সমস্ত 'নির্মাণ সামগ্রী', 'জ্বালানি', ভিটামিন আর খনিজ লবণ প্রবেশ করে।

কোন কোন মা-বাবা অভিযোগ করেন যে তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিনা কারণে ক্ষুধা নষ্ট হয়ে গেছে।

আপনারা কি তখন নিজেদের ছেলেমেয়ের প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল? হয়তো না। তথাকথিত বয়ঃসন্ধি কালে বিভিন্ন আবেগপূর্ণ মর্মপীড়া প্রায়ই ক্ষুধামান্দ্যের কারণ হয়ে থাকে। তখন কিশোরের জীবনের যে-সমস্ত ঘটনা আপনার কাছে অতি সাধারণ ব্যাপার বলে মনে হয় তা-ই অনেক সময় তাকে দিশেহারা করে তুলে, এবং সে যখন-তখন খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দেয়। আর আপনারা তাকে ছোট শিশুর মতো জোর করে খাওয়ার টেবিলের কাছে

ধরে রাখেন এবং তদ্দ্বারা তার অসহায় অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলেন। কিন্তু আপনাদের তখন নিজের ছেলেমেয়েকে সাহায্য করা উচিত যাতে তাদের মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে উঠে। তাহলে ক্ষুধামান্দ্যেরও অবসান ঘটবে। ওই কঠিন সময়ে কিশোরের প্রতি, তার স্বাস্থ্য ও আহারের প্রতি আপনাদের বিশেষ যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন।

শিশুর স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য বলতে কী বোঝায়? এ সম্পর্কে এরূপ নিরুক্তি আছে: 'রোগমুক্ত অবস্থা', 'এমন অবস্থা যখন বিভিন্ন দৈহিক সূচক নির্ধারিত নিয়মাবলির সীমানা ছাড়িয়ে যায় না'। আর এর মানে হচ্ছে — স্বাভাবিক রক্তচাপ, রক্ত পরীক্ষার স্বাভাবিক ফল এবং আরও অসংখ্য 'স্বাভাবিক'।

প্রত্যেকেই জানে যে 'অনেক স্বাস্থ্য' ও 'কম স্বাস্থ্য' বলে দুটো কথা আছে। 'কম স্বাস্থ্যের' বৈশিষ্ট্য হচ্ছে — বাইরের সামান্য প্রভাব হেতুই অসুখ করে, এবং এর ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। তাই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও দেহযন্ত্রের 'মজুত শক্তি' থাকা চাই যা বাইরের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে স্বাস্থ্যকে রক্ষা করে অথবা স্বাভাবিক দৈহিক সূচকগুলোকে নির্ধারিত নিয়মের গন্ডির ভেতরে ধরে রাখে।

কীভাবে এই 'মজুত শক্তির' অধিকারী হওয়া যায়? কেবল চাপের মাধ্যমে, ব্যায়ামের মাধ্যমে, প্রয়াস ও বাধানিষেধের মাধ্যমে; কেবল মাংসপেশী, হৃদয়, ফুসফুস আর স্নায়ুর ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে।

এই ভাবে, 'অনেক স্বাস্থ্যের' অধিকারী হতে হলে, রোগমুক্ত থাকতে হলে — আর অসুখ করলেও তা যাতে গুরুতর না হয় — সর্বদা ব্যায়াম করা প্রয়োজন।

শরীরচর্চা ও খেলাধুলা কেবল দেহই গঠন করে না, চরিত্রও গড়ে তুলে। ভালো স্বাস্থ্যের উপকারিতার বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু ভালো স্বাস্থ্য আপনা থেকে আসে না। তার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। তার জন্য প্রয়োজন হয় চাপ ও বাধানিষেধ, মনোবল। বড়দের চেয়ে ছোটদের স্বাস্থ্য উন্নত ও রক্ষা করা অনেক সহজ। এটা খুবই সুখের বিষয়। শিশুর দেহযন্ত্রে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সক্রিয়তা টিকে থাকে এবং তা হচ্ছে তার বাড়ার অপরিহার্য উপাদান।

আগেই বলা হয়েছে যে স্বাস্থ্যের শর্ত হচ্ছে — সঠিক আহার, শারীরিক চাপ এবং পোড় খাওয়ানো। শিশুর খাদ্য সমৃদ্ধ হওয়া চাই এবং তা যেন তার বয়সোপযোগী হয়। পরিপাক নালীকে ধীরে ধীরে শক্ত খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত করানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিশুকে খেতে দেওয়া উচিত একমাত্র তখনই যখন তার ক্ষিধে পায়, এবং যে পরিমাণ খাবার সে তৃপ্তির সঙ্গে খায় তাকে ঠিক সেই পরিমাণ খাবারই দেবেন। তার পেটে সামান্য ক্ষিধে থেকে গেলেও ক্ষতি নেই। এ হচ্ছে প্রথম ক্ষুধা নিয়ন্ত্রক। দ্বিতীয় নিয়ন্ত্রক — শারীরিক সক্রিয়তা।

স্থূলতা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। সুস্থ শিশু সাধারণত কেবল ২-৩ বছর বয়স অবধিই মোটা থাকে, তারপর তার শীর্ণ হওয়া উচিত। শিশু যদি সুস্থ ও সজীব হয়ে থাকে তাহলে শীর্ণতাকে ভয় করার কোন কারণ নেই। আরও একটি উপদেশ: খাদ্যের রকম বৃদ্ধি করা উচিত — এবং তা সর্বদাই বাঞ্ছনীয় — ধীরে ধীরে: প্রথমে পরীক্ষার জন্য সামান্য পরিমাণ, পরের দিন ঠিক সেই পরিমাণ, এর পরে একটু বেশি। তা খুবই সতর্কতার সঙ্গে করা উচিত। ধীরতা — এরূপেই হচ্ছে তালিমের সাধারণ নিয়ম, এবং তা অন্ত্রের সঙ্গেও সম্পর্কিত।

শিশুকে সঠিকভাবে খাওয়ানো হচ্ছে কি না তা বোঝার উপায় হচ্ছে — ওজন এবং চামড়ার ভাঁজের স্থূলতা। শিশুর ওজন বাড়া প্রয়োজন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাকে মোটা হতে দেওয়া উচিত নয়। তবে এ হচ্ছে আহারের কেবল বাহ্যিক ফল, এবং তা সর্বপ্রধান ফল নয়। আসলে যা দরকার তা হল — সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঠিক বিকাশের সম্ভাবনা গড়ে তোলা। এর জন্য ততটা ক্যালোরি প্রয়োজনীয় নয়, যতটা ভিটামিন এবং বিভিন্ন ধরনের মাইক্রো উপাদান। তা পাওয়া সম্ভব কেবল বহু রকমের কাঁচা উদ্ভিজ্জ খাদ্যে।

শিশুর স্বাস্থ্যের উপর ব্যায়াম আর পোড় খাওয়ানোর হিতকর প্রভাবের মূল্য নির্ধারণ করা কঠিন। শিশুকে পোড় খাওয়ানোর বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, যেমন ভেজা গামছা দিয়ে গা মোছা, মর্দন, গায়ে জল ঢালা, ঠান্ডা ও গরম জলে স্নান। তবে সবচেয়ে সাধারণ যে-কথাটি মনে রাখা উচিত তা হল: রোগের উৎস হিশেবে ঠান্ডাকে ভয় করতে নেই। সর্দিকাশি হয় জীবাণু থেকে, ঠান্ডা থেকে নয়। ঠান্ডা লাগার কুফল পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করা যায় না, তবে সর্দিকাশির মতো রোগগুলো হয় সংক্রমণের বিরুদ্ধে দেহযন্ত্রের প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পেলে। সেটাই সর্দিকাশি হওয়ার

প্রধান কারণ। আরও একটা জিনিস মনে রাখা দরকার: চলাফেরা করলে কারো ঠান্ডা লাগতে পারে না। সুতরাং সেই অনুসারে পোশাকও পরা প্রয়োজন: পোশাক যেন চলাফেরা করতে বাধা না দেয়। বিশেষ করে এ কথাটি খাটে শিশুদের বেলা। যদি কোন কারণে চুপ করে এক জায়গায় বসে থাকার প্রয়োজন থাকে একমাত্র তাহলেই বেশি কাপড়চোপড় পরা উচিত।

কিন্তু তবুও কীভাবে শিশুদের রোগের হাত থেকে রক্ষা করা যায়?

পুরোপুরিভাবে রক্ষা করা অসম্ভব, এবং সর্বাগ্রে তা এই জন্য — আমাদের চারিপাশে অসংখ্য জীবাণু রয়েছে। তা বিভিন্ন ধরনের। রক্ষা আছে, কিন্তু অনাক্রম্যতা গড়ে উঠার আগে ১-২-৩ সপ্তাহ ভোগা দরকার। এরূপ রোগ সুস্থ শিশুর পক্ষে — তা-ও আবার আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুগে — বিপজ্জনক নয়। এমনকি কোনরূপ চিকিৎসা ব্যতিরেকেই দেহযন্ত্র তা সামলাতে সক্ষম — এবং বাস্তব ক্ষেত্রে ঠিক তা-ই ঘটে থাকে।

দেহযন্ত্রের শক্তিতে বিশ্বাস করা উচিত। রোগকে ভয় করতে নেই। বিনা প্রয়োজনে ঔষুধপত্র গ্রহণ করা অনুচিত। সঠিক আহার, শরীরচর্চা ও পোড় খাওয়ানো সর্বাগ্রে আমাদের সংক্রমণ বিরোধী ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে তুলে। শরীরচর্চার মাধ্যমে কার্ডিওভ্যাসকুলার ও শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যবস্থার ভালো ট্রেনিং হচ্ছে অতিরিক্ত এক গ্যারাণ্টি। পরিমিত ও বিচিত্র আহার খাদ্য হজম নালীকে রক্ষা করে এবং সঠিক মেটাবলিজম বজায় রাখে। আরও একটি নিয়ম মনে রাখা উচিত: স্বাস্থ্যবান হওয়ার জন্য সুখী হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরূপই হচ্ছে সরাসরি ও বিপরীত যোগাযোগের নিয়ম। মনস্তাত্ত্বিক চাপ, অপ্রীতিকর ব্যাপার ও দুঃখ ছোট বড় সবার স্বাস্থ্যের পক্ষেই সমান ক্ষতিকর।

শিশুর ভালো মানসিক অবস্থার জন্য তার মধ্যে সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশার চাহিদা উদ্রেক করা প্রয়োজন। বিশেষ করে পরিবারে একটি সন্তান থাকলে তা করা খুবই দরকার। বড়রা সব সময় শিশুর সঙ্গী হতে পারে না। সারা দিন না হলেও অন্তত কয়েক ঘণ্টা এরূপ মেলামেশার প্রয়োজন আছে। তবে স্বনির্ভরভাবে ভাবতে ও কাজ করতে শেখার জন্য একাকীত্বও প্রয়োজনীয়। মেলামেশা আর একাকীত্বের পরিমাণ নির্ধারিত হয় জন্মসূত্রে শিশু কতটা মিশুক প্রকৃতির তার দ্বারা।

মেজাজের কথা বিবেচনা করে

'আমাদের তিন সন্তান। বড় ছেলেটি প্রাণোচ্ছল ও শান্ত। ছোট দু'জন যমজ, পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। একটি একবারে চুপচাপ থাকে, ভীতু এবং এত বাধ্য যে সময় সময় এমনকি তার জন্য — বিশ্বাস করুন — দুঃখ হয়। কিন্তু অন্যটি ডানপিটে, ও-রকম ছেলে কেউ কখনও দেখে নি। বাড়িতে-স্কুলে সে সবাইকে জ্বালাচ্ছে। এর কারণ কী? লোকে বলে যে সমস্তকিছুই নির্ভর করে পালনের উপর। খারাপ ছেলেমেয়ে নাকি হয় না — হয় কেবল খারাপ পালক। কিন্তু এখানে তিন ছেলে বাস করছে সমান পরিবেশে, এক পরিবারে, সমানভাবে শিক্ষাদীক্ষা পাচ্ছে। অথচ অবশেষে দেখা যাচ্ছে তারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অনিচ্ছাকৃতভাবেই ভাবতে শুরু করি যে সমস্তকিছুই ওদের 'রক্তের ব্যাপার'।'

এক পরিবারের তিন সন্তানের মধ্যে মোটেই কোন মিল নেই, এমনকি তাদের চরিত্র, আগ্রহ ও আচরণ সম্পূর্ণ বিপরীত। সত্যিই ভাববার কথা। কী এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে: লালনপালন কিংবা 'রক্তের ব্যাপার', অর্থাৎ জন্মগত অনুভূতি? এরূপ জন্মগত বৈশিষ্ট্য সত্যিই আছে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ছোট করে দেখাটাই হচ্ছে শিশুদের প্রতি 'সমান' মনোভাব পোষণের কারণ।

অনভিজ্ঞ এক ফুলচাষীর কথা কল্পনা করা যাক। সে সবচেয়ে ভালো জাতের ফুল ফোটানোর ইচ্ছায় সমস্ত গাছে প্রচুর জল ও সার দেয়, ওগুলোর সমান সেবাযত্ন করে। কিন্তু সে যখন বাঞ্ছিত ফল পাবে না তখন তার বিস্ময় আর হতাশার অন্ত থাকবে না। এই ভাবে সে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ফুল চাষের বিদ্যা রপ্ত করতে গিয়ে বুঝবে যে কোন কোন গাছ প্রচুর পরিমাণ জল ভালোবাসে, কোন কোন গাছ 'পরিমিত আহার' পছন্দ করে, কোন কোন গাছ ছায়ায় লুকিয়ে থাকে এবং কেবল অস্তগামী সূর্যের আলোক ভালোবাসে, আর কোন কোন গাছ মোটেই নিঃসঙ্গতা সহ্য করে না এবং ভালো বাড়ে কেবল তার স্বজাতিদের সঙ্গে।

কিছু মা-বাবার ক্ষেত্রে ঠিক অনুরূপ ব্যাপারই ঘটে থাকে। তাঁরা ভাবেন যে সব শিশুর বেলায়ই লালনপালনের অভিন্ন এক পদ্ধতি চলতে পারে এবং সেই অনুসারে তাঁরা বাঁধাধরা নিয়ম মেনে ছেলেমেয়েদের মানুষ করেন।

আমরা ভালোই জানি যে শিশু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এমন সব

দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে যা সমস্ত মানুষের আছে এবং যা পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে প্রসার লাভ করে। এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, কেননা অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর ব্যবস্থাদির ক্রিয়াকলাপে রয়েছে বিবর্তন প্রক্রিয়ার সেই সমস্ত ফল যা উত্তরপুরুষের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়।

কিন্তু সেই সঙ্গে প্রকৃতি মাতা বৈচিত্র্য সৃষ্টিতেও প্রয়াসী এবং তাই সে মৌলিক ও অদ্বিতীয় সব নমুনা গড়ার উদ্দেশ্যে রঙ ব্যয়ে কুণ্ঠিত হয় না। যেমন ধরুন মানুষের চেহারা, তার দেহের গড়ন, তার কণ্ঠস্বরের বৈশিষ্ট্য, হাতের আকার। এ সমস্তকিছুই জন্মগত বৈশিষ্ট্য যা শিশুদের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে সহায়তা করে, তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা ফুটিয়ে তুলে।

আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শিশুর মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য, তার স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপের বৈশিষ্ট্য। প্রাপ্ত তথ্যাদির দ্রুত নির্ভুল প্রসেসিং মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণে মস্তিষ্ককে সাহায্য করে। যদিও সমস্ত মানুষের মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ সমান, তা কিন্তু চলে বিভিন্নভাবে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য — উত্তেজক ও প্রতিবন্ধক প্রক্রিয়াসমূহের অনুপাত, ওগুলোর দ্রুততা ও শক্তি — অধ্যয়নের মাধ্যমে জন্মসূত্রে মানুষের চারটি প্রধান ধরনের স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপ, চার রকমের মেজাজ আবিষ্কার করা গেছে। পরিবেশের প্রভাবে পরে অবশ্য মেজাজ বদলাতে পারে, তবে একেবারে ছোটবেলা শিশুর আচরণে তা স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয় এবং মা-বাবাদের, লালনপালনকারীদের সে দিকে অবশ্যই নজর দেওয়া উচিত।

ঘর-পালানো এক ছেলের বাপের সঙ্গে এক অপ্রীতিকর আলাপের কথা মনে পড়ছে।

...ইগর ছিল ফুর্তিবাজ, ভীষণ চঞ্চল ছেলে। বাবা তাঁর শৈশবের কথা স্মরণ ক'রে (তাঁকে মানুষ করা হয় কঠোরতার মধ্যে) নিজের সন্তানকেও কঠোরতার মধ্যে মানুষ করতে চাইলেন। কিন্তু অতি অল্প বয়সেই ছেলেটির মধ্যে অদম্য অটলতা দেখা দেয়। যেমন, ঘরের ভেতরে ছোটাছুটি করতে তাকে বারণ করা সম্ভব ছিল না। চড় খেয়ে ইগর মুহূর্তের মধ্যে শান্ত হয়ে যেত, কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরেই সে আবার দুরন্তপনা শুরু করত। ছেলেটির জুতো খুলে নিয়ে তাকে বিছানায় বসিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু তাতেও সে নিরুৎসাহ হত না। সে মহা আনন্দে বিছানায় ডিগবাজী খেত, বালিশ, কম্বল, চাদর চারিদিকে ছুঁড়ে ফেলত। কেবল একটি জিনিস সে

সইতে পারত না এবং মারপিটের চেয়েও তাকে বেশি ভয় করত — সে হল ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকা। বাবা ভাবলেন যে তিনি শাস্তি দেওয়ার ভালো একটি উপায় খুঁজে পেলেন এবং প্রতিটি 'উপযুক্ত' মুহূর্তে তিনি সেই উপায়েরই আশ্রয় নিতেন।

ছেলেটি যখন কিশোর হল তখনও বাধানিষেধের অবসান ঘটল না। 'স্বেচ্ছাচারিতার' জন্য সাজা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বনে, নদীতে, সিনেমায় যেতে দেওয়া হত না। আর একবার ইগর যখন তার সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে দু'দিনের এক অভিযানে যেতে চাইল, বাবা তাকে বাড়িতে বন্ধ করে রেখে দিলেন। ইগর তিন তলা থেকে পাইপ বেয়ে নিচে নামল এবং চিরদিনের মতো শহর ত্যাগ করে চলে গেল। সে বাড়ি থেকে পালাল, এবং প্যলাল অদম্য মেজাজ আর অফুরন্ত কল্পনার বশবর্তী হয়ে।

এই ঘটনার কথা শুনে বোঝা যায় যে ছেলেটির ছিল অতি উত্তেজনশীল স্নায়ু ব্যবস্থা (কলেরিক টেম্পেরামেণ্ট বা মেজাজ)। যে-সমস্ত শিশু এরূপ মেজাজের অধিকারী তারা সাধারণত চঞ্চল ও লড়িয়ে হয়ে থাকে এবং দ্রুত ও সহজে উত্তেজিত হয়ে উঠে। তারা খুবই চটপটে ও আবেগপ্রবণ, তারা সহজে নিজেদের বাসনা দমন করতে ও পরিকল্পিত কাজ ত্যাগ করতে পারে না। যখনই স্থায়ী বাধানিষেধের সাহায্যে এরূপ শিশুদের সক্রিয়তা দমন করার চেষ্টা করা হয়, তখনই শিশুর স্নায়বিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের উপযোগী স্বাভাবিক চাহিদাসমূহ এবং 'লক্ষ্মী' ছেলের কীভাবে চলতে হয় সে সম্পর্কে মা-বাবার ধারণার মধ্যে আপোসহীন বিরোধ দেখা দেয়। যে-সমস্ত শিশুর এরূপ মেজাজ আছে তাদের পক্ষে যথেষ্ট শারীরিক চাপ (অবশ্য দুর্বল স্বাস্থ্য যদি তার পথে কোন বাধা না হয়), ছোটাছুটি ও খেলাধুলা খুবই প্রয়োজনীয়। তাহলেই তারা তাদের অসামান্য শক্তি ব্যয় করতে পারবে এবং তদ্দ্বারা অধিকতর স্থির ও শান্ত হয়ে উঠবে। এরূপ ছেলেমেয়েরা — যদিও তারা সহজে উত্তেজিত হয়ে উঠে — বিশেষ কোন মানসিক জখম ব্যতিরেকেই মৌখিক দণ্ড ও তিরস্কার সইতে পারে। তবে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হলে ('ঘরের কোণে গিয়ে দাঁড়া', 'কোথাও বেরোতে পারবি না') শিশুরা খুবই যন্ত্রণা ভোগ করে।

যে-সমস্ত ছেলেমেয়ে অতি স্থির স্নায়ু ব্যবস্থার (স্যাঙ্গুইন টেম্পেরামেণ্ট) অধিকারী তারা কম চটপটে হয়। তবে তারা সাধারণত প্রাণোচ্ছল, ফুর্তিবাজ, উদ্যমী ও অক্লান্ত মেহনতী হয়ে থাকে। ক্বচিৎ তাদের মন খারাপ হয়।

তারা সাগ্রহে ও তাড়াতাড়ি খেলাধূলায় মত্ত হতে পারে, যথেষ্ট অধ্যবসায়ী এবং সহজে বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে। কান্নাকাটি এবং আবেগোচ্ছ্বাস ছাড়াই তারা সর্বপ্রকার শাস্তি ভোগ করে।

যে-শিশুরা এদের চেয়েও অধিকতর শান্ত তাদের আচরণে থাকে সংযমী ভাব এবং স্পষ্টরূপে প্রকাশিত বাহ্যিক মন্থরতা। এরা ফ্লেগম্যাটিক টেম্পেরামেণ্ট বা নির্বিকার মেজাজের অধিকারী। এই শিশুরা অধ্যবসায়ী, খুবই কর্মক্ষম, কিন্তু সমস্তকিছুই করে অত্যন্ত ধীরে ধীরে। অন্যান্য শিশুদের ভিড়ের মধ্যে শান্ত স্বভাব ও 'গাম্ভীর্যের' জন্য এদের সহজেই চেনা যায়। এই ধরনের শিশুদের অনেক সময় সক্রিয় করে তুলতে হয়, বিভিন্ন কাজের প্রতি তাদের মধ্যে আগ্রহ বিকশিত করতে হয়। তবে তারা একবার যে অভ্যাস রপ্ত করে তা শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে উঠে এবং সুদীর্ঘ বছর টিকে থাকে। ঠিক সেই কারণেই এদের জীবনধারণের নিয়ম, অভ্যাস ও অনুরাগের ব্যাপারে খুঁটিনাটি সমস্তকিছুই মা-বাবাদের ভালোভাবে ভাবা দরকার। ফ্লেগম্যাটিক টেম্পেরামেণ্ট যুক্ত ছেলেমেয়েদের পুনর্শিক্ষিত করা — সে মা-বাবা আর সন্তান উভয় পক্ষের জন্যই কঠিন কাজ। এরূপ শিশুদের পক্ষে শরীরচর্চা খুবই উপকারী, কেননা তাতে তাদের প্রাকৃতিক সক্রিয়তার অভাব অনেকটা পূরণ হয়ে যায়।

দুর্বল স্নায়ু ব্যবস্থার (মেলানকোলিক টেম্পেরামেণ্ট) অধিকারী শিশুদের বেলা বিশেষ বিবেচনাশীল ও সতর্ক হতে হয়। অত্যধিক উত্তেজনশীলতা, বদমেজাজ, কাঁদুনে স্বভাব ও উচ্চ সংবেদনশীলতা অনেক সময় বেঠিক লালনপালনের জন্য আরও বেশি জটিল আকার ধারণ করে এবং তার ফলে নিউরোসিস দেখা দিতে পারে। এই ধরনের শিশুরা প্রায়ই নিশ্চেষ্ট, ভীরু ও লাজুক হয়; তারা কমবেশি প্রবল স্নায়বিক চাপ সইতে অক্ষম। এদের যত বেশি সম্ভব শিশুদের দলীয় খেলাধুলায় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন, উদ্যোগ ও আত্মনির্ভরতা প্রকাশের সামান্যতম প্রয়াসও সমর্থন করা উচিত, সমস্ত ব্যাপারে তাদের অনুপ্রেরণা দেওয়া চাই। ব্যায়াম ও হাইড্রোথেরাপিউটিক প্রসিজিউর এরূপ শিশুদের জন্য অপরিহার্য, কেননা তা তাদের মজবুত করে তুলে, তাদের স্নায়ু ব্যবস্থা দৃঢ় করে এবং দেহযন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি করে।

অন্যান্য ধরনের মেজাজের অধিকারী ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও শরীরচর্চা, বলাই বাহুল্য, অনুরূপ ভূমিকাই পালন করে থাকে, তবে যে-সমস্ত শিশুর

স্নায়ু ব্যবস্থা দুর্বল, জীবনযাত্রার সঠিক রুটিনে অভ্যস্ত হতে তাদের অনেক বেশি অসুবিধা হয়, এবং তারা সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে, কেননা তা তাদের কাছে কষ্টকর ব্যাপার বলে মনে হয়। এমতাবস্থায় সঠিক পদ্ধতি, লালনপালনের যুক্তিসঙ্গত ও সুবিবেচিত ব্যবস্থাই কেবল সুফল দিতে পারে।

শিশুর স্নায়ু ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যাবলি বোঝা এবং লালনপালনের সেরা উপায় খুঁজে পাওয়া — সে কাজটি খুবই জটিল। তার জন্য চাই আন্তরিক সংবেদনশীলতা ও বিচারবিবেচনার ক্ষমতা। তবে সন্তান লালনপালনের কাজে যেকোন প্রয়াসই সার্থক প্রতিপন্ন হয়।

দক্ষতার কথা স্মরণ রেখে

দক্ষতা বলতে কী বোঝায়? দক্ষ কিংবা অদক্ষ লোকে। এ ব্যাপারটি সর্বদা আমাদের কত চিন্তিত করে! মা-বাবারা প্রায়ই উদ্বেগ প্রকাশ করেন: 'অঙ্কে আমার আন্দ্রেইয়ের একদম মাথা নেই, অথচ আমার খুব ইচ্ছা সে যেন বাপেরই মতো ইঞ্জিনিয়র হয়।' ছেলেমেয়েরাও — বিশেষত উচ্চ শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা — দক্ষতা সম্পর্কে বলাবলি করতে ভালোবাসে। তাদের জন্য এ ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ: জীবনে কোন পথ বেছে নেওয়ার আগে তাদের সঠিকভাবে নির্ধারণ করা চাই নিজস্ব দক্ষতা, ভবিষ্যতের পেশাগত কর্তব্যসমূহের সঙ্গে আপন শক্তির সঙ্গতি থাকা চাই।

তবে সর্বাগ্রে জানা চাই দক্ষতা জিনিসটি কী। অন্যথায় দক্ষতার বিষয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ আলাপই শুরু করা যায় না। তা আরও বেশি প্রয়োজনীয় এই জন্য যে এত সহজে ব্যবহৃত 'দক্ষতা' কথাটি কেবল প্রথম দৃষ্টিতেই এত সাধারণ ও সুস্পষ্ট বলে মনে হয়।

প্রথমেই বলে রাখি যে দক্ষতা ও জ্ঞান, দক্ষতা ও নিপুণতা এক জিনিস নয়, তবে তা পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু এ ব্যাপারটি কি এতই গুরুত্বপূর্ণ? যদি আমরা মেনে নিই যে দক্ষতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হচ্ছে অভিন্ন জিনিস, তাহলে স্কুলের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরই হবে আপনাদের ছেলে বা মেয়ের দক্ষতার প্রতি চূড়ান্ত এক রায় যার বিরুদ্ধে আপীল করা চলবে না। এমনও ঘটনার কথা জানা আছে যখন লোকে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অজ্ঞতা হেতু জ্ঞান ও দক্ষতাকে সমপর্যায়ে স্থাপন ক'রে গুরুতর —

সময় সময় এমনকি মর্মান্তিক ভুল করেছে। তবে অনেক সময় সে ভুল মজাদারও হয়েছে। যেমন, রুশ শিল্পী ভাসিলি সুরিকভের কথাই ধরা যাক। তরুণ বয়সে তাঁকে শিল্প আকাদমিতে ভর্তি করা হয় নি। আকাদমির ইনস্পেক্টর সুরিকভের আঁকা ছবি দেখে ঘোষণা করেন: 'এ ধরনের ছবির জন্য এমনকি আকাদমির পাশ দিয়েও আপনার যাওয়া-আসা নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত।' মহান শিল্পী সহজেই প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও নৈপুণ্য অর্জন করে অচিরেই নিজের কাজের দ্বারা ওই মতটি খণ্ডন করে দেন।

দক্ষতার বিষয়ে বলতে গিয়ে আমরা 'সম্ভাবনা' ও 'বাস্তবতার' মতো দার্শনিক ধারণাগুলোর আশ্রয় নিই। মানুষের দক্ষতা — এ হচ্ছে জ্ঞান ও নৈপুণ্য অর্জনের জন্য সম্ভাবনা মাত্র। তবে এই সমস্ত জ্ঞান ও নৈপুণ্য অর্জিত হবে কি হবে না, সম্ভাবনা বাস্তবতায় পরিণত হবে কি না তা নির্ভর করে অনেকগুলো ব্যাপারের উপর: যেমন, এই সমস্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রয়োজনে লাগবে কি না তার উপর, তার চারিপাশের লোকেরা (পরিবার, স্কুল, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি) কি চায় যে সে এই সমস্ত জ্ঞান ও নৈপুণ্য রপ্ত করুক তার উপর, তাকে কীভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে তার উপর।

দক্ষতা — এ হচ্ছে সম্ভাবনা, আর কোন কাজে অর্জিত নৈপুণ্য — এ হচ্ছে বাস্তবতা। শিশুর মধ্যে আবিষ্কৃত সাঙ্গীতিক দক্ষতা কিছুতেই এই নিশ্চয়তা দেয় না যে শিশু ভবিষ্যতে সঙ্গীত শিল্পী হবে। সঙ্গীত শিল্পী হতে হলে বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন, বাদ্যযন্ত্র, স্বরলিপি, বিপুল ধৈর্য ও সহনশীলতা, অবসর সময়, ভালো স্বাস্থ্য ও অন্যান্য অনেককিছু প্রয়োজন। এগুলো ব্যতিরেকে দক্ষতা বিকাশ লাভ করতে পারে না।

দক্ষতা আবিষ্কৃত হয় কেবল ক্রিয়াকলাপে এবং একমাত্র এরূপ ক্রিয়াকলাপে যা এই দক্ষতা বর্তমান না থাকলে সম্পাদিত হতে পারে না। কাউকে কখনও ছবি আঁকা না শিখিয়েই বলা যায় না যে তার চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা আছে। চিত্রাঙ্কন ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে বিশেষ শিক্ষালাভের প্রক্রিয়ায়ই কেবল জানা যেতে পারে শিক্ষার্থীর কোন দক্ষতা আছে কি না। সে কতটা তাড়াতাড়ি ও সহজে কাজের পদ্ধতি এবং রঙের সম্পর্ক আয়ত্ত করে তাতেই সমস্তকিছু বোঝা যায়।

নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপে প্রকাশিত হয়ে দক্ষতা তাতেই গঠিত ও বিকশিত হয়। অক্লান্ত ট্রেনিং অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ক্রীড়া দক্ষতাও বিকশিত করতে পারে। এমন বহু ঘটনার কথা জানা আছে যখন শৈশবে মানুষের দক্ষতা চারিপাশের

লোকজনের কাছে কোন স্বীকৃতি লাভ করে নি, কিন্তু পরবর্তী কালে তা তাকে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

— লোকে যা-ই বলুক না কেন, শিশুর যদি জন্মগত প্রতিভা না থাকে তাহলে শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে কখনও বিটোফেন, নিউটন বা গালিনা উলানোভা হতে পারবে না।

— সত্যি, জন্মগত প্রবণতার ভূমিকা কেউ-ই অস্বীকার করে না। কিন্তু অনুকূল পরিবেশ ছাড়া, ওই সমস্ত প্রবণতার বিকাশ ব্যতিরেকে তা স্রেফ প্রবণতাই থেকে যাবে। যদি অটলভাবে শিশুর দক্ষতা বিকশিত করা যায়, তার মধ্যে দৃঢ়তা ও শ্রমশীলতা গড়া যায় তাহলে সে তার প্রতিভার আকার ও আয়তন নির্বিশেষে প্রকৃত সৃজনশীল ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারবে।

— তার মানে, ব্যাপারটি আসলে প্রকৃতি প্রদত্ত প্রতিভায়?

— না, ঠিক তা-ও নয়। সামাজিক পরিবেশ গঠিত অনুকূল শর্তাদি — এ-ই হচ্ছে চূড়ান্ত ফ্যাক্টর। তৎকালীন রাশিয়ায় ভূমিদাস কৃষকদের মধ্যে কত প্রতিভাবান ছেলেমেয়ে ছিল? অসংখ্য। কিন্তু কেবলমাত্র কয়েক জনই শ্রেণীগত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে পেরেছিল।

— তাহলে আপনি বলতে চান যে সমস্তকিছুই নির্ভর করে শিক্ষাদীক্ষার পরিবেশের উপর?

— না, মোটেই না। প্রতিভা স্ফুরণে জন্মগত প্রবণতা এবং সামাজিক পরিবেশ উভয়ই সমান ভূমিকা পালন করে থাকে।

এমনকি যদি প্রতিভা না-ও থাকে। এমন কথা বলা যায় না যে প্রতিভাবান শিশু কোটিকে গুটিক। এরূপ শিশুদের আবিষ্কার ও তাদের দক্ষতা বিকাশ করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে বিভিন্ন ব্যবস্থাদি গৃহীত হচ্ছে। প্রতি মাসে, প্রতি বছর যে-সমস্ত শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতা, নৃত্যগীত প্রতিযোগিতা, শিল্পকলা প্রতিযোগিতা আর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়ে থাকে তাতে শত সহস্র প্রতিভাবান স্কুলছাত্র ও স্কুলছাত্রীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বিভিন্ন ক্লাবে, সমিতিতে ও নৃত্যগীত দলে এরূপ ছেলেমেয়েরা তাদের প্রিয় কাজে মনোনিবেশ করার সুযোগ পায়।

তাহলে এ থেকে কি এটা বলা চলে যে প্রতিটি শিশুই হচ্ছে এক-একটি প্রতিভা? তা হোক সম্ভাব্য, লুক্কায়িত, অপ্রকাশিত প্রতিভা, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিভা তো। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়, কারণ সরাসরি 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' কোনকিছু একটা বলে দিলে তা ছেলেমেয়েদের, তাদের মা-বাবাদের এবং সব শেষে আমাদের সবার ক্ষতি করতে পারে।

স্পষ্ট 'হ্যাঁ' বলার পেছনে কীরূপ বিপদ থাকতে পারে?

মেধা, প্রতিভা — সে হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে মানুষের গুণাবলির অতি জটিল এক সমাহার। আমরা যখন বলি যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সৃজনমূলক ক্রিয়াকলাপের যেকোন ক্ষেত্রে প্রতিভা আবিষ্কার করা যায় না, তখন আমরা এটা বোঝাতে চাই না যে প্রত্যেক মানুষকে যেকোন কাজ শেখানো যায় না (পিয়ানো বাজানো, ছবি আঁকা, কবিতা লেখা ইত্যাদি) এবং সেই সমস্ত দক্ষতা বিকশিত করা যায় না যা ব্যতিরেকে এই কাজ সম্পাদন করা অসম্ভব। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের গবেষণা কার্যে এরূপ ধ্যানধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে এক বা এমনকি ততোধিক দক্ষতা গঠন থেকে প্রতিভা গঠন অবধি দূরত্ব অনেক। এ সমস্যা সমাধানের সময় প্রতিভার গুণগত স্বকীয়তার কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন, — এই স্বকীয়তা স্রেফ বিভিন্ন দক্ষতার সমষ্টি নয়।

তাই প্রত্যেক শিশু প্রতিভাবান কি না এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমরা সরাসরি 'হ্যাঁ' বলতে পারি না। তবে 'না-ও' বলব না।

'প্রত্যেক শিশুই প্রতিভাবান' — আমরা এরূপ কথার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলতে পারি না, যদি তা এভাবে বুঝতে হয়: প্রত্যেক শিশু সঠিকভাবে তার প্রবণতা নির্ধারিত হলে এবং তার দক্ষতার বিকাশ ঘটলে মানুষের ক্রিয়াকলাপের এক বা ততোধিক ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিভা আবিষ্কার করতে পারে।

অন্য কথায়, আমরা তখনই 'হ্যাঁ' বলি যখন বিচিত্র ক্ষেত্রে — এবং কখনও কখনও শিশু ও তার মা-বাবার পক্ষে অতি অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্রগুলোতে — প্রতিভা বিকশিত হওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা থাকে। তার প্রবণতা খোদই সে-সমস্ত ক্ষেত্র খুঁজে বার করে। আমরা 'না' বলি, যখন প্রতিভা বিকশিত হয় সংকীর্ণ পথ ধরে, যে-পথ শিশুকে 'সযত্নে' বেছে দেন তার গুরুজনেরা। তাঁরা ও-কাজ করেন বিভিন্ন আত্মমুখী চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে।

কেবল অল্প সংখ্যক ছেলেমেয়ের প্রতিভাই বাইরে আত্মপ্রকাশ করে — তা সময় মতো দেখতে হয় এবং বিশেষভাবে বিকশিত করতে হয়। তা করতে গিয়ে তরুণদের উপর তাদের পক্ষে জীবনের একমাত্র সম্ভাব্য পথ সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত, বরং তাদের নিজেদের ওই পথটি খুঁজে বার করতে এবং নির্বাচিত পথে দৃঢ় পদক্ষেপে যাত্রা করতে

সাহায্য করা উচিত। মা-বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের আশা আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও যদি দেখা যায় যে ছেলেটি বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ বা সুরকার হতে পারছে না তাহলে পীড়াপীড়ি করে লাভ নেই। পেশা কি আর কম আছে — সে হয়তো একজন প্রতিভাবান ইঞ্জিনিয়র বা চমৎকার শিক্ষাবিদ হতে পারবে।

কিন্তু কীভাবে মানুষের দক্ষতা আবিষ্কার করা যায় এবং আবিষ্কার ক'রে কীভাবে তা বিকশিত করা যায়? এ প্রশ্নটি পরিবারে এবং স্কুলে সবাইকে চিন্তিত করছে, তবে কেউ-ই মনে করে না যে কাজটি সহজসাধ্য।

কর্মক্ষমতা। মনস্তত্ত্ববিদদের গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে প্রতিভাবান ছেলেমেয়েদের সৃজনমূলক ক্রিয়াকলাপের পূর্বশর্ত ও ফল হচ্ছে অক্লান্ত শ্রমের দিকে তাদের অটল ও অদম্য প্রবণতা। বাদবাকী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাদের পার্থক্যটি সর্বাগ্রে এখানে, যদিও বলাই বাহুল্য কেবলমাত্র এখানেই নয়। সম্ভবত এরূপ একটি অনুমান যুক্তিসঙ্গত হবে: যে-সমস্ত ছেলেমেয়ে অপরের কাছে — এবং এমনকি নিজেদের কাছেও — প্রতিভাহীন বলে গণ্য হয়, শ্রমশীলতা বা অধ্যবসায়ের অভাবই কি তাদের দক্ষতা বিকাশের পথে প্রধান বাধা নয়? কর্মক্ষমতাকে কি মানবিক দক্ষতাসমূহের একটি উপাদান বলে এবং এমনকি ওই দক্ষতাসমূহের উৎস বলে গণ্য করা উচিত নয়? প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা এই অনুমানের সত্যতা প্রমাণ করছে।

কেউ কেউ আপত্তি তুলবেন: আরে এমন দৃষ্টান্ত কি কম, যখন মাথাওয়ালা ছেলেমেয়েরা সহজে লেখাপড়া করে, তারা বাড়িতে মোটেই পড়াশোনা করে না, তাদের একমাত্র ভরসা হচ্ছে স্মৃতি শক্তি — স্কুলে শিক্ষকরা যাকিছু ব্যাখ্যা করেন তার সবটাই তাদের ভালো মনে থাকে। কথাটি নিঃসন্দেহেই সত্যি, তবে এখানে চূড়ান্ত নির্ণায়ক হবে সহজলভ্য সেরা নম্বর নয়, গভীর জ্ঞান ও নৈপুণ্যে এবং, সবচেয়ে বড় কথা, শ্রমের জন্য মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি, এরূপ নৈপুণ্য যে-প্রস্তুতি জোগাতে অক্ষম। যে-শিশু এমনটা ভাবতে অভ্যস্ত যে সমস্তকিছুই তার পক্ষে অনায়াসসাধ্য এবং অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা ও পরিশ্রম কী জিনিস তা জানে না, সেই শিশু আজ হোক কাল হোক এমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হবে যা তার কাছ থেকে প্রচুর শক্তি ও কঠোর শ্রম দাবি করবে, এবং ঠিক এখানেই দেখা যাবে যে তার কোন কর্মক্ষমতা নেই। অথচ এই কর্মক্ষমতাই হচ্ছে আসল জিনিস।

কর্মক্ষমতা অন্যান্য সমস্ত দক্ষতার স্থান গ্রহণ করে না, ওগুলোর পাশাপাশি থাকে এবং ওগুলোকে তীক্ষ্ম করে তুলে। যখন কর্মক্ষমতা ছাড়া বাদবাকী সমস্ত দক্ষতা প্রথম দিকে সুপ্ত বা অপ্রকাশিত থাকে (এমনটা ঘটে কালেভদ্রে), এমনকি তখনও শ্রম ক্রিয়াকলাপের শেষ ফল চমকপ্রদ হতে পারে।

— দক্ষতা সে এক মজার জিনিস: তা থাকতেও পারে, আর থাকতে না-ও পারে।

— আমার মনে হয়, আপনি বলছেন দক্ষতার বিষয়ে নয়, প্রতিভার বিষয়ে, সেই রহস্যময় জন্মগত গুণের বিষয়ে যার অধিকারী হয় খুবই অল্প সংখ্যক লোক। অথচ দক্ষতা (যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে দক্ষতা) গঠিত হয়, এবং এ ব্যাপারে অনেককিছু নির্ভর করে যেমন স্কুলের শিক্ষকদের উপর, তেমনি পরিবারের প্রয়াসের উপর।

সেই জন্যই দক্ষতা বিকাশের বিষয়ে কোনকিছু বলার আগে কুঁড়েমির সঙ্গে সংগ্রামের বিষয়ে, শ্রমাভ্যাস গঠনের বিষয়ে, নিয়মিত ও ফলপ্রসূ শ্রমের প্রতি বিদ্বেষ দূরীকরণের বিষয়ে বলা উচিত।

আলস্য — এ হচ্ছে জঘন্য এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য; মানসিক দুর্বলতা ও অসহায়তার সাক্ষ্য। অলস ব্যক্তির — সে যতই দক্ষতাসম্পন্ন হোক না কেন — আত্মসমর্থনে কোন যুক্তি নেই এবং থাকতেও পারে না; তার সমস্ত দক্ষতা আলস্যের দরুন অপ্রকাশিতই থেকে যায়।

আলস্যের সঙ্গে লড়ার একমাত্র উপায় হল — ধীরে ধীরে শিশুকে শ্রম ক্রিয়াকলাপের দিকে আকৃষ্ট করা, তার মধ্যে শ্রমাভ্যাস ও শ্রমশীলতা গড়ে তোলা। এ ব্যাপারে কথাবার্তা আর উপদেশে বিশেষ কাজ হয় না। অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শ্রমের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি করা, তার সক্রিয় বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেওয়া, লেখাপড়ার কাজ কেমন চলছে তা নিয়ন্ত্রণ করা ও শ্রমের উপযুক্ত পরিবেশ গড়তে সহায়তা করা। ব্যক্তিগত উদাহরণেরও তাৎপর্য কম নয়। যে-সমস্ত মা-বাবা নিজেরা ভালো কর্মী এবং সকলের সম্মানের পাত্র, শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে নিজের ছেলেমেয়েদের কাছে তাঁদের উচ্চ দাবি হাজির করার নৈতিক অধিকার আছে, এবং ছেলেমেয়েরা এই অধিকার স্বীকার না করে পারে না। শ্রমাভ্যাস গঠনের সময় শিশু প্রথমে গুরুজনের দৃঢ় অভিপ্রায় আর দাবিদাওয়ার উপর নির্ভর করতে পারে, তাতে আশঙ্কার কিছু নেই। কালক্রমে নিজস্ব অভিপ্রায় আর বিশ্বাসই হবে তার একমাত্র ভরসা।

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে কর্মক্ষমতার মতো চমৎকার এক গুণ যে-ব্যক্তির আছে তার উক্ত গুণ থেকে বঞ্চিত অন্য যেকোন লোকের সামনে বিপুল প্রাধান্য থাকে।

...এবং আগ্রহ। শিশুর দক্ষতা বিকাশের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হচ্ছে — স্থায়ী ও বিশেষ কিছু আগ্রহ সৃষ্টি। দক্ষতার ফ্যাক্টর হিশেবে 'সাধারণভাবে' আগ্রহ সম্পর্কে বলে কোন লাভ নেই, কেননা এমন কোন শিশু খুঁজে পাওয়া ভার যার বিভিন্ন ধরনের আগ্রহ নেই: যেমন, অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী আর চলচ্চিত্রের প্রতি আগ্রহ, ফুটবল খেলা আর ডাকটিকিট সংগ্রহের ব্যাপারে আগ্রহ... তাই এখানে আমরা এ ধরনের নয়, বিশেষ ধরনের আগ্রহের কথা বলতে চাইছি। সে হচ্ছে মানুষের সৃজনমূলক ক্রিয়াকলাপের কোন ক্ষেত্রের প্রতি আগ্রহ যা কালক্রমে পেশা নির্বাচনে সহায়তা করবে বা ওই ক্ষেত্রে কাজ করার প্রবণতায় পরিণত হবে। শিক্ষামূলক আগ্রহ এখানে আমাদের অজ্ঞাতসারে নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের উপায় ও পদ্ধতি আয়ত্তকরণে সহায় হয়।

এটা লক্ষ্য করা গেছে যে কোন শ্রম ক্ষেত্র বা শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রতি আগ্রহ জাগরণের ব্যাপারটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে ওই ক্ষেত্রে দক্ষতা জাগরণের সঙ্গে এবং তা ওই দক্ষতা বিকাশের সূত্রপাত ঘটায়। গ্যেটে বলেছেন যে আমাদের বাসনা হচ্ছে আমাদের মধ্যে লুক্কায়িত দক্ষতাসমূহ সম্পর্কে পূর্বানুভূতি, আমরা ভবিষ্যতে কী করতে পারব তার বার্তাবহ। আমরা কি সর্বদা বুঝি যে শিশুর মধ্যে বদ্ধমূল আগ্রহসমূহ হচ্ছে তার দক্ষতারই পূর্বাভাস? দুঃখের বিষয়, আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা লক্ষ্য করি না, তার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকি।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে স্থায়ী আগ্রহ, ক্রিয়াকলাপের প্রতি শিশু প্রকাশিত প্রবণতা হচ্ছে সেই সঙ্কেত যা লক্ষ্য ক'রে বাড়ির লোকজনকে এবং সর্বাগ্রে মা-বাবাকে সতর্ক হওয়া উচিত: এ কি অঙ্কুরিত দক্ষতা জানান দিচ্ছে না?

কিন্তু তখনই আপদ আসে যখন কিশোরের এই সমস্ত আগ্রহ প্রায়ই স্বল্পস্থায়ী শখের চরিত্র ধারণ করে। তা আবেগপূর্ণ হলেও কোন লাভ হয় না।

কিশোর বয়সে বিভিন্ন বিজ্ঞান আর পেশার প্রতি আগ্রহ — যা কখনও আসে, কখনও চলে যায় — তরুণদের বৃত্তি সন্ধানে তৎপর করে তুলে এবং দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে। তখন গুরুজনদের কর্তব্য হচ্ছে যে-বিষয়টি তরুণকে প্রথমে আকৃষ্ট করেছে কেবল তাতে তাকে মনোনিবেশ করতে বাধ্য করা নয়, তার আগ্রহ বিকশিত ও প্রসারিত ক'রে তাকে নিজের জন্য আসল জিনিসটি বেছে নিতেও সাহায্য করা।

সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব গঠনের উৎসে

লেখাপড়া শিখতে শিশুদের কীভাবে সাহায্য করা যায়

এই পরিচ্ছেদে আমরা বলতে চাই সোভিয়েত দেশে পিতামাতারা কীভাবে তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রস্তুত করেন, এ কাজে কী কী সমস্যা ও অসুবিধা দেখা দেয়, কীভাবে তা সমাধান করা হয়। আমাদের অভিজ্ঞতা ও উপদেশ হয়তো আপনাদের কিছুটা কাজে লাগতে পারে।

মা-বাবারা, অন্যান্য গুরুজনেরা আর সময় সময় শিক্ষকরাও শিশুকে কেবল শিক্ষাদানের লক্ষ্যবস্তু হিশেবে দেখেন। বাস্তব জীবনে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি বিরল কিছু নয়। শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে অবশ্য আমরা সবাই অংশগ্রহণ করে থাকি, তবে এ ছাড়া শিশু নিজেও নিজেকে গড়ে। আমরা নিজেদের যেখানে স্রেফ কাজের কর্তা বলে গণ্য করি সেখানে সে সৃজনের জন্য পরিবেশ গড়তে সক্ষম হয় আপনার-আমার চেয়ে অনেক বেশি।

শিশু নিশ্চয়ই শিক্ষককে, মা-বাবাকে, প্রতিবেশীকে, ক্রীড়া কোচকে, প্রিয় অভিনেতাকে অনুকরণ করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার নিজস্বতা বজায় থাকে এবং খোদ তার অনুকরণে উপস্থিত থাকে সৃজনের, নিজস্ব দর্শনের উপাদান এবং এ কথাটি সর্বাগ্রে প্রযোজ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে। শিক্ষা জীবনকে ভরপুর করে তুলে এবং তা ছোট স্কুল-ছাত্রের সমগ্র সত্তার মূল অর্থ গঠন করে। শিশুর সেই 'আমি নিজে' কথাটি — যা সে সর্বদা জোরে উচ্চারণ করে কথা বলতে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই — শেষপর্যন্ত স্কুলে বৈধ অধিকার লাভ করে। সে নিজে নিজে শেখে। শিক্ষার মতো দুরূহ এক

কাজে সাহায্য করতে গিয়ে তাকে আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা উচিত নয়, মুক্তি দেওয়া উচিত; তাকে দমিয়ে রাখা উচিত নয়, সমর্থন জোগানো উচিত; নিজেদের ধ্যানধারণার হিতার্থে তাকে বাঁকানো উচিত নয়, সোজা করা উচিত।

শিশু, কিশোর ও তরুণের শিক্ষাদীক্ষার কাজে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্যই নিজস্ব অভিজ্ঞতা থাকে। এবং আসল জটিলতাটি এখানেই। কখনও কখনও তা হয় আপন শৈশবের অভিজ্ঞতা, স্কুল জীবনের অভিজ্ঞতা; আর এখন, বহু বছর বাদে, মনে হয় যে তাতে সমস্তকিছুই সুন্দর ও মহৎ। আমরা ভাবি যে নিজের সন্তানের বেলা ঠিক সেই সমস্তকিছুই প্রয়োগ করা উচিত যা কোনকালে প্রয়োগ করা হয়েছিল আমাদের ক্ষেত্রে। কিন্তু, হায়, নিজস্ব অভিজ্ঞতা সর্বদা শিক্ষকের নির্ভরযোগ্য সহায়ক হয় না। প্রায়ই তা গঠিত হয় বিচ্ছিন্ন কিছু পর্যবেক্ষণ আর অনুমানের ভিত্তিতে। সে অভিজ্ঞতা সঠিক জ্ঞানের অভাব হেতু প্রায়ই নিঃস্ব।

মানব জীবনে এমন কিছু সংকটপূর্ণ মুহূর্ত রয়েছে যা বরাবরকার ঘটনা প্রবাহের গতি রোধ করে দেয়। স্কুল জীবনের আরম্ভও সেই মুহূর্তগুলোর একটি।

স্কুল, ক্লাস — এ সমস্তকিছু কেবল শিশুরই নয়, গোটা পরিবারের জীবন এবং সত্তায়ও নীতিগত নতুনত্ব নিয়ে আসে। এবার থেকে অনেককিছুই — যেমন, শিশুর ভালোমন্দ, শিক্ষক ও সহপাঠীদের প্রতি তার সম্পর্ক, জ্ঞান ও নম্বরের প্রতি তার মনোভাব ইত্যাদি নির্ভর করবে আপনাদের, অর্থাৎ পিতামাতাদের উপর।

শিশুর পরিবর্তে আপনারা অবশ্যই লেখাপড়া করতে পারবেন না, কিন্তু তার সঙ্গে লেখাপড়া করতে, অর্থাৎ তাকে লেখাপড়া করতে শেখাতে পারবেন এবং তা আপনাদের করতে হবেও। প্রসঙ্গত, বিদ্যাশিক্ষার কাজ স্কুলে ভর্তি হওয়ার অনেক আগেই শুরু হয়।

অল্পকাল পরেই স্কুলে। — জানেন, আমার ছেলের বয়স সাড়ে ছ'বছর হয়ে গেছে। আগামী হেমন্তে স্কুলে যাবে। কিন্তু জানি না, ওকে নিয়ে কী করি। ও এমনকি অক্ষরও চেনে না। হয়তো এখন শেখানো শুরু করতে হবে।

— কী বলছেন? কীসের জন্য? তাহলে স্কুলে ও কী করবে? ওর

তখন একঘেয়ে লাগবে এবং নষ্ট হয়ে যাবে। কিছু শিক্ষক এমনকি এরূপ অনুরোধও করেন: স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে শিশুকে মোটেই কোনকিছু শেখাবেন না, আমাদের কাজে বাধা দেবেন না।

—দেখলেন তো, — আপত্তি জানান প্রথম মহিলাটি, — শিক্ষকরা বলেন এক আর বুদ্ধিমান লোকেরা করে অন্য। পড়শীদেরও ছ' বছরের এক ছেলে আছে, আমার ছেলের সমবয়সী। কিন্তু ও অনায়াসে পড়তে পারে, ২০ অবধি যোগ-বিয়োগ করতে পারে। তাহলে কোন্ পক্ষ ঠিক?

সত্যিই, কোন্ পক্ষ? এই দুই মহিলার মধ্যে কে ঠিক কথা বলছেন: যিনি ভাবছেন যে শিশুকে স্কুলেই সমস্তকিছু শেখানো ভালো তিনি কিংবা সেই আশঙ্কিত মহিলা, যাঁর ছেলে স্কুলে ভর্তি হতে চলেছে একেবারে কোনকিছু না শিখে?

এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক শ্রেণীসমূহের শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গিও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাঁদের একাংশ প্রথম শ্রেণীতে এমন ছেলেমেয়েদের পেতে চান যারা কিছুই জানে না, কিছুই পারে না, যাদের সমস্তকিছু শেখানো যাবে নিজের মতো ক'রে, নিজস্ব স্বভাবসিদ্ধ ও পরীক্ষিত পদ্ধতি অনুসারে। অন্যরা নিজের ক্লাসে এমন ছেলেমেয়েদের নিতে চেষ্টা করেন যারা পড়তে ও গণতে জানে। কিছু কিছু ছেলেমেয়ে এমনকি চতুর্থ শ্রেণীতেও ভালো মতো পড়তে পারে না, তিন বছর পড়াশোনা করার পরও পড়ার কৌশল আয়ত্ত করতে তাদের কষ্ট হয়।

এই তো একটি ছেলে বসে আছে। চোখমুখ দেখে তাকে বুদ্ধিমানই মনে হয়, তার কল্পনা শক্তিতে দশ জনের কুলোবে, কিন্তু সে পড়াশোনায় খারাপ, কেননা অঙ্কের প্রশ্ন পড়া তার পক্ষে সহজ ব্যাপার নয়, আর ভূগোলের পাঠ তৈরি করতে তার লাগে অন্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে দ্বিগুণ-তিনগুণ বেশি সময়। কেন? কারণ সে স্কুলে ভর্তি হয়েছে কোনকিছু না শিখে, বিদ্যাশিক্ষার জন্য তার কোন প্রস্তুতিই ছিল না।

বর্তমানে কিণ্ডারগার্টেনগুলোতে প্রাক্‌স্কুলবয়স্ক শিশুদের পড়তে শেখানো হয়। তবে ওখানেও ওই কাজ সময় সময় কেবল বর্ণ পরিচয়ের মধ্যেই সীমিত থাকে।

আর অন্য দিকে, বাড়িতে সময় সময় শিশুকে পড়তে শেখানো (আমাদের মতে, চার বছর বয়সের শিশুদের ধীরে ধীরে পড়তে শেখানো উচিত) যায় স্কুলের চেয়ে অনেক সহজে।

— স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে শিশুকে কোনকিছু শেখানো উচিত কি? যেমন, পড়তে ও লিখতে?

— কী যে বলেন! নিশ্চয়ই না। ওকে এই সমস্তকিছু শিখিয়ে দেবেন অভিজ্ঞ শিক্ষক, তাঁর আছে শিক্ষাদানের সঠিক পদ্ধতি।

— কিন্তু ভিন্ন মত-ও তো রয়েছে। অনেক মা-বাবা, শিক্ষক আর বিশেষজ্ঞ বলেন, যে-শিশুকে সাত বছর অবধি কোনকিছু শেখানো হয় নি সে তার বিকাশে অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তবে আপনি যদি ও-কাজ চিত্তাকর্ষকভাবে করতে না পারেন, যদি নিজের সাহায্যে আপনি উজ্জ্বল ব্লক আর চমকপ্রদ ডায়াফিল্ম না নেন, যদি আপনি একেবারে শুরু থেকেই পড়ার কাজটিকে নিরস ও বাধ্যতামূলক পাঠে পরিণত করেন তাহলে আপনার সন্তান অবশ্যই কোনকিছু শিখতে চাইবে না। তখন আপনার এমনকি মনে হবে যে তার কোন দক্ষতা নেই, সে কোনকিছুই বুঝে না। তা খুবই মারাত্মক। এখানে পাঁচ বছর বয়সের এক ছেলের বাপের কথা বলি। তিনি ঠিক করলেন ছেলেকে পড়তে শেখাবেন। আন্দ্রিউশা শব্দাংগুলো ঠিকই পড়ল: 'গা' — 'ড়ি'। 'এবার ওগুলো যোগ কোর,' — তাকে বলেন বাবা। 'বেড়াল,' — অপ্রত্যাশিতভাবে জবাব দেয় আন্দ্রিউশা। 'সে কী করে হয়,' — বাবা ধৈর্যচ্যুত হতে শুরু করেন, — 'ভালো ক'রে দ্যাখ্: 'গা' — 'ড়ি'। মিলালে কী হয়?' — 'চড়ুই,' — এক মুহূর্তও না ভেবে উত্তর দেয় ছেলেটি।

— আপনি জানেন, আমার মনে হতে লাগল যে ছেলেটি কোন মনঃরোগে ভুগছে, সে মানসিক দিক থেকে অনগ্রসর। প্রাথমিক শ্রেণীর শিক্ষিকার সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলাম, এবং দেখা গেল যে আমার শিক্ষা পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভুল। আমি তাকে আলাদা আলাদা অক্ষর দেখাতাম এবং তা দিয়ে শব্দাংশ গড়তে শেখাচ্ছিলাম। অথচ দেখানো উচিত গোটা শব্দাংশ, আর তা দিয়ে শব্দ গঠন করা প্রয়োজন। শিশুকে কীভাবে পড়তে শেখানো উচিত শিক্ষিকা তা আমায় বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন, এবং আমার আন্দ্রিউশা ছ' মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দে পড়তে শিখে নিল।

আমাদের মনে হয়, এই বাবা উচিত কাজই করেছেন: প্রাথমিক স্কুল আছে সর্বত্র, এবং কোন শিক্ষকই আপনায় সহায়তা ও পরামর্শ দিতে অস্বীকার করবেন না।

আর যে-সমস্ত মা-বাবা বলেন: 'ও যদি স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে সবকিছু শেখে ফেলে তাহলে স্কুলে করবেটা কী? দুষ্টুমি করবে, একঘেয়ে

লাগবে?' তাঁদের আশঙ্কা কি ঠিক? না, একঘেয়ে লাগার সময়ই হবে না।

অবশ্য সে যদি এমন শ্রেণীতে পড়ে যেখানে সমস্ত ছেলেমেয়ে ভালো মতো পড়তে পারে তাহলে তো কথাই নেই — সবই চমৎকার এগুবে। কিন্তু আমরা সবচেয়ে খারাপ সম্ভাবনাটিই ধরে নেব: ওর মতো ছেলেমেয়ে ক্লাসে কম, এবং শিক্ষিকা অধিকাংশ ছেলেমেয়েকে তা শেখাতে বাধ্য যা অন্যরা ইতিমধ্যে শিখে নিয়েছে ও রপ্ত করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় কী হবে? শিক্ষিকা অবশ্যই আপনাদের ছেলেকে এবং অন্য শিশুদের ব্যস্ত রাখার একটা উপায় খুঁজে বার করবেন যাতে ওরা আলস্যে সময় না কাটায় ও বিরক্তি বোধ না করে।

শিশু যদি অল্প বয়সে পড়তে শেখে তাহলে সে অনায়াসে রূপকথার জগতে প্রবেশ করতে পারে — রঙীন ছবি আর বড় বড় অক্ষরযুক্ত অপূর্ব সেই সমস্ত বই পড়তে তার কোন অসুবিধা হয় না যেগুলোর সঙ্গে অধিকাংশ শিশুরই পরিচয় ঘটে মা-বাবার গল্প শুনে। সত্যিই, শিশু যখন স্কুলে ভালো মতো পড়তে শিখবে, যখন তার নিজের পড়ার ইচ্ছে হবে তখন ওই মজার বইগুলো আর মজার বলে মনে হবে না।

তবে এ সমস্তকিছুর মানে অবশ্য এ নয় যে আপনাদের সন্তান স্বচ্ছন্দে পড়তে শিখে ফেললেই আপনারা নিজেকে উচ্চৈঃস্বরে বই পড়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন। প্রথমত, বই পড়ার কাজ আরও দীর্ঘকাল ধরে তার কাছে এক ক্লান্তিকর ব্যাপারই মনে হবে; দ্বিতীয়ত, প্রিয় বইয়ের পৃষ্ঠাগুলোতে প্রাণসঞ্চারকারী মধুর মাতৃকণ্ঠের চেয়ে বেশি মিষ্ট আর কী হতে পারে! বই পড়ার কাজে একসঙ্গে অতিবাহিত ঘণ্টাগুলোর মতো আর কিছুই আপনাদের নিজের ছেলের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ করতে পারে না। আপনারা যা পড়েন ও দেখেন তা নিয়ে আলোচনা করার চাহিদা অনুভব করেন। এভাবেই আপনাদের সন্তান ধীরে ধীরে নিজের অজ্ঞাতসারে ভালোভাবে কথা বলতে ও স্বাধীনভাবে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে শেখে। প্রসঙ্গত, আরও একটি কাজ স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে করতে পারলে ভালো হয়। তা হচ্ছে শিশুকে সমস্তকিছুর বিষয়ে — চিড়িয়াখানায় যাকিছু দেখেছে তার বিষয়ে, বনে ভ্রমণের বিষয়ে, পঠিত নতুন বইয়ের বিষয়ে, রেডিওতে শোনা রূপকথার বিষয়ে গল্প বলতে শেখানো।

প্রথম বার প্রথম ক্লাস। শেষ হয় প্রাক্‌স্কুল বয়সের শেষ গ্রীষ্ম। প্রথম শ্রেণীর ভাবী ছাত্রছাত্রীরা প্রায়ই তাদের স্কুল দেখতে আসে।

— খুকী, তোমার নাম কী? — তরুণী শিক্ষিকা জিজ্ঞেস করেন ছোট্ট কৌতূহলী এক পিঙ্গল-চুলো মেয়েকে।

— গালিয়া। আর আপনার নাম? আপনি কে, স্কুলের দিদিমণি?

— হ্যাঁ, দিদিমণি।

— ক্লাস ওয়ানে আপনি পড়ান?

— না, আমি নই। পড়তে চাস?

— নিশ্চয়ই! স্কুলে অনেক মজা হবে, কত ছেলেমেয়ে আছে। মা বলেছেন, মাঝেমধ্যে ক্লাসে এমনকি সিনেমাও দেখানো হবে। তাই না?

— অবশ্যই দেখানো হবে।

— আচ্ছা লুন তো, মাস্টাররা কী রকম, খুব রাগী নয় তো? — জানতে চায় ছটপটে এক ছেলে।

— আরে না, ওঁরা খুব ভালো, তোদের ভালোবাসেন।

— আর আমার মা বলেছেন: 'দেখিস, দিদিমণির কথা মন দিয়ে শুনিস যেন, নতুবা না খেয়ে ক্লাসে বসে থাকতে হবে।'

বোঝাই যাচ্ছে যে এই ছেলেটি কোনরূপ উৎসাহ ছাড়াই স্কুল জীবনের প্রথম দিনটির অপেক্ষা করছে। সে এখনও লেখাপড়া শুরু করে নি, কিন্তু এরই মধ্যে স্কুল সম্পর্কে তার মনে পাকাপোক্ত একটা ধারণা গড়ে উঠেছে — ওখানে সবাই এবং সবই কঠোর। এই ধারণা দূর করা সহজ হবে না। তাই গালিয়া প্রথম বার ক্লাসে যাবে খোশ মেজাজে, সুখী মনে, কী এক আনন্দের আশা নিয়ে আর তার ছোট্ট সাথীটি নিশ্চয়ই মা'র গা ঘেঁসে থাকবে, পুরো চারটি ঘণ্টার জন্য মাকে ছেড়ে যাওয়া তার পক্ষে কষ্টকরই হবে।

ব্যাপার কী? ভবিষ্যৎ স্কুল জীবনের প্রতি ছেলেমেয়েদের মনোভাব এত বিভিন্ন হয় কেন? এখানে অবশ্য সমস্তকিছুই নির্ভর করে মা-বাবার উপর। আপনারা যদি ছেলেমেয়েদের বলেন (এবং যত বেশি বলবেন ততই ভালো) যে স্কুল হচ্ছে বৃহৎ একটি গৃহ যেখানে ছেলেমেয়েরা আনন্দে থাকে, আর শিক্ষকরা তাদের ভালোবাসেন এবং বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক জিনিস শেখান, তাহলেই তারা স্কুলে যেতে চাইবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ স্কুলছাত্রকে যদি বলেন যে শিক্ষকদের কথা না শুনলে ও দুষ্টুমি করলে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে, তাহলে সে স্কুলের চৌকাঠও মাড়াতে চাইবে না। আসন্ন শিক্ষাকার্য সম্পর্কে তার মনে যদি মধুর ও উজ্জ্বল ধারণা গড়ে উঠে তাহলে সে সমস্ত বাধাবিপত্তিও দেখবে অন্য চোখে। আর যাতে এরূপ মধুর ধারণা গড়ে উঠে,

শিশু যাতে তার স্কুল জীবনের প্রথম দিনটির জন্য খুব অপেক্ষা করে সে জন্য স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতির সঙ্গে জড়িত সমস্তকিছু তার পক্ষে চিত্তাকর্ষক করে তোলা উচিত।

আপনাদের কিনতে হবে স্কুলের পোশাক, ব্যাগ, খাতা, পেন্সিল, রবার ও স্কেচবই। নিজের সঙ্গে শিশুকেও অবশ্যই দোকানে নিয়ে যাবেন। সে শান্তভাবে দোকানের কাউণ্টারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকুক, সম্পূর্ণ নতুন জিনিসগুলো নেড়েচেড়ে দেখুক এবং নিজের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্তকিছু নিজেই পছন্দ মতো বাছুক।

এবার সমস্ত মজার ঝামেলা গেল: আগামী কালই শিশু স্কুলে যাবে, ব্যাগ প্রস্তুত, নিখুঁতভাবে ইস্ত্রি-করা ইউনিফর্মটি ঝুলছে, জুতো জোড়া সাফ করার পর চকচক করছে। সমস্তকিছুই চকমকে, নতুন। আর ফুল কিনতে ভুলেন নি তো? কিছুতেই ও-কাজটি করতে ভুলবেন না। ফুল ছাড়া উৎসব যে উৎসবই নয়।

স্কুলে রওয়ানা দেওয়ার আগে শিশুকে যদি তাড়াতাড়ি করতে বলেন, যদি হারিয়ে-যাওয়া মোজা খুঁজতে আরম্ভ করেন কিংবা শেষ মুহূর্তে শার্ট ইস্ত্রি করতে বসেন তাহলে উৎসবটি পুরোপুরিই নষ্ট হয়ে যাবে এবং তখন কোন ফুলেই কাজ দেবে না। সমস্তকিছু আগের রাত্রেই প্রস্তুত করে রাখবেন এবং তা অবশ্যই করবেন শিশুর সঙ্গে। মনে রাখবেন, স্কুলের আগে আপনাদের ছেলে কীভাবে শেষ আধ-ঘণ্টা কাটাবে, বাড়ি থেকে বেরোবার আগে আপনারা তাকে কী বলবেন অনেক সময় তার উপর নির্ভর করে আপনাদের ছেলের সারাটি স্কুল-দিন।

হোম টাস্ক দেওয়া হল। পড়াশোনা পুরোদমে শুরু হয়ে গেল। প্রতিদিন স্কুলের ছুটির পর আপনারা নিজের সন্তানকে একই প্রশ্ন করেন: 'কী রে স্কুলে আজ কেমন লাগল? নতুন কিছু শিখেছিস? কোন নম্বর-টম্বর পাস নি?' আপনারা খুব মন দিয়ে তার খাতায় প্রথম টান আর সংখ্যাগুলো দেখেন। কোনকিছু আপনাদের পছন্দ না হলে রাগ করবেন না: স্মরণ করতে চেষ্টা করুন, এক কালে আপনাদের পক্ষেও ও-কাজ করা সহজ ছিল না।

আপনাদের ছেলে বা মেয়ে প্রথম বার নম্বর পেল। প্রথম শ্রেণীগুলোর শিক্ষকরা সচরাচর ছাত্রদের খারাপ নম্বর দেন না, কারণ তাঁরা একেবারে শুরু থেকেই ছেলেমেয়েদের নিরুৎসাহ করতে চান না। কিন্তু যদি হঠাৎ

খারাপ নম্বর নিয়েই আসে?.. শিশুকে মোটেই বকবেন না, অমনোযোগিতা আর উপস্থিতবুদ্ধিহীনতার জন্য দোষারোপ করবেন না। আপনাদের মনে হতে পারে যে প্রথম ভুলের জন্য যদি একটু গালাগাল দেওয়া না হয় তাহলে শিশু পরে ওই সমস্ত ভুলভ্রান্তিকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই গণ্য করবে। ...এমতাবস্থায় কী করা? সম্ভবত নিজের সমস্ত হাবভাবে দেখাতে হবে যে খারাপ নম্বর দেখে আপনারা খুবই দুঃখিত হয়েছেন: মানুষ যা-ই করুক না কেন — সে সেতু গড়ুক কিংবা রেখা টানুক — তা তাকে যথাসম্ভব ভালোভাবে করা উচিত, মন দিয়ে করা উচিত। এ ব্যাপারটি শিশুকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা চাই যাতে সে বুঝতে পারে যে আসল জিনিস নম্বর নয়, কাজ।

প্রথম শ্রেণীর ছাত্রের সঙ্গে বসে পাঠ তৈরি করা উচিত কি? কীভাবে মাত্রা মেনে চলা যায়? অন্য কেউ তার সমস্ত দায়দায়িত্ব নিয়ে মাথা ঘামাক শিশুর মধ্যে এরূপ চিন্তাধারার উৎপত্তি এড়ানো যায় কীভাবে? এ সমস্তকিছু খুবই জটিল। কোন কোন পরিবারে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে পড়া তৈরি করার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে বড় বোনের উপর। খোদ এ ব্যাপারটি খুবই ভালো। কিন্তু ভ্যানিয়া যদি স্কুল থেকে খারাপ নম্বর নিয়ে আসে তাহলে নাতাশার উপর যেন মা-বাবার ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিবদ্ধ না হয়। কখনই এমনটা হতে দেওয়া উচিত নয়। এরূপ ব্যাপার ভাইবোনের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয় না। আর সবচেয়ে বড় কথা: এভাবে চললে নিজের কৃত কাজের জন্য ছেলেটির সাধারণ দায়িত্ববোধ কী ক'রে গড়ে উঠবে?

কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও আপনাদের ছোট্ট স্কুলছাত্রের আপনাদের সহায়তায় প্রয়োজন আছে। সে সহায়তা হতে পারে এরূপ: তাকে পড়া তৈরির করার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত, পড়া তৈরি করার সময় প্রয়োজন বোধে তার পাশেও বসা দরকার। স্কুল জীবনে তার এই প্রথম পদক্ষেপগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর সঙ্গে একমাত্র মনোযোগ দিয়ে খাটলেই আপনারা তাকে শেখাতে পারেন কীভাবে কাজ করতে হয়, কেমন ক'রে দ্রুত ও সুশৃঙ্খলভাবে নিজস্ব দায়িত্ব পালন করতে হয়। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রের চাই নিজস্ব টেবিল, নিজস্ব টেবিল ল্যাম্প, নিজস্ব বইয়ের তাক। খেয়াল রাখবেন, আপনাদের ছেলে যেন কখনও কোনকিছু না খোঁজে: তার সমস্ত জিনিস যেন সর্বদা নির্দিষ্ট একটা জায়গায় থাকে।

আপনারা দেখলেন যে আপনাদের ছেলে চেয়ার-টেবিল ছেড়ে উঠে পড়েছে, কিন্তু খাতাগুলো খোলাই রয়ে গেছে, যে-জলে তুলি ধুয়েছিল তা

ফেলে নি, আঠার শিশিটি বন্ধ করে নি। এমতাবস্থায় তাকে অন্য কিছুতে হাত দিতে দেবেন না। আগে সমস্তকিছু পরিষ্কার করতে ও গুছিয়ে নিতে বলবেন। এমনকি তার কাছে তার বন্ধু এলেও আপনারা কঠোর হতে ইতস্তত করবেন না। অবশ্য তাকে সমস্তকিছু গুছিয়ে রাখতে, তুলি ধুতে ও কাগজের টুকরো ফেলতে সাহায্য করা যায়। তাতে সে আপনাদের মধ্যে সাথী খুঁজে পাবে। তাছাড়া আপনারা তাকে বলতে পারেন: 'ঠিক আছে, আজ তোর কাজ আমিই করে দিচ্ছি, আর কাল তুই আমায় কোন কাজে সাহায্য করবি।' তবে তা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত করবেন না। ছেলে সহজেই আপনাদের সহায়তায় অভ্যস্ত হয়ে যাবে, অথচ আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে — তার মধ্যে নিয়মনিষ্ঠতা, সময়ানুবর্তিতা ও পারিপাট্যের বিকাশ ঘটানো।

শিশু পড়া তৈরি করতে বসল। এ কাজটি যেন সে সর্বদা একই সময়ে করে। লক্ষ্য রাখবেন, টেবিলের উপর পড়া তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া আর কিছু যেন না থাকে। কলম ঠিক আছে, বাঁ দিক থেকে আলো পড়ছে। এবার খোকা স্পষ্ট ক'রে বলুক, বাড়িতে তাকে কী করতে বলা হয়েছে। যেমন, তাকে হস্তলিপির কাজ দেওয়া হয়েছে। খেয়াল রাখবেন, সে কাজটি যেন করে মন দিয়ে, তাড়াহুড়ো না ক'রে।

অনেক সময় শিশু খুবই অল্প বয়সে পড়তে পারে, বই ভালোবাসে, চমৎকার গল্প বলে, ভালো গণে, কিন্তু লেখার ব্যাপারে তেমন দক্ষতা দেখাতে পারে না। আমাদের যুগে অতি সুন্দর হস্তাক্ষর না হলেও চলে, এবং শিশু যদি কথা ভালো বলতে পারে তাহলে তেমন সুন্দর করে না লিখলেও কোন ক্ষতি নেই। সেজন্য তাকে বকবেন না। আপনাদের সন্তানের হস্তাক্ষর যদি 'শিল্পীর মতো' না হয় তাহলে খুব একটা দুঃখিত হবেন না। তবে তাকে মার্জিনের মধ্যে বড় ও পরিষ্কার করে লিখতে শেখানো উচিত। তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষকে সবকিছু — হ্যাঁ সবকিছু — করা চাই সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে। এ কাজে তাকে সর্বতোপায়ে সাহায্য করুন।

এবার আপনারাও হয়তো সব মা-বাবার মতো জিজ্ঞেস করবেন: 'তাহলে শিশুকে কবে স্বনির্ভরভাবে পড়া তৈরি করতে দেওয়া উচিত?'

আমরা মনে করি, যত কম বয়সে সম্ভব ততই ভালো। যখনই আপনারা বুঝবেন যে শিশু আপনাদের সহায়তা ছাড়াই তার কাজ সামলে নিতে পারছে, তখনই তাকে একা রেখে দেবেন। তবে তা হঠাৎ করা উচিত নয় — প্রথমে নিজের কোন কাজে সরে পড়বেন, আর পরে সে ধীরে ধীরে

অভ্যস্ত হয়ে যাবে যে আপনারা পাশে নেই। এ প্রক্রিয়াটি দীর্ঘকাল ধরে চললেও খারাপ: এমনও ছেলেমেয়ে আছে যাদের আর শিশু বলে অভিহিত করা যায় না, অথচ মা-বাবা ও দাদু-দিদিমারা ওই বয়সেও তাদের সঙ্গে বসে পড়া তৈরি করেন। তা খুবই ক্ষতিকর। এরূপ ছেলেমেয়েরা বড়দের ছাড়া কিছুই করতে পারে না এবং বড়দের ব্যতিরেকে তারা নিজেদের সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করে।

কল্পনা শক্তি যাতে কাজ করে। আপনারা জানেন, আমাদের ছেলেমেয়েদের রচনায় অনেক সময় কী আমাদের বেশি দুঃখিত করে? তারা নির্ভুলভাবে লেখে, কখনও কখনও তাদের লেখায় তাদের সুশৃঙ্খল চিন্তাধারার পরিচয় মেলে, কিন্তু তাতে একটি জিনিস থাকে না — এবং তা হচ্ছে কল্পনা শক্তি। অথচ এই কল্পনা শক্তি হচ্ছে ক্ষমতাধর সহচরয়িতা।

আপনারা কখনও লক্ষ্য করেছেন, আপনাদের ছেলে বা মেয়ে কীভাবে খেলে? সে কি নিজেকে তার রূপকথার বইগুলোর নায়ক ভাবে, সে কি প্লাশের বাঘটিকে 'মাউগলি' নামক কাহিনীর জন্তুজানোয়ারদের হিংস্র শত্রুতে পরিণত করে, সে কি তার পুতুলগুলোর সঙ্গে কথা বলে, সে কি কখনও বিক্রেতা, কখনও উদার ডাক্তার, কখনও বৈমানিক আর কখনও বাস ড্রাইভার হয়? সে যদি তা না করে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে তার কল্পনা শক্তি সম্ভবত এখনও জাগে নি। তাকে তা জাগাতে সাহায্য করুন। নিজেই শিশুর সঙ্গে এই সমস্ত খেলা খেলতে চেষ্টা করুন। আপনারা বলবেন: 'সে হচ্ছে বিশেষ এক শিল্প।' নিশ্চয়ই শিল্প, কিন্তু নিজের সন্তানকে মানুষ করতে হলে, তাকে বুদ্ধিমান ও উদ্যমী করে তুলতে চাইলে কী না শিখতে হয়!

একদা গ্রীষ্মকালে আমরা একটি মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। এক বাবা সমুদ্র তীরে তাঁর ৪ ও ৫ বছরের দুই ছেলের সঙ্গে খেলছিলেন। ভদ্রলোক ছিলেন বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ছেলেদের সঙ্গে গড়ছিলেন বালুর দুর্গ; রাস্তাঘাট, বাড়িঘর আর বাগবাগিচা সমেত গোটা একটি শহর। হঠাৎ এই শহরটি বিভীষিকাময় দুর্যোগের কবলে পড়ল — বন্যা শুরু হল। ভদ্রলোক কীভাবে মুখ দিয়ে সাইরেন বাজাচ্ছিলেন, শহরের বিভিন্ন প্রান্তে নৌকো পাঠিয়ে কীভাবে ত্রাণকর্মীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তা ছিল সত্যিই দেখার মতো ব্যাপার। এ খেলায় উদাসীন থাকা সম্ভব ছিল না। ধীরে ধীরে বাবাকে ও তাঁর ছেলেদের সৈকতের সমস্ত শিশু ঘিরে ফেলে, এবং পরে

বড়রাও এসে ভিড় করে। তাঁদের খেলা তখন আর খেলা ছিল না, তা পরিণত হয় চিত্তাকর্ষক এক নাট্যাভিনয়ে। বাবা তাতে ছেলেদের চেয়ে মোটেই কম মজেন নি।

এমনও পরিবার দেখা যায় যেখানে মা-বাবা আর ছেলেমেয়েরা হাস্যকর অভিনয়ের আয়োজন করে থাকেন। তাঁরা মঞ্চস্থ করেন তাঁদের প্রিয় রূপকথা আর গল্প, নিজেরা মজার মজার কাহিনী রচনা করেন। এ ধরনের ছেলেমেয়েদের পক্ষে স্কুলে রচনা লেখা সহজ হবে।

একবার অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের একটি কাজ দেওয়া হল। তাদের লেও তলস্তয়ের মিউজিয়মের একটি কক্ষ বর্ণনা করতে বলা হল। ছেলেমেয়েদের অধিকাংশই কাজটি করল খুব সততার সঙ্গে: দেয়ালের সমস্ত ফোটো, ঘরের টেবিল-চেয়ার আর দোয়াত-কলমের বিশদ বর্ণনা দিল। কিন্তু এই রচনাগুলো পড়তে একঘেয়ে লাগছিল। একমাত্র নিনার রচনাটিই খুব মনোগ্রাহী হয়েছিল। সে ওই সমস্ত চেয়ার-টেবিল, দোয়াত-কলম আর ফোটোরই বর্ণনা দিয়েছে। কিন্তু নিনা ওগুলোকে কথা বলতে বাধ্য করেছে। এক কালে এই সমস্ত জিনিস তো তলস্তয়েরই ছিল। তারা দেখেছে কীভাবে তিনি ঘরে ঢুকতেন, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেছে। তাই এবার তারা সে সব কথা বলুক। নিনা অপূর্ব রচনা লিখেছিল, তা পড়ল সারা ক্লাস। তখন থেকে অনেক ছেলেমেয়ে কেবল মিউজিয়মের নিদর্শন সামগ্রীই নয়, অন্যান্য বহু জিনিসও ভিন্ন চোখে দেখতে লাগল, — অ্যান্ডারসনের মতো তারা ওগুলোর কণ্ঠও শুনতে আর বুঝতে চেষ্টা করত।

অনেক সময় আমরা নিজেরাই আমাদের ছেলেমেয়েদের কল্পনা শক্তিকে দমিয়ে দিই।

ছোট্ট ছেলে নীল পেন্সিল দিয়ে একটা ঘোড়া এঁকে বাবার কাছে নিয়ে এল।

—বাবা, সত্যি কী সুন্দর, তাই না? — সে ছবিখানি বাবার দিকে বাড়িয়ে দিল।

— নীল রঙের ঘোড়া হয় না, — ছেলের রচনা দেখে বিচক্ষণতার সঙ্গে জবাব দিলেন বাবা।

ছেলেটি বিহ্বলতা বোধ করে। তা সত্যিই পরিতাপের বিষয়। পরের বার সে অবশ্য বাদামী বা ধূসর রঙের ঘোড়া আঁকবে, তবে 'বুরাতিনোর অ্যাডভেঞ্চার' নামক রূপকথাটি সম্পর্কে বলবে: 'ওতে সবকিছু মিথ্যা। পুতুলরা তো কথা বলতে পারে না, এবং মেয়েদের চুল কখনও নীল হয় না।'

না, আপনারা এ কথা ভাববেন না যে আপনাদের ছেলে বাস্তবতা বোধ হারিয়ে ফেলতে পারে। আঁকুক সে তার নীল ঘোড়াগুলো, তার পেন্সিলের টানে ফুটে উঠুক অকল্পনীয় সব ফুল এবং অদৃশ্য গ্রহসমূহ থেকে যাত্রা করুক মহাকাশচরেরা, তার অ্যালবাম ভরে উঠুক রূপকথার জীবজন্তুতে, সে বিশ্বাস করতে শিখুক যে প্রতিটি তৃণ নিজের অদৃষ্টের কথা বলতে পারে, কেবল তার কথাগুলো কীভাবে শুনতে হয় তা জানা চাই।

তাকে তা শিখতে সাহায্য করুন। ধরুন, আপনারা ছেলের সঙ্গে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ছেলে আপনাদের অ্যাশবেরির একটি ডাল ভেঙে দিতে বলল।

— কিন্তু গাছ যদি ব্যথা পায়? আয় শুনি, গাছটি কী বলছে। তোর কী মনে হয়?

এবং আপনাদের ছেলে যদি একঘেয়ে পত্রমর্মরে কোনকিছু বুঝতে না পারে তাহলে নিজেরাই তাকে বলতে চেষ্টা করবেন, অ্যাশবেরি এখন কী ভাবছে, কী অনুভব করছে। ছেলেকে জিজ্ঞেস করবেন, তার কী মনে হয়, ডালের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটলে গাছের কি কষ্ট হবে, ব্যথা লাগবে।

কেবল এ কথা ভাববেন না যে ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে আপনাদের কথাবার্তা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফল মিলবে। অবশ্যই না: কল্পনা শক্তির জাগরণ— এ হচ্ছে খুবই ধীর এক প্রক্রিয়া। ধরুন, শিশু এই মাত্র পড়া এক কাহিনী অবলম্বনে কাগজে কোন দৃশ্য আঁকার চেষ্টা করছে। সে ভালো শিল্পী নয় বলে আপনারা বিহ্বলতা বোধ করবেন না — আসল কথা ওটা নয়। সে যদি পঠিত বিষয় অবলম্বনে কোনকিছু আঁকতে চেষ্টা করে এর মানে তার মধ্যে চাক্ষুষ প্রতিমূর্তির উন্মেষ ঘটেছে। ধরুন, সে ও তার ছোট বন্ধুরা নিজেদের 'তিন বন্দুকধারী' কল্পনা করছে কিংবা লিলিপুটিয়ানদের দেশে গুলিভার-গুলিভার খেলছে। এ-ও হচ্ছে জাগ্রত কল্পনা শক্তির লক্ষণ। আর পরে হয়তো তার রূপকথা রচনা করার ইচ্ছে হবে। সে যদি তখনও লিখতে না পারে তাহলে তার মুখে-বলা রূপকথাটি নিজেই লিখে রাখবেন। তার সঙ্গে বসে গল্প রচনা করার চেষ্টা করে দেখবেন: কে ভালো পারে?

মৌখিক পাঠ। এতক্ষণ আমরা শিশুদের লেখ্য পাঠের কথা বললাম। অনুশীলনী, শ্রুতলিপি, রচনা — এ সমস্তকিছুই লেখ্য বিষয়।

কাজ থেকে বাড়ি ফিরে আমরা সর্বাগ্রে জিজ্ঞেস করি: 'লেখ্য পাঠ তৈরি

করেছিস?' লেখ্য পাঠ আমাদের কাছে আপনা থেকেই মুখ্য ব্যাপার বলে গণ্য হয়, আর বাদবাকী সমস্তকিছু — অর্থাৎ 'মৌখিক' সমস্তকিছু — আমরা গৌণ বলে বিবেচনা করি, আমাদের কাছে তার তেমন কোন গুরুত্ব নেই। আমরা মৌখিক বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ কম দিই, সব সময়ই ভাবি যে তা পরে দেখা যাবে, কিন্তু সেই 'পরে' আর কখনও আসে না।

এমন অনেক ছেলেমেয়ে আছে যাদের রচনা অকৃত্রিম, সুন্দর ও কল্পনা সমৃদ্ধ; কিন্তু যেই তাদের সারা ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে ওই একই বিষয়ে বলতে হয় অমনি তাদের ভাষা নিরস হয়ে পড়ে, মুখস্থ করা কথাগুলো কেমন যেন অস্পষ্ট মনে হয়, সময় সময় আবার কথায়ও কুলোয় না, এবং তখন আসে ক্লান্তিকর নীরবতা ও বিরতির মুহূর্তগুলো যা শ্রোতা ও বক্তা সবাইকেই সমানভাবে বিব্রত করে তুলে।

এই সমস্ত বিরতি থেকে রেহাই মেলে কীভাবে, শিশুকে তথাকথিত মৌখিক পাঠ প্রস্তুত করতে সাহায্য করা যায় কীভাবে, যাতে সে সহজে ও বিনা বাধায় মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারে?

এ ব্যাপারেও সবকিছু শুরু করা চাই তখন, যখন সে একেবারে ছোট। যে-সমস্ত ছেলেমেয়ে বাড়িতে বেশি গল্প করতে অভ্যস্ত এবং মাকে দেখা ফিল্ম বা পড়া বইয়ের সারমর্ম বলা যাদের জন্য এক চাহিদায় পরিণত হয়েছে তারা মুখে মুখে উত্তর দিতে পারে ভালো।

কিন্তু ধরুন, শিশু যখন প্রাক্‌স্কুলবয়স্ক ছিল, তখন নানান কারণে আপনারা তার প্রতি বেশি মনোযোগ দিতে পারেন নি এবং তার গল্প বলার অভ্যাস গড়ে উঠে নি। তবে শিশু স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর এ ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব। যেমন, তাকে প্রথম বার মৌখিক পাঠ তৈরি করতে বলা হল। কেবল এই প্রশ্নটি করেই ক্ষান্ত হবেন না: 'কীরে, মৌখিক পাঠ তৈরি করেছিস, বলতে পারবি তো?' আপনারা একটু বেশি কৌতূহলী হবেন: শিশু কীভাবে তার প্রথম মৌখিক পাঠটি প্রস্তুত করেছে, কত বার মূল পাঠটি পড়েছে, কীভাবে পড়েছে। প্রসঙ্গত, অনেকে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে যে মৌখিক বর্ণনার জন্য মূল পাঠ নাকি অবশ্যই উচ্চৈঃস্বরে পড়া উচিত। এমনও ছেলেমেয়ে আছে উচ্চ কণ্ঠে পঠন যাদের কেবল বাধা দেয়: তারা মনোযোগ দিয়ে নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে থাকে এবং একাগ্রচিত্ত হতে পারে না। তারা একাধিক বার পাঠ পড়লেও কোনকিছু মনে থাকে না। শিশু মনে মনে পড়তে চেষ্টা করুক। যদি এমতাবস্থায়ও বর্ণিতব্য বিষয়টি তার মুখস্থ না হয় তাহলে বিচলিত হবেন না, রাগ

করবেন না এবং, আসল কথা, শিশুকে বকবেন না। পাঠটি অর্থানুসারে কয়েকটি ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে নিন। সে এক-একটি অংশ পড়ুক ও বর্ণনা করার চেষ্টা করুক।

আপনাদের ছেলে যখন ৫ম-৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়বে, তখন তাকে ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে বড় বড় পাঠ তৈরি করতে হবে। সে যাতে দ্রুত ও মনোযোগ সহকারে এ ধরনের পাঠ তৈরি করতে পারে তার জন্য আপনাদের সাহায্য প্রয়োজন। তাকে পেন্সিল হাতে কাজ করতে শিখিয়ে দিন। একটি অনুচ্ছেদ পড়ে নিল—ব্যস, তার সারকথাটি সংক্ষেপে লিখে ফেলুক। এভাবে প্রথম বার পড়ার পর অনুচ্ছেদের সারমর্ম ধরা যাবে। দু'বার পড়ার পর পরিকল্পনা মতো অনুচ্ছেদের সারকথাটি নিজের কাছে বর্ণনা করা উচিত এবং একমাত্র তারপর মা বা বাবাকে শুনতে অনুরোধ করা যায়।

আপনাদের ছেলে অনুচ্ছেদের যে-সারমর্মটি প্রস্তুত করেছে তা হাতে নিয়ে দেখবেন, মনোযোগ সহকারে তার বর্ণনা শুনবেন এবং তার বাক্‌ধারার দিয়ে খেয়াল রাখবেন যাতে সে জোরে ও স্পষ্টভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করে, যাতে তার কথাগুলো আপনাদের নিজেদের শুনতে ভালো লাগে।

আপনাদের ছেলে দু'-তিন বার পড়ার পরও পাঠ মুখস্থ করতে পারে না, আর তার মানে তার চাক্ষুষ স্মরণশক্তি তেমন বিকশিত নয়। আর আপনারা যদি জানেন যে আপনাদের ছেলে শোনা কথা সহজে মনে রাখতে পারে তাহলে পাঠটি বার কয়েক তাকে পড়ে শোনালে ভালো বই খারাপ হবে না—আপনাদের পড়া শুনে শুনে সে তা মুখস্থ করে ফেলবে। অবশ্য এ ব্যাপারকে দৈনন্দিন নিয়মে পরিণত করা উচিত নয়: শিশু পাঠ স্মরণ করার এরূপ সহজ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে। তবে বিশেষ কঠিন মুহূর্তগুলোতে (যেমন, সময়ে কুলোচ্ছে না, শিশু ক্লান্ত হয়েছে) তাকে সাহায্য করা উচিত—তখন তার পক্ষে কঠিন উপায়টি ত্যাগ ক'রে সহজতর উপায়ে মৌখিক পাঠ প্রস্তুত করাই ভালো। আপনাদের এ সাহায্যের জন্য সে আপনাদের প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা বোধ করবে।

মনে রাখবেন, আপনাদের ছেলে বা মেয়ে যদি কম পড়ে (আর তা প্রায়ই ঘটে থাকে এই জন্য যে শিশুরা পড়ার কৌশল আয়ত্ত করতে পারে না) তাহলে ইতিহাস, ভূগোল ও সাহিত্যের পাঠ প্রস্তুত করতে তাদের অবশ্যই খুব কষ্ট হবে। এমতাবস্থায় সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে শিশুকে পঠন পদ্ধতি আয়ত্ত করতে সাহায্য করা।

ছেলে পড়তে ভালোবাসে না। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে: সাধারণত সেই সমস্ত ছেলেমেয়েই ভালো বলে ও ভালো লেখে যারা অনেক পড়ে ও বুঝেশুনে পড়ে। আর অন্য দিকে, যে-সমস্ত ছেলেমেয়ে কোন-না-কোন কারণে পড়তে ভালোবাসে না তাদের পক্ষে লেখাপড়া করতে খুবই কষ্ট হয়। অধিকাংশ মা-বাবার অভিযোগ হচ্ছে এ নয় যে ছেলেকে পড়তে বসানো যায় না, তাদের অভিযোগ হচ্ছে: ও কিছুতেই বই থেকে মাথা তুলতে চায় না। প্রতিটি স্বাভাবিক শিশুর মনে হাজারো প্রশ্ন ('কেন') জাগে, এবং সে ওগুলোর উত্তর পায় বইয়ে। বই তার অদম্য অনুসন্ধিৎসা আর অকল্পনীয় অ্যাডভেঞ্চারের বাসনা পরিতৃপ্ত করে।

তাহলে শিশুকে কীভাবে পড়তে শেখানো যায়? আপনারা জানেন যে শিশু অনেক কষ্টে শব্দাংশ দিয়ে শব্দ গড়ে, আর সেই জন্যই বাক্য পুরোপুরিভাবে শুনতে পায় না ও বুঝতে পারে না। এই ত্রুটি দূর করা সম্ভব একমাত্র উচ্চৈঃস্বরে ও বেশি ক'রে পড়ার মাধ্যমে। কিন্তু কৃত্রিমভাবে তা করা কঠিন ও ক্লান্তিকর। বহু মা-বাবাই আমাদের বলেছেন যে তাঁদের ছেলেমেয়েদের তাঁরা যখন জোরে পড়তে বাধ্য করেন তখন তা থেকে কোন ফল মিলে না: শিশু সে কাজটি করে দায় সারার মনোভাব নিয়ে, পড়ে নিরস কণ্ঠে এবং পঠিত বিষয়ের অর্থ বোঝার চেষ্টা করে না। পড়ার পর যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয় বইয়ে কী লেখা আছে সে অনেক সময় কিছুই বলতে পারে না।

তাই এই পড়ার কাজ যাতে ব্যর্থ না হয় সে জন্য কোনকিছু ভেবে বার করা দরকার, সামান্য শিক্ষামূলক চাতুরী প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

যেমন, আপনারা অফিসের পরে বাড়ি ফিরলেন, আপনাদের তাড়াতাড়ি গৃহস্থালির কিছু কাজ শেষ করতে হবে।

— বাবা, এখানে এসো তো। আমার এই বইটি পড়ার খুবই ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু সময় নেই। আমি যতক্ষণ বাসন ধোব, তুমি আমায় একটু পড়ে শোনাও।

তাহলে ছেলে বুঝবে যে সে স্রেফ পড়ার কৌশলই রপ্ত করছে না, একটি ভালো কাজও করছে। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে এমন বই খোঁজা দরকার যা শিশুকে আকৃষ্ট করতে পারে।

সে কুড়ি-তিরিশ মিনিট আপনায় পড়ে শোনাল। তাকে সময় মতো থামাবেন — বেশিক্ষণ পড়লে বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

— চমৎকার পড়েছ লক্ষ্মীটি, এবার আমার কাজ শেষ, এসো নিজেই তোমায় পড়ে শোনাই।

আপনি ছেলেকে বই পড়ে শোনাচ্ছেন। কাজটি করবেন যান্ত্রিকভাবে নয়, মনোযোগ সহকারে, ব্যঞ্জনা সহকারে, সাগ্রহে। অবোধ্য শব্দ দেখলে থামবেন এবং ছেলেকে তার অর্থ বুঝিয়ে দেবেন, আর নিজে তা করতে না পারলে অভিধানে শব্দটির অর্থ দেখে নেবেন। সবচেয়ে মজার জায়গাটি অবধি পেঁৗছলেন। তারপর কী? এবার আরও একটি চাতুরীর আশ্রয় নিতে চেষ্টা করুন।

— আরে, আমরা কী কান্ডটি করলাম: পড়ায় মজে গিয়ে রান্নাবান্নার কথা একেবারেই ভুলে গেছি!

শিশুর যদি বইটি পছন্দ হয়, সে যদি জানতে চায় পরে কী হল তাহলে সে অবশ্যই পড়ার কাজ অব্যাহত রাখবে, নিজে মনে মনে পড়ে যাবে।

তবে অবশ্য এমনও হতে পারে যে শিশুর জন্য অন্য কোন কাজ বা মজার জিনিস অপেক্ষা করছে, সে তার চিত্তাকর্ষক খেলাটি মাঝখানে ছেড়ে দিয়েছে, রাস্তায় বন্ধুরা তার অপেক্ষা করছে কিংবা বইটি তার মনে ধরে নি।

নিরাশ হবেন না, ভাববেন না যে আপনাদের সন্তান অলস এবং তার কোন কৌতূহলই নেই। আসল কথা, পিছু হটবেন না। বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট করার সংগ্রাম অব্যাহত রাখবেন। বুড়ো দিদিমাকে বই পড়ে শোনানোর দায়িত্ব তার উপর আরোপ করবেন—বলবেন যে দিদিমা চোখে ভালো দেখেন না এবং তাই তাঁর পক্ষে বই পড়া কঠিন (এমনকি তিনি পড়তে পারলেও তা-ই বলবেন)। সে যেন ছোট বোনকেও তার চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে বই পড়ে শোনায়। তাকে কথা দেবেন যে তাকে পঠিত বইটি অবলম্বনে তৈরি ফিল্ম দেখাতে নিয়ে যাবেন। তবে এর আগে দাবি করবেন, সে যেন আপনায় বইটির সারমর্ম বলে।

— আপনি বলছেন যে আপনার ছেলে পড়তে ভালোবাসে না। আসুন দেখা যাক, সে পড়তে পারে কি না। হয়তো সে এখনও পড়তে জানে না?

— পড়তে জানে, আসলে ও ভীষণ অলস।

— তা হতেই পারে না। আপনি যদি এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকেন যে সে সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দে পড়তে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পড়ার কাজ হচ্ছে তার পক্ষে এক ক্লেশকর ব্যাপার, তাহলে বিশ্লেষণ করে দেখবেন স্বনির্ভর পঠনের জন্য প্রথম বইগুলো নির্বাচনে কোন ভুলত্রুটি রয়েছে কি না।

আরও অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা মনে রাখবেন। শিশুকে সর্বদা রঙীন ছবিযুক্ত সুন্দর বই উপহার দেবেন। যত ঘন ঘন বই উপহার দেবেন ততই ভালো। শিশু যেই একটু অবাধে পড়তে শিখে ফেলবে অমনি তাকে নিকটতম গ্রন্থাগারে নিয়ে যাবেন। যে কোন গ্রন্থাগারে যায় না সে পাঠকই নয়। খেয়াল রাখবেন, গ্রন্থাগার থেকে বই এনে সে যেন কেবল তার পাতাগুলো উল্টিয়ে ছবি দেখেই ক্ষান্ত না হয়। অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন, বইখানি চিত্তাকর্ষক কি না। প্রসঙ্গত, অনেককিছুই তো নির্ভর করে প্রথম বইগুলো কতটা মনোগ্রাহী তার উপর।

প্রথম বইগুলো বাছা কঠিন। এ ব্যাপারে পাঠক হিশেবে নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই আপনাদের ভালো সাহায্য করতে পারে না। স্মরণ করুন, এরূপ বয়সে কোন্ কোন্ বই পড়ে আপনারা নিজেরা বেশি আনন্দ পেয়েছিলেন, এবং শিশুকে ঠিক ওই বইগুলোই এনে দেবেন। ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ আরও এই কারণে যে ওই বইগুলো সম্পর্কে নিজের ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে অনেককিছুই বলতে পারবেন, কেননা ওগুলোর সারমর্ম আপনাদের মনে আছে। আর তা অবশ্য খুবই প্রয়োজনীয়। আপনারা কখনও মনে এরূপ আশা পোষণ করবেন না যে স্কুলের লাইব্রেরিয়ান তাঁর প্রত্যেক শিশু পাঠকের সঙ্গে পঠিত বই সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন: ও রকম পাঠক তাঁর আছে শত শত।

তাছাড়া অনেককিছু অবশ্য নির্ভর করে বই আপনার নিজের জীবনে কী ভূমিকা পালন করে তার উপরও।

লালনপালন ও শিক্ষাদানের কাজে কোনকিছুই অকস্মাৎ বা আপনা-আপনি ঘটে না। আপনারা যদি চান যে আপনাদের ছেলেমেয়ে কোনকিছু শিখুক ও অর্জন করুক তাহলে সে ব্যাপারে তাদের অনুপ্রাণিত করতে হবে, আর তার মানে নিজের প্রিয় কাজের দ্বারা তাদের 'সংক্রামিত' করতে হবে।

অভ্যাস থেকে গড়ে উঠে চরিত্র। প্রখ্যাত রুশ শিক্ষাবিদ কনস্তান্তিন উশিন্‌স্কি লিখেছেন: 'গুরুত্বপূর্ণ কাজ শিশুর পক্ষে চিত্তাকর্ষক করে তোলা—এ হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য। যেকোন সুস্থ শিশু ক্রিয়াকলাপের—গম্ভীর ক্রিয়াকলাপের চাহিদা অনুভব করে। ...সুতরাং, প্রথম ক্লাসগুলো থেকেই শিশুকে তার দায়দায়িত্ব ভালোবাসতে এবং তা সম্পাদন ক'রে আনন্দ উপভোগ করতে শেখাবেন।'

ক্রিয়াকলাপের চাহিদা—এ হচ্ছে যেকোন সুস্থ শিশুর মানসিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য। পারিপার্শ্বিক বিশ্বকে জানার সঙ্গে সঙ্গে সে এই বিশ্বে কাজ করতে প্রয়াসী হয়।

আপনারা বুঝতেই পারছেন যে শিশুর মানসিক বিকাশের বর্ণিত বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ ক্রিয়াকলাপের ইচ্ছা এবং শ্রমশীলতার মধ্যে ব্যবধান অনেক, এবং এ দুয়ের মধ্যে সমান চিহ্ন বসানো যায় না। শিক্ষকদের কর্তব্য হচ্ছে এই প্রকৃতি প্রদত্ত প্রবণতাকে — যা হচ্ছে শ্রমশীলতার কেবল পূর্বশর্ত — নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গুণে রূপান্তরিত করা।

তা কীভাবে করা সম্ভব? অভ্যাসের কথা বলা যাক। আমরা জানি যে অভ্যাস হচ্ছে মানুষের 'দ্বিতীয় স্বভাব'। সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে শ্রমাভ্যাস গড়া, এবং মা-বাবারা যেন কখনও এ ব্যাপারে দ্রুত ও সহজ ফল লাভের আশা না করেন। প্রথমত, এই জন্য যে শ্রমের প্রতি আসক্তি গড়ে উঠে কেবল শ্রমে, আর দ্বিতীয়ত, এই জন্য যে যেকোন শ্রম জড়িত রয়েছে অপারদর্শিতা অতিক্রমণের সঙ্গে, প্রয়াসের সঙ্গে, ক্লান্তি আর চাপের সঙ্গে। কেবল কষ্টকাঠিন্য ও অপারদর্শিতা অতিক্রম ক'রে শিশু ধীরে ধীরে এই অতিক্রমণের মধ্যেই তৃপ্তি লাভ করে।

এত কাল যে-কাজটি তার হাতে উৎরায় নি এবার তা উৎরেছে! অর্জিত হল আরও একটা দক্ষতা। শিশুর আবেগময় জীবনে সে হচ্ছে অতি গুরুত্বপূর্ণ এক মুহূর্ত, যার দিকে মনোযোগ না দিয়ে পারা যায় না। শিশু আনন্দ লাভ করে এবং সে চায় যে তার চারিপাশের সবাইও যেন সেই আনন্দের ভাগী হয়। এই প্রথম বার সে সবিস্ময়ে তাকাচ্ছে তার হাত দু'টির দিকে, যা এতকাল কেবল নিতেই জানত, আর এখন কিছু একটা করতে শিখল।

শুরু করা উচিত খুবই অল্প বয়সে—স্বয়ং পরিবেশন (সেল্‌ফ সার্ভিস) দিয়ে। প্রথম দিকে কত ধৈর্যের দরকার! মায়েরা—আর বাবাদের কথা না-ই বা বললাম—সব সময় ভীষণ তাড়াহুড়ো করেন। ২-৩ বছর বয়সের শিশুকে কাপড় পরানো মোটেই সহজ কাজ নয়। সে ছটফট করে, পালিয়ে যায়। তাকে নিজেকে যদি কাপড়-জুতো পরতে দেওয়া হয় তাহলে সে ও-কাজে কতক্ষণ সময় লাগাবে!

এই তো দ্যাখুন না, বরাবরকার মতো জুতো জোড়া পরেছে উল্টো। 'ঠিক পরিস নি,—এই নিয়ে কত বার আপনি শান্তভাবে ও ধৈর্য সহকারে

বলছেন,—জুতোগুলো এভাবে রাখ যাতে ওগুলোর ডগা সামনের দিকে তাকায়। বিভিন্ন দিকে তাকালে বুঝবি যে উল্টো পরেছিস।'

শিশু যতকাল এই 'বিজ্ঞান' আয়ত্ত না করছে ততকাল এই একই কথা বলা উচিত প্রতি দিন। এবার সে পরার আগে জুতোগুলো প্রথমে পাশাপাশি রাখবে, এবং ওগুলোর ডগা সামনের দিকে তাকাচ্ছে কি না কেবল সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পরই তা পরতে শুরু করবে। প্রতি বার সে এ কাজটি করবে আগের চেয়ে তাড়াতাড়ি, বেশি দক্ষতার সঙ্গে, ক্রমশই স্বয়ংক্রিয়তা অর্জন করবে যার কল্যাণে শক্তি ব্যয় হবে কম, আর চাপের সঙ্গে জড়িত অপ্রীতিকর ভাবাবেগ একেবারেই দূর হয়ে যাবে।

— শিশু যা করতে চায় না তাকে দিয়ে তা করানো তেমন সহজ কাজ নয়। জবরদস্তি তার মধ্যে প্রতিবাদের উদ্রেক করবে, আর এর ফলে শ্রমের প্রতি বিদ্বেষ দেখা দিতে পারে।

—শিশুকে কাজ করতে বাধ্য করবেন না, শ্রমের প্রতি তার অনুরাগ গড়ে তুলবেন। ধীরে ধীরে, ধৈর্য সহকারে, অটলভাবে। তাকে নিজের বাসনা নিয়ন্ত্রণ করতে শেখাবেন, তার মধ্যে মনোবলের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ গুণটি গড়তে চেষ্টা করবেন।

একই কথা বলা যায় বোতাম, জুতোর ফিতে, বাক্‌লস্‌ ইত্যাদির বিষয়ে। পুরোপুরিভাবে অভ্যস্ত না পর্যন্ত শিশুকে এ সমস্তকিছুই গভীর ধৈর্য সহকারে শিখিয়ে যেতে হয়।

যেমন, হাত-মুখ ধোওয়ার ব্যাপারটিই ধরুন না কেন। পিছলা সাবান সব সময় অপটু ছোট হাতগুলো থেকে পড়ে যায়। আর শিশু মুখ কীভাবে ধোয়: হাত দিয়ে নাক আর ঠোঁট মোছার সঙ্গে সঙ্গে হাতের তালুটিও একবার চেটে নিতে ভুলে না। তখন অর্ধেক জল এসে পড়ে পোশাকে, আস্তিন যায় ভিজে। তোয়ালে ব্যবহার করাও এক সাধ্যাতীত কাজ।

ধৈর্য ধরুন: পাঁচ বার, দশ বার দেখিয়ে দিন জল আটকে রাখার জন্য কীভাবে হাতের তালুগুলো নৌকোর মতো বাঁকাতে হয়, ভিজে না যাওয়ার জন্য হাত-মুখ ধোওয়ার জায়গার উপর কীভাবে নত হতে হয়। শান্তভাবে ও সস্নেহে বুঝিয়ে দিন যে তোয়ালে রাখতে হয় হাতের তালুতে, প্রথমে এক তালুতে, আর পরে অন্যটিতে; তাহলে হাতগুলো মুছতে সুবিধা হয়।

বাড়িতে যে বাচ্চা আছে তা বোঝা যায় প্রথম দৃষ্টিতেই। সে ব্যাপারে ভুল করার কোন কারণ থাকতে পারে না। আপনার চোখের সামনে কত

খেলনা!.. ওগুলো ছড়ানো আছে ঘরময়। শিশুকে হাজার বার বলা সত্ত্বেও সে ওগুলো কখনও নির্দিষ্ট জায়গায় রাখে না। খেলনা দেখা যায় এমনকি সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত স্থানেও। আর সে জন্য দোষী খোদ বড়রা। তাঁরা কেবল শিশুকে খেলনাগুলো ঘরের কোন কোণে, আলমারিতে বা তাকে রাখার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত দেন। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। যতদিন শিশুর এ-কাজটি নিজে করার অভ্যাস গড়ে না উঠছে ততদিন পর্যন্ত তাকে সাহায্য করা উচিত।

একই কথা খাটে পোশাকের ক্ষেত্রে। বাইরে থেকে বেড়িয়ে এল — নিজেই ওভারকোটটি হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখুক। ঘুমানোর আগে নিজের কাপড়চোপড় চেয়ারের উপর ভাঁজ ক'রে রাখুক।

বয়স বাড়ার সঙ্গে স্বয়ং পরিবেশনের পরিধিও বাড়ে। পাঁচ বছর বয়স নাগাদ শিশুকে বিছানা পাততে ও বিছানা তুলতে অভ্যস্ত করানো যায়।

ওলিয়া এতকাল চারিদিকে বেড়া লাগানো খাটে ঘুমাত। এখন সে বড় হয়েছে। মা-বাবা তার জন্য ছোট্ট একখানি সোফা কিনে আনলেন। তখন ওলিয়ার কী আনন্দ!

প্রথম সন্ধ্যায়ই ওলিয়া বলল: 'আমি নিজে বিছানা পাতব।' প্রথম দিকে সে অবশ্য কোন মতেই বিছানা করতে পারছিল না। বিছানার চাদরটিই ছিল বিশেষ অবাধ্য, কোথাও বেঁকে যাচ্ছিল, কোথাও কুঁচকে যাচ্ছিল। তবে কয়েক দিন পরে চাদর মেয়েটির 'কথা শুনতে' লাগল। ওলিয়া নিজের দক্ষতায় কী গর্বিত হয়েছিল!

— আমি নিজে বোতামটি সেলাই করব।

— তুই পারবি না।

— তা তুমি দেখিয়ে দাও না কীভাবে করতে হয়।

— আমার অত সময় নেই।

— আর লেনা কভালেভা বোতাম সেলাই করতে পারে। সে এমনকি তার বাবা আর ভাইয়ের শার্টে বোতাম লাগিয়ে দেয়।

'বড়দের' কাজ। — দিদিমা, আমায় সিণ্ডেরেলা-র গল্প বলো।

— সেরিওজাকে বল, ও তোকে পড়ে শোনাবে। তোর তো বই আছে।

— না দিদিমা, বইতে একেবারে অন্য সিণ্ডেরেলা। আমি তোমার সুন্দর গল্পটি শুনতে চাই।

— ঠিক আছে,—বলেন দিদিমা আন্না সের্গেয়েভনা,—এক্ষুনি বলছি। তবে আগে সেলাইয়ের কাজটা সেরে নিতে দে।

ইউলিয়া টুলের উপর আরাম ক'রে বসল এবং ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে লাগল। তার দিদিমার মতো আর কেউ এত ভালো গল্প বলতে পারে না।

— ...সৎমা'র নিজের মেয়েরা ছিল অলস, জেদী ও বদমেজাজী। তারা সারা দিন কোনকিছু করত না, কেবল মিটাই, বিস্কুট আর চকলেট খেত, একে অন্যকে হিংসে করত এবং তাদের ঝগড়াঝাঁটির কোন অন্ত ছিল না। কাজ না ক'রে ক'রে তারা ভীষণ মোটা হয়ে গেল, নড়াচড়া করতে পারত না। তাদের মুখগুলো ছিল ফ্যাকাশে, আর দাঁতগুলোতে সব সময় ব্যথা করত।

— খুব ভালো, ওদের তা-ই দরকার,—মন্তব্য করে ইউলিয়া। তার মনে আছে, এক সপ্তাহ আগে যখন তার দাঁত ব্যথা হয়েছিল তখন কেমন ক'রে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদেছে।

— কিন্তু সিন্ডেরেলা বাড়িতে সব কাজ করত: কাপড় কাচত, ইস্ত্রি করত, বাসন মাজত, চুলোয় আগুন ধরাত, রান্নাবান্না করত, নদী থেকে জল আনত। সে দিনে দিনে নয়, ঘণ্টায় ঘণ্টায় সুন্দর হয়ে উঠছিল। সে সবকিছুই করত খুশি মনে, সানন্দে এবং কাজ করার সময় সর্বদা মজার মজার গান গাইত। তার হাতগুলো ছিল নিপুণ ও শক্তিশালী—সে যেকোন কাজ তাড়াতাড়ি করতে পারত। মেঝে মুছতে মুছতে সিন্ডেরেলা নাচতে শিখে ফেলল। সারা রাজ্যে তার মতো ভালো নর্তকী আর ছিল না। সব সময় সে সবজি ভুঁইয়ে কাজ করত, রোদে থেকে থেকে তার মুখটি লাল হয়ে গিয়েছিল আর চোখগুলো হয়ে উঠেছিল উজ্জ্বল। সৎমা সিন্ডেরেলাকে তিক্ত-বিরক্ত করার ইচ্ছায় তাকে হামেশা নতুন নতুন কাজ দিত, আর সিন্ডেরেলা তাতে কেবল আনন্দিতই হত, কেননা সে জানত: কাজ মানুষকে সুন্দর ও উদার করে...

ইউলিয়া চায় না যে দিদিমার গল্প শেষ হোক। গল্পটি তার খুব ভালো লাগে, কারণ তাতে সমস্তকিছুই যুক্তিভিত্তিক ও ন্যায়সঙ্গত। আর সিন্ডেরেলা অবশেষে যে-সুখ ভোগ করতে লাগল তা তার প্রাপ্যই ছিল।

— এসো দিদিমা, আমরা এবার খেলব, ধরো আমি সিন্ডেরেলা!

— চল্‌ খেলা যাক,—বলেন আন্না সের্গেয়েভনা।

— তবে তুমি আমায় বড়দের কোন একটি কাজ দাও।

— আয়, তুই আমায় সেলাইয়ের কাজে সাহায্য কোর। দ্যাখ কীভাবে তা করতে হয়। আর পরে নিজে সুতো কাটবি।

— আমি কাজ করতে করতে গানও গাইব, কেমন?

— ঠিক আছে।

ইউলিয়া আনন্দে তার প্রিয় গানটি ধরে: 'কাঁদিস না, ও খুকীটি; এক্ষুনি ধরবে বৃষ্টি...' কিন্তু একই সঙ্গে কাজ ও গান করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। সেলাইয়ের কাজে মনোযোগ দরকার। আর আসল কথা — জিহ্বাও তাতে অংশ নেবে। ইউলিয়ার এরূপ এক অভ্যাস আছে: যখন সে মন দিয়ে কোনকিছু করে তখন তার জিহ্বাটি কেন যেন বেরিয়ে আসে।

ইউলিয়া 'বড়দের' কাজ করতে খুব ভালোবাসে। তবে তা সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে উৎরায় না। এমতাবস্থায় দিদিমা বলেন: 'ধৈর্য ধর। এক-দু' বার করার পরই সহজ লাগবে। আসল কথা, আগ্রহ থাকা দরকার।'

আন্না সের্গেয়েভনা নিজে কাজ করেন সহজে ও খুশি মনে। তিনি কেমন দ্রুত ও নিপুণভাবে কাজ করেন তা দেখতেও ভালো লাগে। তাঁর প্রিয় প্রবাদ বাক্য: 'চোখ পায় ভয়, হাত করে কাজ।' বাড়িতে বেশি কাজ থাকলেই তিনি এ কথা বলেন। ইউলিয়া সাগ্রহে সর্বদা তাঁকে সাহায্য করে। সে সমস্তকিছুই করে খুব মন দিয়ে, নিখুঁতভাবে: তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কাজের ফল। পিয়ানোর উপর থেকে ধুলো মুছে সে সামান্য দূরে সরে গিয়ে ওটার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকায়: একটা ধূলিকণাও নেই। খাওয়ার আগে টেবিল সাজানোর সময় ইউলিয়া হামেশা নিজেকে যাচাই করে: 'তাহলে পাঁচটি প্লেট, এক দুই তিন চার পাঁচটি কাঁটা, এই তো রুটির পাত্র, নেপকিন... কিছু একটা কম পড়ছে... ও হ্যাঁ, লবণ!' আর সেরিওজার অন্য দায়িত্ব — খাওয়া-দাওয়ার পর সে টেবিল পরিষ্কার করে।

তবে অন্য রকমের ব্যাপারও ঘটে। একদিন ক্লাস ঝাড়াই-মোছাইয়ের সময় পঞ্চম শ্রেণীর এক মেয়ে হাতে ন্যাকড়া নিতে হল বলে... কেঁদেই ফেলল। মেয়েটি প্রথমে সসঙ্কোচে দু' আঙুল দিয়ে মেঝে থেকে ন্যাকড়াটি একটু তুলল, তারপর জলপূর্ণ বালতিতে ফেলে দিয়ে সোজা বলে দিল যে সে বেঞ্চ-ডেস্ক কিছুই মুছবে না। তাকে 'ময়লা মুছতে' হবে — কেবল এই ধারণাটিই তার মধ্যে দৈহিক বিদ্বেষের উদ্রেক করে। আর ছেলেমেয়েরা যখন বিক্ষুব্ধ হয়ে তাকে 'বড় লোকের মেয়ে', 'মায়ের আদুরে মেয়ে' ইত্যাদি বলে অভিহিত করতে লাগল তখন সে কেঁদে ফেলল।

বাড়িতে এই মেয়েটিকে কোন কাজই করতে দেওয়া হত না। বারো বছরের মেয়ে তাতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল: তার ঘরটি সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঘুম থেকে উঠার পর ফেলে-রাখা বিছানাটি গোছানো, খাবার তৈরি, তার জামাকাপড় ধোওয়া ও ইস্ত্রি করা। সে কখনও ভাবে না যে মা পরিশ্রম ক'রে এ সব কাজ করেছেন। তাকে এই ভাবেই মানুষ করা হয়েছে। সে পড়াশোনায় ভালো, তাকে অলস বলা যায় না। কিন্তু লেখাপড়া করা—এ হচ্ছে তার কর্তব্য। তা সে ভালো বোঝে। আর তার সেবাযত্ন করা—সে হচ্ছে মায়ের দায়িত্ব। এ জিনিসটিও সে বেশ ভালো ক'রে আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে। এ কথাটি কখনও তার মাথায় আসবে না: 'মা, তুমি যাও একটু বসো, আমি নিজেই বাসনটা ধুয়ে নিচ্ছি।'

— হ্যাঁ,—দুঃখ ক'রে বলেন মা,—ও ভীষণ নির্দয়। একবার রাতের খাবারের পর আমি শুয়ে ছিলাম: শরীরটা খারাপ লাগছিল। দেখলাম ও নিজের ঘরে আলমারিতে কী খুঁজছে।

— আমার ট্রেনিং ড্রেস কোথায়?

— আমি ওটা জলে ভিজিয়ে রেখেছি,—বললাম আমি।

— খুব ভালো করেছ, আর কাল আমার শরীরচর্চার ক্লাস।

— তুই নিজে কেচে নে মা, ও সহজ কাজ।

— কী, আমি নিজে কাচব! আর তুমি কী করছ?—সে এমনকি স্তম্ভিত হয়ে গেল।

— আমার শরীর খারাপ করেছে।

ও যেন আমার কাটা ঘায়ে নুন ছিটিয়ে দিল:

— তোমার শরীর খারাপ হয়েছে বলে কাল শরীরচর্চার ক্লাসে আমি গোল্লা পাবে।

কথাটি বলতে তার মুখে বাধল না। আমায় উঠে কেচে দিতে হল। ও এমনকি ধন্যবাদও বলল না।

বাড়িতে কাজকর্ম যেন শিশুর জীবনে আকস্মিক না হয়ে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়। তা শ্রমাভ্যাস গড়ে তুলে। তার থাকা চাই স্থায়ী চরিত্র।

শিশুদের অবশ্যই স্থায়ী কিছু কর্তব্য থাকতে হবে। একমাত্র তখনই শ্রম শিক্ষামূলক ব্যাপারে পরিণত হতে পারে। স্থায়ী কর্তব্য গড়ে তুলে গুরুত্বপূর্ণ এক গুণ—দায়িত্ব বোধ। বছরে বছরে কর্তব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তা জটিল হয়ে উঠে। এটা ঠিক যে মা অনেক তাড়াতাড়ি মেঝে

মুছতে, বাসন ধুতে ও ফুলগাছে জল দিতে পারেন। তবে সে কাজ যদি ছয় বছরের মারিনা করে তাহলে বিশেষ ভালো হয়। তাতে তার খুব উপকার হবে। দিনে দিনে সে তা ভালো ও নিখুঁতভাবে করতে থাকবে। কিণ্ডারগার্টেনে মা যখন বলেন যে তাঁর মেয়ে বাড়িতে তাঁকে কত সাহায্য করে তখন সে গভীর আনন্দ লাভ করে ও নিজের দক্ষতার জন্য গর্বিত হয়। বাড়ির অন্য কেউ যদি হঠাৎ ধুলো মুছতে কিংবা ফুলগাছে জল দিতে আরম্ভ করে তাহলে মারিনা ভীষণ রাগ করে: 'এ যে আমার কাজ!' আগামী বছর সে স্কুলে যাবে, তাকে শেখাতে হবে না কীভাবে বইখাতা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়, পড়া তৈরি করার কথা বলতে হবে না। সে এটা ভালো ক'রে আয়ত্ত করে নিয়েছে যে কর্তব্য বা দায়িত্ব হচ্ছে এমন গুরুত্বপূর্ণ ও অটল কোনকিছু যা পালন না করে পারা যায় না।

— আমার কাতিয়ার এ বছর সাত পূর্ণ হল — শিগগিরই স্কুলে যাবে। কিছুই শেখাই নি। ভাবছেন, ভালো করি নি? ও-সব বাজে কথা। দেখবেন, সবই ঠিক শেখে নেবে। না শিখে যাবে কোথায়! তদুপরি শৈশবের কথা স্মরণ করার মতোও অনেককিছু থাকবে।

— আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। আপনি হয়তো চান যে আপনার মেয়ে যেন ভালো পড়াশোনা করে। আর লেখাপড়া হচ্ছে শ্রম, এবং তা-ও আবার কঠিন শ্রম যা প্রচুর প্রয়াস ও অধ্যবসায় দাবি করে। এই সমস্ত গুণ সে কোত্থেকে পাবে? তা শিশুর মধ্যে গড়তে হয় খুবই অল্প বয়সে, ধীরে ধীরে ও ধৈর্য সহকারে। শ্রম দক্ষতা তার জীবনে তো কাজে লাগবেই, তাছাড়া তা মানসিক বিকাশেও সাহায্য করে।

মানুষের জীবনে শ্রম দক্ষতার বিপুল তাৎপর্য রয়েছে। শ্রম দক্ষতার কল্যাণে আমরা সৃজনমূলক কাজ করতে পারি, কেননা তা কাজের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে ভাবার প্রয়োজনীয়তা থেকে আমাদের বুদ্ধিকে মুক্ত করে। সেই জন্যই নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন আর পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শিশুর মধ্যে শ্রমাভ্যাস গড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের দক্ষতাও বিকশিত করা উচিত। যতদিন পর্যন্ত গতিতে স্বয়ংক্রিয়তা না আসছে এবং কাজ যান্ত্রিকভাবে সম্পাদিত না হচ্ছে (অবশ্য চেতনার সামান্য নিয়ন্ত্রণ থাকবেই) ততদিন পর্যন্ত সে দক্ষতা বিকশিত করার ব্যাপারটি অব্যাহত রাখতে হবে।

দক্ষতা শ্রমাভ্যাস দৃঢ় করে। দক্ষতা ছাড়া শ্রমাভ্যাস গড়ে উঠতে পারে না। শিবিরে ছুটি কাটাতে গিয়ে যে-সমস্ত ছেলে নদীতে গেঞ্জিটি কাচতে

জানে না, আলু সেদ্ধ হয়েছে কি না তা বুঝতে পারে না, পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে জানে না তাদের দেখলে দুঃখই হয়।

মায়েরা এই ছেলেদের বাড়িতে কোনকিছু করতে না দিয়ে তাদের অপকার বই উপকার করেন নি।

'উচিত' বলে একটা কথা আছে। সংক্ষিপ্ত, নির্দয় ও আদেশের মতো কঠোর। উচিত!—এবং তার মানে করতেই হবে। 'পারব না', 'ইচ্ছে নেই' বললে চলবে না, করতে হবেই। যাদের উপস্থিত মুহূর্তে যা করতে ইচ্ছে হচ্ছে তা নয়, যা করা উচিত তা করার অভ্যাস আছে, তাদের লোকে শ্রদ্ধা করে, শক্তিশালী, দৃঢ়চিত্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বলে গণ্য করে। আর শ্রমাভ্যাসগুলোর মধ্যে এটা প্রায় সর্বপ্রধান অভ্যাস। একেবারে অল্প বয়স থেকেই এই অভ্যাস বিকাশের দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। কীভাবে তা করা যায়? খুবই সাধারণভাবে: সবই শুরু হয় সামান্য ব্যাপার দিয়ে: 'খেলনাগুলো তুলে না রাখলে বেড়াতে যেতে পারবি না।' শিশু অবশ্যই প্রতিবাদ করে। সে জেদ ধরে, কিন্তু আপনি অটল। এবং এভাবে চলবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন না প্রথমে যা 'উচিত', আর পরে যা 'চাই' তা করার অভ্যাস গড়ে উঠছে। এই অভ্যাসটি হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি গঠনের পূর্বশর্ত। 'সম্ভব', প্রয়োজন', 'উচিত', 'অনুচিত' — অল্প বয়সেই শিশুকে এই কথাগুলোর পার্থক্য বুঝতে পারা উচিত।

'অনুচিত' কথাটিতে শিশুকে অভ্যস্ত করানোর মানে হচ্ছে তাকে তার বাসনা সংযত করতে, ওগুলো পরিবর্তিত করতে শেখানো, অর্থাৎ, অন্য কথায়, সবচেয়ে প্রাথমিক আকারে শিশুর আত্মসংগঠন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গড়ে তোলা যা তার দৃঢ় সঙ্কল্পতা বিকাশে বিপুল এক তাৎপর্য বহন করে।

ছেলেমেয়েদের দ্বারা প্রকাশিত সঙ্কল্প হচ্ছে শৈশবে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে নয়, যেভাবে উচিত সেভাবে কোনকিছু করার গঠিত অভ্যাসের ফল। মা-বাবাদের স্মরণ রাখা উচিত যে শিশুর চরিত্রে আপনা-আপনিই সংকল্পের উৎপত্তি ঘটে না। শিশু যখন ছোট, তখন নিজেকে কোনকিছু করতে বাধ্য করা কিংবা বাসনা দমন করা তার পক্ষে কঠিন, সে যা চায় তা ছাড়তে পারে না। প্রথম দিকে মা-বাবার ধৈর্য, ইচ্ছাশক্তি আর অটলতা তাকে বিভিন্ন যুক্তিসিদ্ধ ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করতে সাহায্য করে।

শিক্ষাদীক্ষার প্রথম বছরগুলোতে শিশুর চেতনায় এ কথাটি বদ্ধমূল করে

দেওয়া উচিত যে শিক্ষা হচ্ছে এমন এক শ্রম যা ইচ্ছাশক্তি, মনোযোগ আর মেধাগত সক্রিয়তা দাবি করে। এই সমস্ত গুণ গড়তে হলে আগে বেশকিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করতে হয়। শিশু যাতে শ্রমশীলতাকে প্রধান ক্ষেত্রে, অথবা, মনস্তত্ত্ববিদদের ভাষায়, 'মুখ্য ক্রিয়াকলাপের' ক্ষেত্রে, অর্থাৎ শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ করতে পারে তার জন্য তাকে প্রস্তুত করে তোলা চাই।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শ্রমাভ্যাস হচ্ছে মানুষের আচরণের স্থায়ী এক রূপ এবং তা তার সমস্ত ক্রিয়াকলাপের উপর নির্দিষ্ট ছাপ ফেলে। প্রসঙ্গত, গ্রীক ভাষায় 'ছাপ', 'প্রভাব' শব্দগুলোর মানে হচ্ছে — 'চরিত্র'। আর এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে মানুষের অন্যান্য মানসিক গুণ আর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলে অভ্যাসগুলো চরিত্র গঠন করে। সেই জন্যই তো লোকে বলে: 'যেমন অভ্যাস গড়বে, তেমনি চরিত্র হবে।'

খেলা ও শ্রম

এমন কিছু কাজ রয়েছে যেগুলোর সাহায্যে শিক্ষক মুহূর্তের মধ্যে মেলামেশার আনন্দপূর্ণ পরিবেশ গড়তে এবং শিশুদের মধ্যে প্রস্তাবিত ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের তীব্র বাসনা জাগাতে সক্ষম। ক্রীড়ামূলক কাজ তার মধ্যেই পড়ে।

প্রতিটি পদ্ধতির নিজস্ব ভালো দিক রয়েছে। অন্যান্য ধরনের প্রভাবের থেকে ক্রীড়ামূলক কাজের পার্থক্যটি হচ্ছে এই যে শিশুদের সামনে এমন একটি পরিস্থিতি গড়ে উঠে যা তাদের নিজে নিজে প্রয়োজনীয় কাজটি বেছে নিতে ও সম্পন্ন করতে বাধ্য করে।

আসুন, আমাদের ছেলেমেয়েদের সমবয়সী এবং তাদের প্রিয় পাত্র — 'প্রতিভাধর শিক্ষাবিদ' টম সোয়ের-এর (মার্ক টোয়েন, — 'টম সোয়েরের অ্যাডভেঞ্চার') ক্রিয়াকলাপে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। নৈরাশ্যের সেই কঠিন মুহূর্তে অনুপ্রেরণা তাকে কৃপা করল! ওই মুহূর্তে — যখন সবাই স্নান করতে যাচ্ছিল আর তাকে অতি লম্বা একটা বেড়া রঙ করতে হচ্ছিল — তার মাথায় প্রতিভাদীপ্ত শিক্ষামূলক একটা চিন্তা এল!

— কী, কাজ করতে বাধ্য করছে? — টমকে সহানুভূতি জানায় তার বন্ধু বেন। টম ভাবাবেগে, অবিশ্বাস রকমের আনন্দ প্রকাশের মাধ্যমে সর্বপ্রকার

পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি তার পূর্ণ উদাসীনতা এবং বেড়া রঙ করার প্রতি অসাধারণ প্রবল এক আকর্ষণ প্রদর্শন করল। সে শিল্পীর মতো তুলি চালিয়ে যাচ্ছিল এবং বার বার পেছনে সরে গিয়ে নিজের হাতের কাজ দেখে মুগ্ধ হচ্ছিল। বেন যখন নব্যাবির্ভূত জাদুকরের রহস্য উপলব্ধির বাসনায় অত্যধিক অভিভূত হয়ে পড়েছিল, তখন টম বলল:

— জানিস, আমি তোকে এটা দিতে পারি না। সবার দ্বারা এ কাজ হবে না...

— আমি তোকে আমার আপেলের মাঝখানটা দিয়ে দেব, — নিজের সম্পদের সেরা অংশটি উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয় বেন।

আর এই কথাগুলোর জবাবে টম সোয়েরের শিক্ষণ প্রতিভা বলে:

— ঠিক আছে! না, দিতে পারি না...

— আমি তোকে পুরো আপেলটা দেব, — নিজের সমস্ত সম্পদ বাড়িয়ে দিয়ে মিনতি করে বেন। উদার টমের কৃপা হল: সে বেশ অনিচ্ছার সঙ্গে তুলি আর রঙের বালতিটি দিল। বেন ক্ষিপ্তের মতো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

না, টমের এরূপ কারসাজির আশ্রয় নেওয়া উচিত নয় আমাদের। তবে তার ক্রিয়াকলাপে সত্যিই অসাধারণ কিছু রয়েছে। যেমন, অনুপলব্ধ অনুমান: চিত্তাকর্ষক নয় এমন শ্রমের প্রতি কাউকে আকৃষ্ট করতে হলে সে শ্রমের অফুরন্ত সৌন্দর্য দেখানো উচিত, তা কত আনন্দ দিতে পারে তা বোঝানো উচিত, — সে আনন্দ আপেল, সূর্যালোক, নদী ইত্যাদির মতো জীবনের উৎকৃষ্ট উপহারগুলো উপভোগের চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর।

আপনি যদি শিশুর মন জয় করতে ও তাকে হিতকর শ্রমের প্রতি আকৃষ্ট করতে চান, তাহলে নিজের 'বড়ত্ব' ছাড়ুন, নতুবা শিশু ভয় পাবে, আপনার কাছেও ঘেঁষবে না।

আপনি যদি শিশুর মধ্যে খাটার সামান্যতম চাহিদাও আবিষ্কার করতে সক্ষম হন তাহলে কাজ করার এই আনন্দপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে জীইয়ে রাখার চেষ্টা করবেন। এটা হচ্ছে মানবীয় আকাঙ্ক্ষাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান আকাঙ্ক্ষা।

জীবন্ত সমস্তকিছু শৈশবে খেলা করে। খেলা — এ হচ্ছে শেখার উপায়, নির্দিষ্ট জীবন ধারাতে দীক্ষিত হওয়ার উপায়। বেড়াল তার ছানাদের সঙ্গে খেলার সময় ওগুলোকে চুপি চুপি চলতে, দ্রুত সাড়া দিতে, ধরতে, লাফাতে, বেঁকে যেতে, মনোযোগ দিয়ে দেখতে ও কান পেতে শুনতে

শেখায়। জীবজন্তুর জীবনে খেলাধুলো এমনকি এক লাভজনক ব্যাপার, এবং তাতে আনন্দ ও উপকার দু'-ই থাকে।

খেলা অথবা, সঠিকভাবে বললে, ক্রীড়ামূলক ক্রিয়াকলাপ শিশুর সারা জীবন জুড়ে থাকে, বড়দের সঙ্গে তার সমস্ত পারস্পরিক সম্পর্কে ব্যাপ্ত থাকে: যৌথ শ্রমে, যৌথ পঠনে, সঙ্গীত শ্রবণে, থিয়েটার, সার্কাস আর চিড়িয়াখানা দর্শনে। এই ক্রীড়ামূলক মুহূর্তগুলো যাতে উপযুক্ত মালমসলার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে উঠে, খেলা যাতে হামেশা স্মৃতি শক্তি, কল্পনা শক্তি বিকশিত করে এবং, সবচেয়ে বড় কথা, মানসিক ও শারীরিক শ্রমের জন্য প্রস্তুত করে তুলে সেদিকে খেয়াল রাখা খুবই প্রয়োজন।

শিশু ক্রীড়ামূলক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করে তার শিশুসুলভ যুক্তি অনুসারে। শিশুর খেলায় হস্তক্ষেপের শর্তগুলো নির্ভর করে, আমাদের মতে, শিশুর মতাবস্থান বিবেচনা করার নিপুণতার উপর। শিশু নিজের ক্রিয়াকলাপকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক ব্যাপার বলে গণ্য করে।

আমরা অবশ্য এ কথা বলছি না যে শিশুর সমস্ত খেলাকে, তার সমস্ত আমোদপ্রমোদকে উপকার লাভের উপযোগী করে তুলতে হবে। তবে শিক্ষাকার্যে সুফল পেতে চাইলে খেলার মাধ্যমে শিশুকে হিতকর কাজে, শ্রমে দীক্ষিত করতে আমরা বাধ্য। এখন আমরা বস্তুত পক্ষে সেই সমস্ত সম্ভাব্য পরিস্থিতির কথা বলছি যখন খেলা স্বাভাবিক উপায়ে ও শিক্ষকদের কল্যাণে পরিণত হয় প্রভাবিত করার প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে যা চিত্তাকর্ষক ও অচিত্তাকর্ষক দুইকেই যুক্ত করে।

স্কুলের ছেলেমেয়েদের এমন এক খেলায় আমন্ত্রণ করা হল যাতে নিপুণতা, শক্তি আর উপস্থিত বুদ্ধি যাচাই করা যায়। শিক্ষক জানেন, তাতে কী কী চিত্তাকর্ষক কাজ থাকবে। তার মধ্যে আছে: বেড়া রঙ করা ও গর্ত খোঁড়ার কাজ। শিক্ষক ছেলেমেয়েদের তিনটি দলে বিভক্ত করেন। প্রতিটি দলকে তিনি একটি ক'রে পরিচয়-পত্র দেন। তারপর ছেলেমেয়েরা নির্দিষ্ট একটা জায়গায় গিয়ে হাজির হয় যেখানে তাদের দেওয়া হয় তুলি এবং বেলচা। সময় নির্ধারিত করে দেওয়া হয়: স্কুলের চারিপাশে বেড়ার প্রতি অংশ রঙ করতে — ২০ মিনিট, আর ক্রীড়া ক্ষেত্রের জন্য গর্ত খুঁড়তে — ১২ মিনিট। শিক্ষক যদি দূরদর্শী হন এবং তিনি যদি চান যে এক ফোঁটা রঙও মাটিতে না পড়ুক, তাহলে বলবেন: 'মাটিতে পড়া প্রতি গ্রাম রঙের জন্য পাঁচ নম্বর বাদ পড়বে।' এবং সঙ্গে সঙ্গেই আদর্শ ফল মেলে: ছেলেমেয়েরা খুব মন দিয়ে কাজ করে, আগে কখনও তারা এত চেষ্টা করে

নি। বেড়ায় রঙ লাগানো হল, গর্ত খোদিত, এবং ছেলেমেয়েরা কত আনন্দ পেল। এবার তারা অন্য জায়গায় চলে যায়। ওখানে তাদের কোন দাবা সমস্যা সমাধান করতে কিংবা ফুটবল ম্যাচে নামতে বলা হয়।

এ ক্ষেত্রে খেলার গণ্ডিতে একাধিক ক্রীড়ামূলক পারস্পরিক ক্রিয়া যেন আপনা-আপনি অক্রীড়ামূলক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে মিলে বিকাশ লাভ করতে থাকে।

চূড়ান্ত কঠোরতা: 'এখানে রঙ পড়েছে...' শিশুরাও আত্মসমর্থন করে: 'আরে ও কিছু না... এক্ষুনি ঠিক করে দিচ্ছি... এই দ্যাখুন না।' দেখতেই পাচ্ছেন, সংলাপটি অক্রীড়ামূলক। তার ভিত্তিটি কেবল ক্রীড়ামূলক, এবং তা টিকিয়ে রাখা হচ্ছে ক্রীড়ামূলক মনোভাব আর ক্রীড়ামূলক ভাবনাচিন্তার দ্বারা। তাছাড়া ক্রীড়ামূলক নিয়ম, দায়িত্ব আর ভূমিকা তো রয়েছেই। ছেলেমেয়েরা নিল নির্বাহকের ভূমিকা, আর শিক্ষককে অথবা সাথীদের কাউকে করল বিচারক।

এই বিচারক হতে পারে ভীষণ ছিদ্রান্বেষী এবং কড়া — ছেলেমেয়েদের আর রক্ষে থাকবে না। তবে এ ব্যাপারটিও কাউকে দুঃখিত করে না। বিচারক ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ হলে এরূপ কড়াকড়ি সবারই পছন্দ হয়।

আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করা যাক: মনে হয় নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কাজগুলো যেন সম্পাদিত হচ্ছে কেবল ক্রীড়ামূলক ভিত্তিতে, আর কর্তব্য থেকে যাচ্ছে কোথাও একপাশে। কিন্তু তা ঠিক নয়। খেলায়, বিশেষত দলীয় কিংবা গ্রুপে খেলায়, সর্বদাই কর্তব্য বোধ থাকে, থাকে মর্যাদা বোধ, থাকে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। যেমন ধরুন, শিশু-বিচারক ন্যায়পরতার সঙ্গে বিচার করছে কেবল মাত্র এই জন্য নয় যে খেলার নিয়ম তা দাবি করছে, এই জন্যও যে সেই দাবির উপর আরও রয়েছে মর্যাদা বোধ, শিশুদের উচ্চ মানবিক মূল্যবোধ। ছেলেমেয়েরা বলে: 'আমরা ওকে সবার আগে এই পদে বসাচ্ছি, কারণ ও সবচেয়ে বেশি ন্যায়পরায়ণ।' দেখা যাচ্ছে যে বাস্তব মূল্যবোধ পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি হিশেবে গৃহীত হচ্ছে। তার মানে, ক্রীড়ামূলক ভিত্তি সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণাবলি সম্পর্কে কথা হচ্ছে। অবশ্য চিরকালের সেই সমস্যাটি থেকেই যাবে যা সূত্রবদ্ধ হয় এভাবে: 'খেলায় তো তার কর্তব্য জ্ঞান আছে এবং ওই কর্তব্য পালনও করে, কিন্তু বাস্তব জীবনে ব্যাপারটি কেমন?'।

শিশুদের জীবনে সেই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ চালু করা অতি আবশ্যক যা

'স্রেফ কর্তব্যের' উপর প্রতিষ্ঠিত। শিশুদের কাছে আপোসহীন সোজা দাবি হাজির করতে পারা চাই। যেমন: 'এই বেড়াটি তোমাদের রঙ করা উচিত। আমাদের তা করতেই হবে।' অথবা: 'খুঁটিগুলোর জন্য আমাদের গর্ত খোঁড়া উচিত, নতুবা কাল আর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হবে না।'

'উচিত' ছাড়া শিক্ষাকার্য সম্ভব নয়। তবে দাবি হাজির করা প্রয়োজন বিভিন্ন রূপে।

ক্রীড়ামূলক রূপ, এক দিকে, শিক্ষককে তাঁর শিক্ষামূলক মতাবস্থান গোপন রাখার সুযোগ দেয়, আর, অন্য দিকে, ছাত্রকে অধিক সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করতে সাহায্য করে। খেলা যাতে ভালোভাবে চলে সেই জন্য সমস্ত অংশগ্রহণকারীকে তাদের বয়স নির্বিশেষে নিয়ম ও কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালন করতে হয়।

বলাই বাহুল্য, খেলার সময় যেকোন অংশগ্রহণকারী উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে: কিছু একটা প্রমাণ করতে শুরু করবে, প্রতিবাদ জানাবে, বিক্ষুব্ধ হবে। কিন্তু এই সমস্ত ভাবাবেগ — যদি তা খেলার নিয়মাবলির গণ্ডিতে প্রকাশ লাভ করে — কেবল ক্রীড়া সহযোগিতাই দৃঢ় করে থাকে। খেলায় বড়ও অনেক সময় কোন-না-কোনভাবে ছোট হয়ে যায়, আর সঠিকভাবে বললে, সে নিজেই শিশুর কর্তব্য পালন করে। এই অবস্থাটি তাকে মুহূর্তের মধ্যে শিশুদের ভাবনাচিন্তার জগতে, আত্মিক মূল্যবোধের জগতে, দলের গঠনের ভেতরে প্রবেশ করার সুযোগ দেয়। তাছাড়া খেলা শিশুদের চরিত্রকে এত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে কোন পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি করতে পারেন পরস্পরের প্রতি তাদের প্রকৃত মনোভাবটি কীরূপ। তবে সচেতনভাবে ক্রীড়ামূলক ক্রিয়াকলাপের আশ্রয় নিলে শিক্ষকও ছেলেমেয়েদের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করতে পারেন।

শিশুদের খেলা আর শ্রমের ব্যাপারগুলোকে আমরা কেন তাদের ক্রিয়াকলাপে মুখ্য জিনিস বলে গণ্য করি? ক্রিয়াকলাপের এই দুটো রূপকে আমরা কেন এক ক'রে দেখি? কারণ, ক্রিয়াকলাপের এই রূপগুলোতেই প্রধানত শিশু বিকাশ লাভ করে।

প্রথম দৃষ্টিতে খেলা ও শ্রম মনে হয় সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী জিনিস, এবং তা এই জন্য যে ওগুলোর মধ্যে সত্যিই আকাশপাতাল তফাৎ রয়েছে ও তা পরস্পরের বিরুদ্ধে যায়। তবে তা কেবল প্রথম দৃষ্টিতে। চিত্রশিল্পে যেমন রঙের দাগ আর সঠিক রেখা নিপুণ শিল্পীর দ্বারা মৌলিকভাবে যুক্ত হয়ে থাকে, তেমনি প্রশিক্ষণ কলায়ও ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন পদ্ধতি

আর রূপ মিলে যায় কিংবা নিজের সাদৃশ্যের কল্যাণে নয়, পার্থক্যের কল্যাণে পরস্পরকে সমৃদ্ধ ক'রে পাশাপাশি চলতে থাকে।

খেলায় থাকে স্বেচ্ছার প্রাধান্য; আর শ্রম বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক। খেলায় অংশগ্রহণ নির্ভর করে শিশুদের ইচ্ছার উপর, আর শ্রম ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ কর্তব্য বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু স্বেচ্ছা ও ইচ্ছার উপাদান ব্যতিরেকে শ্রম প্রায়ই শিশুর পক্ষে ক্লেশকর ব্যাপার। একই কথা বলা যায় খেলার বিষয়ে, যদি তা পরিণত হয় বাধ্যতামূলক কর্তব্যে। খেলা প্রায় মুহূর্তের মধ্যেই যেকোন বাধাবিপত্তি অতিক্রম করার প্রচেষ্টার জন্ম দেয় যা যেকোন শ্রম ক্রিয়াকলাপের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। খেলা নিজেতে মত্ত ক'রে ক্লান্তি দূর করে। কেবল বাইরে থেকেই মনে হয় তা নির্বিঘ্ন ও সহজ ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা খেলোয়াড়ের কাছ থেকে যথাসম্ভব বেশি শক্তি, বুদ্ধি ও ধৈর্য দাবি করে।

খেলার প্রতি শিশুর আকর্ষণ অপরিসীম এবং শ্রমে সে সর্বদা অনুরূপ চাহিদা অনুভব করে না। কিন্তু শিক্ষকের পরিশ্রম তখনই সার্থক হয় যখন তিনি শিশুদের মধ্যে কাজ করার চাহিদা গড়ে তুলতে সক্ষম হন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায় খেলার উপাদানসমূহের সাহায্যে। কাজটি অবশ্য জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ: সর্বদা ফলপ্রসূ না-ও হতে পারে।

খেলাকে কর্ম ভারাক্রান্ত করা এবং তাকে কেবল শিশুর সক্রিয়তা বিকাশের উপায় হিশেবে দেখা উচিত নয়। আমরা যদি খেলাকে শ্রম ক্রিয়াকলাপে শিশুর অংশগ্রহণের উপায় হিশেবে ভক্তিবস্তুতে পরিণত করি, তাহলে কুফল বই সুফল মিলবে না। খেলা তার উত্তেজনা বশত আপন বর্ণবৈচিত্র্যে শিশুকে মোহান্ধ করে, এবং বলা যেতে পারে, ঘটমান সমস্তকিছু উপলব্ধিকরণের প্রয়োজনীয়তা, নিজের ক্রিয়াকলাপের ফলাফলের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা দূর করে দেয়। খেলা আবেগপূর্ণ ব্যাপার। আর মননের উপর আবেগের প্রাধান্যও ছেলেমেয়েদের উপলব্ধি ক্ষমতা বিকাশের উপর অনুকূল প্রভাব ফেলতে পারে।

* * *

পরিশ্রমী ছেলে, পরিশ্রমী মেয়ে। ...নিজের ছেলেমেয়ের বিষয়ে এরূপ কথা শুনলে আনন্দে ও গর্বে মন ভরে যায়। তা আপনারা পিতামাতা হিশেবে নিজের বিজয়, নিজের প্রশিক্ষণ সাফল্য বলে বিবেচনা করেন। তবে সব

পিতামাতা এ কথা বলে গর্ব করতে পারেন না যে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের মধ্যে এই গুণটি গড়তে সক্ষম হয়েছেন।

স্বনামধন্য সোভিয়েত শিক্ষাবিদ ভাসিলি সুখমলিনস্কি শ্রম শিক্ষাকে তিনটি জিনিসের — উচিত, কঠিন ও চমৎকারের সঙ্গতি বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কথার অর্থটি খুবই গভীর।

উচিত... নিশ্চয়ই! অতি আবশ্যক। শ্রমের প্রতি ভালোবাসা ছাড়া মানুষ মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে ও ব্যক্তি হিশেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। কেবল শ্রমশীলতা এবং তার সঙ্গে লক্ষ্যনিষ্ঠতা আর অটলতার মতো অপরিহার্য গুণগুলোই তাকে জীবনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করবে।

কঠিন... অবশ্যই। এবং মা-বাবাদেরও তার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। শিশুর মধ্যে শ্রমশীলতা গড়তে হলে আপনাদের বিপুল দৃঢ়তা আর ধৈর্যের অধিকারী হতে হবে, প্রচুর সময় ব্যয় করতে হবে। প্রতি দিন, প্রতি ঘণ্টায়, আসল ও খুঁটিনাটি কাজে, ব্যক্তিগত উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রের এ প্রধান কাজটি চালিয়ে যাওয়া সহজ নয়।

চমৎকার... হ্যাঁ। বাধাবিপত্তি অতিক্রান্ত, লক্ষ্য অর্জিত — এই জিনিসটি উপলব্ধির মতো আর কিছুই মানুষকে এত গভীর নৈতিক তৃপ্তি দানে সক্ষম নয়। যে-ব্যক্তি শ্রম ভালোবাসে একমাত্র সে-ই এই আনন্দ পুরোপুরিভাবে উপভোগ করে।

মহান শিক্ষক — প্রকৃতি

শিশুর মধ্যে প্রকৃতিকে বোঝার, তার সমস্ত স্বাভাবিক, সাধারণ ও একই সঙ্গে মহান গুণাবলি বোঝার ক্ষমতা বিকশিত করা প্রয়োজন। এর জন্য পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সাধারণীকরণ করতে পারা চাই: বর্তমানের মধ্যে দেখতে হবে অতীতকে, একমাত্র বীজের মধ্যে আগে থেকেই দেখতে হবে সুন্দর সুন্দর ফুলের ভবিষ্যৎ মাঠ, এবং সবচেয়ে বড় কথা, মনপ্রাণ দিয়ে বুঝতে হবে জীবন্ত ও অজীবন্তের ঐক্যের, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঐক্যের নিয়ম, বুঝতে হবে যে প্রাকৃতিক ব্যাপারাদির সাধারণ যোগাযোগের চিরন্তন নিয়মাবলি উপেক্ষা করে চললে পৃথিবীতে জীবনের অবসান ঘটতে পারে। সেই জন্যই প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হচ্ছে — কেবল নিজের মঙ্গলের জন্যই নয়, ভাবী পুরুষদের মঙ্গলের জন্যও প্রকৃতিকে রক্ষা করা।

পর্যবেক্ষণশীলতা — এ হচ্ছে মানুষের এক অতি মূল্যবান গুণ যার

কল্যাণে সে পৃথিবীকে চিনতে ও প্রকৃতির বিচিত্র জগৎ বুঝতে সক্ষম হয়।

কীভাবে পর্যবেক্ষণশীলতা বিকাশ করা যায়? সর্বাগ্রে শিশুর মধ্যে আবেগের সূত্রপাত ঘটানো প্রয়োজন। এই আবেগ তাকে উপলব্ধ সমস্তকিছুতে বিস্মিত, মুগ্ধ ও সুখ লাভের সুযোগ দেয়, তার মধ্যে নতুন সাক্ষাতের বাসনা জাগিয়ে তুলে। সুযোগ পেলে বছরের যেকোন সময়েই — কেবল আবহাওয়া মোটামুটি ভালো হলেই হল — মাঠে, বনে, নদীতে বেড়াতে চলে যাবেন, খাতে নামবেন, সীমাহীন প্রান্তর আর সৌর রশ্মি বিদ্ধ মেঘমালা দেখার জন্য টিলার চূড়ায় গিয়ে উঠবেন...

— তাহলে আপনি আবার সেই ধ্বনিটি তুলতে বলছেন: 'বনে ফিরে যাও!'

— না, বরং তার উল্টো। এ হচ্ছে আধুনিক সমাজ ও প্রকৃতির সঙ্গতির দিকে, প্রতিবেশের সঙ্গে ব্যক্তি বিশেষ এবং মানবজাতির এরূপ সহযোগিতার দিকে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান যাতে প্রকৃতির সঙ্গে মেলামেশা মানুষের — যে-মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ ধ্বংস করতে নয়, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পুরুষের মঙ্গলে তা বৃদ্ধি করতে প্রয়াসী সেই মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উৎস হয়ে উঠতে পারে।

— সে হচ্ছে স্কুলের দায়িত্ব। তবে আধুনিক পাঠ্যসূচিতে প্রথম স্থানে রয়েছে গণিতশাস্ত্র, 'শূককীট আর পুংকেশর' নয়।

— খুবই অন্যায়। আমরা বলছি পারিবারিক শিক্ষার উপায় হিশেবে পর্যবেক্ষণের বিষয়ে। আর পারিবারিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুদের মধ্যে বিচিত্র আগ্রহ, বিচিত্র চাহিদা জাগানো, সৌন্দর্যবোধ বিকশিত করা।

— আর গণিতশাস্ত্রের কথা যদি ধরি তাহলে বলতে হয় যে তা সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রকৃতির জীবনের নিয়মাবলি উপলব্ধির হাতিয়ার হিশেবে, কোন লক্ষ্যবস্তু হিশেবে নয়।

বনের জীবজন্তুদের জন্য কিছুটা খাবার নিয়ে যান। তাদের জন্য ভোজের আয়োজন করুন। সবচেয়ে নির্জন স্থানে গিয়ে থামবেন। হয়তো বা কাঠবিড়ালী দেখার সৌভাগ্য হবে, কাঠঠোকরার কাজ দেখার আর নীলকণ্ঠ পাখীর গান শোনার সুযোগ হবে। বুনো জীবের সঙ্গে সাক্ষাতের আনন্দ শিশুর অনেককাল মনে থাকবে, তার মধ্যে অনুসন্ধিৎসা ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তুলবে।

প্রাথমিক শ্রেণীগুলোর ছেলেমেয়েদের প্রতিদিন প্রকৃতিতে পর্যবেক্ষণ চালানো উচিত। তারা যাকিছু দেখে তা বিশেষ দিনপঞ্জীতে লিখে রাখা দরকার। যদি প্রকৃতির দিনপঞ্জী জোগাড় করতে না পারেন তাহলে আপনাদের ছেলে বা মেয়েকে তা তৈরি করে নিতে সাহায্য করুন। ছেলেমেয়েদের প্রায়ই প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ চালানোর ধৈর্য থাকে না। আর

এ ছাড়া দিনপঞ্জী তার তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। এর উদ্দেশ্য — ধৈর্য সহকারে প্রকৃতি সম্পর্কে নিজের পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করতে শেখানো। আর পর্যবেক্ষণ চালাতে হয় সর্বদা — এমনকি তখনও, যখন প্রকৃতিতে কোন প্রত্যক্ষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না, একই প্রকার আবহাওয়া থাকে, এবং তখনও, যখন মজার ঘটনাবলি ঘটে, বিশেষত ঋতু পরিবর্তনের সময়। কাজটি যদি স্রেফ দিনপঞ্জী পূর্ণ করার মধ্যেই সীমিত থাকে তাহলে বিশেষ কোন লাভ হবে না। শিশুদের প্রাকৃতিক ঘটনাবলির মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে শেখানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ধরুন, সূর্য নভোমণ্ডলে অনেক উপরে — তার মানে দিন লম্বা, রাত ছোট, বাইরে গরম। বেশি আলো ও তাপ — সমস্তকিছু বাড়তে শুরু করে। বৃষ্টি নেই, আর্দ্রতা নেই — তখন গরম রোদও উদ্ভিদের জীবনকে সাহায্য করতে পারে না। প্রথম বৃষ্টির পর সমস্তকিছু সঙ্গে সঙ্গে সবুজ হয়ে উঠে, কারণ জল পেয়ে কুঁড়িগুলো ফুটে যায় এবং দেখা দেয় নরম পাতা। পশ্চিমের হাওয়া আনে বৃষ্টি, উত্তরের বাতাস — ঠান্ডা, আর দক্ষিণের হাওয়া — উত্তাপ ও খরা। দিনপঞ্জীতে হামেশা বাতাসের গতি চিহ্নিত ক'রে কাঁটা আঁকলে পরে আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কে বেশ যথাযথ পূর্বাভাসই দেওয়া যাবে।

বছরের প্রতিটি ঋতুতে, তার বারো মাসের প্রতিটিতে আছে অনুপম এক বিস্ময়, নিজস্ব কোমল মাধুর্য, নিজস্ব আনন্দ। দিনপঞ্জী লেখা হয় এই জন্য যাতে ছেলেমেয়েরা প্রকৃতির গতি ও যোগাযোগের সঙ্গতি জানতে পারে, তার জীবনকে বোঝে।

শিশুর মধ্যে জানার বহুমুখী আগ্রহ বিকাশের কাজ অব্যাহত রেখে নির্দিষ্ট এক সময়ে তা অধিকতর উদ্দেশ্যপূর্ণ ও গভীর করে তোলা চাই। এ ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের অমূল্য সহায়তা জোগাতে পারে জীবজন্তু ও পশুপাখি, বিস্ময়কর উদ্ভিদ ও অজানা দেশ সম্পর্কে লেখা সুন্দর আর চিত্তাকর্ষক বইগুলো।

কনস্তান্তিন উশিন্স্কি বলেছেন, 'প্রকৃতির যুক্তি হচ্ছে শিশুদের পক্ষে সবচেয়ে বোধগম্য যুক্তি।' আমরা যখন বলি 'যুক্তিসঙ্গত', তখন এর দ্বারা এটাই প্রমাণ করতে চাই যে বাস্তবতার সঙ্গে তার মিল রয়েছে এবং প্রকৃতিতে বিদ্যমান যোগাযোগ আর পারস্পরিক সম্পর্কের সঙ্গে তার কোন বিরোধ নেই।

পর্যবেক্ষণশীলতার বিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে যৌক্তিক চিন্তাধারা গঠনের সঙ্গে। শিশু যাতে দেখতে পারে তার জন্য তাকে জিনিসের

মুখ্য ও গৌণ লক্ষণসমূহ পৃথক করতে শেখানো উচিত। কোন জিনিস দেখার সময় তার মুখ্য লক্ষণগুলো পৃথক করতে গিয়ে সুপরিচিত কিংবা নিকটে অবস্থিত কোন সামগ্রীর সঙ্গে তুলনা ব্যবহার করতে ভুলবেন না।

যেমন, শিশুকে দেখিয়ে দিন কীভাবে আলু এবং টমেটো ফলে। আপনারা কি জানেন যে ওগুলো হচ্ছে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়? উদ্ভিদগুলোর গঠন দ্যাখুন। শিশুর হয়তো জানতে আগ্রহ হবে যে এককালে টমেটোর চারা রোপণ করা হত কেয়ারিতে, আর আলুর ফুল দিয়ে খোঁপা সাজাত ধনী মহিলারা। আলুর ফুল সুন্দর ও মিষ্ট গন্ধ ছড়ায়।

শিশুরা প্রকৃতি সম্পর্কে অধিকতর গভীর জ্ঞান লাভ করে তখন, যখন পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাও চালানো হয়। পরীক্ষা স্রেফ সামগ্রী দেখতেই সাহায্য করে না, কীভাবে নির্দিষ্ট সমস্যা প্রস্তুত ও সমাধান করতে হয় তা-ও শেখায়: বিভিন্ন ঘটনার কারণ ও পরিণাম নির্ধারণ করা যায় কীভাবে, গৌণ থেকে মুখ্য আলাদা করতে হয় কেমন করে। যেমন, আপনি ঘরের ভেতরে টবে একটা চারা লাগাতে চাইলেন এবং ছেলেকে কিছুটা বালু আনতে বললেন।

— বালু দিয়ে কী করবে? বালুতে কোনকিছু ভালো হয় না।

সাধারণ কথায় এটা অবশ্য ব্যাখ্যা করা যায় যে শিকড়ের শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য, জল যাতে ভালো মতো প্রবেশ করতে পারে তার জন্য মাটির সঙ্গে কিছুটা বালুও মেশানো দরকার। তবে সবচেয়ে ভালো হবে এমন একটা পরীক্ষা চালালে যা প্রমাণ করবে যে প্রচুর পরিমাণ মাটিযুক্ত টবে জল উপরিভাগে জমে থাকে, আর শুষ্ক মাটি ফেটে গিয়ে উদ্ভিদের মূল ছিঁড়ে দিতে পারে, আর যে-টবে অনেক বালু আছে তাতে মাটি ভুরভুরে, সে মাটিতে তাড়াতাড়ি জল প্রবেশ করে এবং তাড়াতাড়ি শুকিয়েও যায়।

স্কুলের ছেলেমেয়েরা যখন কম্পাসের সঙ্গে পরিচিত হয় তখন চুম্বক নিয়ে অতি চিত্তাকর্ষক পরীক্ষা চালানো যায়; যখন জল ও বায়ুর ধর্ম গবেষণা করা হয় তখন বাষ্প, কুয়াশা গঠন ও ঠান্ডা জিনিসের উপর শিশির বিন্দু গঠন নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো যায়।

এই সমস্ত পরীক্ষানিরীক্ষায় বেশি সময় ব্যয়িত হবে না, তবে তা নিঃসন্দেহেই আপনাকে ও ছেলেমেয়েদের খুব মাতিয়ে তুলবে, অভিন্ন কাজে অভিন্ন আগ্রহের সুন্দর একটি পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

শিশু সম্পাদিত পরীক্ষা নিয়ে আলাপ-আলোচনা খোদ পরীক্ষা পরিচালনার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আলাপের সময় জিজ্ঞেস করা উচিত,

পরীক্ষার মাধ্যমে সে কী জানতে চেয়েছিল ('আমি জানতে চেয়েছিলাম কোন্ নৌকোটি জলের উপর ভালো ভাসতে পারে'); পরীক্ষা পরিচালনার কী কী পরিস্থিতি সে বেছে নিয়েছে এবং তা সমস্যার সঙ্গে খাপ খায় কি ('নৌকোর জন্য তুমি বিভিন্ন রকমের আকারের পরিবর্তে বিভিন্ন জিনিস নিয়েছ?'); পরীক্ষা পরিচালনার সময় সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার লক্ষ্য করা হয়েছে কি ('তুমি লক্ষ্য করেছ যে গাছের ছাল দিয়ে তৈরি নৌকোটি বেশি দোল খাচ্ছিল?'); উদ্ভূত ব্যাপারগুলোর কারণ কী ('চেপ্টা তলাযুক্ত নৌকোটি কেন অন্যগুলোর আগে ডুবে গেল?'); পরীক্ষা থেকে কী কী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

পরীক্ষা পরিচালনার সময় আমাদের অল্পবয়সী গবেষক যে-সমস্ত মনন ক্রিয়াকলাপের আশ্রয় নেয় তা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে ঠিক ওগুলো থেকেই গড়ে উঠছে যৌক্তিক চিন্তাধারণা বিকাশের সমস্ত প্রধান উপাদান: বিশ্লেষণ, সংশ্লেষ, তুলনা, আরোহ, আরোহ, বিমূর্তীকরণ ও সাধারণীকরণ।

বিজ্ঞানী-মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন যে শিশুদের সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক ঘটনা বোঝার স্বাভাবিক চাহিদা বেশি কাল টিকে থাকে না — কেবল ১০-১১ বছর অবধি। সময় মতো এর ব্যবহার করা উচিত, কারণ পরে এমন সব নতুন আগ্রহ দেখা দেয়, প্রকৃতি গবেষণার সঙ্গে যেগুলোর কোন সম্পর্কই থাকে না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা গভীর হলে তা পরেও বিকাশ লাভ করতে থাকবে।

প্রকৃতির সৌন্দর্যকে দেখার ক্ষমতা এবং নিজের কথায়, নিজের সুরে ও বিশেষত নিজের হাতে তার রূপ দান করার চাহিদার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য এক সম্পর্ক রয়েছে।

— আপনি বলছেন যে জীবজন্তুর প্রতি ভালোবাসা মানুষকে মহৎ করে। কিন্তু এমনও ঘটনার নজির রয়েছে যখন আপন জনের প্রতি নিষ্ঠুর লোকেরা জীবজন্তু ভালোবাসে।

— হ্যাঁ, এরূপ ঘটনার কথা জানা আছে এবং তা মানুষের প্রতি তাদের প্রতিকূল মনোভাবের কারণগুলোর নির্দিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দাবি করে।

নিজের ছেলেমেয়েকে নিয়ে বনে গিয়ে দেবদারুর মোচা, ডালপালা, ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করুন। পুরনো গুঁড়ি ও পড়ে-থাকা গাছের ছাল ছাড়াতে পারেন। এগুলো দিয়ে ছেলেমেয়ের সঙ্গে আপনারা কত সুন্দর সুন্দর

জিনিস গড়তে পারেন! মন দিয়ে প্রকৃতির অনুপম সৃষ্টির দিকে তাকান, এবং প্রকৃতি নিজেই আপনাদের প্রয়োজনীয় রূপ ও গঠন বাৎলে দেবে।

দেখতে হবে, প্রকৃতির সঙ্গে মেলামেশা যেন শিশুদের কেবল সৃজনকার্যেই অনুপ্রাণিত না করে, তা যেন সমাজের ও ভাবী পুরুষদের সামনে আপন প্রকৃতি রক্ষার ব্যাপারে তাদের মধ্যে উচ্চ দায়িত্ব বোধও গড়ে তুলে।

সুবিখ্যাত সোভিয়েত লেখক, প্রকৃতি প্রেমিক আর প্রকৃতিবিদ মিখাইল প্রিশভিন একদা বলেছিলেন:

'আমরা আমাদের প্রকৃতির মালিক, এবং আমাদের জন্য সে হচ্ছে এক বিশাল ধনাগার যাতে রয়েছে জীবনের সমস্ত মহান সম্পদ। তারও চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এই সমস্ত ধন রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আগে তা খুলে দেখানো প্রয়োজন।

মাছের জন্য প্রয়োজন নির্মল জল — সেই জন্য আমাদের জলাশয়গুলো রক্ষা করব। বনেজঙ্গলে, স্তেপাঞ্চলে ও পাহাড়পর্বতে আছে বিভিন্ন জাতের মূল্যবান জীবজন্তু — সেই জন্য আমাদের বনজঙ্গল, স্তেপাঞ্চল আর পাহাড়পর্বতগুলো রক্ষা করব।

মাছের চাই — জল, পাখির চাই — আকাশ, জন্তুর চাই — বনজঙ্গল, পাহাড়পর্বত। আর মানুষের চাই মাতৃভূমি, এবং প্রকৃতিকে রক্ষা করা মানেই হচ্ছে মাতৃভূমিকে রক্ষা করা।'

মানুষ এবং প্রকৃতির সম্পর্কের প্রশ্নে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই মানবিক। মানুষকে উত্তরাধিকারসূত্রে তার বংশধরদের দিতে হবে সভ্যতা বিকাশের দরুন সৃষ্ট মরুভূমি নয়, ফুলেফলে সুশোভিত উর্বর মাটি। আমাদের দেশে প্রকৃতি প্রতিরক্ষার কাজ রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা লাভ করেছে।

প্রযুক্তিগত ক্রিয়াকলাপে হাতে-খড়ি

উদ্ভাবকরা কোত্থেকে আসে? প্রত্যেকে কি উদ্ভাবন করতে শিখতে পারে? এমন এক সময় ছিল যখন এ প্রশ্নকে কেন্দ্র ক'রে আপোসহীন তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছিল। লোকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত, বিরোধী। কেউ কেউ দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলত: 'উদ্ভাবক হয়ে জন্মাতে হয়।' আর অন্যরা আপত্তি জানাত: 'না, প্রত্যেকেই উদ্ভাবক হতে পারে।'

দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরই বোঝা গেল যে তর্কের বিষয়টি খোদই ছিল নিছক কল্পিত ব্যাপার। বস্তুত পক্ষে, তর্ক হচ্ছিল বিভিন্ন

জিনিস নিয়ে। যারা প্রমাণ করছিল যে 'উদ্ভাবক হয়ে জন্মাতে হয়' তারা বলতে চাইছিল প্রতিভাধর উদ্ভাবকদের কথা এবং অতি উচ্চ মানের উদ্ভাবনের কথা। আর তাদের বিরোধীরা — এরা বলত যে 'প্রত্যেকেই উদ্ভাবক হতে পারে' — সেই সমস্ত লোকের কথা বলতে চাইছিল যারা উদ্ভাবনের পর্যায়ে সাধারণ প্রযুক্তিগত সমস্যাদি সমাধান করে থাকে। এই সমস্ত সমস্যার মধ্যে এমন সমস্যাও থাকতে পারে যা এমনকি স্কুল ছাত্ররা পর্যন্ত সমাধান করতে পারে।

প্রযুক্তিগত কাজের সমস্যাটি এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে এ কথাটি বুঝতে কষ্ট হয় না যে উদ্ভাবন করতে পারে প্রত্যেকেই, তবে সেই মানে যার জন্য সে প্রস্তুত।

— আপনি মনে করেন, শিশুদের টেকনিকেল কাজও করা দরকার। কিন্তু এ ছাড়াই তাদের উপর চাপ কি কম?

— শিশুকে অধিকতর যুক্তিসিদ্ধভাবে সমস্যা সমাধানের কাজ সংগঠন করতে সাহায্য করা উচিত, এবং তাতে ক'রে চাপ বাড়বে না, বরং কমবে।

— কিন্তু ছেলেমেয়েদের সবাই তো আর প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কাজ করবে না!

— প্রযুক্তিগত ক্রিয়াকলাপের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে উদ্ভাবন ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো। আর তা প্রয়োজন কেবল প্রযুক্তিতেই নয়। উদ্ভাবন ক্ষমতা ছাড়া এমনকি সাধারণ খেলাও সংগঠন করা অসম্ভব।

— স্কুল ছাত্রের লেখাপড়ার কথা ভাবা উচিত, খেলার কথা নয়।

— লেখাপড়ার কাজ যখন ছেলেমেয়েদের জন্য কেবল কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন সাফল্যের আশা করা অনুচিত। তাদের স্বনির্ভরভাবে জ্ঞানার্জনের চাহিদা থাকতে হবে।

— আর এরূপ চাহিদা যদি না থাকে?

— ঠিক এই উদ্দেশ্যেই তাদের সঙ্গে টেকনিকেল কাজকর্ম শুরু করা প্রয়োজন। অন্তত প্রথম পদক্ষেপগুলো করতে সাহায্য করুন। পরে তারা নিজেরাই নিজের কাজ সামলে নেবে।

তাহলে কোন্ বয়স থেকে প্রযুক্তিগত কাজ শুরু করা যায়? যারা প্রযুক্তিগত কাজে মন দিতে চায় তাদের মধ্যে প্রাক্‌স্কুলবয়স্ক ছেলেমেয়ে ও নিম্ন শ্রেণীগুলোর ছাত্রদের সংখ্যা খুবই বেশি। স্বনির্ভরভাবে কাজ করার সম্ভাবনা তাদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। তাদের জ্ঞান অবশ্য এখনও কম। তবে এই অভাবটি পূরণ করে দেয় তাদের জ্ঞানার্জনের বাসনা। তাছাড়া শুরুতে সর্বদাই এমন কাজ বাছা যায় যা সম্পাদনের জন্য ন্যূনতম পরিমাণ জ্ঞানই যথেষ্ট। তাই বিশেষভাবে সংগঠিত খেলার মধ্য দিয়ে প্রযুক্তিগত

কাজ এমনকি প্রাক্‌স্কুলবয়স্ক ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও শুরু করা যায়। শিশুদের চাই খেলার আকারে সংগঠিত কাজ যাতে অংশগ্রহণ করবে অল্পসংখ্যক লোক। আর সে কাজ পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে মা-বাবাদের উপর।

প্রযুক্তিগত কাজের জন্য প্রস্তুতি চালানো যায় সেই সমস্ত সামগ্রীর ভিত্তিতে যার, প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, প্রযুক্তির সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক নেই।

'ব্যারন মিউনহাউজেনের অ্যাডভেঞ্চার', 'রূপকথার দেশে অ্যালিস', 'ছোট্ট রাজকুমার', 'উঃ বাবারে' ও অন্যান্য বহু বই শিশুদের সঙ্গে উদ্ভাবনী ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার পক্ষে খুবই উপযোগী। এই ধরনের বইগুলো যদিও শিশু সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, তা সত্ত্বেও তাতে বর্ণিত ঘটনাবলি, নায়কদের উদ্ভাবন ক্ষমতা, এবং খোদ ছেলেমেয়েদের দ্বারা কল্পিত নতুন পরিস্থিতি — যেখানে দরকার হয় উপস্থিত বুদ্ধি — প্রযুক্তিগত সৃজনকার্যে সহায়তা করবে।

শিশুদের কল্পনা শক্তি বিকাশের জন্য আর কী করা যায়? সবাই স্বীকার করে যে কল্পনা ব্যতিরেকে কোনকিছু সৃষ্টি করা অসম্ভব। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিশু কল্পনার প্রতিটি উচ্ছ্বাসই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত হয় — 'এরূপ ঘটে না!' কিন্তু কেন ঘটে না? এরূপ কোনকিছু এখনও ঘটে নি। তা বিদ্যমান বিধি-নিয়মের বিরুদ্ধে, বিদ্যমান তত্ত্বে তার কোন স্থান নেই। কিন্তু নতুন কিছুরও তো আবির্ভাব ঘটতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞান হামেশাই 'সম্ভব' ও 'অসম্ভবের' মধ্যে, 'অলৌকিক ব্যাপার' ও 'বিশ্বাসযোগ্যতার' মধ্যে সীমানার আপেক্ষিকতা প্রমাণ করছে। এই অল্পকাল আগেও বিদ্যুৎ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেডিও, টেলিভিশন, ল্যাসার, হলোগ্রাফি ইত্যাদি প্রকৃত অলৌকিক ব্যাপার বলেই মনে হত। কিন্তু আজ?

অসাধারণ সাধারণে এবং অবাস্তব বাস্তবে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি আরও বেশি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় কল্পনামূলক সাহিত্যে।

অধিকতর বেশি বয়সের ছেলেমেয়েদের দ্বারা বৈজ্ঞানিক-কল্পনামূলক সাহিত্য পাঠ স্বকীয় ধরনের 'কাল্পনিক সমস্যা ও কাজের তালিকার' অস্তিত্বের সন্ধান দেয়। এই সমস্ত সমস্যা ও কাজ আবিষ্কার, বিশ্লেষণ ও সুসম্বদ্ধকরণ — এ হচ্ছে চিত্তাকর্ষক ও একই সঙ্গে অতি গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যাপার, কেননা বহু বিজ্ঞানীই সমস্যাগুলো এই 'তালিকায়' অন্তর্ভুক্ত করে রাখেন — তাঁদের কালে তা সমাধানের পক্ষে প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা ছিল

না। এরূপ কাজের মাধ্যমে এটা আরও স্পষ্টরূপে কল্পনা করা যায়, সম্ভব ও কেন-এর সীমানার বাইরে বর্তমানে কী রয়েছে।

কল্পনামূলক সাহিত্য ভান্ডারে কেবল সমস্যাই নয়, পদ্ধতিও পাওয়া যায়, যা ব্যবহৃত হতে পারে তা সমাধানের জন্য। এই সমস্ত পদ্ধতির অনেকগুলোই প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। বলতে গেলে, কাল্পনিক প্রকল্পসমূহ হচ্ছে স্বকীয় ধরনের উদ্ভাবন, এবং তা সেই নীতিগুলোর ভিত্তিতেই নির্মিত যার ভিত্তিতে নির্মিত খোদ প্রযুক্তিগত প্রকল্পসমূহও, এবং সেই জন্যই এই সমস্ত প্রকল্প প্রযুক্তিগত কার্যকলাপের প্রস্তুতির পক্ষে এত উপযোগী। তবে এরূপ প্রস্তুতি সম্ভব হবে একমাত্র তখনই, যখন কল্পনামূলক সাহিত্যের ভক্তরা পড়ার কাজ ছেড়ে অধিকতর সক্রিয় ক্রিয়াকলাপে — সমস্যা সমাধানের কাজে মনোনিবেশ করবে।

ছেলেমেয়েদের যদি বৈজ্ঞানিক-কল্পনামূলক রচনা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ওগুলোতে বর্ণিত 'উদ্ভাবনসমূহ' এবং তা নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ বিশ্লেষণ করার অভ্যাস গড়ে উঠে তাহলে প্রযুক্তিগত ক্রিয়াকলাপের নিয়মিত প্রস্তুতি চলবে অতিরিক্ত সময়ের প্রায় কোন ব্যয় ছাড়াই।

সৃজনমূলক ক্রিয়াকলাপের প্রস্তুতির জন্য নিয়মিতভাবে বই পড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কেবল বই পড়াই যথেষ্ট নয়। এমন বিশেষ কাজকর্ম প্রয়োজন যার প্রক্রিয়ায় ছেলেমেয়েরা কেবল প্রস্তুত ব্যাখ্যাই পাবে না, স্বনির্ভরভাবেও নিজেদের প্রশ্নের জবাব খুঁজে বার করতে সক্ষম হবে। এর জন্য পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে এরূপ পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো দরকার যা এমনকি তারাও বুঝতে পারবে যারা এখনও পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করে নি, কিংবা করলেও খুবই কম, ভাসাভাসাভাবে।

এ ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা আয়োজন করতে সাহায্য করবে খেলনা। তবে সাধারণ রকমের খেলনা নয়।

নতুন গাড়ি তৈরি করার আগে — যা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার — সাধারণত গড়া হয় ভবিষ্যৎ গাড়িটির অনতিবৃহৎ মডেল বা প্রতিরূপ। এই মডেলগুলো দেখতে অনেকটা খেলনার মতো। কিন্তু ওগুলোতে আমাদের প্রয়োজন নেই। বিমানটি এত ছোট হয়ে যাবে, তা হাতে নেওয়া যাবে — এতে ক'রে বায়ুর চেয়ে ভারী মেশিনগুলোর খোদ উড্ডয়ন ক্ষমতা যে-সমস্ত অ্যায়রোডিনামিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তা ব্যাখ্যার কাজটি তো আর সহজ হয়ে যাবে না।

বিমান কেন উড়ে এবং কীসের উপর উড্ডয়নের গুণাগুণ নির্ভর করে

এরূপ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য আমাদের ব্যবস্থাটির প্রধান উপাদান নিয়ে — উড়ন-যন্ত্রের সমতল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করার সুযোগ পেতে হবে। ব্যাপারটি যাতে বুঝতে সুবিধা হয় সেই উদ্দেশ্যে অন্যান্য সমস্ত ফ্যাক্টরের প্রভাব একেবারে ন্যূনতম মাত্রায় নিয়ে আসা উচিত। এমতাবস্থায় পাখার সমতলে বায়ু চাপের বিভিন্নতার উপর উড্ডয়নের নির্ভরশীলতা অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সেই জন্যই ব্যাখ্যাকরণের জন্য এরূপ মডেল ব্যবহার করা খুব প্রলোভনজনক হলেও, — যা হবে 'একেবারে সত্যিকার বিমানের মতো', — প্রাধান্য দেওয়া উচিত ঘুড়ি কিংবা কাগজের বিমানকে।

'সিনেমা' কীভাবে গঠিত, তার ভিত্তিতে কী রয়েছে এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে চোখের গঠন, আলোকবিদ্যার নিয়ম ইত্যাদির বর্ণনা দিয়ে শুরু করলে চলবে না। তা শিশুদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক হলেও অতি জটিল ব্যাপার। তাছাড়া পরীক্ষার জন্য কে-ই বা তাদের সত্যিকার সিনেমা-যন্ত্র দেবে। বরং অন্য একটি সহজ কাজ করা যেতে পারে। কিছুটা ছবি এঁকে তা একটি স্ট্রবোস্কোপের মধ্যে রেখে ছিদ্র দিয়ে দেখতে দেওয়া যায়। নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরালে ছবিগুলো 'জ্যান্ত' হয়ে উঠবে এবং সত্যিকার 'সিনেমা' বলে মনে হবে।

পদার্থবিদ্যার নিয়মাবলি ব্যাখ্যা ও অধ্যয়নে সাহায্য করতে পারে এমন খেলনা প্রস্তুত করা মোটেই সহজ কাজ নয়। বহু খেলনা আছে যা নির্মাণ করা বৃহৎ উদ্ভাবনেরই সমান। তবে ছেলেমেয়েদের পক্ষে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা অসম্ভব নয়, এবং তা হচ্ছে — বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খেলনার সন্ধান, ওগুলোর সম্ভাবনা আবিষ্কার, তার কয়েকটি প্রস্তুত করা এবং একাধিক পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো।

পরবর্তী পদক্ষেপ — প্রাপ্ত খেলনাগুলোর নতুন সম্ভাবনা আবিষ্কার এবং ওগুলোর একটি নতুন রকম প্রস্তুত। এর পরে নির্দিষ্ট পদার্থবিদ্যাগত ব্যাপারাদির ভিত্তিতে নতুন খেলনা নির্মাণ।

এবং অন্তিম পর্যায়ে — আধুনিক প্রযুক্তিতে খেলনার ভিত্তিতে বর্তমান ফলপ্রসূতা ব্যবহারের উপায়াদি অনুসন্ধান।

পদার্থবিদ্যাগত ব্যাপারাদির মধ্যে ছেলেমেয়েদের সাধারণত বেশি আকৃষ্ট করে ল্যাসার, যার ব্যবহারের ক্ষেত্র দ্রুত বেড়ে চলেছে। ল্যাসার প্রয়োগের ভিত্তিতে সম্পাদিত উদ্ভাবন বিশেষ আধুনিক দেখায়, তবে বাড়ির পরিবেশে তা কাজে লাগানো অতি জটিল কাজ। তবে চুম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করতে

পারে সবাই। প্রযুক্তিতে তা প্রয়োগের সম্ভাবনা ল্যাসারের চেয়ে কম নয়, বরং বেশিই হতে পারে।

প্রযুক্তিগত ক্রিয়াকলাপের জন্য ছেলেমেয়েদের প্রস্তুতি চলতে পারে বিভিন্ন আকারে। সমস্তকিছুই নির্ভর করবে মা-বাবাদের প্রস্তুতি ও ইচ্ছার উপর, তাঁদের আগ্রহ, রুচি, অভিজ্ঞতা, হাতের সময় ও অন্যান্য অনেকগুলো শর্তের উপর। তবে এ কাজকে অবশ্যই নিয়মিত হতে হবে। অন্যথায় সাফল্যের আশা পোষণ করা উচিত নয়।

ক্ষুদে সংগ্রাহকরা

এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে পৃথিবীর কোটি কোটি ছেলেমেয়ে কোন-না-কোন জিনিস সংগ্রহ করে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা হচ্ছে ডাকটিকিট, ব্যাজ, পোস্ট কার্ড, মুদ্রা, দিয়াশলাইয়ের বাক্সের ল্যাবেল। আমাদের ছেলেমেয়েদের হাজারো রকমের শখ বা হবির মধ্যে কোনকিছু সংগ্রহকরণ আজ সবচেয়ে প্রথম একটি স্থান অধিকার করে। মা-বাবা আর শিক্ষকরা এর উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করেন না, আর কখনও কখনও তাঁরা এ বিষয়ে কিছু জানেনই না। সংগ্রহকরণ — এ হচ্ছে অতি চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার, তবে সেই সঙ্গে গম্ভীর, শ্রমসাধ্য আর জটিলও বটে। যেমন, আপনার ছেলের অল্প কয়েকটি ডাকটিকিট আছে, কিন্তু সে প্রতিটি টিকিটের বিষয়ে অনেককিছুই জানে, যেকোন ডাকটিকিটই হচ্ছে কোনকিছুর ইতিহাস। আপনার মেয়ের কাছে অনেকগুলো ব্যাজ আছে এবং সে আরও ব্যাজ সংগ্রহ করতে চায়; সে ওগুলোর সংখ্যা নিয়ে গর্ব ক'রে বার বার গণে, সব সময় নতুন নতুন ব্যাজ কেনে, অন্যের কাছ থেকে চেয়ে নেয়, বিনিময় করে, কিন্তু একটি ব্যাজ সম্পর্কেও কোনকিছু জানে না। অথচ প্রতিটি ব্যাজ হচ্ছে ইতিহাসের চেয়েও বেশি কোনকিছু, তা উচ্চ ও উজ্জ্বল কোনকিছুর প্রতীক। আমরা প্রায়ই আমাদের ছেলেমেয়েদের দ্বারা লজেন্সের মোড়ক, পাথর অথবা রঙীন কাঁচ জড় করার কাজকে খামখেয়াল হিশেবে দেখি। অনেক সময় তা সত্যিই খামখেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয় এবং বেশি কাল টিকে থাকে না। কিন্তু যদি মন দিয়ে লক্ষ্য করেন, যদি বুঝতে চেষ্টা করেন কী জিনিসটি সংগ্রাহকদের চালিত করে, কেন তারা তাদের বাঞ্ছিত বস্তুটি লাভের জন্য দুনিয়া তোলপাড় করে দিতে প্রস্তুত, তাহলে এমন এক 'নেশার' অঙ্কুর দেখতে পাবেন যা সমগ্র

জীবনের সাধনায়, পেশায় পরিণত হতে পারে, মানুষের অস্তিত্বকে মেধাগত ও আত্মিক বিকাশের দ্বারা সার্থক করে তুলতে পারে।

অজ্ঞাত শব্দ, বুলি আর প্রবাদ বাক্য সংগ্রহের কাজ রুশ নৌ-বাহিনীর ওয়ারেণ্ট অফিসার ভ্লাদিমির দাল-কে বিগত শতাব্দীর প্রখ্যাত বিজ্ঞানীতে — রুশ ভাষার বিশারদে পরিণত করে। তাঁর দুই লক্ষ শব্দ বিশিষ্ট বিখ্যাত ব্যাখ্যামূলক অভিধান আজও ভাষাবিদদের জন্য অন্যতম সেরা সহায়িকা। আকাদমিশিয়ান আলেক্সান্দর ফেস্‌মান ছ' বছর বয়স থেকে খনিজ-দ্রব্য সংগ্রহ করতেন, তিনি ছিলেন বিশ্বের সেরা একজন ভূ-রসায়নবিদ। সংগ্রাহক পাভেল ত্রেতিয়াকোভ সংগৃহীত চিত্রশালার কথা জানে সমস্ত বিশ্ববাসী। আকাদমিশিয়ান সের্গেই করোলিওভ মহাকাশ গবেষণার সঙ্গে জড়িত সমস্তকিছু, মানুষের ইচ্ছায় যাকিছু উড়ত সে সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছেন সারা জীবন। আর যে যা-ই বলুক, তিনি অবশ্যই জানতেন যে আসক্তি আর মত্ততা থাকলে সবচেয়ে স্পর্ধিত স্বপ্নও সফল হয়।

সত্যিই, সংগ্রহকরণ অনেক সময় সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার বলেই মনে হয়। তবে অতি অভাবিত দ্রব্য ও সামগ্রীর অধিকাংশ সংগ্রাহকই কৌতূহলী লোক, তাদের অন্তর্জগৎ সমৃদ্ধ, চরিত্রের দিক থেকে তারা কল্পনাবিলাসী। তারা কার্যক্ষেত্রেও সোৎসাহে ও সৃজনশীল মনোভাব নিয়ে খাটে। তাদের সঙ্গে মেলামেশা করেও আনন্দ মেলে। কেউ ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলেছিলেন: সৃষ্টিছাড়া সংগ্রাহকরা আমাদের জীবন অলঙ্কৃত করে।

আমাদের ছেলেমেয়েদের সংগ্রহকরণের কাজ প্রায়ই শুরু হয় আকস্মিকভাবে খুঁজে পাওয়া কোন জিনিস দিয়ে। ধরুন, কোন ছেলের হাতে পড়ল প্রাচীন একটা মুদ্রা, তাতে শতাব্দীর ছাপ। তার ছবি ও লেখা দেখা যেতে পারে কেবল আতস কাঁচের সাহায্যে, আর দেখা হয়ে গেলে ওগুলোর অর্থ উদ্ধার করতে ইচ্ছে জাগে। মুদ্রাটির রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলে ছেলেটি জানতে পারে স্কাইথিয়ানদের বিষয়ে, পুরাকালের কৃষ্ণসাগরীয় উপকূলের বিষয়ে। তারপর সে আরও কিছু মুদ্রার অধিকারী হয়। দেখা দেয় সংগ্রহ। ঠিক তখনই তাকে সাহায্য করা প্রয়োজন, এবং তা করতে পারেন মা-বাবা। সর্বাগ্রে শিশুদের মধ্যে এ ধারণাটি বদ্ধমূল করতে হবে: সংগ্রহের প্রকৃত প্রকৃত মূল্য সামগ্রীর সংখ্যায় নয়, ওগুলোর গুণে ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়নে।

সমস্ত ডাকটিকিট, সমস্ত ব্যাজ, সমস্ত মুদ্রা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। সে সাধ্যাতীত ব্যাপার। আসল হচ্ছে কী সংগ্রহ করতে হবে তা নয়, কীভাবে ও কীসের জন্য সংগ্রহ করতে হবে। আমাদের ছাড়া ছেলেমেয়েরা তা বুঝবে

না, এবং তখন নিষ্পাপ আসক্তি তাদের কৃপণ ও লোভী সঞ্চয়কারীতে পরিণত করতে পারে।

শিশুরা হচ্ছে পাকা ক্রেতা, বিনিময়কারী ও সংগ্রাহক। তাদের প্রয়াসের নিন্দা করব না।

আকাদমিশিয়ান ইভান পাভলোভ সংগ্রহ কাজের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন যে তা মানুষকে শৃঙ্খলানিষ্ঠ, অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী হতে সাহায্য করে, এক কথায়, সেই সমস্ত গুণ গড়ে তুলে যা বিজ্ঞান ও উৎপাদনের যেকোন ক্ষেত্রে গবেষণামূলক কাজ পরিচালনার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। প্রকৃত ও হিতকর সংগ্রহ কার্য শুরু হয় সংগৃহীত সামগ্রী সুসম্বদ্ধকরণ আর অধ্যয়ন দিয়ে। এ ক্ষেত্রে মা-বাবাদের সাহায্য অপরিহার্য। ছেলেকে মুদ্রার জন্য বাক্স বানাতে, ডাকটিকিটের জন্য অ্যালবাম জোগাড় করতে সাহায্য করা, তার সঙ্গে মিলে প্রতিটি জিনিসের কার্ড-ইণ্ডেক্স প্রস্তুত করা, বিভিন্ন বই, অভিধান আর বিশ্বকোষ দেখা, পরামর্শ লাভের জন্য যাদুঘরে যাওয়া — এ হচ্ছে অজটিল কাজ, তবে তা চিত্তাকর্ষক ও হিতকর। ক্ষুদ্র রহস্যের জগতের সঙ্গে, সেই রহস্য উদ্ঘাটনের সঙ্গে এ দিয়েই শুরু হয় শিশুর পরিচয়। সংগ্রহ কাজের ভেতর দিয়ে ছেলেমেয়েরা আত্মশিক্ষার নিয়মাবলি রপ্ত করে, সংগ্রহের নতুন সামগ্রী জ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ জ্বালাতে সক্ষম।

— এসো তো মা, এবার আমাদের ধনসম্পদগুলো একটু দেখা যাক, — বাবা বললেন মেয়েকে। এবং মেয়েটি সানন্দে তার ডাকটিকিটের অ্যালবামটি আনতে ছুটল। শিশুরা তাদের সংগ্রহ দেখাতে এবং ওগুলো সম্পর্কে বলতে ভালোবাসে। ধরুন, নতুন একটি ডাকটিকিটকে কেন্দ্র ক'রে শুরু হল গবেষণা কাজ। তখন মানচিত্র আর গাইড-বুক, বিদেশী শব্দ ও ভাষার অভিধান ছাড়া গতি নেই। ওই ডাকটিকিট অনেক কালই আর স্রেফ ডাক মাশুলের চিহ্ন নয়। এ ছাড়াও তা এখন ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন, মিনিয়েচার পোস্টার, প্রখ্যাত ব্যক্তির প্রতিকৃতি, শিল্প রচনা ও দেশের ভিজিটিং কার্ড।

ডাকটিকিট সংগ্রহকরণকে বলা হয় ফিলাটেলি। 'ফিলোস ও টেলোস' — 'চিহ্নের প্রতি ভালোবাসা' — এরূপ হচ্ছে এই শব্দটির প্রাচীন গ্রীক ব্যুৎপত্তি। কথাটি একটু সঠিকভাবে বলতে ইচ্ছে করছে: 'জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা'। ডাকটিকিট সংগ্রহকরণের জন্য বহু চিত্তাকর্ষক বিষয় আছে, যেমন: শান্তি ও মৈত্রীর ডাকটিকিট, নিজেদের দেশের মহান ব্যক্তিবর্গ, মহাকাশ বিজয়, শিল্পকলা, প্রাণিকুল, উদ্ভিদকুল ইত্যাদি। এমনকি সংকীর্ণ বিষয়ের সংগ্রহও অতি চিত্তাকর্ষক ও হিতকর ব্যাপার: তা

দৃষ্টিভঙ্গির পরিধি প্রসারিত করে, জ্ঞান গভীর করে তুলে, অধ্যবসায় ও নিয়মনিষ্ঠতা এনে দেয়, অভিজ্ঞতা জোগায়। ডাকটিকিট শিশু মনে অবশ্যই এই প্রশ্নগুলোর অবতারণা করে: 'কেন?', 'কোত্থেকে?', 'কী কারণে?'; তারা এগুলোর উত্তর পায় বিভিন্ন সূত্র থেকে এবং প্রায়ই মা-বাবার কাছে। জানা আছে যে চেখোভ ও গোর্কি যে প্রচুর সংখ্যক চিঠিপত্র পেতেন ওগুলোর সমস্ত ডাকটিকিট সংগ্রহকারী বন্ধুদের জন্য জমিয়ে রাখতেন।

আমাদের ছেলেমেয়েদের অনুরাগের জগৎটি অসীম। তারা কী যে সংগ্রহ করে না! তারা বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন কালের মুদ্রা, ডাকটিকিট, ব্যাজ, চিহ্ন, পদক, অর্ডার ইত্যাদি কতকিছু যে সংগ্রহ করে তার কোন ইয়ত্তা নেই।

মহাকবি গ্যেটে বলেছেন যে সংগ্রাহকরা হচ্ছে সবচেয়ে সুখী লোক। তাঁর সঙ্গে একমত না হয়ে পারা যায় না: যারা প্রকৃত সংগ্রাহক তাদের জীবনে অশুভ দিন বলে কোনকিছু নেই।

এমন এক বিস্ময়কর সময় আসে যখন শিশুর মধ্যে জেগে উঠে এক সংগ্রাহক-গবেষক এবং সে নিজেকে আবিষ্কার করে, — মানুষ যেমন মাটির তলে শহর ও সমুদ্রে দ্বীপ আবিষ্কার করে এ ব্যাপারটাও ঠিক তারই মতো। শিশুরা সংগ্রহ করে বোতাম আর ঝিনুক, বুক-প্লেট আর পোস্টকার্ড, চকলেটের লেবেল আর টিনের সেপাই, পাথর আর পাখির পালক। এই সমস্ত তুচ্ছ জিনিস সংগ্রহের মাধ্যমে কতকিছুই না জানা যায়; কোন বিষয়ে সংকীর্ণ আগ্রহ জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করে। তা অদ্ভুত মনে হলেও সত্যি। আমাদের ছেলেমেয়েদের হবি তাদের জীবনকে মধুর করে তুলে, অবসর সময়ের যুক্তিসিদ্ধ ও লক্ষ্যনিষ্ঠ ব্যবহার করতে সাহায্য করে। সংগ্রহকরণের কাজ বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা জোগায়। সংগ্রাহকরা নিঃসঙ্গতা বলে কোনকিছু জানে না, এবং সেটাও হচ্ছে তাদের জীবনের একটি সুখী দিক। প্রত্যেক অপেশাদার সংগ্রাহকই বলবে: অভিন্ন আসক্তি মানুষকে ঘনিষ্ঠ করে, বয়সের পার্থক্য ও পেশাগত বাধা দূর করে, বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহায়তার মনোভাব গড়ে তুলে।

সংগ্রহ করার কাজ — সে হচ্ছে সূক্ষ্ম ব্যাপার। এ নিয়ে মা-বাবা যদি হাসাহাসি করেন তাহলে অনুরাগের প্রথম অঙ্কুরটি বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাঁদের সমর্থন এই অঙ্কুরকে প্রবল আকর্ষণে পরিণত করবে, আর আকর্ষণ ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকার্যে, তাদের নৈতিক বিকাশে সহায়ক হবে।

...মেঝের উপর রয়েছে পৃথিবীর একখানি ভৌগোলিক মানচিত্র, যাতে হামা দিচ্ছে দুটি পাগলাটে লোক — বাপ ও ছেলে। তারা খুঁজছে

লিখটেনস্টেইন রাষ্ট্রটি, যার একটি ডাকটিকিট সম্প্রতি তাদের হস্তগত হয়েছে। রবিবার দিনের দুটো ঘণ্টা তারা এই ডাকটিকিটটি অধ্যয়নের কাজে ব্যয় করেছে। কিন্তু তাতে তারা কম চিত্তাকর্ষক ব্যাপার আবিষ্কার করে নি। জানা গেল যে, এটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট রাষ্ট্র, তার সমগ্র জনসংখ্যার বসার জায়গা করে দেওয়া যেতে পারে যেকোন একটি বড় স্টেডিয়ামে। জানা গেল যে, লিখটেনস্টেইন রাজ্যে ডাকটিকিট ছাপানো হয় যেকোন উপলক্ষে, — বলতে গেলে ডাকটিকিটই হচ্ছে এ দেশে আয়ের প্রধান উৎস। জানা গেল যে, এই রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীতে আছে কুল্লে ২০ জন লোক। কতকিছুই জানা হল, এবং সমস্তকিছুই ছেলের অনতিবৃহৎ সংগ্রহের নতুন একটি ডাকটিকিটকে কেন্দ্র ক'রে। তা শিশু ও বাবাকে দিল নতুন জ্ঞান আর মানবিক মেলামেশার আনন্দ।

সৌন্দর্য বোধ

মানুষের সৌন্দর্য বোধ বিকাশ করা — এ হচ্ছে এমন এক ব্যাপার যাতে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে কান্তিবিদ্যা (শিল্পকলা বিষয়ক বিজ্ঞান) এবং নীতিবিদ্যার (নৈতিকতা বিষয়ক, সমাজের সঙ্গে ও পরস্পরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিধি বিষয়ক শিক্ষার) সমস্যাবলি।

শিলপকলা আমাদের ও আমাদের সন্তানসন্ততিদের গভীর ও সূক্ষ্মভাবে দেখতে আর অনুভব করতে শেখায়।

কিন্তু শিলপকলা উপলব্ধির জন্য নির্দিষ্ট প্রস্তুতি প্রয়োজন। ঠিক সেই জন্যই আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বোধ শক্তি গড়ে তোলা উচিত, মানুষকে সৌন্দর্য উপলব্ধি করার প্রকৃতি প্রদত্ত মহামূল্যবান ক্ষমতাটি বিকশিত করা উচিত।

— শিশুদের জন্য লেখা বইয়ে ভালো নায়ক থাকতে হবে, যাতে বাচ্চারা তাকে নিজেদের আদর্শ হিশেবে গ্রহণ করতে পারে। এরূপ বই ছেলেমেয়েদের মানুষ করে।

— বই ছেলেমেয়েদের মানুষ করে যদি তাতে শিল্পীয় গুণাবলি থাকে, যদি তাতে রচয়িতার উচ্চ নৈতিক মতাবস্থান থাকে, — তখন এমনকি আদর্শ নায়ক না থাকলেও ক্ষতি নেই। ললিত সাহিত্য বিশেষ নিয়মাবলির সংকলন নয়।

সোভিয়েত শিশুদের কান্তিগত শিক্ষার বিষয়ে বলার সময় আমরা সাধারণত তাদের কল্পনা করি শিল্প বিদ্যালয়ে, পাইওনিয়র ভবন ও

প্রাসাদগুলোর স্টুডিওতে, স্কুলের শিল্পসঙ্গীত চক্রগুলোতে, যেখানে তারা গানবাজনা শেখে, ছবি আঁকে, কবিতা লেখে, নাটকে অভিনয় করে।

সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে শেখা — তা নিঃসন্দেহেই শিল্পকলার সংস্পর্শে আসার অপূর্ব এক উপায়, শিল্প রুচি গড়ার ভালো মাধ্যম। কিন্তু যারা এই সমস্ত স্টুডিওতে যায় না, যাদের আমরা, মা-বাবারা, তেমন ঘন ঘন যাদুঘরে নিয়ে যাই না, যারা সব সময় টিভি-র সামনে বসে থাকে, আর বই পড়ে বাছবিচার ছাড়া এবং তা-ও আবার বেশি পড়ে না? তাদের নিয়ে কী করা? যাদের যাদুঘর, বই বা গানবাজনা এখনও আকৃষ্ট করছে না তাদেরই বা কী গতি হবে? তাদেরও তো কান্তিগত শিক্ষার প্রয়োজন আছে এবং তা মোটেই কম নয়!

সোভিয়েত ইউনিয়নে তরুণদের জন্য সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয় গড়া হচ্ছে, স্কুল ছাত্রদের জন্য সাহিত্য চর্চার আসর ও চক্রাদি রয়েছে, কিশোর ও তরুণরা যাতে শিল্পকলার জগতে প্রবেশল করতে পারে তার জন্য বিশেষ টেলিভিশন কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

কিন্তু আসুন আমরা, মা-বাবারা, নিজেদের খোলাখুলিভাবে জিজ্ঞেস করি: সৌন্দর্যের সংস্পর্শে আসার ব্যাপারে আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের কীভাবে সাহায্য করি?

একদা বাড়ির প্রাঙ্গণে একটি ছেলে বালুর উপর দুর্গ, প্রাচীর আর শহর গড়ছিল। লোকেরা থেমে তা দেখছিল এবং হাসিমুখে তার প্রশংসা করছিল:

— বাঃ, চমৎকার, তুমি যে দেখছি একেবারে ওস্তাদ, স্থপতি। আর এ তো দস্তুর মতো এক শিল্প রচনা!

হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরোলেন ছেলেটির বাবা। তিনি এই সমস্ত তারিফ শুনে ছেলেকে বললেন:

— বাড়ি চল্। হয়েছে, শিল্প অনেক হয়েছে, ও-সব ছাড়াই বাঁচা যাবে, এবার কাজে একটু মন দে। পড়া তৈরি করে নি, মা ভেবে মরছে, আর উনি কিনা...

ক্রুদ্ধ পিতা ঠিকই বলেছেন: সময় মতো পাঠ তৈরি করা উচিত। এবং সেই সঙ্গে তিনি ভুলও করেছেন। শিল্পকলা ব্যতিরেকে মানুষের পক্ষে জীবন যাপন করা অসম্ভব। শিল্পকলার জন্ম হয়েছে এই কারণে নয় যে কোন এক সবজান্তা ইচ্ছে ক'রে তা উদ্ভাবন করেছে, আর তার ইচ্ছা না থাকলে — উদ্ভাবনই করত না। ব্যাপারটি আসলে তা নয়। শিল্পকলার জন্ম হয়েছে এই জন্য যে তা মানবজাতির পক্ষে প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য, তা হচ্ছে নিজেকে ও

বিশ্বকে সাবেগে প্রকাশের উপায়। শিল্পকলা আমাদের সারা জীবন জুড়ে থাকে ও বিভিন্ন আকারে অভিব্যক্তি লাভ করে।

— যারা বই ভালোবাসে তারা খুবই সুন্দর লোক। বই পড়ার প্রতি প্রবল আকর্ষণ — সে হচ্ছে অতি মহৎ এক আকর্ষণ, এবং পড়ার কাজে বিভোর ব্যক্তিকে অনেককিছুই ক্ষমা করা যায়...

— পড়ার প্রতি আকর্ষণ হেতু মানুষ যদি তার দায়দায়িত্ব ভুলে যায় এবং আশেপাশের লোকজনের প্রতি উদাসীন থাকে তাহলে সেটা ক্ষমার অযোগ্যই বলতে হবে। মানুষকে মহৎ করে পড়ার প্রক্রিয়া নয়, এই প্রক্রিয়ার ফল, যদি তা যথেষ্ট উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ লাভ করে তার আচরণে, মানুষের প্রতি ও কাজের প্রতি তার মনোভাবে।

কান্তিগত চিন্তা, সৌন্দর্যের ধারণা এবং সৌন্দর্যের প্রয়োজনীয়তা আমাদের জীবনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। ঠিক সেই কারণেই 'শিল্প অনেক হয়েছে, এবার একটু কাজে লাগ্' কথাটি বলে বাবা উচিত কাজ করেন নি। সৌন্দর্য অনুভব করার ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করার ক্ষমতা হিশেবে শিল্পকলা এমনকি কাজের সময়ও আমাদের সঙ্গে থাকে।

যে-ব্যক্তির আত্মিক জগৎ রিক্ত, সে সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। জীবনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি খুবই সেকেলে ও নিঃস্ব। মা-বাবাদের কর্তব্য হচ্ছে — ছেলেমেয়েদের এরূপ আত্মিক বধিরতা থেকে রক্ষা করা, খোলা মনে তাদের সৌন্দর্যকে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে শেখানো।

লেখক মিখাইল প্রিশভিন — যাঁকে প্রকৃতির গায়ক আর দার্শনিক বলে অভিহিত করা হয় — তাঁর ডায়েরিতে প্রতি দিন তাঁর জন্মভূমির মাটিতে, বনে, প্রান্তরে জীবনের প্রতিটি মৃদু ও সূক্ষ্মতম ছন্দদোলার কথা লিখে রাখতেন। এই সমস্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনার ভিত্তিতে তিনি রচনা করেন অপূর্ব সব কাব্যিক গ্রন্থ। কার জন্য তিনি ডায়েরি লিখতেন? পাঠকের জন্য, যাকে তিনি বন্ধু বলে অভিহিত করতেন। 'আমি নিজে তাকে দেখি না, কেবল জানি যে সে আছে। সে আছে, এবং আমি লিখছি... কেবল লিখছি, আর তার মানে ভালোবাসি।' অন্যত্র তিনি ভালোবাসার মানে ব্যাখ্যা করেন: 'ভালোবাসা — মানে করা।'

কিন্তু মানুষের জন্য — ছোট ও বড়দের জন্য লেখক-শিল্পীর কথাগুলো কী করতে পারে? তাকে বিশ্বকে আবিষ্কারের ক্ষমতা দিয়ে ভূষিত করতে পারে। কিন্তু আমাদের এত আপন, এত পরিচিত পৃথিবীকে নতুন ক'রে

আবিষ্কার করার কোন প্রয়োজন আছে কি? আমরা তো প্রতিদিনই তার দিকে তাকাই!

তাকালেই যে দেখা হয় এমনটা বলা চলে না। প্রিশভিন যেখানে আমাদের সামনে 'সম্পদের জগৎ' উদ্‌ঘাটন করেন সেখানে কোন উদাসীন ব্যক্তি কোনকিছুই লক্ষ্য করবে না। অনুদাসীনতাও শেখাতে হয়। উদাসীন বা নিরাবেগ ব্যক্তি কাউকে রক্ষা করতে, কোনকিছু সৃষ্টি করতে পারে না; সে কেবল ধ্বংস করতে পারে, এবং সর্বদা ক্ষতি সাধনের ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে নয়, এমনিতেই, —অনেক সময় সে জানেই না যে জীবনের সৌন্দর্য বিনাশ করছে। সেই জন্যই বৃদ্ধ লেখক তাঁর রচনাকার্যের উদ্দেশ্য হিশেবে বেছে নেন উদাসীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, কাব্যের মাধ্যমে আপন মাটির জীবনের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব গঠন।

স্মরণ করা যাক সেণ্ট-অ্যাকজিউপেরির 'ছোট্ট রাজকুমার'এর গর্বিত ফুলটির কথা, সোভিয়েত লেখক ইউরি নাগিবিনের 'শীতের ওক' গল্পে বর্ণিত সুন্দর গাছটির কথা যা একটি জটিল ও ঘটনা সমৃদ্ধ জীবন যাপন করে, অথবা অ্যান্ডারসনের গল্পে ছোটবড় সবার পরিচিত ফারগাছটির কথা। প্রকৃতি অথবা মানব জীবনের প্রতিটি ঘটনা লেখকের কলমে বা শিল্পীর তুলিতে নিজস্ব এক অনুপম বৈশিষ্ট্য লাভ করে।

পড়তে, শুনতে, তাকাতে ও দেখতে শেখানো — এই কর্তব্যগুলো আমাদের সামনে, অর্থাৎ মা-বাবা, গুরুজন আর শিক্ষকদের সামনে উপস্থিত করছে খোদ জীবন। এ কথা ভোলা উচিত নয় যে পরিবারে সান্ধ্যকালীন পুস্তক পাঠ, একসঙ্গে যাদুঘর ও প্রদর্শনী দর্শন কিশোরকে অনেককিছু দেয়। ক্রমশই অধিক সংখ্যক যাদুঘর ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ দেখা দিচ্ছে, ছেলেমেয়েরা তাদের স্কুলেও যাদুঘর তৈরি করছে। বিভিন্ন সামগ্রী সংগ্রহ করতে গিয়ে কিশোর-কিশোরীরা শিল্পকলার সান্নিধ্যে আসে, নিজের সৌন্দর্য বোধ বিকশিত করে তুলে। কিশোরদের জন্য লিখিত হয়েছে পঠন কলা বিষয়ক বই, চিত্রকলা, স্থাপত্য ও থিয়েটার বিষয়ক বই। ভালো ভালো লেখক আর নাট্যকারদের রচনাবলি মঞ্চস্থ করা হয়, টেলিভিশন মাধ্যমে বিশেষ পাঠ্যসূচি প্রচার করা হয়। তাছাড়া আছে মহান সুরকারদের অমর রচনা সম্বলিত রেকর্ড যাতে সুর দিয়েছেন সেরা গায়ক আর শিল্পীরা, বিখ্যাত অর্কেস্ট্রাগুলো।

এ সমস্ত ব্যাপারে মা-বাবারা তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিশেষ সাহায্য করতে পারেন।

শিল্পী তাঁর সারা জীবনের কঠোর শ্রম ও সাধনার মাধ্যমে তাঁর রচনায় আমাদের জন্য ও আমাদের সন্তানসন্ততিদের জন্য যাকিছু রেখে গেছেন তা ছেলেমেয়েদের গ্রহণ করতে সহায়তা করার মানে হচ্ছে তাদের সৌন্দর্যের জগতে নিয়ে যাওয়া।

সৌন্দর্য উপলব্ধির ক্ষমতা — সে হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি প্রদত্ত গুণ। তা রক্ষা ও বিকশিত করা উচিত যাতে যেকোন ক্ষেত্রে তার ফলপ্রসূ ব্যবহার করা যেতে পারে।

আপনার ছেলেমেয়ে এবং সঙ্গীত

এ কথাটি কারো কাছে প্রমাণ করার দরকার নেই যে সঙ্গীত প্রয়োজন কেবল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পুরুষগুলোরই নয়। মা-বাবাদের নিজেকে জিজ্ঞেস করা উচিত, তাঁদের সন্তানদের শিক্ষাদানের পক্ষে তাঁরা নিজেরা কি যথেষ্ট প্রস্তুত? শিশুদের শিক্ষা শুরু হয় বড়দের শিক্ষা ও আত্মশিক্ষা দিয়ে।

শিশুদের সঙ্গীত শিক্ষার সুদীর্ঘ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে শিশুদের নিয়ে সঙ্গীত চর্চা শুরু করা উচিত একেবারে অল্প বয়সে — ৩, ৪, ৫ বছর বয়সে। শৈশবের স্মৃতি — সবচেয়ে মূল্যবান স্মৃতি: শৈশবে যাকিছু জানা যায় তা সারা জীবন মনে থাকে। মানব জীবনের বহু কীর্তিকলাপ যদি বিশ্লেষণ করা যেত তাহলে আমরা সম্ভবত সবিস্ময়ে আবিষ্কার করতাম যে কিয়ৎ পরিমাণে এ সমস্তকিছুই হচ্ছে শৈশবে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফল।

হাঙ্গেরীয় সুরকার জল্তান কদাই-এর উক্তিটি বিশেষ কৌতূহলজনক:

‘‘সঙ্গীত শিক্ষা কবে শুরু করা উচিত?’ — বছর ষোলো আগে এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলতাম: ‘সন্তান জন্মের ন’ মাস আগে।’ কিন্তু তারপর থেকে আমার মত বদলে গেছে। আজ আমি জবাব দেব এভাবে: ‘মায়ের জন্মের ন’ মাস আগে!’ বাস্তবিকই তাই, সম্ভবত তাহলেই আমাদের পৌত্র ও প্রপৌত্ররা এই বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে বড় হবে যে সঙ্গীতহীন জীবন — সে সত্যিই অসার জীবন, এবং তারা তাদের মায়েদের চেয়ে অধিকতর স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে।’

পরিবারে কারো যদি পেশাগত শিক্ষা না থাকে, এবং কেউ যদি গানবাজনা

করে না, তাহলে সেখানে নির্ধারিক ভূমিকা পালন করবে সঙ্গীতের প্রতি, সঙ্গীত শিক্ষার প্রতি মা-বাবার মনোভাব।

পরিবারের কাছ থেকে প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে-জিনিসটি আশা করা হয় তা হচ্ছে — ইনস্ট্রুমেণ্টাল, সিম্ফোনিক সঙ্গীত, অপেরা, ব্যালে, জাজ — এক কথায়, যেকোন ভালো সঙ্গীতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার পরিবেশ সৃষ্টি করা। শ্রদ্ধা অবশ্যই থাকতে হবে। সঙ্গীত সম্পর্কে অবজ্ঞার সঙ্গে কোনকিছু বলা অনুচিত। সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে জবরদস্তি বা একঘেয়েমির কোন স্থান থাকতেই পারে না। মনে আছে, আমার মা বিক্ষোভের সঙ্গে তাঁর পরিচিত এক পরিবারের কথা স্মরণ ক'রে বলতেন যে ওই পরিবারে ছেলেমেয়েরা কোন অপরাধ করলে তাদের এরূপ শাস্তি দেওয়া হত: 'যা তো, গিয়ে এক ঘণ্টা পিয়ানোটা বাজা।' সঙ্গীত চর্চার মুহূর্তগুলোকে শিশুরা যাতে আনন্দ ও পুরস্কার বলে মনে করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। আর সন্তানের সঙ্গে গানবাজনার কাজে সময় ব্যয় করে মা-বাবারাও যেন তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করেন।

শিল্প শিক্ষার প্রথম সোপান হচ্ছে পরিবার, — তাকে তা-ই হওয়া উচিত ও হতে হবে। যে-সমস্ত মা-বাবা সজ্ঞানে সন্তানের সঙ্গীত প্রবণতা গড়ে তুলছেন ও বিকশিত করছেন তাঁদের এ কাজটি করা উচিত যথা সম্ভব নিয়মিতভাবে, শিশু পেশাদার সঙ্গীত শিল্পী হতে পারবে ও হবে কি না কিংবা সঙ্গীত স্রেফ তার সারা জীবনের সঙ্গী হবে তা নির্বিশেষে।

এটা কোন গোপন কথা নয় যে কিছু পিতামাতা সঙ্গীতের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। সেই সঙ্গীতের প্রতি, যা জীবনকে সমৃদ্ধ ও অলংকৃত করতে সক্ষম! সময় সময় প্রচুর পরিমাণ সঙ্গীত ধ্বনিত হয়, কিন্তু প্রায়ই অশ্রুত থেকে যায়। বেতার মাধ্যমে যদি সব সময় সঙ্গীত ধ্বনিত হয় তাহলে তাতে ক্ষতি হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি: সঙ্গীতের প্রতি পূর্ণ উদাসীনতা দেখা দেয় এবং ছেলেমেয়েরা দৈনন্দিন জীবনে নিরবচ্ছিন্ন শব্দে অভ্যস্ত হয়ে সঙ্গীতকে সঙ্গীত হিশেবে গ্রহণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

সঙ্গীত শ্রবণ করতে শেখানো উচিত। শিশুর সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করতে গিয়ে আমাদের মনে রাখা দরকার যে সঙ্গীতের ধ্বনির জগৎ — এ হচ্ছে সেই বিশেষ জগৎ যেখানে শিশুর প্রবেশ ঘটানো উচিত অলক্ষ্যে ও আনন্দের সঙ্গে, জোর ক'রে টেনে নিয়ে গেলে কোন লাভ হবে না। এবং একমাত্র সেরা, সবচেয়ে সেরা যাকিছু আছে শিশুর চেতনায় কেবল তা-ই ঢোকানো প্রয়োজন।

বিখ্যাত সোভিয়েত কবি সামুইল মার্শাক বলেন: 'শিশুদের জন্য যে-সমস্ত বই লেখা হয় তাতে প্রতিটি শব্দ একাধিক বার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করা উচিত, কারণ এই সমস্ত ছোট ছোট বই পড়েই শিশুরা ভাবতে ও অনুভব করতে শিখছে।' ঠিক সেরূপ যত্নশীল ও দায়িত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়েই আমাদের সঙ্গীতও বাছা উচিত, যার সাহায্যে আমরা শিশুর সঙ্গীত রুচি গড়তে ও বিকশিত করতে চলেছি।

— শিশু বলতে আমরা কী বুঝি? তার বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা কীরূপ, তার মধ্যে লুক্কায়িত ও এখনও অজ্ঞাত সম্ভাবনাগুলো কীরূপ?

— শিশু — এ হচ্ছে শত মুখোস, দক্ষ অভিনেতার শত ভূমিকা। সে মায়ের সঙ্গে এক রকম, বাবার সঙ্গে এক রকম, দিদিমার সঙ্গে এক রকম, দাদুর সঙ্গে এক রকম, কড়া শিক্ষক ও স্নেহশীল শিক্ষকের সঙ্গে এক রকম, রান্নাঘরে এবং সমবয়সীদের মধ্যে এক রকম, ধনী ও দরিদ্রের সঙ্গে এক রকম, আটপৌরে ও উৎসবের পোশাকে এক রকম। সে সরল ও চতুর, বিনীত ও প্রতিহিংসা পরায়ণ, শিষ্ট ও দুষ্টু, এমনভাবে নিজের মধ্যে ডুবে থাকতে পারে যে আমাদের অনেক সময় বিভ্রান্ত করে দেয় এবং তা নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে...

আমার সুদীর্ঘ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আছে। এ সময়ের মধ্যে আমি এমন বহু ছাত্রের দেখা পেয়েছি যারা অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। আমরা প্রায়ই এমনকি ভাবিও না যে সঙ্গীতের প্রতি প্রকৃত ও সক্রিয় আগ্রহ যদি শিশুর সত্তাকে স্পর্শ করে তাহলে সে কী যে না করতে পারে! সেই জন্যই বহু কাল থেকেই আমার প্রশিক্ষণ কাজের ভিত্তিতে রয়েছে শিশুর মধ্যে লুক্কায়িত অনন্ত শক্তির প্রতি বিশ্বাস।

ছ' বছরের ছোট্ট এক ছেলে গ্রীষ্ম যাপনের জন্য গ্রামে চলে যাচ্ছে। মা তাকে বলছেন:

— আফসোসের কথা, বাদ্যযন্ত্রটি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না!

— ও কিছু না, তুমি কেবল বেশি ক'রে স্বরলিপির কাগজ নিও, আমি লিখব।

— কী লিখবি?

ছেলে সবিস্ময়ে মায়ের দিকে তাকায়:

— কী আবার লিখব? সমস্তকিছু...

—সমস্তকিছু মানে?

— এই তো কীভাবে নদী বইছে, চারিদিকে কী রকম বন, ঘাস কী সবুজ...

আমরা অনেক সময়ই বুঝি না যে শিশুর সঙ্গীত বোধ চারিদিকের জগৎকে উপলব্ধির সঙ্গে এত বেশি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

এই ছেলেটি যখন প্রথম বার পিয়ানো দেখেছিল তখন বাড়ি যেতে চায় নি, কিছুতেই চোখ সরাতে পারছিল না, এক জায়গায় বসে থেকে কয়েক ঘণ্টা ধরে শুনছিল কীভাবে ছাত্ররা গানবাজনা করছে, বিরতির সময় পিয়ানোর কাছে গিয়ে এক-একটি রীডে চাপ দিচ্ছিল এবং বিস্মিত হয়ে নিজের জায়গায় চলে যাচ্ছিল। বাড়ির পথে সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বাবাকে বলল: 'জিনিসটা কিন্তু খাসা, ওতে প্রায় সবকিছুই বাজানো যেতে পারে। আমি যখন বড় হব, তখন কিলোমিটার লম্বা একটি পিয়ানো বানাব, যাতে ওর উপর একবার এদিকে, একবার ওদিকে বাজানো যায়...' ছেলেটি তখনও জানত না যে ধ্বনি সম্পর্কে বলা যায়: উপরের দিকে ও নিচের দিকে।

চারিদিকের জগৎ কীভাবে শিশুর জন্য ধ্বনির জগতে রূপান্তরিত হয়? খুবই সহজে! তা হতে পারে রেল এঞ্জিনের শিটি কিংবা শোনা কোন গানের সুর। শিশুর হঠাৎ ইচ্ছে হল শিটি 'বাজাবে', সে তা করতে চেষ্টা করে: সে দেখতে পেল যে এই শাদাকালো কাঠের রীডগুলো সাগ্রহে পরিচিত ধ্বনি সৃষ্টি করার ইচ্ছায় সাড়া দেয়, আর একঘেয়ে ও হাস্যকর বিন্দু এবং রেখাগুলোর মধ্যে আছে সঙ্গীতের রহস্য এবং অধ্যয়ন করলেই ওগুলো সাগ্রহে সেই রহস্য উদ্ঘাটন করে।

প্রতিভার প্রকাশ ঘটে বিভিন্নভাবে। কেউ কেউ সঙ্গীত ভালোবাসে, তারা সঙ্গীতের প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে, গাইতে, শুনতে ও নাচতে ভালোবাসে, কিন্তু তারা প্রকৃতি প্রদত্ত সঙ্গীত শ্রুতি, তাল বোধ, সঙ্গীত স্মৃতি থেকে বঞ্চিত। অন্যরা সমস্ত এই গুণেগুলোর দ্বারা ভূষিত, কিন্তু তারা সঙ্গীতে তেমন একটা সাড়া দেয় না — এ ধরনের ছেলেমেয়েদের আকৃষ্ট করতে পারা চাই। প্রায়ই এমনও ঘটে যে শিশু যা শুনতে পায় ও মনে রাখে তার সঙ্গে স্বরগ্রন্থির সমন্বয় থাকে না, এবং এর দরুন শিশু পরিষ্কারভাবে তানটি ধরতে পারে না, এমনকি সে যদিও তার অভ্যন্তরীণ শ্রুতির দ্বারা তা স্মরণ রেখেছে। তবে তার মানে এ নয় যে সঙ্গীত চর্চা করার মতো কোন দক্ষতা তার নেই।

আমার মনে হয় যে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ব্যাপক শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে সবাইকে, কারণ একেবারে প্রতিভাহীন শিশু নেই কিংবা প্রায় নেই। শারীরিক যোগ্যতা (শ্রুতি, তাল, সঙ্গীত স্মৃতি, 'সুবিধাজনক' হাত) থাকলে শিশু

তার স্বভাব অনুসারে সহজে যাকিছু করতে পারে তা তাকে আনন্দ না দিয়ে পারে না। শিশুকে যদি সুন্দর গান শুনিয়ে, ভালো তালের নাচ দেখিয়ে একটুও আকৃষ্ট করা যায়, তাহলে তার মধ্যে প্রকৃতি প্রদত্ত যে-গুণগুলো নেই তা অর্জন করার বাসনা জাগবে, সে অভীষ্ট লাভে অবশ্যই উঠেপড়ে লাগবে। সে সঙ্গীত ভালোবাসতে আরম্ভ করবে, এবং আমার মতে, এ সামান্য কিছু নয়। প্রায়ই এমনকি অভিজ্ঞ শিক্ষকও আগে থেকে বলতে পারেন না, মানুষের মধ্যে তার দক্ষতা এবং সঙ্গীতের প্রতি তার মনোভাব কীভাবে বিকাশ লাভ করবে।

চার বছর বয়সে শিশু তার সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করতে পারে। কেবল এ কথাটি মনে রাখা উচিত যে শিশুকে সহজে শিক্ষা দেওয়া যায় ক্রীড়ামূলক পদ্ধতির সাহায্যে, এবং সব সময় তার আগ্রহ টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে ও সর্বতোপায়ে তার কল্পনা শক্তি জাগ্রত করার উদ্দেশ্যেও সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যেমন, রূপকথা বলার সময়, তার সঙ্গে খেলার সময় অথবা কথা বলার সময় তাকে 'যাদু করা' উচিত এবং তার মধ্যে অল্প অল্প ক'রে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত যা পরে প্রকৃত ও বৃহৎ সঙ্গীতের জগতে প্রবেশ করতে তাকে সাহায্য করবে।

আর ৫-৬ বছর বয়সে শিশুর জন্য স্বরলিপির পাঠ যখন প্রথম বার 'কথা বলতে শুরু করে' তখন তার জন্য হাজার হাজার জিনিস — যা এত কাল তার কাছে চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয় নি — বাজতে আরম্ভ করে। পৃথিবী তখন তার কাছে নতুন রূপে ধরা দেয়, এবং সমস্তকিছু — বই, ছবি, এমনকি খেলনা — নিজস্ব কণ্ঠ লাভ করে।

অনেকেই বলে যে সমস্ত শিশুই একই ধরনের শ্রুতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, তবে কারো কারো ক্ষেত্রে তা বিকাশ লাভ করে উপযুক্ত পরিবেশের কল্যাণে, আর অন্যদের বেলা অবিকশিতই থেকে যায়। আমি জানি না, সমস্ত ছেলেমেয়েই একই ধরনের শ্রুতি নিয়ে জন্মায় কি না কিংবা এখানে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে শ্রবণ যন্ত্রের বংশগত বৈশিষ্ট্য, তবে এ কথাটি আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে শ্রুতিকে যত ইচ্ছে বিকাশ করা যায়। নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমি তা বুঝেছি। জীবনে সমস্ত সৃজনমূলক সাফল্যের মতো শ্রুতি বিকাশের বেলাও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে উদ্যম: যার শ্রুতি বিকশিত করা হচ্ছে এবং যে এ ব্যাপারে সাহায্য করছে তাদের দু'জনের উদ্যম। শ্রুতি বিকশিত করার কাজে শিক্ষকের ভূমিকাটি খুবই বৃহৎ, তবে মা-বাবাদের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

— শিশুদের বিকাশে ও মেলামেশায় প্রধান দোষটি কী? এ বিষয়ে আপনি কিছু বলতে পারেন?

—একঘেয়েমি — নিঃসঙ্গতা, দর্শনমূলক, শ্রবণমূলক ও অনুভূতিমূলক প্রভাবের অভাব। একঘেয়েমি — প্রভাবের আধিক্য, শব্দ হৈ-হল্লা আর হুড়োহুড়ি... একঘেয়েমি — অনীহা, উদাসীনতা, স্বল্প তৎপরতা, মৌনতা, জীবনী শক্তির হ্রাস... একঘেয়েমি — অত্যধিক তৎপরতা। এক মিনিটও এক জায়গায় বসে থাকবে না, কোন কাজ করবে না, জেদ করবে, শৃঙ্খলানিষ্ঠ নয়, হিংসাপরায়ণ; মনে আঘাত দেয়, পেছনে লাগে, বিরক্ত করে, কাঁদে ও রেগে উঠে। সময় সময় ইচ্ছে করে ঝগড়া বাধায়, এবং প্রত্যাশিত শাস্তিতে শংকিত প্রবলানুভূতি লাভের আশা পোষণ করে... একঘেয়েমি কখনও কখনও ব্যাপক মনোবিকারের বৈশিষ্ট্য লাভ করে। খেলা সংগঠন করতে না পারার দরুন কিংবা লজ্জা করার দরুন, বয়স ও চরিত্রের দিক থেকে পরস্পরের মধ্যে অমিল থাকার দরুন কিংবা অনভ্যস্ত পরিবেশে শিশুরা অর্থহীন চিৎকার ও শব্দের মাধ্যমে প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করে...

চিঠিপত্রে মা-বাবারা প্রায়ই এরূপ প্রশ্নও করে থাকেন: শিক্ষক না থাকলে শিশুকে পিয়ানো বাজাতে দেওয়া যায় কি? তাতে 'হাত খারাপ' হয়ে যাবে না তো?

প্রাথমিক পর্যায়ে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, সঙ্গীত শুনতে শেখানো, সঙ্গীত যাকিছু বলছে তার প্রতি আকৃষ্ট করা, সঙ্গীত কল্পনা বিকশিত করা। এই উপদেশটি সেই সমস্ত ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য যারা হয়তো কখনও পেশাদার শিল্পী হিশেবে কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাবে না। শিশু আনন্দ মিশ্রিত বিস্ময়ের সঙ্গে দেখে যে আঙুলের তলা থেকে হঠাৎ পরিচিত সুর বেরিয়ে আসছে, এবং তখনই সম্ভবত — যদি তার শ্রুতি ও সঙ্গীত স্মৃতি থাকে — সে সাগ্রহে যাকিছু শোনে তা-ই বাজাতে শুরু করে। তার এরূপ উদ্যোগে বাধা দেওয়া উচিত নয়। এ হচ্ছে সৃজনী সম্ভাবনার প্রকৃত অভিব্যক্তি এবং তা খোদ খুবই মূল্যবান জিনিস। সত্যি কথা বললে, প্রাক্‌স্কুলবয়স্ক শিশুদের স্বনির্ভর সঙ্গীত চর্চার এই সমস্ত প্রথম চেষ্টাচরিত্র কেবল অতি বিরল ক্ষেত্রেই হাতের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করতে পারে, আর এরূপ সঙ্গীত চর্চার ফলে সঙ্গীত শিক্ষার ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে অনেক উপকার মিলতে পারে। যদি সুযোগ থাকে: যদি বাড়িতে বাদ্যযন্ত্র থাকে, বাড়িতে কেউ বাজায় কিংবা অন্ততপক্ষে সঙ্গীত খুব ভালোবাসে ও ব্যক্তিগত আকর্ষণবশত তার সঙ্গে পরিচিত থাকে, তাহলে বেশি দেরি না ক'রে ৪-৫ বছর বয়সেই সঙ্গীত চর্চা শুরু করা উচিত।

বাড়িতে কেউ যদি কোন বাদ্যযন্ত্র না বাজায়, তাহলে শিশুদের পক্ষে বোধগম্য সঙ্গীতের রেকর্ড কিনে বাজানো যেতে পারে। এ কথা বলা উচিত যে আপনার সন্তান বিশেষভাবে কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে না শিখলেও রেকর্ড, রেডিও ও টেপ-রেকর্ডার আপনার খুব সাহায্য করতে পারে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে-সমস্ত মা-বাবা মনেপ্রাণে সঙ্গীত ভালোবাসেন ও আত্মশিক্ষার কাজে মনোনিবেশ করার বাসনা পোষণ করেন, তাঁরা শিল্পের সঙ্গে সোৎসাহে মিলনের ফলে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা নিজের সন্তানের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য অনেককিছুই করতে পারেন। তবে উৎসাহ ব্যতিরেকে এ ক্ষেত্রে কোন সাফল্য লাভ করা অসম্ভব।

যে-সমস্ত মা-বাবা নিজের ছেলেমেয়েদের সবে সঙ্গীত চর্চায় হাতে-খড়ি দিচ্ছেন তাঁদের বলতে চাই যে সঙ্গীত জগতে প্রবেশের পথটিকে হতে হবে সহজ ও পরিষ্কার। যারা সঙ্গীত ভালোবাসে, সঙ্গীতও তাদের ভালোবাসে। মা-বাবাদের এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত যেখানে 'সঙ্গীত' কথাটি শিশুদের মনে কেবল আনন্দের উদ্রেক করবে।

সঙ্গীতের ভাষা — এ হয়তো পৃথিবীতে একমাত্র ভাষা, যাতে মানব হৃদয় ব্যক্ত করতে পারে সবচেয়ে সূক্ষ্ম, সবচেয়ে উদাত্ত অনুভূতি, যা সঙ্গীতের ধ্বনি ছাড়া আর কোনকিছুর দ্বারাই প্রকাশ করা যায় না। যেখানে কথার শেষ, সেখানেই সঙ্গীতের শুরু।

সঙ্গীত একঘেয়ে, অমার্জিত, বিরক্তিকর ও কুশ্রী কোনকিছু সহ্য করে না। শিশুকে অন্তহীন চিত্তাকর্ষক রূপকথারই মতো সঙ্গীতের দ্বারাও বিমোহিত করতে চেষ্টা করবেন।

চেষ্টা করবেন যাতে সঙ্গীত চর্চার সময় কোনকিছু যেন আপনাদের অন্যমনস্ক না করে, সঙ্গীতের সঙ্গে শিশুর প্রথম সাক্ষাতের সময় কোনকিছু যেন তাকে বাধা না দেয়। এই সমস্ত সাক্ষাৎ চলবে তাড়াহুড়ো ছাড়া। চিৎকার ছাড়া, ধৈর্যের সঙ্গে। শান্ত ও সুন্দরভাবে।

শিশু পৃথিবী আঁকছে

শিশুর শিল্প শিক্ষা শুরু হওয়া উচিত তার জীবনের প্রথম বছরগুলো থেকে যাতে সে একেবারে ছোটবেলা হতে সৌন্দর্যে ও সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

ছবি আঁকার জন্য বিশেষ গুণ বা প্রতিভার প্রয়োজন আছে কি? খুব ইচ্ছা থাকলে মোটামুটি ভালো ছবি আঁকার কাজ শিখতে পারে প্রত্যেকেই। এ ব্যাপারে আসল জিনিসটি হচ্ছে — কেবল প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করা এবং ছবি ও চিত্রকলার উপকরণ আয়ত্ত করাই নয়, চিত্তাকর্ষক সমস্তকিছু লক্ষ্য করতে আর দেখা সমস্তকিছু সাধারণীকৃত করতেও শেখা।

শিশুর জন্য সচরাচর চিত্রাঙ্কনই হচ্ছে কাগজের উপর তার কল্পনা, তার মনোভাব ও পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে তার ধারণা প্রকাশের সর্বপ্রথম মাধ্যম। মা-বাবাদের মনে রাখা উচিত যে শিশুর কাছে বাস্তব জগৎ ভিন্ন এক রূপ পরিগ্রহ করে — সে তাকে দেখে তার শিশুসুলভ দৃষ্টিতে। শিশুর ব্যক্তিত্বও ভিন্ন — তা এখনও পেলব, সবে গড়ে উঠছে। নিজের সাধ্য মতো শিশু চারিদিকের পৃথিবীটাকে আঁকে ঠিক যেভাবে সে তাকে দেখে। সে তাকে পরিবর্তিত করে না, বিকৃত করে না, এবং চেষ্টা করে যাতে তার ছবিটি 'জীবন্ত' হয়ে উঠে, যেন তাতে 'সাদৃশ্য' বজায় থাকে।

...আজ শিশু মানুষের হাতে চারটি নয়, পাঁচটি আঙুল আঁকতে শিখছে, এবং এটা তার জন্য অগ্রগতিই বলতে হবে। কাল সে বুঝবে যে আঁকা মানুষটিকে তার পাশে আঁকা বাড়িটির চেয়ে আকারে ছোট হতে হবে, নতুবা ওই বাড়িতে সে বাস করতে পারবে না। পরে সে তার ছবিটি স্রেফ উজ্জ্বলভাবে রঙাতেই শিখবে না, মানুষ এবং জিনিসের প্রকৃত রঙ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করবে। এর পর সে আয়ত্ত করবে দৃশ্যের প্রকৃত বাহ্যিক রূপ ফুটিয়ে তোলার কলাকৌশল। এ সমস্তকিছুই হচ্ছে শিশুর বৈশিষ্ট্য গঠন ও বিকাশের ভিত্তি, কেননা প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কেবল ব্যক্তিগত নয়, সর্বমানবীয় বিকাশের ফল, এবং তা সম্ভব কেবল ব্যাপক সংস্কৃতির ভিত্তিতে।

মানুষ বহির্বিশ্বের ৮০ শতাংশেরও বেশি তথ্য লাভ করে দৃষ্টির মাধ্যমে।। এই সংখ্যাটি অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক-শিক্ষাবিদ দিদ্রো-র একটি উক্তির ব্যাখ্যা দেয়: যে-দেশে ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে সবাইকে কেবল পড়তে ও লিখতেই নয়, বাধ্যতামূলকভাবে আঁকতেও শেখানো হবে সেই দেশে আমরা কেবল শিল্পকলার ক্ষেত্রেই নয়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তীব্র অগ্রগতি লক্ষ্য করব, কেননা শেষোক্তটি নির্ভর করে বহির্বিশ্ব থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর।

— পৃথিবী প্রকৃত পক্ষে যে-রকম, শিশু ঠিক সেই রকমভাবেই তাকে উপলব্ধি

করুক, — সেটাই দরকার। কিন্তু তার ছবিতে নীল ঘোড়া কোত্থেকে এল? বাস্তব জীবনে সে কখনও এমনতর কোনকিছু কি দেখতে পারে?

— আর হয়তো বা শিশুর কল্পনাকে মুক্তি দেওয়া উচিত? আসল কথা হচ্ছে সে যেন নিরস নকলকারী না হয়ে অ্যান্ডারসনের মতো চারিদিকের সমস্তকিছু অনুভব করতে পারে, জিনিসের কণ্ঠ ও চরিত্র বুঝতে শেখে।

বাস্তবধর্মী ছবি শিশুকে পৃথিবীর সঙ্গে বহু বিচিত্র সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ দেয়। শিশু বাস্তব পৃথিবীকে যত বেশি জটিলভাবে উপলব্ধি ও চিত্রিত করে, ততই বেশি জটিল ও উজ্জ্বল হয়ে উঠে তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব।

বাস্তব ও আত্মমুখী ব্যাপারাদির ঐক্য প্রতিফলিত হয় শিশুদের ছবিতে। আর ছবির প্রধান তাৎপর্য নিহিত থাকে খোদ শিশু কর্তৃক বিশ্বকে সর্বাঙ্গীণভাবে উপলব্ধি করা ও আবেগের সঙ্গে মূল্যায়ন করার সেই প্রক্রিয়ায় যা সম্ভব কেবল বাস্তবতার ব্যক্তিগত, আত্মমুখী উপলব্ধির পরিস্থিতিতে। প্রকৃতিকে উপলব্ধিকরণ থেকে চিত্রণ অবধি সমগ্র পথটি শিশুকে নিজেকেই অতিক্রম করতে হয়।

চাঁদের উপর মানুষ হাঁটছে। সোভিয়েত মহাকাশচর আলেক্সেই লেওনোভ একজন পেশাদার শিল্পী। তাঁর ছবিগুলো অসাধারণ ও সরল রোমান্সে ভরপুর।

মহাকাশচর ছবি আঁকেন... এ কথা না বললেও চলে যে আঁকার দক্ষতা বস্তুত পক্ষে বিভিন্ন পেশার মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়, যেমন, ভূগোলবিদ, উদ্ভিদবিজ্ঞানী, প্রত্নতত্ত্ববিদদের পক্ষে... তাছাড়া এই দক্ষতার দ্বারা ইঞ্জিনিয়র, ডিজাইনার, প্রযুক্তিবিদ, শিক্ষক, শল্যচিকিৎসক আর কৃষিবিদরাও কি উপকৃত হন না? ফরাসি লেখক ও বৈমানিক আঁতুয়াঁ দে সেন্ত-অ্যাকজিউপেরি — যিনি ছিলেন স্বকীয় এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং পুরো একটি পুরুষের স্নেহ ও ভালোবাসার পাত্র — নিজের বইগুলোর জন্য নিজেই ছবি আঁকতেন, কারণ তিনি আঁকতে ভালোবাসতেন।

প্রথম রুশ বিমানের নির্মাতা আলেক্সান্দর মজাইস্কি উত্তরাধিকার হিশেবে মানবজাতির জন্য রেখে গেছেন কেবল তাঁর প্রযুক্তিগত ভাবধারণাই নয়, বহু ছবি আর চিত্রও।

যে-মানুষ আবিষ্কার ও বীরোচিত কীর্তিকলাপ সম্পন্ন করে তাকে

পৃথিবী ভালোবাসতেই হবে, তাকে পৃথিবী দেখতে হবে শিল্পীর দৃষ্টিতে।

...মেয়েটি ক্লাসে বসে আছে। তার সামনে শিক্ষিকার টেবিলের উপর — নোংরা একটি ডেকচি এবং এই মাত্র শাদা করে তোলা প্লাস্টারের একটি শঙ্কু। মেয়েটি আঁকছে: সে দেখতে শিখছে।

মেয়েটি রাস্তায় বেরিয়ে এল: আকাশের অর্ধেকটা জুড়ে সূর্যাস্ত।

— আজ সূর্যাস্তটা কী সুন্দর, দেখেছিস? — জিজ্ঞেস করেন শিক্ষিকা।

—আজকাল আমি সমস্তকিছুই দেখি!.. — গর্বিতভাবে জবাব দিল মেয়েটি। 'আজকাল' কথাটির দ্বারা সে বোঝাতে চেয়েছে চিত্রাঙ্কনের পাঠ। মেয়েটি হৃদয়ঙ্গম করেছে যে সে দেখতে শিখছে। সে তাকায় ও দেখে। সে দেখে এবং এ নিয়ে গর্বিত: 'আজকাল আমি সমস্তকিছুই দেখি!..'

বাড়িতে সে অসম্ভব কঠিন এক কাজে হাত দেয়: আয়নার সামনে বসে নিজের মুখটি ভালো ক'রে দেখছে, এর আগে কখনও এত মন দিয়ে সে নিজের মুখ দেখে নি। সে শিল্পীর চোখ দিয়ে মুখটি দেখার চেষ্টা করছে। মেয়েটি নিজের প্রতিকৃতি আঁকছে।

'আয়নার পক্ষে সবই খুব সহজ। আয়না যা দেখে তা-ই প্রতিফলিত করে, তার জন্য ও কোন কাজই নয়। কীসব রশ্মি এদিকে-সেদিকে ছোটাছুটি করে, এবং তা থেকে গড়ে উঠে ছবি। আমাদের আয়না আমায় ভালোভাবেই চেনে। কিন্তু যখন আমি রঙ নিয়ে আয়নার সামনে বসলাম, চটপট নিজের প্রতিকৃতিখানা এঁকে ফেললাম, তখন আমি অবাকই হলাম। যা আঁকলাম তা মোটেই আত্মপ্রতিকৃতি হল না।

অর্ধেক দিন আমি ভাবলাম, কী করা উচিত, এবং পরে পেন্সিল হাতে নিয়ে স্মরণ করতে লাগলাম স্কুলে আমাদের কী বলা হয়েছে: 'দ্যাখো, তোমাদের মাথার প্রস্থ কতবার তার উচ্চতায় আঁটছে। কান নাকের চেয়ে কতটা বড় কিংবা ছোট। কী বেশি প্রশস্ত — চোখ না নাকের ভিত। নাকের খাঁজ থেকে ভুরুগুলো কীভাবে চলেছে — উপরের দিকে, নিচের দিকে অথবা সোজা... ইত্যাদি ইত্যাদি।' আমি নিজের নাকটি দেখতে ও কানের সঙ্গে তার তুলনা করতে লাগলাম — কী বেশি বড়? দেখা গেল কান বড়। দিদিমণি বলেছেন, যত বেশি মাপবে ততই ভালো। আমি মাপছিলাম আর আঁকছিলাম, মাপছিলাম আর আঁকছিলাম। অবশেষে ছবিখানি আঁকা শেষ হল। 'মন্দ নয়,' — ভাবলাম আমি এবং ঠিক করলাম যে সবচেয়ে কঠিন ধাপটি অতিক্রান্ত।

কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম যে ভুল করেছি।

আমার মুখটি কী রঙের? আমি রঙ মিশিয়ে মিশিয়ে পাঁচটি প্লেট নষ্ট করেছি। শেষ পর্যন্ত কী একটি মানানসই রঙ মিলল — শাদাও নয়, গোলাপীও নয়, খয়েরীও নয়। ক্লাসে আমি ছেলেমেয়েদের দিকে হঠাৎ ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলাম এবং দেখতে পেলাম: তারা সবাই কত ভিন্ন! তাদের নাক, চোখ সবই ভিন্ন, এমনকি কান ও গালের রঙের মধ্যেও কোন মিল নেই। আশ্চর্য! সবই দেখছি! সবই লক্ষ্য করছি! সবই লক্ষ্য করছি! সবই চোখে পড়ছে!' — আনন্দিত হয় মেয়েটি।

ছেলের আঁকা ছবি। সন্ধ্যাবেলা। ঘরে উপরের আলোগুলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাবা স্ট্যান্ডার্ড ল্যাম্পের আলোর নিচে আরাম ক'রে বসে রুশ শিল্পী ইলিয়া রেপিনের স্মৃতিকথামূলক একখানি বই পড়ছেন। পাশে ছোট টেবিলে ছেলে ছবি আঁকছে। সময় সময় বাবা বইয়ের উপর দিয়ে ছেলের দিকে তাকাচ্ছেন: মনে হচ্ছে ঘরের জিনিসপত্র রঙ দিয়ে খুব একটা নোংরা করছে না — টেবিলখানি পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে, গায়ের শাদা জ্যাকেটটিও। সবকিছু ঠিকই চলছে। ফ্ল্যাটে পূর্ণ নিস্তব্ধতা। ছেলে আঁকা ছবিখানি বাবার দিকে বাড়িয়ে দেয়। বাবা সবিস্ময়ে তাকান।

— এটা কী হল? — অবশেষে তিনি উচ্চারণ করলেন।

ছেলে তো অবাক।

— বাবা, তুমি কেন এত অবুঝ! — বলে ছেলে। — এটা লেনিনগ্রাদ — দেখেছ, নদী? আর এ হচ্ছে এক নৌ-সৈনিক। সে কিছুই ভয় করে না। বুঝলে? — জিজ্ঞেস করে ছেলে।

বাবা তাকে জবাব দেন:

— না। তুই এখন বড় হয়েছিস, দশ বছর হয়ে গেছে, এবং আমি তোকে সোজা কথা বলব: তুই ওসব ছাড়, তোকে দিয়ে শিল্পী হবে না। তোর মধ্যে প্রতিভার কোন নামগন্ধই নেই। এই তো যেমন রেপিনের কথা ধর। উনি যেমন আঁকেন, তেমনি লেখেন: সমস্তকিছু যেন সত্যিকার ব্যাপার, বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার মিল আছে। তোকে কষ্ট দিতে আমারও কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু সত্যের বিরুদ্ধে তো যাওয়া যায় না: তুই — রেপিন নস।

ছেলেটির মুখ কালো হয়ে যায়। বিষণ্ন দৃষ্টিতে ছবির দিকে তাকাতে তাকাতে সে সন্দেহের সঙ্গে নাক দিয়ে শব্দ করতে শুরু করে। এরূপ পরিস্থিতিতে সচরাচর যা ঘটে থাকে বাবা তার ব্যতিক্রম না ক'রে বুদ্ধিমানের মতো টেলিভিশনটি চালু করে দিলেন। কোন হাসিখুশির প্রোগ্রামই চলছিল।

ছেলেটি শান্ত হয়ে খুশি মনে ঘুমিয়ে পড়ে। বাবা কিংবা ছেলে কেউ-ই সন্দেহ করছে না যে খুব বড়, খুব দুঃখজনক একটা ঘটনা ঘটে গেল: উপহাসের দ্বারা, ছেলের ছবি আঁকার প্রয়োজন নেই তাতে পূর্ণ বিশ্বাসের দ্বারা বাবা রঙচঙে হাসিখুশি শিশুসুলভ মজার ছবিখানির সঙ্গে ছেলের ঝগড়া বাধিয়ে দিলেন।

ছেলে ঘুমাচ্ছে। এমনকি ঘুমের মধ্যেও সে শিশুর এক অপূর্ব জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে হচ্ছে বৈমানিকদের, বীর লোকেদের, দস্যু-ডাকাতদের, পাখিদের, নির্ভীক শিকারীদের, মহাকাশচরদের ও গৃহপালিত জীবজন্তুদের জগৎ। সকালবেলা ছেলেটির ঘুম ভাঙলে তার রঙীন ও মজার পৃথিবী কাগজে অঙ্কিত হওয়ার দাবি জানাবে, এবং সে যখন হাতে তুলি নেবে তখন বাপের কথাগুলো মনে পড়বে: 'আমি তোকে পুরুষ হিশেবে পুরুষের মতোই বলব: তোর কোন প্রতিভা নেই, তুই রেপিন নস। ওই সব আঁকা-টাকা ছাড়।' এবং ছেলেটি তুলি ছুঁড়ে ফেলবে, 'ওই সব আঁকা-টাকা' ছেড়ে দেবে। হাজার হাজার প্রশস্ত চিত্তাকর্ষক পথ তাকে রঙীন পেন্সিল আর উজ্জ্বল রঙের কাছ থেকে বহু দূরে নিয়ে যাবে। ছেলেটি আর কখনও (অন্ততপক্ষে স্বেচ্ছায়) ছবি আঁকার কাজে হাত দেবে না।

কিন্তু বাবা এমন কী করলেন? ছেলেকে বলেছেন: 'তুই — রেপিন নস।' কিন্তু সত্যিই তো ছেলের কোন দক্ষতা নেই।

কিন্তু ঠিক এই জিনিসটাই বিচার করার সময় এখনও হয় নি।

মা-বাবাদের কাছে যা অদক্ষতার লক্ষণ বলে মনে হয় তা প্রায়ই হচ্ছে গ্রাফিক জ্ঞানের পূর্ণ অনুপস্থিতি। সমস্তকিছুর মতো তা-ও শিশুকে দিতে হয় শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে।

যখন পৃথিবী অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে ছোট্ট মানুষটির চারিদিকে প্রসারিত হতে থাকে, যখন পৃথিবী অনেকটা অচেনা ও অজানা, প্রতিটি পদক্ষেপে তা বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিত, তখন — অর্থাৎ সেই ছোটবেলাতেই — শিশু রঙ, গতি, ছন্দ আর রূপের প্রতি বিশেষ সজাগ। ওই সময় তার পক্ষে ছবি আঁকার ব্যাপারটি কিছুটা লাফালাফি করা, ছোটাছুটি করা, কথা বলা ও গান গাওয়ারই মতো স্বাভাবিক। শিশু পেন্সিল হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে-সমস্যাটির সম্মুখীন হয় তা হল এই যে বড়দের অধিকাংশই তার ছবিখানি একদম বুঝে না।

— ঠিক হল না, — বলে বড়রা।

— ঘোড়া কি দেখতে এ রকম? — বিস্মিত হয় বড়রা।

— জীবনে মোটেই ও রকম নয়! — প্রমাণ করতে চায় বড়রা।

এই সমস্ত উপহাস এড়ানোর উদ্দেশ্যে শিশু ছবি আঁকা ত্যাগ করে।

অথচ তাকে সাহায্য করা খুবই সহজ!

অবশ্য আলোচ্য ক্ষেত্রে সাহায্য করার ব্যাপারে সবচেয়ে যোগ্য হচ্ছেন সেই সমস্ত পিতামাতা যাঁরা নিজেরাই শিল্পী। কিন্তু জীবনে এমনটা ঘটে খুব কম।

যেকোন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিই — এমনকি যদি শিল্পকলার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক এবং ছবি আঁকার ব্যাপারে তাঁর কোন দক্ষতা না-ও থাকে — শিশুকে আঁকতে শেখাতে পারেন। এ কাজের জন্য তাঁকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি গড়ে তুলতে হবে: শিশুর আঁকা ছবির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করা উচিত, তাকে নিজের ছবিগুলো রাখতে শেখানো উচিত। খুদে শিল্পীদের দিতে হবে ভালো কাগজ, পেন্সিল, তুলি আর রঙ। ছবি আঁকা কঠিন কাজ। সেই জন্যই শিশুর ছবি নিয়ে হাসাহাসি করা খুবই অনুচিত। গুরুজনকে শিশুর ছবিখানি গভীর গুরুত্ব সহকারে বিচার করতে হবে এবং তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে বাড়ির ছাদ কীভাবে গড়া হয় (ছবিতে নয়, বাস্তব জীবনে), গাছ কীভাবে বাড়ে, মানুষের কতটা হাত পা কান। ছোটবেলা যেকোন সাহায্যই শিশুর জন্য মহামূল্যবান।

— আপনি ড্রয়িং টিচার?

— আজ্ঞে হ্যাঁ।

— আমার ভলোদিয়া পড়াশোনায় খুবই ভালো ছেলে। কখনও খারাপ নম্বর পায় নি। কিন্তু আপনি — এই আপনিই প্রথম ওকে খারাপ নম্বর দিচ্ছেন... আর গতকাল এমনকি একটি 'লাড্ডু' বসিয়ে দিয়েছেন।

— আপনার ছেলে ড্রয়িংয়ের কাজ করে নি।

— আসুন তাহলে, খোলাখুলি কথা বলি। আপনার ওই ড্রয়িং দিয়ে আমার ছেলে করবেটা কী শুনি? ও যে শিল্পী হতে যাচ্ছে না! ও হবে গণিতবিদ। এবং আপনার ওই ড্রয়িংয়ের জন্য ওকে তো আর...

— বহু বিখ্যাত গণিতবিদও তো শিল্পচর্চার গুরুত্বের কথা বলেছেন।

— আপনি কী বলছেন?! কিন্তু আপনি জানেন, আমার ভলোদিয়া প্রযুক্তি নিয়েও মাথা ঘামায়। হয়তো ও উদ্ভাবক হবে। অথবা সাধারণ ইঞ্জিনিয়র!

— আর ইঞ্জিনিয়র হলে টেকনিকেল ড্রয়িং অবশ্যই জানতে হবে। বইয়ের এই তালিকাটি দ্যাখুন। এই সমস্ত বইয়ে বলা হচ্ছে — এমন কোন পেশা নেই যা চিত্রাঙ্কনের দ্বারা সমৃদ্ধ হয় নি বা হতে পারে না।

— আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত? আপনি — নিজে? কেবল খোলাখুলি কথা বলবেন!

— নিশ্চিত। সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

— তাহলে... দিন তালিকাটি একটু দেখি। সত্যিই তো— কেবল নাম আর নাম!.. ভালো কথা, আমি এই বইগুলো পড়ব, এবং তা সত্যি হলে আমি আমার ভলোদিয়াকে বলব সে যেন ভালো ও সুন্দর ক'রে আঁকে!..

আঁকার কাজে অদক্ষ ব্যক্তি যদি শিশুকে দেখাতে না পারেন কীভাবে কোন্ বস্তু আঁকতে হয়, তাহলে তিনি তাকে অন্তত সেই বস্তুটি ভালো ক'রে দেখতে সাহায্য করতে পারেন। তাঁর অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, যুক্তিসঙ্গতভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা এবং অনেক কাজের মধ্যে প্রধান কাজটি নির্বাচনের নিপুণতা শিশুকে তার ছবিতে আসল ভুলটি খুঁজে বার করতে, তা সংশোধন করতে সহায়তা করতে পারে। এভাবে বহু বারের প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিশুর ছবি সবচেয়ে মারাত্মক ভুল আর হাস্যকর বিকৃতি থেকে মুক্ত করা সম্ভব।

একেবারে অল্প বয়সে শিশুকে শেখানো সহজ। মেয়ে যদি তোতার তিনটি পা আঁকে, তাহলে তাকে তোতা দেখিয়ে বোঝানো উচিত যে তিনটি পা বিশিষ্ট তোতা হবে বিকৃত-অঙ্গ এবং চলতে পারবে না। ছেলে যদি প্রতাকাবাহী কোন লোক আঁকে এবং পতাকা যাতে উপরে থাকে সেই জন্য সে যদি লোকটির হাত তার দেহের চেয়ে লম্বা করে ফেলে, তাহলে নিজের হাতগুলো নিচে নামিয়ে দেখিয়ে দিলেই হয় যে হাত দু'টি এমনকি হাঁটু অবধিও পেঁাছুচ্ছে না, এবং তাই এরূপ হাত আঁকা উচিত নয় যা স্বাভাবিকভাবে রাখলে মাটি ছুঁতে পারে,—এত লম্বা হাত হয় না, তা দেখতে কদাকার। এরূপ সাধারণ ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা শুনে শিশুর লাভই হবে। এখানে একমাত্র রহস্য হচ্ছে: শিশুর ছবিটি গুরুত্ব সহকারে নেওয়া, তাতে জগৎকে বোঝার ও উপলব্ধি করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায় দেখা। ছেলের ছবি দেখে বাবা যদি এ কথাগুলো বলেন তাহলে তো খুবই ভালো হয়: 'পরের বার লোকগুলোকে একটু লম্বা আঁকিস। তোর ছবিতে রঙ সত্যিই ভালো হয়েছে — ঠিক বোঝা যাচ্ছে, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে এবং ঠাণ্ডায় জল নীল হয়ে গেছে... আর ছবি আঁকার কাজে রঙ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভালো কথা, চল্ কাল আমরা মিউজিয়মে যাই, ছবি দেখব।'

পরের দিন বাবা ও ছেলে মিউজিয়মে গেলেন। ছেলে এই প্রথম বার লক্ষ্য করল যে শিল্পীদের ছবিগুলোর রঙ সমান নয়। মানুষের প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে সে ঠোঁট নাড়ায়: সে গুণছে আঁকা লোকটির মাথার উচ্চতা

কতবার তার নিজের দৈর্ঘ্যে আঁটতে পারে। ছেলে নিজের অজ্ঞাতসারে শিখছে।

শিশুর মধ্যে জগতের প্রতি কান্তিগত মনোভাব জাগানো যায় খুবই অল্প বয়সে। তার জন্য বিশেষ কোনকিছুর প্রয়োজন নেই। শিশুকে মাসে একবার ক'রে মিউজিয়মে নিয়ে যাওয়া, বছরে এক-আধবার শিল্প বিষয়ক কোন বই কিনে দেওয়া, শিশুর চিত্র সম্বলিত কার্ডগুলোর সংগ্রহটির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করা — ব্যস, এই-ই যথেষ্ট। এবং পরিবারকে এরূপ পরিবেশে অভ্যস্ত হওয়া: সন্ধ্যা। উপরের আলোগুলো নেভানো। স্ট্যান্ডার্ড ল্যাম্পের আলোয় শিশু ছোট্ট টেবিলের পাশে বসে ছবি আঁকছে।

তাকে বাধা দেবেন না: সে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে।

তাকে সাহায্য করুন: সে খুবই কঠিন পথ ধরে চলেছে।

শিশুর আঁকা ছবিগুলো ভালোবাসতে শিখুন, তাকে জীবনের কাছাকাছি এনে দিন, নিজের ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে শিল্প সাধনায় মন দিন।

পরিবার এবং ক্রীড়া

আজ সম্ভবত পৃথিবীতে এমন কোন লোক নেই যে ক্রীড়ার প্রতি উদাসীন। সোভিয়েত দেশে খেলাধুলো করে প্রতি পঞ্চম ব্যক্তি। কিন্তু এর পরও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে: মানুষ খেলাধুলা ক'রে কতটা উপকার লাভ করে? ক্রীড়া জিনিসটি আসলে কী?

...বাড়ির প্রাঙ্গণে খেলছে ঝাঁকড়া চুল ছেলেরা... কী তারা খেলছে? মনে আছে, আমরা ছোটবেলা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলতাম, আমাদের সময়কার বীরদের — চাপায়েভ,* পাপানিন** প্রভৃতিকে — অনুকরণ করতাম। আজকের ছেলেপিলেরা খেলাধুলায় অনুকরণ করে আজকের নামকরা খেলোয়াড়দের, ক্রীড়াবিদদের। তাদের খেলাধুলাতে সেই সময়েরই ছাপ দেখা যায় যে-সময়ে তারা বাস করছে। যুগের আকর্ষণ এই ক্রীড়া শিশু মনকে আলোড়িত করে তুলেছে। ক্রীড়া ক্ষেত্রের বীরেরা শিশুদের হৃদয়কে চুম্বকের মতো নিজেদের

---

* ভাসিলি চাপায়েভ (১৮৮৭-১৯১৯) — গৃহযুদ্ধের বীর। ১৯১৮ সাল থেকে বিভিন্ন সৈন্যদলের সেনাপতিত্ব করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। — সম্পাঃ

** ইভান পাপানিন (১৮৯৪) — সোভিয়েত মেরু গবেষক। — সম্পাঃ

দিকে টানছে। বড়রা প্রাঙ্গণের উপর দিয়ে যেতে যেতে ক্রীড়ারত ছেলেদের দেখে ঈর্ষা বোধ করে। অতিক্রান্ত বছরগুলোর কথা ভুলে গিয়ে ফের ছোটাছুটি ও লাফালাফি করবে, একটু বল খেলতে ইচ্ছে হয় তাদের...

খেলাধুলার তাৎপর্য সবাই বোঝে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বড়রা অনেক সময় খেলাধুলা করে না। কারো কারো সময় হয় না, কারো কারো ধৈর্যে কুলোয় না, কারো কারো কোন শৃঙ্খলা নেই। সকালে ঘুম থেকে উঠার পর সবাই ব্যায়াম করতে চায় না।

এ কথাটি ভুলবেন না যে আপনাদের ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে এবং তারা মনোযোগ সহকারে আপনাদের অধ্যয়ন করে। জানেন, আপনাদের ছেলে কেন সকালবেলা ব্যায়াম করতে চায় না — আলস্য বোধ করে? কারণ একেবারে ছোটবেলা থেকে তাকে ব্যায়াম করতে শেখান নি। ফলে সে ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। তবে এখনও তার কুঁড়েমি দূর করা সম্ভব — দেরি হয়ে যায় নি। তার জন্য কেবল ব্যক্তিগত উদাহরণ প্রয়োজন।

প্রখ্যাত সোভিয়েত শিশু-চিকিৎসক আকাদমিশিয়ান গেওর্গি স্পেরানস্কি ৯৪ বছর বয়সে শরীরচর্চা সম্পর্কে কী বলেছেন তা শুনুন: 'নব্বই বছর আগে আমি সেই প্রথম বার প্রাতঃকালীন ব্যায়াম করেছি। তখন থেকেই প্রতি সকালে আমি ব্যায়াম করছি ও ভেজা গামছা দিয়ে গা মুছছি।

প্রায় একশোটি বছর আমি বেঁচে আছি এবং এই সময়ের মধ্যে একবারও গুরুতর কোন অসুখে ভুগি নি।

আপনারা জানেন, আমাদের শতাব্দীর সবচেয়ে মারাত্মক রোগ কোন্‌টি? ক্যান্সার? অ্যাথেরোসক্লিরোসিস? না। হাইপোডাইনামিয়া। স্বল্প-তৎপরতা! আমাদের জন্য সমস্তকিছুই করে মেশিন। আমরা কম চলাফেরা করি। কাজে যাই বাসে বা গাড়িতে ক'রে। রাত্রে টিভিতে হকি বা ফুটবল দেখেই খেলাধুলার কাজ সাঙ্গ করে নিই। তাতে ক্রীড়া জগতের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও প্রকৃত ক্রীড়া থেকে কিন্তু বহু দূরেই থেকে যাই। প্রসঙ্গত, আপনি কখনও লক্ষ্য করেছেন, সারস পাখি কীভাবে চলে? ওদের চলার ভঙ্গীটি অবশ্যই একবার মন দিয়ে দ্যাখবেন। তখন আপনি বুঝতে পারবেন সারস কত গর্বের সঙ্গে চলে। প্রথমে সে তার পা'টি হাঁটুতে বাঁকায়, সামনের দিকে প্রসারিত করে এবং কেবল তারপরই মাটিতে রাখে। আচ্ছা, একবার সারসের মতো করুন তো দেখি! হাত দু'টো পাখার মতো দু'দিকে টেনে লম্বা করুন ও মাথা সোজা ক'রে হাঁটুন। দেখলেন তো — কীভাবে আপনি ক্রীড়ার সংস্পর্শে চলে এলেন!'

জীবন আমাদের দেওয়া হয় একমাত্র একটি শর্তে — তাকে প্রতিদিন রক্ষা করতে হবে। পৃথিবীতে বাঁচা মানেই হচ্ছে অপূর্ব সুখের জন্য জীবনকে রক্ষা করা। স্রেফ আয়ু বৃদ্ধির চেষ্টা করলেই চলবে না; প্রফুল্লতা, শক্তি, চিন্তাধারার নমনীয়তা আর কর্ম-ক্ষমতাও রক্ষা করতে হবে।

বিখ্যাত সোভিয়েত শল্যচিকিৎসক আকাদমিশিয়ান আলেক্সান্দর বাকুলেভ — আমাদের দেশে যে-সকল ডাক্তার প্রথম হৃদয়ে অস্ত্রোপচার করেন ইনি হচ্ছেন তাঁদেরই একজন — শরীরচর্চাকে মানুষের জীবনের ধরন হিশেবে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, জীবনের এই ধরন কেবল খেলাধুলো নিয়েই গঠিত নয়। তিনি বলেন:

'যে-ব্যক্তি শরীরচর্চা করে, সে যদি ধূমপান করে, শ্রমে, দৈনন্দিন জীবনে ও পোশাকপরিচ্ছদে নির্দিষ্ট নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে না চলে, সে যদি কেবল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আগে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনের কথা ভাবে এবং বাড়িতে পরিবারের দিকে কোন দৃষ্টি না দেয়, শৃঙ্খলানিষ্ঠ না হয় ও অনিয়ম করে, সে যদি পানাহারে সংযত না হয় ও ব্যক্তিগত জীবনে অগোছালো হয়, তাহলে এরূপ ব্যক্তি কি শরীরচর্চাবিদ বলে অভিহিত হতে পারে? আমি মনে করি যে সে শরীরচর্চাবিদ হতে পারে না, — তা সে যত গোলই দিক না কেন, যত উঁচুতেই লাফাক না কেন কিংবা যত কম সময়েই শ' বা দশ হাজার মিটার দূরত্ব অতিক্রম করুক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না।

শরীরচর্চা যেহেতু মানুষের জীবনের ধরন, ঠিক সেই কারণেই তাতে আকৃষ্ট করা চাই বয়সের মানুষকে।'

হ্যাঁ, সব বয়সের মানুষকে... তবে একেবারে ছোটবেলা থেকে আরম্ভ করলে সবচেয়ে ভালো হয়। এ স্রেফ কামনা নয়, বর্তমান কালের বিচারে বড় এক প্রয়োজনীয়তাও। প্রসঙ্গত, ১২ বছরের মেয়ে লুসিয়া তেরেখোভার চিঠিখানি পড়ে এ জিনিসটা আমরা আরও ভালো ক'রে উপলব্ধি করতে পেরেছি। লুসিয়া লিখেছে: 'কিছুকাল যাবৎ আমাদের পরিবারের সদস্যদের চেনাই যাচ্ছে না। আগে বাবা ঘুমোতেন একেবারে শেষ মিনিটটি পর্যন্ত। মা যখন বলতেন, 'এই শুনছ, আমরা চললাম, অফিস মিস কোরো না কিন্তু,' কেবল তখনই তাঁর ঘুম ভাঙত। ...সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে একদিন তিনি মা আর দাদুকে বললেন: 'জানো, স্তেপানস্কিদের পরিবারের সবাই আজকাল সকালে ছোটাছুটি করছে। আমাদের সবাইকে প্রতিযোগিতায় নামতে বলেছে। সবাইকে একটু ট্রেনিং নিতে হবে।' তখন দাদু জিজ্ঞেস

করলেন: 'আমায়ও ট্রেনিং নিতে হবে?' — 'নিশ্চয়ই, — বললেন বাবা। — ওদের বাড়ির বুড়োবুড়ি দু'জনই সকাল ছ'টার সময় রাস্তায় ছোটাছুটি করে।' আমাদের পরিবার দৌড়তে শুরু করে খেলা দিয়ে, বলা যায় তর্ক ক'রে: 'দৌড়ানো যাক — সে তো কঠিন কোনকিছু নয়।' কিন্তু যখন আমরা ট্রেনিং আরম্ভ করলাম সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম: দৌড় দেওয়া খেলার কথা নয়। স্তেপানস্কিরা ট্রেনিং নিচ্ছে; কোথা থেকে যেন কীসব বই জোগাড় করেছে — তারা বিজ্ঞানসম্মতভাবে শরীরচর্চা করছে, আর আমরা... দয়া করে বলুন, আমাদের কীভাবে ও কতটা ছোটা প্রয়োজন যাতে স্তেপানস্কিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে না যাই।

আমার বয়স ১২ বছর, আমার বড় বোনের —১৫, মা ও বাবার ৩৮ বছর ক'রে, দাদুর বয়স — ৫৯ বছর আর দিদিমা আমাদের দৌড়াদৌড়িতে নেই...'

দৌড়! তা কবে আমাদের জীবনে প্রবেশ করে? নিজের কথা মনে না থাকলে একটি বার সেই শিশুদের দিকে তাকান যারা এই গতকালও ভয়ে ভয়ে পা ফেলত, আর আজ ছুটতে চাইছে! শিশুদের সবচেয়ে প্রিয় কাজ— দৌড়। তারা জমা জলের উপর দিয়েও লাফাতে ভালোবাসে।

তার মানে সেই সুদূর শৈশব থেকেই দৌড় আমাদের সঙ্গী।

দৌড় হচ্ছে প্রথম ক্রীড়াসক্তি। আমরা প্রায়ই তাকে লক্ষ্য করি না, যেমন লক্ষ্য করি না বায়ুকে যা ছাড়া শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালানো অসম্ভব।

দৌড় মানুষের জীবনে প্রবেশ করে খুবই অল্প বয়সে। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, অনেক সময় তা তাড়াতাড়ি চলেও যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শিশুরা ৩ বছর বয়স থেকে কিন্ডারগার্টেনে যেতে শুরু করে। ওখানে তারা সব সময় খোলা বাতাসে খেলাধুলা ও ছোটাছুটি করে। কিন্ডারগার্টেনগুলোতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় জাতীয় খেলাগুলোর দিকে যা উপস্থিত বুদ্ধি, অটলতা, নিপুণতা, দ্রুততা ইত্যাদি বিকশিত করে।

ক্রীড়া প্রবৃত্তি গড়া উচিত একেবারে শৈশব থেকে। শিশুর মধ্যে, মহান রুশ শারীরবিজ্ঞানী ইভান পাভলোভের ভাষায়, 'পেশীগত আনন্দ বোধ' তীব্রতর করে তোলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ হচ্ছে এমন এক আনন্দ যা সুস্থ মানুষ উপভোগ করে থাকে কেবল পেশীগত কাজের মাধ্যমে। জন্মসূত্রে প্রত্যেকেই এই অনুভূতিটির অধিকারী। তবে সুদীর্ঘ কাল ধরে স্বল্প তৎপর জীবন ধারণের ফলে তার প্রায় পূর্ণ অবসান ঘটতে পারে।

সময় থাকতে এই অনুভূতিটির সদ্ব্যবহার করা চাই — মা-বাবাদের এ কথাটি মনে রাখা উচিত।

প্রথম ব্যায়ামগুলো শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক ও অকঠিন হতে হবে। সব শিশুই ছুটে ছুটে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলতে বা পরস্পরের নাগাল ধরতে খুব ভালোবাসে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যত বেশি পারেন দৌড়াবেন। দৌড়ে অবশ্যই প্রতিযোগিতার উপাদান যোগ করবেন।

শিশুদের অন্য একটি প্রিয় কাজ হচ্ছে — বল নিয়ে খেলা। এ খেলায় সৃজন সম্ভাবনা, ক্রীড়ার নেশা (শব্দটির সবচেয়ে ভালো অর্থে) বিকাশের সম্ভাবনা আরও বেশি। পরস্পরের কাছ থেকে অল্প দূরে দু'টি গোল কিংবা চতুষ্কোণ ক্ষেত্র গড়া হল: বড়টি — বড়র জন্য, ছোটটি — ছোটর জন্য। প্রত্যেক খেলোয়াড় নিজ নিজ কোর্টে স্থান নেয়। খেলার উদ্দেশ্য: এমনভাবে বলটি উপরের দিকে ছোঁড়া হবে যাতে তা প্রতিদ্বন্দ্বীর কোর্টে গিয়ে পড়ে। আর প্রতিদ্বন্দ্বীর কাজ হচ্ছে তাতে বাধা দেওয়া: বলটি লুফে ফেলা অথবা আঘাত ক'রে কোর্টের সীমানা থেকে দূরে পাঠিয়ে দেওয়া...

গতিযুক্ত খেলাগুলোকে হতে হবে শিশুর ক্রীড়া চরিত্র গঠনের এবং তার শারীরিক শিক্ষার প্রধান উপায়। ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে খেলার সময় মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সদর্থক আবেগ দেখা দেয় যা স্নায়ু-ব্যবস্থায় সর্বপ্রকার গতি-জ্ঞান গঠনের জন্য ও শারীরিক গুণাবলি বিকাশের জন্য সেরা শর্ত গড়ে তুলে। এই সমস্ত জ্ঞান আর গুণই বিভিন্ন ক্রীড়ায় মানুষের নৈপুণ্য নির্ধারণ করে।

আমরা জানি যে সর্বাগ্রে শিশুর মধ্যে বিকশিত হয় দ্রুততা, নমনীয়তা ও নিপুণতা। পরে, কৈশোরে পেশীর যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। আর মানুষের সহনশীলতার মতো গুণটি কমবেশি পুরোপুরি মাত্রায় অর্জিত হয় কেবল ২০ বছর পূর্ণ হওয়ার পর। এই বৈশিষ্ট্যগুলো সর্বদা মনে রাখা উচিত।

নিপুণতা বিকাশের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। নিপুণতা হচ্ছে অন্যতম সেরা শারীরিক গুণ, এবং তার প্রতি যত অল্প বয়সে মনোযোগ দেওয়া যায় তা ততই বেশি ফলপ্রসূভাবে বিকশিত হতে থাকে। মানুষ যতই শক্তিশালী আর সহনশীল হোক না কেন, গতিতে আনাড়ী হলে সে সর্বদা অসুবিধা বোধ করবেই।

তাহলে কীভাবে শিশুর মধ্যে গতির নৈপুণ্য গড়া যায়? প্রধান পদ্ধতিমূলক নিয়মটি এখানে খুবই সাধারণ: গতিকে যথাসম্ভব বেশি

বিচিত্র করে তোলা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যেকোন সক্রিয় খেলার আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে।

দ্রুততা বিকাশের জন্য প্রয়োজন হয় অল্প দূরত্বে (১৫-২০ মিটার) দ্রুত দৌড়, যত দূরে সম্ভব টেনিসের বল নিক্ষেপ, সামান্য উপরে ঝুলানো কোন বস্তু লাফ দিয়ে স্পর্শ করা, সঙ্কেত শুনে — অপ্রত্যাশিত হাততালি অথবা বাঁশির শব্দ শুনে — কোন কাজ সম্পাদন (যেমন, চলতে চলতে হঠাৎ পেছন পানে ফিরে যাওয়া)। প্রাক্‌স্কুল বয়সে নমনীয়তা বিকাশের জন্য শিশুকে পূর্ণ বিস্তার নিয়ে বিভিন্ন ব্যায়াম করতে দেওয়া উচিত। তার মধ্যে বিশেষ উপকারী হচ্ছে সেই ব্যায়াম দু'টি যা করতে গিয়ে চিৎ হয়ে হাত দিয়ে মাটি স্পর্শ ক'রে দেহকে সেতুর মতো বক্র করতে হয় এবং সামনের দিকে নুইয়ে মাটি স্পর্শ করতে হয়।

...আমাদের সন্তানসন্ততিদের জন্য আদর্শ হচ্ছি আমরা নিজেরাই। আমাদের উদাহরণ হচ্ছে তাদের জন্য সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ও প্রয়োজনীয় জিনিস। আমরা যদি খেলাধুলায় মেতে উঠি তাহলে আমাদের ছেলেমেয়েরাও আকৃষ্ট হবে।

লোকে যখন সুখের কথা বলে তখন তারা সর্বাগ্রে পরস্পরের জন্য সুস্বাস্থ্য কামনা করে। তাই কামনা করব আমাদের ছেলেমেয়েরা স্বাস্থ্যবান ও সুখী হোক। আর তার মানে হচ্ছে আমরা সবাইও স্বাস্থ্যবান আর সুখী হব।

শিশুদের মেলামেশা

সম্ভবত কারোরই সঠিক মনে নেই কবে আমরা উপলব্ধি করেছি আমাদের মাথার উপরে নীল যা রয়েছে তা হচ্ছে আকাশ, সূর্য পৃথিবীকে তাপ দিচ্ছে, চারিদিকের লোকজনের মধ্যে সবাই আমাদের আপন ও ঘনিষ্ঠ নয়, তাদের মধ্যে অসংখ্য লোক আছে যারা সম্পূর্ণ অপরিচিতও। তবে প্রত্যেকেই একদিন এ সমস্তকিছু বুঝেছে। তা বোঝার জন্য তাকে বাড়ি থেকে বেরোতে হয়েছে, বেড়াতে যেতে হয়েছে। কেবল বড়রাই ভাবে যে বেড়ানোর মানে হচ্ছে নির্মল বায়ু সেবন করা। কিন্তু শিশু বেড়াতে গিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে, অক্লান্তভাবে চারিদিকের সমস্তকিছু অধ্যয়ন করে...

শিশুরা কখনও নিঃসঙ্গ গবেষক হয়ে থাকতে ভালোবাসে না। হঠাৎ দেখা গেল কোথা থেকে আরও এক 'আবিষ্কারক' বেরিয়ে এল, এবং তখনই

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়নের পরিবর্তে মেলামেশার সুযোগ গড়ে উঠে। মানবিক মেলামেশার গুরুত্ব জীবনে যে কত বেশি তা তারা বুঝবে অনেক পরে, তবে এখনও পরস্পরের সঙ্গে মিলে তারা কম আনন্দ উপভোগ করছে না। উভয়েই পরস্পরকে চমৎকার বোঝে, অনেক সময় বাক্য বিনিময় না করেই। আমাদের পক্ষে কী এক অবোধ্য উপায়ে ছোটরা অনুভব করে যে তারা আত্মীয়, বড়দের পৃথিবীতে তারা একই গোষ্ঠীর মানুষ, এবং এই অনুভূতিটা তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলে। বলাই বাহুল্য, তাদের জীবন ও সুখসমৃদ্ধি পুরোপুরিভাবে নির্ভর করে বড়দের উপর যারা তাদের পেঁছে দেবে মানবজাতির জ্ঞানভাণ্ডারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছোট সমবয়সীরা পরস্পরকে অনেকিকছুই দিতে সক্ষম।

নিজের কাছ থেকে পরের কাছে গমন, একাকীত্ব ছেড়ে সঙ্গ লাভ — সে হচ্ছে বিপুল ও অমূল্য এক প্রাপ্তি। কালক্রমে তারা সংবাদ আদান-প্রদান করতে শিখবে, এবং কথাবার্তা বলবে কেবল নিজেদের জন্যই নয় — অন্যদের জন্যও, আশেপাশের লোকজনকে বুঝবে। আর এ জিনিসটি ছোট্ট মানুষটিকে এমন এক প্রাণীতে পরিণত করে যে বলতে ও চিন্তা করতে পারে।

দু'বছরের এক ছেলে অনেক চেষ্টার পর উঁচু একটি বেঞ্চিতে উঠল। ওই বয়সের আরও একটি ছেলে ব্যাপারটি লক্ষ্য করল এবং সে-ও বেঞ্চিতে উঠল। প্রথম ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বসেই মাটিতে নেমে পড়ল। দ্বিতীয় শিশুটিও ঠিক তাই করল। তখন প্রথমটি বেঞ্চির চারিপাশে ছুটতে লাগল। দ্বিতীয়টিও বসে থাকল না। যতক্ষণ না এই 'দুষ্টু ছেলেদের' বিভিন্ন দিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল, ততক্ষণ তারা ছুটেই চলেছিল। কিন্তু ছোট্ট 'দুষ্টু ছেলেরা' যদি সবাইকে ও সমস্তকিছু অনুকরণ করার এই প্রস্তুতি ছাড়া ভূমিষ্ঠ হত? তাহলে তারা কি এত সহজে কথা বলতে শিখতে এবং হাজারো রকমের নৈপুণ্য অর্জন করতে পারত? তারা অনুকরণ করে মহা আনন্দে। তারা ভঙ্গি, গতি, শব্দ ও কাজ সবই অনুকরণ করে। তারা জানতেও পারে না যে এর মাধ্যমে নিজেদের গতি ও বাক্‌ধারা উন্নত করছে।

শিশুরা কখনও কোন ব্যাপারে পরস্পরের চেয়ে পিছিয়ে থাকতে ভালোবাসে না — অন্যরা যা পারে তাদেরও তা পারতে হবে। প্রত্যেক শিশু চায় যে সবাই দেখুক সে কী পারে ও জানে, এবং সে কত লক্ষ্মী ছেলে বা মেয়ে। আমরা সাধারণত শিশুদের সামনে উপস্থিত বাধাবিপত্তি দেখে খোদ শিশুদের চেয়ে আগেই ভয় পেয়ে যাই, আর তারা যাকিছু এত কষ্ট

ক'রে করে তাতে গর্বিত হয়। শিশ্ব ভয় করে না, তার মানে আমাদেরও ভয় করার কোন কারণ নেই, আর তার মানে ও এর্প কীর্তিকলাপের জন্য প্রস্তুত।

প্রাঙ্গণে বড় ছেলেমেয়েদের পাশে একেবারে ছোটরাও খেলা শ্বর্ব করে দিল। খেলাটি আপাতত অতি সাধারণ: চার বছরের ভলোদিয়া — ইঞ্জিন ও দ্বই বছরের ভানিয়া — ইঞ্জিন। দেউড়িটি হচ্ছে — মস্কো স্টেশন, আর বাইরের বেড়ার গেটটি — লেনিনগ্রাদ স্টেশন। গাড়িতে মাল আসা-যাওয়া করছে। খেলাটি মাম্বলি অন্বকরণ নয়, তা কল্পনা সমৃদ্ধ, আর কল্পনা বাস্তবে পেঁছার পথ করে দেয়: কিছ্বক্ষণের জন্য ডাক্তার হওয়া যায়, ড্রাইভার, বাবা, মা হওয়া যায়; ঘোড়া, কুকুর, বিমান ও জাহাজে পরিণত হওয়া যায়। এই ভাবে দ্বরকে নিজের কাছে আনা যায়, অসাধ্য সাধন করা যায়, এ সমস্তকিছ্ব কাছে ও ভেতর থেকে দেখা যায়।

প্রাঙ্গণে শিশ্বরা খেলছে। 'খেল্বক গে', — বলি আমরা। কিন্তু খেলা তাদের প্রয়োজন জীবনের জন্য, বৃদ্ধির জন্য।

শিশ্বরা পরস্পরের প্রতি টান অন্বভব করে, কারণ তারা একে অন্যতে প্রয়োজন বোধ করে। আর তারা একে অন্যতে প্রয়োজন বোধ করে আমরা যা ভাবি তার অনেক আগে। এবং প্রয়োজন বোধ করে আমরা যা ভাবি তার চেয়ে ঢের বেশি। শিশ্বরা খেলার সময় পরস্পরকে উদার ও সহজভাবে যাকিছ্ব দিয়ে থাকে এবং আমাদের মাঝখানে থেকে এমনকি তাদের জীবনের প্রথম বছরগ্বলোতে যাকিছ্ব পেয়ে থাকে তার সবটা আমরা কখনও কল্পনা করতে, ব্বঝতে ও উপলব্ধি করতে পারব না এবং তার জন্য চেষ্টা করেও লাভ নেই। নিজেদের সরল বিশ্বাসবশত আমরা ভাবি যে আমরাই আমাদের ছেলেমেয়েদের সমস্তকিছ্ব দিয়েছি, সাহায্য করেছি। এই ভাবে আমরা বেশির ভাগ কৃতিত্বের ভাগী হতে প্রয়াস পাই। অথচ ছেলেমেয়েরা নিজেরা নিজেদের কম সাহায্য করে নি। তারা তা করেছে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতায়।

সমবয়সীদের সমাজ থেকে বঞ্চিত শিশ্ব এমন অনেককিছ্ব থেকেই বঞ্চিত হয় যা আর কোনদিন কোথাও পাবে না। সে এক অপ্বরণীয় ক্ষতি। হামেশা বড়দের সঙ্গে থেকে ও মেলামেশা ক'রে শিশ্ব সম্ভবত অনেক সময় অনেক ব্যাপারে লাভবানই হয় — বেশি জানে, স্বক্ষ্মভাবে বোঝে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঢের বেশি।

নিজের সন্তানকে ভালো ক'রে জানা যায় কেবল যখন সে অন্যান্য

ছেলেমেয়েদের মাঝখানে থাকে। একেবারে সেই জন্ম হওয়ার পর থেকেই আমরা তার মুখ দেখে আসছি, শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, মুখভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি, কান্না আর হাসির ভাষা বুঝতে শিখেছি। সমস্ত চালাকি, অভ্যাস, বুজরুকি ভালো ক'রে জানি, অনেক আগেই বুঝে নিয়েছি দেখতে কার মতো হয়েছে ও কার স্বভাবচরিত্র পেয়েছে। নিজের সন্তানকে কি আমরা চিনব না?

কিন্তু এবার আমরা ক্রমশই ঘন ঘন ও বেশি ক'রে তাকে অন্য ছেলেমেয়েদের পরিবেশে দেখছি। তাদের মেলামেশা ক্রমশই বাড়ছে ও বিচিত্র হয়ে উঠছে। মিলিয়ে ও তুলনা ক'রে আমরা হঠাৎ এমনকিছু লক্ষ্য করি যা আগে কখনও আমাদের চোখে পড়ে নি, এমনকিছু জানতে পারি যা আগে কখনও অনুমানও করি নি। অবশ্য অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাকে দেখা অবধি সেটা অনুমান করা সম্ভবও ছিল না।

১০-১২ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের খেলাগুলো যে-নামেই অভিহিত হোক না কেন তাতে কিন্তু হামেশা প্রতিযোগিতার মনোভাব উপস্থিত থাকবেই, — নিপুণতা, শক্তি, উপস্থিত বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণশীলতা আর লক্ষ্যভেদের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মনোভাব। প্রতিযোগিতার উপাদান সম্ভবত খেলার খোদ জীবতাত্ত্বিক প্রকৃতিতেই রয়েছে, আর হয়তো বা শিশুর বিকাশের প্রকৃতিতে। ওই বয়সে শিশুরা কার কত শক্তি আছে তা পরীক্ষা করে দেখতে ভালোবাসে। সে হচ্ছে বিরাট এক আনন্দের ব্যাপার। তবে ছেলেদের স্বতঃস্ফূর্ত দুরন্তপনার চেয়ে সংগঠিত প্রতিযোগিতায়ই শক্তি পরীক্ষা করা ভালো, তাতে অনেক বিপদ এড়ানো যায়।

প্রাঙ্গণে ছেলেমেয়েরা খেলছে। খেলার সময় তাদের আচরণ কত বিভিন্ন: একটি ছেলে চালাকি করছে, অন্যটি সব সময় রেগে যাচ্ছে, আর শান্ত একটা মেয়ে নিজের জন্য বেশি সুযোগসুবিধা খুঁজছে। একটি ছেলে যেকোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত, কেবল খেলা চললেই হল, অন্যটির কঠোর নীতি হচ্ছে — পরের জিনিস নেব না, তবে নিজেরটাও দেব না। খেলায় প্রতিফলিত হয় পারিবারিক মূল্যবোধ, আচার-আচরণ ও চরিত্র। অবশ্য সেটাই হওয়ার কথা — খেলা তো আর তুচ্ছ ব্যাপার নয়, সে হচ্ছে মানুষের সহমিতালির সক্রিয় মডেল, যেখানে সহযোগিতা ও বৈরিতা, সহানুভূতি ও ঔদাসীন্যতা, পরার্থপরতা ও স্বার্থপরতার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সংঘর্ষ আর সংগ্রাম চলছে। যদি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করা যায় তাহলে খেলা আমাদের অনেককিছুই বলতে পারে। সুন্দর ও সঠিকভাবে সংগঠিত খেলা ছেলেমেয়েদের নিজেদের

মধ্যে সহনশীলতা, সাহসিকতা, দৃঢ়তা, নিপুণতা গড়ে তুলতে ও উপলব্ধি করতে, আমাদের সমাজের নৈতিকতা — সহযোগিতা, পারস্পরিক সহায়তা, কর্তব্য বোধ, মর্যাদা বোধ আর ন্যায়পরতার নিয়মগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্যে করবে।

ছোটবেলা বন্ধু কে হয়? সে, যে সব সময় সঙ্গে থাকে। কিন্তু একটু বড় হওয়ার পর মানুষ এ ব্যাপারে আর উদাসীন থাকতে পারে না। তখন সে দেখে তার বন্ধুটি কী রকমের — নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, সাহসী কিংবা ভীরু, কৃপণ না চুকলিখোর। ওই বয়সে সবাই কাপুরুষতার জন্য অভিযুক্ত হতে ভয় পায়, এবং চেষ্টা করে — অন্তত বাইরে বাইরে — যাতে তার প্রকাশ না ঘটে। তবে ঠকানো সহজ নয়, সর্বদা তা হয়ে উঠে না, এবং তখনই অস্বীকৃত ও পরিত্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ছেলেদের কাছে সাহসিকতা, বীরত্ব আর অটলতা অতি উচ্চ নৈতিক গুণ বলে পরিগণিত হয়। এমন কোন ছেলে নেই যে একটু সুযোগ পেলেই দেখাতে, প্রমাণ করতে ও নিশ্চিত করতে চেষ্টা করবে না যে সে ওই সবগুলো গুণেরই অধিকারী।

ছেলেরা নিপুণতার অধিকারী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। কী নিপুণতা তাতে কিছু এসে যায় না, আসল কথা হচ্ছে তা পুরুষের নিপুণতা, পুরুষোচিত নিপুণতা হতে হবে।

এ জিনিসটার দিকে আমরা একটু নজর দেব। তবে একটি প্রয়োজনীয় শর্ত আমাদের মনে রাখতে হবে: ছেলেদের আমরা যে-কাজটি শেখাব তা হতে হবে যথেষ্ট কঠিন যাতে তাদের ওই কাজটি রপ্ত করার ইচ্ছা হয়, তা হতে হবে যথেষ্ট সহজ যাতে তাদের পক্ষে রপ্ত করা সম্ভব হয় এবং তা হতে হবে বর্তমান কালের দৈনন্দিন জীবনে যথেষ্ট প্রয়োজনীয় যাতে সমবয়সীদের সমাজে তাদের সামান্য জাঁক করার ইচ্ছে হয় ও জাঁক করা সম্ভবও হয়।

১২ বছর বয়সের এমন কোন ছেলে পাবেন না যে স্বেচ্ছায় আদর্শ বালকের ভূমিকা নিতে রাজী হবে। বড়রা বলে: 'আরে দ্যাখো, কী ভালো খোকা।' সত্যিই: চেহারায় বুদ্ধির ছাপ, চোখে-মুখে সজীবতার ভাব, কাউকে লজ্জা করে না, ভদ্রভাবে প্রশ্নের জবাব দেয়, বিচারবিবেচনায় বিচক্ষণ। কিন্তু অন্য ছেলেরা জানে: ওকে বিশ্বাস করা যায় না। তার সদাশিব ভাব — এ হচ্ছে মুখোস, লড়াই বাধলে পরের পেছনে লুকিয়ে পড়ে, আর খেলায় ঠকায়। তবে আসল কথাটি হচ্ছে — ও যেকোন মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।

ছেলেরা কিন্তু ভালো বলতে অন্য জিনিস বোঝে। সব ছেলেদেরই পছন্দ

হয় নির্ভীক, শুভাকাঙ্ক্ষী আর হাসিখুশি মানুষ। নির্ভীক, কিন্তু ঝগড়াটে নয়। শুভাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু দুর্বলতার জন্য নয়। হাসিখুশি, কিন্তু উপর-পড়া, উপহাসকারী ও বেহায়া নয়। এ ধরনের ছেলেরা কখনও নিঃসঙ্গতা কী জিনিস তা জানবে না। তাদের কাছে অন্যরা অবশ্যই আসবে, কথা বলবে, খেলতে ডাকবে। এই সৌভাগ্যবানরা সাধারণত সারা জীবনই সৌভাগ্যবান থাকে। তা হয়তো এই জন্য যে তারা নিজেরা জীবনকে বিশ্বাস করে, মানুষকে বিশ্বাস করে...

দিবাবসানে একসঙ্গে সন্ধ্যার যে-ঘণ্টাগুলো কাটানো যায় তা খুবই মধুর। তখন সমস্ত ঝামেলা চলে যায় (যা আজ করা হয় নি তা আর শুরু করে লাভ নেই), চেহারা শান্ত ও উদার হয়ে উঠে। তখন মনমেজাজই অন্য রকম। ওই সময় আর ছোটাছুটি করতে ইচ্ছে হয় না, ঘুমানোও অসম্ভব, — তখন পাড়ার ভাইবন্ধুদের (তাদের মধ্যে ছেলেমেয়ে সবাই থাকবে) নিয়ে কোথাও জড় হয়ে গাছের গুঁড়িতে বা বেঞ্চিতে বসে কথাবার্তা বলার চেয়ে ভালো কোনকিছু নেই। তবে তাদের আলাপটি হতে হবে নিঃশব্দ ও সব ছেলেমেয়ের জন্য চিত্তাকর্ষক।

কেউ বলছে যে কোন্ এক দেশে বিজ্ঞানের অজ্ঞাত এক সামুদ্রিক দানব একখানি জেলে নৌকো গিলে ফেলেছে। কেউ বলছে সে নাকি ঠিক জানে নতুন — তবে এখনও অনির্মিত — সুপারসনিক বিমানটি কী গতিতে উড়ে। ...এ সমস্তকিছু নিশ্চয়ই সঠিক কোন তথ্য নয়। তবে আসল ব্যাপারটিও সঠিকতায় নয়, অন্যত্র। ছেলেমেয়েরা বেশ বসে আছে। আলাপ করছে দুনিয়ার সবকিছু নিয়ে। এই সান্ধ্যকালীন আলাপের কথা শৈশবের উজ্জ্বল ঘটনা হিশেবে সুদীর্ঘ বছর তাদের মনে থাকবে...

পাড়ায় ছেলেমেয়েদের বন্ধুবান্ধব থাকলে খুবই ভালো হয়। কোন মা-বাবা হয়তো এত সুস্পষ্ট উক্তি মেনে নিতে পারবেন না। একজন মা প্রায় সগর্বে বললেন: 'আমার ছেলেটি খুবই লক্ষ্মী, অভদ্র নয়, এবং পাড়ায় তার কোন সঙ্গীসাথীও নেই।' অনেক সময় মনে করা হয় যে ছেলে বা মেয়ের সঙ্গীসাথীরা আমাদের পরিবারের জন্য অমঙ্গল ডেকে আনে — ছেলেমেয়েদের ছন্নছাড়া করে তুলে, সমস্ত খারাপ জিনিস শেখায়। যেই কোন সেগেইি আর কোন আন্দ্রেইয়ের মধ্যে একটু বন্ধুত্ব শুরু হবে, অমনি মা সতর্ক হয়ে যাবেন:

— সেগেইি তোর কে রে — ভাই না এয়ার। তুই ওকে সবকিছু দিয়ে দিতে প্রস্তুত। মাথায় একটু বুদ্ধিসুদ্ধিও নেই। ওর সঙ্গ ছাড়।

সময় সময় মা নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে সক্ষমও হন। সেগেইিকে

তাড়িয়ে দেওয়া হল। আন্দ্রেই এখন একলা, একেবারে একলা। মা বুঝতেও পারেন না যে তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা সত্ত্বেও ছেলে কত একাকী, বেচারার কত কষ্ট হচ্ছে।

— আমার কলিয়া বাজে ছেলেদের সঙ্গে সময় নষ্ট করে না। ওকে আমি এভাবেই মানুষ করেছি: প্রথম প্রথম বারণ করতাম, আর এখন ও নিজেই বোঝে যে প্রতিটি মিনিটের খুব মূল্য আছে।

— ছেলেমেয়েদের পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা অনুচিত এবং তাদের মেলামেশায় বিশ্বাস না রাখা উচিত নয়। দেখতে হবে তারা যেন নতুন সম্পর্কের স্বাদ বোঝে ও অনুভব করে, যৌথ চিন্তাভাবনা, আশংকা, সংগ্রাম ও বিজয়ের আনন্দ উপলব্ধি করে। মা-বাবাদের এই পন্থাটিই অবলম্বন করা উচিত।

মা-বাবার ভালোবাসা সমবয়সীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের অভাব পূরণ করতে পারে না, কারণ বন্ধুত্বে একঘেয়েমি থেকে রেহাই পাওয়ার উপাদানই কেবল থাকে না। তাতে আরও থাকে বয়সোচিত ভয় ও আশঙ্কা থেকে রেহাই পাওয়ার, অসাফল্য জনিত তিক্ত অনুভূতি উপশম করার, নিজেকে বেশি শক্তিশালী, দৃঢ় প্রত্যয়ী আর শান্ত বোধ করার উপাদান। এ ছাড়াও তাতে আছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অন্তরতম বাসনা বিনিময় করার ও বোধগম্য হওয়ার সুযোগ।

সহানুভূতি, অনুরাগ, আনুগত্য ও স্বার্থত্যাগের অনুভূতি, নিষ্ঠা, কর্তব্য, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও সাথীত্ব বোধ আগে থেকে তৈরি কোন জিনিস নয়। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে আমরা এই গুণগুলোর খুব কদর করি এবং তা বিকাশের জটিল এক পথ অতিক্রম করি। একেবারে ছোটবেলা আবেগ ততটা স্পষ্ট হয়ে উঠে না। আবেগ পরিণতি লাভ করে সুদীর্ঘ কাল ধরে। কেবল কালক্রমেই অনুভূতি সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে, নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। শৈশবের বন্ধুত্ব — অনুভূতি গঠনের চমৎকার এক পাঠশালা, মানবীয় মহত্ত্বের স্কুল।

শিশুকালে লোকে বন্ধুত্ব স্থাপনের চাহিদা, বিশ্বাস রাখার চাহিদা, বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কে বিশ্বস্ত ও সততাপরায়ণ হওয়ার চাহিদা অনুভব করে। তবে এই সমস্ত ভাবাবেগ ভঙ্গুর ও দুর্বল, তা রক্ষা ও পুষ্ট করা প্রয়োজন। রূক্ষ ও বিবেচনাহীন হস্তক্ষেপের ফলে তা সহজেই দমিত ও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আপনারা কখনও লক্ষ্য করেছেন যে ছেলেমেয়েরা তখনই তাদের

বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে যেতে ভালোবাসে যখন বাড়িতে বড়রা থাকে না — কেবল ছোটরা নিজেরাই? তখন তারা লজ্জা না ক'রে মনোযোগ সহকারে লোভী দৃষ্টিতে চারিদিকের সমস্তকিছু দেখে। এ বাড়িতে লোকে কী ধরনের কাঁটা দিয়ে খায়, কী রকম পেন্সিল দিয়ে লেখে, দেয়ালে কী টাঙানো আছে, জানলা দিয়ে তাকালে কী দেখা যায়। এক কথায়, পরের বাড়িতে লোকে কেমন বাস করে। তা কোন উদ্দেশ্যহীন কৌতূহল নয়। পরের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে মানুষ নিজের জীবন নিয়ে ভাবে, কিছু দিক তুলনা করে দেখে, কিছুটা ব্যাপার মেনে নিতে পারে না।

বন্ধুর ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে। দৃষ্টিভঙ্গি তুলনা করা হয়, গুণগ্রাহিতা পরিবর্তিত হয়, কী খারাপ ও কী ভালো, কী উচিত ও কী অনুচিত সে বিষয়ে বিচারবিবেচনা স্পষ্ট হয়ে উঠে, অভিন্ন স্বপ্ন জন্ম লাভ করে, নিরবচ্ছিন্নভাবে আলোচিত হয় অদূরে ও সুদূরে ভবিষ্যতের অভিন্ন পরিকল্পনাগুলো। এ সমস্ত পরিকল্পনার অনেকগুলোই হয়তো বাস্তবায়িত হবে না, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আসল কথাটি হচ্ছে এই যে আজ মানুষের বন্ধু আছে, এবং এতে তার নিজের সত্তা বোধ অধিকতর আনন্দপূর্ণ, সমৃদ্ধ আর নিশ্চিত হয়ে উঠে।

সমবয়সীদের কারো প্রতি শিশুর টান বা অনুরাগ থাকা উচিত। আমাদের দৃষ্টিতে, অনেক সময় তার বন্ধুটি তার যোগ্য হয় না। এমনও হয় যে আপনার ছেলের বন্ধুটি পড়াশোনায় খারাপ, বই কম পড়ে অথবা অমনোযোগী, কিন্তু সহানুভূতি ও বিরাগের কারণগুলো এমনকি বয়ঃপ্রাপ্ত লোকেদের পক্ষেও বিচার আর ব্যাখ্যা করা তেমন সহজ কাজ নয়। বড় হয়ে ছেলেমেয়েরা এখন যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে তাদের প্রতি অধিকতর কঠোর দাবি হাজির করবে, শৈশবে তারা প্রশ্রয় দানে খুবই পটু।

সময় কেটে গেল। পাড়ায় সমস্তকিছু বদলে গেছে। যদিও সবই আগের মতো। যাদের বয়স ছিল ১০-১২ বছর, এখন তারা হয়েছে ১৪ বছরের, — তফাৎটা আসলে এখানেই। শৈশব চলে গেছে। আর শৈশবের সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে তার চিন্তাভাবনাহীনতা, অহেতুক আনন্দ, হৈ-হল্লা ও ব্যস্ততা।

অথচ এ দিকে সাবালকত্ব এখনও আসে নি। তার আনন্দ, তার অধিকার ছেলেমেয়েদের কাছে অজ্ঞাত। ছেলেমেয়েরা এখনও পাড়ার সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু অন্য দিকে সে বয়সও চলে গেছে। এখানে অধ্যয়ন ও গবেষণা করার মতো আর কিছুই নেই। এখন তারা বাইরের বৈষয়িক জগৎ গবেষণায় ততটা ব্যস্ত নয়, যতটা খোদ নিজেকে গবেষণায়, নিজের অন্তর্জগৎ ও

অন্যান্যদের অন্তর্জগৎ গবেষণায় ব্যস্ত। নতুন, অজ্ঞাত, বিস্ময়কর, রহস্যময় ও অব্যাখ্যাত কতকিছুই তাদের জানতে হবে...

আচরণের সংস্কৃতি সম্পর্কে

অন্যদের জন্য নতুন মানুষ প্রায়ই শুরু হয় পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি, রুচি, কর্মগুণ, নৈতিক গুণ দিয়ে নয়, যদ্দ্বারা তার অন্তর্জগৎ সমৃদ্ধ তা দিয়েও নয়। সে হবে পরে। আর আপাতত — বাহ্যিক চেহারা, আদবকায়দা, আচরণের শৈলী। 'প্রথমে অনুমোদন করে চোখ, পরে হৃদয়।'

ভালো আচার-আচরণ, শিষ্টাচারের নিয়ম পালন, ভদ্রতা — এ সব স্রেফ বাহ্যিক ব্যাপার নয়। স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ এ জিনিসগুলোর কদর ও মূল্য দিয়ে আসছে এই জন্য যে ওগুলোর উৎসে রয়েছে গভীর আধ্যাত্মিকতা, মানুষের সমৃদ্ধ অন্তর্জগৎ। পঞ্চদশ শতাব্দীর এক কবি বলেছিলেন: 'প্রকৃত উচ্চ মানসিক গুণাবলি আমরা বিচার করতে পারি আদবকায়দা দেখে।' বলাই বাহুল্য, ব্যাপারটি এভাবে বোঝা উচিত নয় যে অভ্যন্তরীণ বা আত্মিক সংস্কৃতি আপনা-আপনিই বাহ্যিক সংস্কৃতির জন্ম দেয়, আর এই শেষোক্তটি আয়নার মতো অন্তরের গভীরতা প্রতিফলিত করে। শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে কী মুখ্য ও কী গৌণ তা সঠিকভাবে ধরতে না পারলে এই ঐক্য ব্যাহত হতে পারে। দুঃখের বিষয়, এমনও লোক দেখা যায় যারা বাহ্যিক চাকচিক্য ও নিখুঁত আদবকায়দার দ্বারা নিজের নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, উদাসীনতা আর নির্লজ্জতা গোপন রাখতে প্রয়াস পায়। তবে সোভিয়েত সমাজে এরূপ ব্যাপার খুবই নিন্দনীয়, আমাদের জীবনের যেকোন ত্রুটিবিচ্যুতির মতোই তা প্রবল প্রতিরোধ পেয়ে থাকে। কিন্তু প্রায়শ অন্য এক ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতিও লক্ষ্য করা যায় যখন বুদ্ধিমান, সৎ, পরিশ্রমী ও ভালো লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে, কাজ করতে, বাস করতে খুবই অসুবিধা হয় একমাত্র এই জন্য যে সে ভদ্র ব্যবহার করতে পারে না, মানুষের সঙ্গে বসবাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় সাধারণ রীতিনীতিগুলো জানে না কিংবা মানে না। অথচ আচরণের সংস্কৃতি না থাকলে মানুষের অনেকগুলো গুণ তার চারিপাশের লোকজনের জন্য বাস্তব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূল্য হারিয়ে ফেলে। জন লক এ বিষয়ে ভালো বলেছেন: 'অমার্জিত ব্যক্তির মধ্যে সাহসিকতা অশিষ্টতার আকার ধারণ করে, ...পাণ্ডিত্য তার

মধ্যে পরিণত হয় পণ্ডিতিয়ানায়, রসজ্ঞতা -- ভাঁড়ামিতে, সারল্য — রূঢ়তায়, উদারতা — চাটুকারিতায়। ভালো গুণাবলি নিয়ে গঠিত হয় অন্তরের মৌলিক সম্পদ, তবে কেবল শিষ্টাচারই হচ্ছে ওগুলোর ফ্রেম।'

অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতি ও আচরণের সংস্কৃতির মধ্যেকার যোগাযোগ একার্থবোধক ও সহজ দৃষ্টিতে বিচার করা উচিত নয়। এটা অবশ্য ঠিক যে প্রথমটির দ্বারা নির্ধারিত হয় দ্বিতীয়টি, এবং এই ঐক্যে তা পালন করে মুখ্য ভূমিকা। কিন্তু সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতা বিপরীতমুখী যোগাযোগেরও জন্ম দেয়।

মেলামেশার সংস্কৃতি। শিষ্টতা — এ হচ্ছে ব্যক্তিত্বের গুণ, যার মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হয়েছে মেলামেশার সংস্কৃতি, বাহ্যিক চেহারার সংস্কৃতি ও চাহিদা পূরণের সংস্কৃতি (দৈনন্দিন জীবনের সংস্কৃতি)। এই তিনটি সংস্কৃতির মধ্যে প্রধান হচ্ছে মেলামেশার সংস্কৃতি।

মেলামেশার সংস্কৃতির নীতি ও নিয়মগুলো গড়ে উঠেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। সমস্ত দেশ ও সব কালের মানুষ এই নীতি মেনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেলামেশার অভিজ্ঞতা বেছেছে, রক্ষা ও সঞ্চয় করেছে: যুক্তিসঙ্গতভাবে — নৈতিকভাবে — সুন্দরভাবে। মেলামেশার প্রকৃত সংস্কৃতির মূলে রয়েছে মানুষের প্রতি মানুষের মানবিক সম্পর্ক। সেই জন্যই শিশুদের মধ্যে খোলাখুলি, আস্থাপূর্ণ ও বন্ধুভাবাপন্ন মনোভাব গঠন — এ হচ্ছে মেলামেশার সংস্কৃতি গড়ার পক্ষে এক অপরিহার্য শর্ত। এই সমস্যাটি সমাধান করতে গিয়ে বড়দের অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা উচিত তারা নিজেরা চারিপাশের লোকজনের প্রতি, পরিচিত ও অপরিচিত লোকেদের প্রতি, প্রতিবেশী, সহকর্মী, আপনজন, আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি এবং অবশ্যই খোদ শিশুদের প্রতি কীরূপ মনোভাব পোষণ করে।

মানুষের প্রতি উদার মনোভাবের অভিব্যক্তি ঘটা চাই সবার পক্ষে বোধগম্য আকারে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলামেশার এ ধরনের আকার বা রূপটি হচ্ছে শিষ্টতা। সৌজন্যের রীতিনীতিতে থাকে নির্দিষ্ট সমাজে অভিবাদন, পরস্পরের প্রতি সম্বোধন, কিছু সহায়তা দানের রীতি, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও ক্ষমা প্রার্থনার রীতি। সৌজন্যের দ্বারা নির্ধারিত হয় পরিচিতির রীতি, আলাপের কিছু নিয়ম, বাড়ির বাইরে আচরণের রীতি, পুরুষ ও নারীর মেলামেশার নিয়ম। খেয়াল রাখা উচিত যে সৌজন্যের মধ্যে শিশুরা

যেন কেবল জীবন জটিলকারী শূন্যেগর্ভ একটি রেওয়াজই না দেখে। ছেলেমেয়েদের কাছে সৌজন্যের অভ্যন্তরীণ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা খুবই প্রয়োজন। তাদের জানতে হবে যে সৌজন্যের রীতিনীতি পালন করলে মানুষের প্রতি, প্রচলিত ঐতিহ্য ও রেওয়াজের প্রতিই শ্রদ্ধা জানানো হয়। জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি শিষ্ট ও অশিষ্টের নির্দিষ্ট কিছু নীতির সঙ্গে জড়িত। সেই জন্যই ছেলেমেয়েদের এই পরিস্থিতিমূলক আদবকায়দার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত। তারা জানুক, আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ লোকেদের সঙ্গে, প্রতিবেশী, সাথী আর বন্ধুদের মধ্যে, স্বল্পপরিচিত ও একেবারে অপরিচিত লোকেদের মাঝখানে কীরূপে আচরণ করতে হয়। তারা ভদ্র অতিথি ও অতিথিপরায়ণ গৃহকর্তা হতে শিখুক, উৎসবে অভিনন্দন জানাতে ও উপহার দিতে, দুঃসময়ে সহানুভূতি আর সমবেদনা প্রকাশ করতে শিখুক। রাস্তাঘাটে, যানবাহনে, ক্যান্টিন আর হোটেল-রেস্তোরাঁয়, সিনেমা-থিয়েটারে, অফিস-আদালতে, সভাসমিতিতে, বিভিন্ন সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠানে আচরণের নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। উদীয়মান বংশধরদের এ সমস্তকিছুই জানতে হবে।

মেলামেশার সংস্কৃতি কেবল এক শিষ্টতার মধ্যেই সীমিত নয়। তার অপরিহার্য ধর্ম — কুশলতা, যা হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক মানবীয় গুণগুলোর একটি, এবং তার বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে চারিপাশের লোকজনের অনুভূতি ও মনোভাব বোঝার ক্ষমতায়, নিজেকে তাদের অবস্থায় উপলব্ধির ক্ষমতায়, কোন্ আচরণ তাদের মধ্যে কীরূপে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তা অনুমান করার ক্ষমতায়।

...দীর্ঘাকৃতি এক তরুণের সঙ্গে বাসে এসে ঢুকলেন সুসজ্জিত সজীব এক মহিলা। তাঁকে দেখে ছোট একটা মেয়ে তার জায়গা ছেড়ে দিল:

— বসুন।

— আরে না না... তুমিই বসো... ধন্যবাদ, আমার দরকার নেই...

— বসুন, বসুন। আমি সব সময়ই বেশি বয়সের লোকেদের বসতে দিই।

মহিলার মুখের সজীবতা চলে গেল...

মেয়ের মা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। সম্ভবত মেয়েকে শিষ্টতা শেখাতে গিয়ে কুশলতার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেন নি। এ হচ্ছে তারই ফল।

মেলামেশার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে ভাষা, কথা, শব্দ। আদানপ্রদানের এই মাধ্যমের উপর কার কীরূপে দখল আছে তা দেখেই মানুষ প্রায়ই তার

সংস্কৃতি ও শিষ্টতা বিচার করে। মার্জিত ভাষা শেখানোর কাজ মেলামেশার সংস্কৃতি গঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

স্কুলের ছেলেমেয়েরা যাতে আলাপ-আলোচনা শুরু করার ও তা চালিয়ে যাওয়ার শিলপটি আয়ত্ত করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে প্রথম প্রথম তাদের এই সহজ জিনিসগুলো শিখিয়ে দেওয়া উচিত: সুস্পষ্টভাবে, অমায়িকতার সঙ্গে, গুছিয়ে ও সরলভাবে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া; এমন প্রশ্ন করা, আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে যার সম্পর্ক রয়েছে; কেবল জিজ্ঞাসা করলেই নিজের মতামত ব্যক্ত করা, এবং তখন কোনরূপ কটূক্তি না করা ও আপোসহীন মনোভাব না দেখানো; সহালাপীর কথা সমনোযোগে ও অমায়িকভাবে শ্রবণ করা।

তর্ক ছাড়া আলাপ হয় না। সুসম্পর্ক ও বন্ধুত্বের মনোভাব নষ্ট না ক'রে তর্ক করার শিলপটিও রপ্ত করতে হয় ছেলেবেলা থেকে। ছেলেমেয়েদের সবচেয়ে প্রধান যে জিনিসটি জানতে হবে তা হচ্ছে এই: সহালাপীর ব্যক্তিগত দোষত্রুটির সংখ্যা গণনা ও তার গুণাবলির নেতিবাচক মূল্য নির্ধারণ — কোন যুক্তি হতে পারে না। তবে তর্কের সময় ঠাট্টাতামাসা খুব সাহায্য করতে পারে। রসিকতা বোধ ও রসজ্ঞতা — আধুনিক সমাজে এই গুণগুলোর উচ্চ মূল্য আছে। তবে এই গুণগুলোর সামাজিক আকর্ষণীয়তা থাকাতে কিশোর ও তরুণ ছেলেমেয়েরা অনেক সময় রসিকতা বোধ না থাকলেও নিজেদের যেন-তেন প্রকারেণ রসিক হিশেবে উপস্থিত করার বাসনায় মাতাল হয়ে উঠে। গুরুজনরা নিপুণ নেতৃত্ব না দিলে তা অশ্লীলতা, কুরুচি আর অভদ্রতার জন্ম দিতে পারে।

বিকশিত রুচি বোধ মেলামেশা সহজ ও সুন্দর করে তুলে। সন্দেহ নেই যে তা হচ্ছে শিষ্টাচারের এক অপরিহার্য উপাদান এবং তা — অন্য যেকোন অনুভূতিরই মতো — নিজের বিকাশের জন্য অনুশীলন দাবি করে।

ব্যহ্যিক চেহারার সংস্কৃতি। মানুষের বাহ্যিক চেহারা তুচ্ছ কিছু নয়। তা শিশু ও কিশোরের জীবনে, তাদের চরিত্র গঠনে অতি গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা পালন করে। কৈশোরে এবং যৌবনে আকর্ষণীয় হওয়ার বাসনা বিশেষ তীব্র আকার ধারণ করে। চারিপাশের লোকেরা এবং কিশোর নিজে তার বাহ্যিক চেহারার কীরূপ মূল্যায়ন করে তার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে তার মনমেজাজ, আত্মবোধ এবং এমনকি দলের মধ্যে তার স্থান। ঠিক ওই সময়ই ছেলেমেয়েদের মধ্যে মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য সম্পর্কে ধারণা

গড়তে থাকে। এ হচ্ছে তাদের আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ। তখন কিশোররা যদি ভালো প্রশিক্ষণমূলক নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত থাকে তাহলে কান্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদাই ভ্রান্ত ধারণা থেকে গড়ে উঠে না। এই ভাবেই দেখা দেয় নিকৃষ্ট, অমার্জিত ও কূপমণ্ডূকসুলভ রুচি। সেই জন্যই কি কিশোর আর তরুণদের একাংশের অশিষ্টতার বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশের সময় প্রায়ই রঙ-ঢঙী চাল, চেঁচিয়ে কথা বলার প্রবণতা, পোশাকপরিচ্ছদে রুচিহীনতা, প্রসাধন দ্রব্যের অপব্যবহার, হাঁটা-চলায় বিকৃত রুচি সম্পর্কে নিন্দা শোনা যায় না?

এই সমস্ত দোষত্রুটি দূর করার পক্ষে সবচেয়ে কার্যকর উপায় হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক চেহারার সংস্কৃতি গঠন। সে কাজ শুরু করা উচিত অতি সাধারণ ব্যাপারটি দিয়ে — পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার অভ্যাস গঠন দিয়ে। সাম্প্রতিক কালে, দুঃখের বিষয়, কিছু কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীকে ভীষণ অপরিচ্ছন্ন থাকতে দেখা যাচ্ছে। কেবল তা-ই নয়, — তারা সেই অপরিচ্ছন্নতাকে অর্চনীয় বস্তুতে পরিণত করছে। সংগ্রাম এবং প্রতিষেধের উপায় আছে একটি: একেবারে ছোটবেলা থেকে অপরিচ্ছন্নতার প্রতি গভীর বিদ্বেষ গড়ে তোলা, ছেলেমেয়েদের কাছে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলির নৈতিক, কান্তিগত ও সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা।

বাহ্যিক চেহারার পক্ষে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে অঙ্গভঙ্গি, ইঙ্গিত, গতি ও মুখভঙ্গি যা হচ্ছে শিষ্টতা আর সংযমের সূচক। তা অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা আর শৃঙ্খলানিষ্ঠতারও পরিচায়ক। অন্য দিকে তা আবার অদৃঢ়তা, শৃঙ্খলাহীনতা আর আত্মনিয়ন্ত্রণহীনতাও প্রমাণ করতে পারে। সাধারণত শিশুদের মুখভঙ্গির দিকে খুবই কম মনোযোগ দেওয়া হয়। অনেক সময় ছেলেমেয়েরা ভুরুগুলো বেশি উপরে তুলে ফেলে (এবং চেহারায় ফুটে উঠে চির বিস্ময়), বিশ্রীভাবে কপাল কোঁচকায়, বাঁকা হাসি হাসে, ভ্রূকুটি ক'রে তাকায়, জেদ ক'রে ঠোঁটগুলো সামনের দিকে এগিয়ে দেয়, ভেঙচিয়ে মুখ বিকৃত করে। এ সমস্তকিছু কেবল কান্তিগত খুঁতই নয়। অনুরূপ দোষত্রুটি মেলামেশায়ও অসুবিধা বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, কেননা মুখভঙ্গি হচ্ছে মনের ভাব আদানপ্রদানের সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত একটি হাতিয়ার। মানুষ তার মুখভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং তাকে তা পারা উচিতও। তার মানে এ নয় যে মুখখানি শক্ত একটি মুখোসের মতো দেখাক, যার মধ্য দিয়ে কোন অনুভূতিরই প্রকাশ ঘটবে না। কিন্তু একই সঙ্গে অত্যধিক মাত্রায় ভাবাবেগ প্রদর্শনেরও প্রয়োজন নেই। ছেলেমেয়েদের

মুখগুলো সরল, সজীব ও অমায়িক হয়ে উঠুক, যার সৌন্দর্য ও ভাবগর্ভতা ব্যক্ত করবে সুশিক্ষার মাধ্যমে গঠিত মুখভঙ্গি।

অঙ্গভঙ্গি আর গতির সংস্কৃতি গঠনের কাজটি মা-বাবাদের পক্ষে বিশেষ শ্রমসাপেক্ষ। খোদ ছেলেমেয়েরা এ ব্যাপারে খুব একটা মনোযোগ দেয় না। তারা বিভিন্ন জিনিস (চামচ, পেন্সিল) নিয়ে অনর্থক কারিকুরি করে, হাতের মুঠো দিয়ে চোখ মোছে, হাত দিয়ে মুখ ও চুল স্পর্শ করে, আঙুল দিয়ে টেবিল ঠোকাঠুকি করে, গা চুলকায়, পা দোলায়, চেয়ারের উপর একেবারে গা এলিয়ে বসে, দেয়ালে ঠেস দেয়, মেয়েরা বিশ্রীভাবে বসে, পা বাঁকা করে চলে, কুঁজো হয়ে থাকে, সব সময় সাজগোজ করে, বার বার আয়না কিংবা পালিশ-করা আসবাবপত্রে নিজেকে দেখে, কাপড় ঠিক করে এবং আরও অনেক অশোভন আচরণ করে। একেবারে ছোটবেলা থেকে শিশুর গতি আর অঙ্গভঙ্গির দিকে খেয়াল রাখলে সমস্ত কুঅভ্যাসই দূর করা যায়। তখন দেখা উচিত তার গতি যেন উপযুক্ত ও স্বাভাবিক হয়ে উঠে, ধীরে ধীরে তাতে যেন সৌন্দর্য ও নৈপুণ্য আসে। গতি ও অঙ্গভঙ্গির ক্ষেত্রে শিষ্টতা এবং অশিষ্টতার সীমানা ছেলেমেয়েদের জানা থাকা চাই। সাধারণ্যে তারা শারীরিক প্রক্রিয়াসমূহের (হাঁচি দেওয়া, নাক ঝাড়া, কাশি, হাই তোলা ইত্যাদি) যত কম প্রকাশ ঘটাবে ততই ভালো। এ ব্যাপারটিও তাদের শিখিয়ে দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

মানুষের চলার ভঙ্গিও তার সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেককিছু বলতে পারে। তবে কিশোর-কিশোরীরা প্রায়ই জানে না পুরুষ ও নারীর কোন্ গতিভঙ্গিটি সুন্দর বলে গণ্য হয়। এমনও দেখা যায় যে কিছু ছেলে চলার সময় মাথাটি কাঁধের ভেতরে টেনে নেয়, কুঁজোটে হয়ে হাঁটে, পা ঘষে ঘষে চলে, পা টেনে চলে, আর মেয়েরা খুব বেশি ঊরু নাড়ায়, অথবা হাত-পা ছড়িয়ে অমেয়েলি কায়দায় চলে, কিংবা টুক টুক করে হাঁটে ও প্রতি পদক্ষেপে একটু লাফিয়ে উঠে। শিশুদের সঠিক চলন ভঙ্গিতে অভ্যস্ত করানোর সময় চেষ্টা করা উচিত যাতে সেই চলন ভঙ্গি বেশি দ্রুতও না হয়, বেশি মন্থরও না হয়। তা হতে হবে সতাল ও সহজ। মাটিতে পা পড়বে দৃঢ়ভাবে, পায়ের সম্মুখ ভাগ বাইরের দিকে সামান্য প্রসারিত থাকবে, দেহের ভার পালা করে উভয় পায়ের উপর পড়বে, অন্যথায় গতিভঙ্গিতে খাপছাড়া ভাব আসবে। দেহটি সোজা, কাঁধগুলো সিধা, মাথাটি সামান্য হেলানো, চোখের দৃষ্টি সামনের দিকে, হাত দুটো সহজ ও স্বাভাবিকভাবে চলতে সাহায্য করবে, স্কন্ধ ও ঊরু সঞ্চলন প্রায় অদৃশ্য এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সাধারণ ভিত্তির উপর শিশুর ব্যক্তিত্ব

নিজস্ব ছাপ ফেলবে এবং বিশেষ, অনুপম ও অবশ্যই সুন্দর চলন ভঙ্গি গড়ে তুলবে।

গৃহ প্রশিক্ষণ। পারিবারিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আচরণের সংস্কৃতি গঠনের হাজারো রকমের পদ্ধতি ও উপায় রয়েছে। তবে দুঃখের বিষয়, সর্বদা তা থেকে সেরা পদ্ধতি ও উপায়গুলো গ্রহণ করা হয় না।

— টেবিল থেকে কনুই সরা... মুখ দিয়ে শব্দ না ক'রে খা তো... গা এলাবি না... চুলগুলোতে হাত দিস না... চামচে নিয়ে খেলা বন্ধ কর... কালই যেন চুলগুলো কাটাতে যাস, দেখে দেখে একেবারে ঘেন্না ধরে গেছে... তোর হয়ে কে 'ধন্যবাদ' বলবে? এক্ষুনি ফির বলছি! দরজাটি ধড়াম ক'রে বন্ধ করিস কেন?..

অনবরত অজস্র উপদেশ, গালাগাল, মন্তব্য, শাস্তি, হুমকি — এ হচ্ছে আচরণের সংস্কৃতি গড়ার অফলপ্রসূ উপায়। মাত্রা না মেনে এ ধরনের উপায়ের আশ্রয় নিলে তা গুপ্ত, আর সময় সময় খোলাখুলি প্রতিরোধ উদ্রেক করে, নিজের মতো ক'রে আচরণ করার ইচ্ছাকে প্রবল করে তুলে এবং সমস্ত রকমের আদবকায়দার প্রতি বিদ্বেষ বৃদ্ধি করে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মা-বাবার ভালো অগ্রগতিই কেবল এরূপ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে পরিবারে স্বাভাবিক, ভালো সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েরা আচার-আচরণে গুরুতর ভুল করে, তাদের অশিষ্ট দেখায়। সাধারণ একটি উদাহরণ দিই: বাস স্টপে ৮-৯ বছরের এক মেয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে মধ্যবয়সী একটি লোকের ক্ষতচিহ্নের দ্বারা বিকৃত মুখটির দিকে। লোকটি লজ্জিত হয়ে অসহায়ভাবে মুখটি লুকোতে চেষ্টা করছে। মেয়েটি মায়ের হাত ছেড়ে পাশ ঘুরে গিয়ে ফের দেখতে লাগল — মনোযোগ সহকারে, পলকহীন দৃষ্টিতে। এটা ভাবাই কঠিন যে মেয়েটি তার অজ্ঞাত লোকটিকে আঘাত দিতে চায়। আসল ব্যাপারটি হচ্ছে সে এখনও জানে না অশিষ্ট আচরণ বলতে কী বোঝায়। ছেলেমেয়েরা প্রায়ই প্রচলিত আদবকায়দা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা হেতু ভুল আচরণ করে থাকে।

আদবকায়দা-দুরস্ত ব্যক্তি হতে গেলে সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে শিষ্টাচারের নিয়ম ও নীতিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একত্রে বসবাসের যে পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা বদ্ধমূল রয়েছে তা আয়ত্ত করা। শিষ্টতার সঙ্গে পরিচয়ের রূপ হতে পারে বিভিন্ন। সময় সময় দু'-একটা সংক্ষিপ্ত কথাই

যথেষ্ট: 'সেগেই, দাদু এলে তুই প্রথমে হাত বাড়াবি না, তা অভদ্রতা হবে।' কখনও কখনও ছেলেমেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত ফিল্মের বা টিভি অনুষ্ঠানের কোন খুঁটিনাটির দিকে: 'তুই লক্ষ্য করেছিস, সবাই যখন খেতে বসছিল তখন ছেলেটি প্রথমে ওই মেয়ের চেয়ারখানি একটু পেছনে সরিয়ে নিয়ে ফের সামনের দিকে ঠেলে দিল, মেয়েটি যতক্ষণ না বসল ততক্ষণ অপেক্ষা করল, এবং কেবল তারপরই নিজে বসল।' সময় ও সুবিধা বুঝে কিশোর-কিশোরীদের এরূপ একটা সমস্যাও সমাধান করতে দেওয়া যায়: 'শোন। একটি লোককে বাড়িতে নেমতন্ন করা হল। সে প্রবেশ কক্ষে ঢুকতেই দেখল যে দরজার কাছে এক তরুণী তার ওভারকোটটি খুলছে। গৃহকর্তা ওখানেই দাঁড়িয়ে আছেন এবং বলছেন: 'আসুন, আলাপ করুন।' লোকটি বলল: 'সানন্দে,' — এবং সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজের নাম উচ্চারণ করল: 'এডিক'। এখানে শিষ্টাচারের নিয়ম পালনে যে-পাঁচটি ভুল হয়েছে তা বার করতে পার?'

বলাই বাহুল্য, কেবল শিষ্টাচারের নিয়ম জানা থাকলেই শিষ্ট হওয়া যায় না। নিয়মাবলি অবশ্যই শিষ্টতা রপ্ত করার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় এক শর্ত, কিন্তু কেবল তা-ই যথেষ্ট নয়। প্রকৃত শিষ্ট ব্যক্তি হচ্ছেন একমাত্র তিনিই, যিনি নিজের মধ্যে দৃঢ় ও স্থায়ী সুঅভ্যাস গড়তে সক্ষম হয়েছেন।

দৈনন্দিন জীবনে মানুষকে অসংখ্য বার অসংখ্য অজটিল কাজ সম্পন্ন করতে হয়: অভিবাদন জানাতে হয়, ক্ষমা চাইতে হয়, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হয়, সাহায্য করতে হয়, বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রায়ই ছেলেমেয়েদের অশিষ্ট দেখায় এই জন্য নয় যে তারা জানে না কীভাবে এ সমস্তকিছু করতে হয়, তাদের অশিষ্ট দেখায় এই জন্য যে তারা প্রয়োজনীয় অভ্যাসগুলো রপ্ত করে নি। ১০০টি স্কুলছাত্রকে জিজ্ঞেস করুন, থিয়েটারে দুই সারির মাঝখান দিয়ে কীভাবে যেতে হয়। তাদের ৯৫ জনই বলবে: উপবিষ্ট লোকেদের দিকে মুখ করে। এই ছেলেমেয়েদেরই সিনেমায় নিয়ে যান। তাদের অর্ধেকই দুই সারির মাঝখান দিয়ে চলার রীতি মানবে না, কারণ অভ্যাস গড়ে উঠে নি।

অভ্যাসে কাজ স্বয়ংক্রিয় হয়ে যায় এবং সম্পাদিত হয় ঠিক এই ভাবেই করতে হবে অন্যভাবে নয় সেরূপ চাহিদার ভিত্তিতে। ছেলেটিকে তখন আর ভাবতে হয় না গুরুজনের সঙ্গে, মহিলার সঙ্গে কথা বলার সময় তার উঠা উচিত কি না। সে বসে থাকতে পারবেই না, তা তার পক্ষে অস্বস্তিকর, তা ভালো নয়। এটাই হচ্ছে অভ্যাস। এর আসল মূল্যটি হচ্ছে এই যে তা সব

সময় একই জিনিস কীভাবে করতে হবে সে বিষয়ে অগভীর ভাবনা থেকে মানুষের চেতনাকে মুক্ত করে। প্রতি বার মানুষ অঙ্ক করার কাজে ব্যস্ত স্কুলছাত্রের মতো ধীরে ধীরে আচরণের রীতি বাছতে পারে না এবং তা করা উচিতও নয়। রুশ শিক্ষাবিদ কনস্তান্তিন উশিনস্কি সুঅভ্যাসকে মানুষের স্নায়ু ব্যবস্থায় রক্ষিত নৈতিক পুঁজির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই পুঁজি নিরবচ্ছিন্নভাবে বাড়ে, এবং তা থেকে প্রাপ্ত সুদ মানুষ সারা জীবন উপভোগ করে। অন্য দিকে, কুঅভ্যাস হচ্ছে অপরিশোধিত ঋণ, যা মানুষকে একেবারে দেউলিয়া করে দিতে পারে। অভ্যাস গড়ে উঠে অনুশীলনের মাধ্যমে। প্রয়োজনীয় কাজ ও আচরণ নিয়ে শিশু যত বেশি অনুশীলন করবে, তার আদবকায়দা ততই সরল ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। শিশুকে খোলাখুলিভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়: 'তুই যখন বাইরে থেকে বেড়িয়ে আসবি, তখন বাড়িতে অনেক অতিথি থাকবে। দেখা তো কীভাবে তুই ঘরে ঢুকবি এবং নমস্কার বলবি... না, ঠিক হল না... শান্তভাবে দরজাটি খোল... ঘরের ভেতরে তাকা... আরও একবার: তুই ভীষণ আস্তে বলেছিস... চেঁচানোরও প্রয়োজন নেই... এবার ভালোই হয়েছে...' ছেলেমেয়ে একটু বড় হলে এরূপ ট্রেনিংয়ে কোন কাজ হবে না। তা অপমানকর। তাদের অনুশীলন চলবে দৈনন্দিন জীবনে, অলক্ষ্যে ও স্বাভাবিকভাবে। তবে তা করতে গিয়ে দোষত্রুটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত নয়। অর্জিত সাফল্য এবং ভালো সমস্তকিছুর উপর জোর দেওয়াই শ্রেয়।

— কাল পাশের বাড়ির এক ভদ্রমহিলা বলেছেন তুই নাকি সব সময় তাঁর সঙ্গে খুবই ভদ্রভাবে কথা বলিস। শুনে আমার কত ভালো লাগল...

— দেখেছিস, তুই এখন ছুরি আর কাঁটা দিয়ে কীভাবে খেতে হয় তা শিখে নিয়েছিস। এবং কত তাড়াতাড়ি!

— ধন্যবাদ বাবা। এই সেদিনই তো আমি তোকে কাপড় পরিয়ে দিতাম, বোতাম লাগাতাম। আর আজ তুই-ই আমায় ভদ্রলোকের মতো ওভারকোটটি পরিয়ে দিচ্ছিস!

সর্বদা সঠিক আচরণ আর ক্রিয়াকলাপের প্রশংসা করা উচিত। তাতে ক'রে সুঅভ্যাস গড়ে উঠে সহজে এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

আচরণের সংস্কৃতি গড়ার কাজে অনেক সময় কোন কথারই দরকার হয় না, কাজের একটি উদাহরণই যথেষ্ট। মিউজিয়মের প্রবেশ কক্ষে, যেখানে দর্শকরা জুতোর উপর বিশেষ এক ধরনের চটি পরছিল, এক ভদ্রলোক নুইয়ে তার স্ত্রীর চটিতে ফিতেগুলো বাঁধতে লাগলেন। তাঁদের ১১ বছরের

ছেলে সঙ্গে সঙ্গেই উটকো হয়ে বসে মা'র অন্য পায়ের চটিতে অনুরূপভাবে ফিতে বেঁধে দিল। খুবই লক্ষণীয় ব্যাপার: সে তা করেছে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে, তার এরূপ আচরণ করার ইচ্ছে হয়েছিল। ছেলেমেয়েরা আচরণের সংস্কৃতির নিয়মাবলি যেন ভালো চোখে দেখে সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত। মানুষ যদি আদবকায়দা-দুরস্ত হতে না চায়, তাহলে তাকে বাধ্য করা অসম্ভব। শিষ্টতা হচ্ছে এমন এক গুণ, যা কারো উপর জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তা বিকাশ লাভ করে নিজেকে নিয়ে শিশুর নিজেরই কাজের ফলে। শিষ্টাচারের নিয়ম জানা উচিত। তা পালনের দৃঢ় অভ্যাস থাকা চাই। তবে সবচেয়ে বড় কথা — আদবকায়দা-দুরস্ত হতে চাওয়া উচিত। এই শিক্ষামূলক সমস্যাটি যদি সমাধান করা না হয় তাহলে কোন উপায় আর পদ্ধতিই — তা যত ভালোই হোক না কেন — কোন কাজ দেবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পারিবারিক সম্পর্ক

সময়, শিশু এবং পরিবার প্রসঙ্গে

মানুষের আত্মিক বিকাশে পরিবার যে বিপুল এক ভূমিকা পালন করে তা বোধগম্য ও অনস্বীকার্য। অবশ্য শিশু যুগপৎ অথবা ক্রমাগতভাবে কয়েকটি দলের সদস্য, এবং এই দলগুলোও তাকে প্রভাবিত করে। শিশু স্কুলের সদস্য, সমবয়সীদের দলের সদস্য, সে শহরের বাসিন্দা। শৈশবে ও তারুণ্যে ছেলেমেয়েরা ছোট বড় এই দলসমূহের অনেকগুলোই বদলাতে পারে। তবে অপরিবর্তিত থেকে যায় কেবল একটি দল — পরিবার। শিক্ষাদীক্ষার কাজে পরিবারের বিশেষ ভূমিকার প্রথম কারণটি — পারিবারিক প্রভাবের দৃঢ়তা, স্থায়িত্ব ও দীর্ঘকালীনতা। দ্বিতীয় কারণটি — সে ভূমিকার বহুমুখীনতা। পরিবার হচ্ছে মানবীয় সম্পর্কের প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রন্থটির এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে — আধুনিক পরিবার, তার বড় ও ছোট সমস্যা। এখানে আরও আলোচনা চলবে আত্মিক সম্পদ ও নৈতিক পরিবেশের বিষয়ে, পারিবারিক শিক্ষা পদ্ধতির বিষয়ে এবং দৈনন্দিন মেলামেশার সেই সমস্ত গুরুত্বহীন — আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বহীন — খুঁটিনাটির বিষয়ে, যেগুলোতে জন্মলাভ করে পারস্পরিক সমঝোতা, চলে মানুষ গড়ার সুকঠিন ও সানন্দ এক প্রক্রিয়া।

আজকের পরিবার

পারিবারিক গণতন্ত্রের বিষয়ে

সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে বর্তমানে দু' ধরনের পারিবারিক সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করেছে। প্রথম ধরনের সম্পর্কের অধিকারী হচ্ছে সেই সমস্ত পরিবার যেখানে ব্যক্তিগত ক্ষমতা টিকে আছে, তবে তার বাহক সর্বদা পুরুষ নয়। এবং সবচেয়ে আসল ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে এ ক্ষমতা গড়ে উঠছে পরিবারের কর্তার অন্ধ একনায়কত্বের উপর ভিত্তি ক'রে নয়, সেই নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের উপর ভিত্তি ক'রে, যা পরিবারে বাদবাকি সদস্যরা স্বেচ্ছায় মেনে নেয়। এরূপ ক্ষমতা নীতিগতভাবে স্বেচ্ছাচারিতা বা স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হতে পারে না, তার কোন ঐতিহ্যগত-বাধ্যতামূলক চরিত্র নেই এবং তার পরিবারের সমস্ত সদস্যের কাছ থেকে নির্বাচন না হলেও সম্মতি অন্তত চাই-ই।

দ্বিতীয় ধরনের সম্পর্কের অধিকারী হচ্ছে সেই সমস্ত পরিবার, যেগুলোতে প্রধান অভ্যন্তরীণ সমস্যাদি সমাধানের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর বাস্তব সমানাধিকার আছে। প্রায়ই এই সমানাধিকার সংযুক্ত হয় পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন অংশে 'প্রাধান্যকারী প্রভাবের ক্ষেত্রসমূহের' স্বকীয় বণ্টনের সঙ্গে।

পুরনো, পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের স্থান নিয়েছে নতুন ধরনের পরিবার। নতুন ধরনের পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে খুবই দ্রুত, কিন্তু তা হলেও তার ভিত্তিটি অতি মজবুত। পারিবারিক পরিবেশের পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন অগ্রগতি — যেমন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির কল্যাণে।

অবশ্য পারিবারিক সম্পর্কের সমতার পেছনে যে কেবল অর্থনৈতিক কারণগুলোই রয়েছে তা বললে ভুল হবে। পারিবারিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিপুল এক ভূমিকা পালন করেছে নারীদের আইনগত শৃঙ্খলমোচন, তাদের মেধাগত বিকাশের জন্য পরিবেশ গঠন এবং সমাজ জীবনে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

পারিবারিক সম্পর্ক — ব্যাপারটি মোটেই একার্থবোধক নয়। পরিবারের জীবনে সত্যিই আইনগত সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এমনকি সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনসমূহও ঘটে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের

রক্ষণশীল মনস্তত্ত্ব, অভ্যাস, প্রথা, রীতি-রেওয়াজ এবং বদ্ধমূল ধারণাদির ভিত্তিতে গড়ে উঠা অনুভূতি এখনও বিদ্যমান। এ সমস্তকিছু গ্রাহ্য না করাটা মারাত্মক ভুল বলে গণ্য হওয়া উচিত। অর্থনৈতিক ও আইনগত বুনিয়াদ ছাড়া পারিবারিক সমতার নিজস্ব সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক একটি দিকও রয়েছে।

কয়েক বছর আগে পরিবারের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক গবেষণা করতে গিয়ে এবং যে-সমস্ত কারণ আধুনিক পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে তা জানার ইচ্ছায় আমরা নবম শ্রেণীর ছাত্রদের মা ও বাবাদের একই প্রশ্ন করলাম: বাড়িতে কী কী দায়িত্ব প্রধানত মা পালন করেন আর কী কী দায়িত্ব — বাবা? উভয় পক্ষই বিভিন্ন রকমের উত্তর দিল। স্ত্রীরা পুরুষদের উপর ছেড়ে দেয় বাড়ির সমস্ত কাজের প্রায় ৮ শতাংশ মাত্র। পুরুষরা বলল যে পারিবারিক দায়দায়িত্বের ২৫ শতাংশ ন্যস্ত রয়েছে তাদের উপর। স্পষ্টতই বোঝা গেল যে ছেলেমেয়ে মানুষ করার দায়িত্ব ও গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজ সহ সংসারের প্রধান চাপ মায়েদের ঘাড়েই রয়েছে। কিন্তু সমস্ত দায়দায়িত্বের মতো পুরুষরা একই রকমের আগ্রহের সঙ্গে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারটিও নারীদের দিয়ে দিতে রাজী হবে কি? তারা সর্বদা বাস্তব অবস্থা স্বীকার করতে কি রাজী হবে? না, সর্বদা রাজী হবে না। এ থেকেই বহু পারিবারিক সংঘর্ষ দেখা দেয়।

এ সমস্তকিছু ছেলেমেয়ে মানুষ করার কাজকে প্রভাবিত করে কি? সত্যি কথা বললে, অতি স্পষ্ট এই প্রশ্নটি করার পেছনে কোন যুক্তি নেই। তার চেয়ে বরং দেখা যাক, যে-সমস্ত পরিবারে মা বা বাবার অথবা একসঙ্গে দু'জনের সাংস্কৃতিক মান পারিপার্শ্বিক জীবনে সংঘটিত পরিবর্তনের থেকে পিছিয়ে আছে সেই পরিবারগুলোতে সংঘর্ষের কী পরিণাম হতে পারে।

এখানে সবচেয়ে টিপিকেল কয়েকটি পরিস্থিতির উল্লেখ করা যাক।

প্রথম পরিস্থিতিটি — এবং এটাই সবচেয়ে বেশি দেখা যায় — হচ্ছে পিতামাতার মধ্যে অনৈক্য, অমিল ও বিরোধ। শিশুর জন্য তার প্রথম স্বনির্ভর পদক্ষেপের মুহূর্ত থেকেই অদ্ভুত ও হাস্যকর সব প্রশ্ন দেখা দেয়: কার কথা শুনব? কার উপদেশ বেশি গ্রহণযোগ্য? কার পক্ষ নেওয়া উচিত?

ছোট্ট মানুষটি প্রতি দিন মনে ব্যথা নিয়ে দেখছে কীভাবে মা-বাবা ঝগড়া করছেন, কীভাবে তাঁরা একে অন্যকে অপমানিত করছেন কিংবা

কীভাবে তাঁরা একে অন্যের সঙ্গে কথা না বলে একই ফ্ল্যাটে বাস করছেন। শিশুর কাছে মা-বাবা দু'জনই সমান প্রিয় এবং তাঁদের সংঘর্ষের পরিবেশে তার অবস্থাটি একবার কল্পনা করুন।

আমরা আগেই বলেছি, শিশুর জীবনে কী বৃহৎ ভূমিকা পালন করে বড়দের প্রভাব-প্রতিপত্তি। তা শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত গঠনে, স্বনির্ভর চিন্তাধারা বিকাশে এবং আচরণের নীতি নির্ধারণে সহায়তা করে। কিন্তু এখানে মা-বাবার প্রভাব-প্রতিপত্তি সন্তানের চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

তবে এবার কোন্দলপূর্ণ পরিবারের কথা ছেড়ে সেই সমস্ত পরিবারের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক, যেখানে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক সম্পর্ক সোভিয়েত দেশে তাদের জন্য ও তাদের মঙ্গলার্থে প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আইনগত সুযোগসুবিধাদির উপযোগী।

যে-শিশু সর্বদা গুরুজনদের মধ্যে সমতা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক লক্ষ্য করছে সে কখনও তার নিজের প্রতি ব্যবহারে অশিষ্টতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও কোন অবিবেচিত পদক্ষেপ বুঝবে না, বরদাস্ত করবে না এবং ক্ষমা করবে না। অন্য কথায় বলা যায়, সমাজে অর্থনৈতিক ও আইনগত পরিবর্তনের ভিত্তিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে নতুন আর গণতান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাকে মৈত্রীপূর্ণও হতে হবে এবং তা নির্ভর করবে কেবল ক্ষমতাপ্রসূত অন্ধ মর্যাদার উপরই নয়, জীবনের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, দম্পতি ও সন্তানদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের নৈতিক আর মানসিক শ্রেষ্ঠতার উপরও।

আধুনিক পরিবারে সদস্য সংখ্যা কত হওয়া চাই?

আমরা এখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের বড় শহরের টিপিকেল পরিবারের কথাই বলতে চাইছি। সত্যিই, আধুনিক শহুরে পরিবারে সদস্যের সংখ্যায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। এর একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথম কারণটি — এবং এটাই সবচেয়ে সাধারণ ও স্বাভাবিক — জন্মের হার হ্রাস পেয়েছে। এর কারণগুলো যতই জটিল, বিচিত্র ও আপাত-বিপরীত হোক না কেন, আমাদের এই অখন্ডনীয় পরিসংখ্যান তথ্যটি মানতেই হবে: আধুনিক পরিবারে সন্তানের সংখ্যা কমে গেছে।

পৃথিবীতে মানুষ কখনও নিঃসঙ্গ নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক সন্তানের পরিবার শিশুকে আত্মিক জীবনের বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ কোন একটি দিক

থেকে বঞ্চিত করে। এরূপ পরিবারে শিশুর আত্মিক জীবন নিঃস্ব হয়ে উঠে। রূপকথার উদার বীরদের জগৎ প্রসূত রোমাণ্টিক অনুপ্রেরণার, কু-এর বিরুদ্ধে সু-এর বিজয়ে অপরিবর্তনশীল বিশ্বাসের বিনাশ ঘটে। এরূপ পরিবারে শিশু বার বার ফিরে আসে বড়দের দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ আর চিন্তাভাবনার জগতে।

একমাত্র সন্তানে সময় সময় বিচিত্র, বিপরীত ও বিরোধী গুণাবলির সমাবেশ ঘটে: নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বিদ্যমান ইনফ্যাণ্টিলিজম — মা-বাবারা একমাত্র, এমনকি যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেকেও সর্বদা বাচ্চা মনে করেন — এবং পুরোপুরি ও স্বাভাবিক মেধাগত সাবালকত্ব, কারণ তার আচরণের প্রধান পরিবেশ ও মাপকাঠি হন মা-বাবা, তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিরা, — এক কথায়, সেই সমস্ত লোকেরা যাদের সঙ্গে হামেশা তাকে মেলামেশা করতে হয়, কথাবার্তা বলতে হয়, যাদের আচার-আচরণ ও জীবনের ধরন তাকে দেখতে হয়। এরূপ শিশু আলোচনা করতে, তর্ক করতে ভালোবাসে, সে 'বড়দের' সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে, কিন্তু তার সঙ্গে একটু কথা বললেই দেখা যায় যে তার নিজস্ব কোন বিচারবিবেচনা নেই; কোনকিছু না বুঝে ও না ভেবে সে কেবল বড়দের কাছ থেকে শোনা বুলিগুলোই তোতার মতো আওড়াচ্ছে।

— আজকালকার জোয়ান ছেলেমেয়েরা ফুটানি মারতে বড্ড ভালোবাসে। তারা বড়দের চেয়ে অন্য রকমের হতে চায়। পোশাক-আশাক ও আচার-ব্যবহার — সবই কেমন যেন অস্বাভাবিক, কৃত্রিম।

— আর আমরা কি ও রকম ছিলাম না? আমাদের 'মেঝে কাঁপানো' নাচ পছন্দ হয় না, আমাদের দাদু-দিদিমারা ফক্‌সট্রট দেখলে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠত — তা তাদের কাছে ছিল ভ্রষ্টাচার, আর ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে ওয়াল্‌জ্‌ নাচ তুমুল তর্কবিতর্কের সৃষ্টি করে: সবার চোখের সামনে কোলাকুলি করা কি খেলার কথা!

— তাহলে ব্যাপারটি কী দাঁড়াচ্ছে — বিভিন্ন পুরুষের সংঘর্ষ আছে কিংবা নেই?

তবে যে শত সহস্র একমাত্র সন্তানের শৈশব কিণ্ডারগার্টেনে কেটেছে তারা তাদের মানসিক বিকাশের দিক থেকে বহু সন্তানের পরিবারের ছেলেমেয়েদের চাইতে খুব একটা ভিন্ন রকমের হয় বলে মনে হয় না। একেবারে অল্প বয়সে বাচ্চাদের পরিবেশে পড়লে শিশুর নিঃসঙ্গতা জনিত ক্ষতিগুলো পূরণ হয়ে যায়।

পরিবারে ছেলে বা মেয়ের একটি ভাই বা বোন থাকলে ভালোই হয়। তবে সামাজিক বাস্তবতাও আমাদের মেনে নিতে হয়। একমাত্র ছেলে কিংবা মেয়েকে নিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে জেনে রাখা উচিত ভবিষ্যতে কী কী সমস্যার — তা আবার সর্বদা হঠাৎ ও সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় না — সম্মুখীন হতে হবে। জেনে রাখা উচিত স্রেফ কৌতূহল দূর করার জন্য নয়, সময় মতো তা লক্ষ্য ও সমাধান করার উদ্দেশ্যেও।

কেবল অন্নবস্ত্রই যথেষ্ট নয়

দেখা যায় যে কিছু কিছু পরিবারে, বিশেষত সেই সমস্ত পরিবারে, যেখানে অল্প শিক্ষা, লালনপালনের ভুলত্রুটি কিংবা পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের দরুন মেধাগত ও নৈতিক বুনিয়াদ যথেষ্ট দৃঢ় নয়, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি আশঙ্কাজনক ব্যাপারাদির জন্ম দিচ্ছে: জীবনের লক্ষ্যের পর্যায়ে উন্নীত নোংরা ব্যবহারিকতা, বস্তু পূজা ও তদ্দ্বারা প্রসূত ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থপরতা।

এমনও লক্ষ্য করা যায় যে মা-বাবার ভালোবাসা পরিণত হয় ছেলেমেয়েদের মন জোগানোর বস্তুতে, তাদের আবদার আর স্বার্থপর ইচ্ছা পূরণের বস্তুতে। যে-সমস্ত মা-বাবার শৈশব দুঃখদুর্দশা ও বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে কেটেছে তাঁদের ছেলেমেয়েদের বেলাই অমনটা বেশি ঘটে থাকে। ছোটবেলা তাঁরা নিজেরা যে সুখ ও আনন্দ উপভোগ করতে পারেন নি তাঁরা নিজেদের সন্তানদের সেই সুখ আর আনন্দ দানের জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন না।

এমন কোন যন্ত্র নেই যা মানুষের নৈতিক শিক্ষার মান নির্ণয় করতে পারে। পরিসংখ্যানও তা নির্ধারণ করতে সক্ষম নয়। জনসংখ্যাতথ্যবিদরাও এ বিষয়ে কোনকিছু বলতে অক্ষম। তবে আমরা ব্যক্তিগত সম্পর্কের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, পত্রপত্রিকা পড়ে, রেডিও শুনে এবং চলচ্চিত্র দেখে ভালো ক'রেই জানি যে আলোচ্য সমস্যাটি বিদ্যমান। এমন কিছু সংখ্যক তরুণ-তরুণী রয়েছে যাদের মধ্যে সামাজিক অপরিপক্বতা লক্ষ্য করা যায়। তাদের জন্য খোদ পেশার প্রতি আকর্ষণ নয়, অর্থোপার্জনই জীবনের পথ নির্বাচনের মুখ্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা পেশার ক্ষেত্রে নিজেদের আত্মিক ও শারীরিক শক্তি নিয়োগে পরাঙ্মুখ, তারা আপন স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে

অধিকতর সুবিধাজনক ও লাভজনক উপায় খুঁজে বেড়ায়। দৈনন্দিন জীবনে হীনাসক্তি — আমাদের পরিস্থিতিতে সে এক বিরল ব্যাধি। তাতে সর্বাগ্রে আক্রান্ত হয় সেই সমস্ত পরিবার, যেগুলোতে নৈতিক ও মেধাগত শিক্ষার মান খুবই অনুন্নত।

পরিবার এবং শহর

হালের বছরগুলোতে আধুনিক শহরের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তা আমাদের সামনে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হাজির করছে যা নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করতে হচ্ছে। সমস্যাগুলোর একটি হচ্ছে — ছেলেমেয়ে এবং মা-বাবাদের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে শহর সৃষ্ট শিথিলতা। অতি সাধারণ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে চেষ্টা করুন দেখি: আপনারা কি যথেষ্ট ভালো ক'রে জানেন, স্কুলে ও বাড়ির বাইরে আপনার ছেলেমেয়েদের বন্ধুরা কারা? অবসর সময়ে তারা কী বিষয়ে কথাবার্তা বলে? কীসে তাদের আগ্রহ আছে? তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলো কীরূপ? তারা কার মতো হতে চায়? মা-বাবারা তাঁদের ছেলেমেয়েদের আচরণ সম্পর্কে, ওদের যোগাযোগের চরিত্র সম্পর্কে খুব একটা ওয়াকিবহাল নন। এ হচ্ছে বৃহৎ শহরের জীবনের বৈশিষ্ট্য।

আজ বড় বড় শহরের বড় বড় বাড়িগুলোতে লোকে বিচ্ছিন্ন ফ্ল্যাট পাচ্ছে। তাতে প্রতিবেশীদের মধ্যে যোগাযোগ শিথিল হয়ে পড়েছে। বড় কোন বাড়িতে খুব বেশি পরিবার মিলবে না যারা একে অন্যকে অন্তত নামেও চেনে।

— স্বভাবের দিক থেকে ছেলেটি সে ভালোই, তবে খাপছাড়া, অভিমানী। কী করা যায় বলুন তো?

— প্রথমত, নিজেরা ধৈর্যচ্যুত হওয়া ও রাগারাগি করা বন্ধ করুন। আর এর পর ছেলেকে তার নেতিবাচক ভাবাবেগকে ইতিবাচক ভাবাবেগে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করুন।

ব্যাপারটি আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছই মনে হতে পারে। কিন্তু এখানেই অনেককিছুর শুরু। নিজের ফ্ল্যাটের চৌকাঠ পার হওয়ার পর শিশু মা-বাবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নাগালের বাইরে চলে যায়। তার সুকর্ম অথবা

কুকর্ম কোনটাই সেই সামাজিক প্রশংসা বা নিন্দার এক-শতাংশও পায় না যা সর্বদা পেয়ে থাকে তার গ্রামীণ সমবয়সীটির আচরণ। শহরে কেবল শিশুর আচরণই নয়, সে প্রাঙ্গণে, পাড়ায় কিংবা রাস্তাঘাটে কার সঙ্গে কী ধরনের সম্পর্ক আর যোগাযোগ রক্ষা করছে তার উপরও নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে আসছে। গ্রামে সবাই সবাইকে ভালো চেনে। ওখানে লোকে একসঙ্গে বাস ও কাজ করে। প্রতিবেশীর কদর করা হয় সর্বাগ্রে তার হাত ও মাথার জন্য, উৎপাদনী সাফল্যের জন্য।

বৃহৎ শহরের পরিস্থিতিতে তা কি আছে? অনুরূপ আকারে নেই। এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। ওগুলো যথেষ্ট স্পষ্ট। শহরে অফিস-আদালত আর শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বাসস্থান থেকে দূরে। কলকারখানা, ডিপো, গ্যারাজ ইত্যাদিতে বিশেষ অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ। ওগুলোতে স্কুলের ছেলেমেয়েদের তাদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা ক'রে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

শহুরে সুযোগসুবিধা স্কুল ছাত্রদের অবসর সময়ের বাজেট পরিবর্তন করে। গ্রামাঞ্চলে যৌথখামারে সাহায্য করতে অথবা নিজস্ব বাগানে কাজ করতে যে-সময় ব্যয়িত হয় শহরবাসীদের তা হাতেই থেকে যায়। তারা সে সময় ব্যবহার করে বিভিন্ন রকমে। কখনও কখনও যেভাবে আশা করা হয় সেভাবে নয়।

যা সবাই জানে তার আর পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই: শহর হচ্ছে সংস্কৃতির কেন্দ্র। তার গ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কন্সার্ট হল, প্রদর্শনী, থিয়েটার ও সিনেমা হলগুলো ছোট বড় সবার জন্য আত্মিক বিকাশের বিপুল সম্ভাবনা জোগায়। সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য তরুণদের এই সমস্ত সুযোগসুবিধা কাজে লাগাতে, অবসর সময়কে সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্পদ হিশেবে ব্যবহার করতে শেখানো — এ হচ্ছে মা-বাবাদের বড় এক কর্তব্য।

পরিবারের পরিবেশ

পরিবার — সে হচ্ছে মানুষের আত্মিক বিকাশের কেন্দ্র। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের বৈচিত্র্য, পরস্পরের প্রতি অনুভূতির নগ্নতা ও সরলতা, এই সমস্ত অনুভূতি প্রকাশের বিভিন্ন রূপের প্রাচুর্য, শিশুর আচরণে জীবন্ত প্রতিক্রিয়া — এ সমস্তকিছু আবেগ ও নৈতিকতা গঠনের জন্য

সর্বাধিক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। তা সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা ও তথ্য সঞ্চিতকরণের জন্যও অনুকূল পরিবেশ গড়ে যা নিয়ে পরে নতুন আর অনুপম এক ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়।

একেবারে শৈশবে আবেগযুক্ত অভিজ্ঞতার স্বল্পতা ও বৈচিত্র্যহীনতা সারা জীবনের জন্য মানুষের চরিত্র নির্ধারিণ করে দিতে পারে।

আবেগ আমাদের স্বভাবের সমস্ত দিক জুড়ে থাকে, তাকে মানুষের চরিত্র থেকে, তার আচার-আচরণ থেকে আলাদা করা যায় না। কোথাও কোথাও (বিশেষত গভীর ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে) তা নির্ধারক ভূমিকা পালন করে, অন্যান্য ক্ষেত্রে পালন করে গৌণ বা অধীন ভূমিকা, কিন্তু সর্বদাই তা কোন-না-কোন ভাবে আমাদের চিন্তাধারাকে, আমাদের ক্রিয়াকলাপকে, মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে প্রভাবিত করে, আমাদের সমগ্র জীবনকে রঙীন করে তুলে। যতটা ভাবা যায় তার চেয়ে বেশিই প্রভাবিত করে। আমরা অনেক সময় পরিস্থিতির উপর প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্ব আরোপ করে থাকি। যেমন, নিজের পেশা ও কাজে মানুষের অসন্তোষ কীসের উপর নির্ভর করে? এমনটা প্রায়ই ঘটে থাকে যখন মানুষ তার নিজস্ব মানসিক গঠন এবং অফিসে বা কারখানায় কৃত কাজের ধরনের মধ্যে তার অজানা গরমিলের শিকারে পরিণত হয়। অন্যকে এবং খোদ নিজেকে বোঝার অক্ষমতার দরুন কী বিপুল পরিমাণ আন্তরিকতা বিনষ্ট হয়ে যায়! মানুষের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, ক্ষমা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের ক্ষমতা থাকলে অনেক ছোটবড় সংঘর্ষই এড়ানো যেত। ভালোবাসতেও পারা চাই, এবং এই ক্ষমতাটি প্রকৃতি-মাতা দেয় না।

যে-সমস্ত পরিবারে আপনাদের যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল তাদের কথা একবার স্মরণ ও কল্পনা করতে চেষ্টা করুন। এ কি সত্যি নয় যে প্রতিটি পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর কীরূপে একটি নিজস্ব — সময় সময় অবোধ্য, কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা — অনুভূতি থেকে যায়। সেই অনুভূতিটি কোত্থেকে আসে তা বিশ্লেষণ করতে শুরু করলে মাথায় আসে কেবল মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোই নয় — আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা কিংবা, তার বিপরীতে, পারিবারিক পরিবেশের শুষ্কতা; আরও আসে — নিজেদের মধ্যে ও অতিথিদের সঙ্গে ব্যবহারের ধরন, পারিবারিক ও অপারিবারিক ব্যাপারাদি নিয়ে কথাবার্তা বলার রীতি ও সুর, অবসর যাপনের ধরন, বাড়িতে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রা... এক কথায় মাথায় অনেককিছুই আসে, যার মধ্যে কোন-কোনটি প্রথম দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্বহীন খুঁটিনাটি

বলে মনে হয়, অথচ এগুলোই আমাদের কল্পনায় নির্দিষ্ট পরিবারের চেহারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়।

এটা অবশ্য ঠিক যে পরিবারের পরিবেশ সর্বাগ্রে নির্ধারিত হয় তার দৃঢ়তার দ্বারা, তার নৈতিক আদর্শাবলির দ্বারা, নিকট ও দূরের লক্ষ্যগুলোর দ্বারা। কিন্তু সাধারণ আবেগগত এবং ভাবাদর্শগত বুনিয়াদ ছাড়াও পারিবারিক আবহাওয়া বলেও একটা জিনিস আছে।

পরিবারের আবেগগত গঠন নিজে থেকেই অনুভূত হয়, এবং তা অনুভূত হয় পরিবারের মানসিক স্বাস্থ্যের মাপকাঠি হিশেবে, সহজ ও সুন্দর এক পরিবেশ হিশেবে। ইচ্ছে হলে তা বোঝার জন্য এরূপ একটা পরীক্ষা চালানো যেতে পারে।

পুরো একটি সপ্তাহ নিজের পরিবারের সদস্যদের আচরণের দিকে খেয়াল রাখুন এবং তাদের প্রত্যেকে ওই সময়টি ধরে কী ব্যাপারে সবচেয়ে প্রবল আবেগ দেখিয়েছে তা মনে রাখুন অথবা লিখে রাখুন। সে কী ধরনের আবেগ ছিল: সুপে বেশি লবণ হওয়ার জন্য বিরক্তি, কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য আনন্দ, বৈষয়িক কারণে ঝগড়া, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি প্রবল সহানুভূতির উচ্ছ্বাস? এর পর এক মাসের পর্যবেক্ষণগুলো একত্র করে তার একটা খতিয়ান করুন। শিশু কী ধরনের— ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক — আবেগ সবচেয়ে বেশি পেল? ভেবে দ্যাখুন! তা খুবই ভালো কাজ।

নেতিবাচক আবেগের উপর ইতিবাচক আবেগসমূহের প্রাধান্যই (ঝগড়াবিবাদ, হতাশা ও একঘেয়েমির উপর প্রফুল্লতা, আশাবাদ, পারস্পরিক স্নেহমমতা আর বন্ধুত্বের প্রাধান্য) কেবল সেই জিনিসটি গড়তে পারে যাকে আমরা আন্তরিকতাপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ বলে অভিহিত করি। এরূপ পরিবেশ পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিদের মিলিত ও সংহত করে, তাদের হৃদ্যতা দেয়, অনুভূতির খোরাক জোগায় এবং মনকে বিশ্রাম দেয়। সমস্ত দৈনন্দিন চিন্তাভাবনা আর ঝামেলা সত্ত্বেও, সমস্ত সম্ভাব্য দুঃখকষ্ট এবং এমনকি বিপদ-আপদ সত্ত্বেও পরিবার মানুষকে আনন্দ দানে বাধ্য।

দেখা যাক পারিবারিক জীবনের নিস্বতা, বৈচিত্র্যহীনতা আর একঘেয়েমি শিশুর উপর কীভাবে প্রতিফলিত হয়। বলাই বাহুল্য, বিভিন্ন পরিবারে এবং বিভিন্ন ছেলেমেয়ের উপর তা বিভিন্ন রকমের প্রভাব ফেলে। তবে এটা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে তা খারাপ প্রভাবই ফেলে। ছেলেমেয়েরা হয়

মনের দিক থেকে ভীষণ সাদাসিধে হয়ে উঠে, — তারা সমৃদ্ধ মানসিক ভাবনা উপভোগ করতে অক্ষম এবং তাতে কোন চাহিদাও অনুভব করে না, নয় দৈনন্দিন অস্তিত্বে প্রয়োজনীয় আবেগগত 'মালমসলা' না পেয়ে তারা 'অত্যধিক উত্তেজক' কোনকিছুর সন্ধানে ছোটাছুটি করতে আরম্ভ করে। অথবা সব সময় নিজের আবেগগত অভিজ্ঞতার অভাব অনুভব ক'রে পরে যেকোন জটিল পরিস্থিতিতে দিশেহারা হয়ে পড়ে ও কষ্ট পায়।

আর যা-ই হোক না কেন, অনুরূপ পরিবারে শিশু কিন্তু অবশ্যই আবেগগত ক্ষুধা অনুভব করে। শিশুরা তাদের স্বভাবের দিক থেকে অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে ভালোবাসে। কিছুতেই তাদের আশ মেটে না, তারা সর্বদা কোনরূপ মজার ব্যাপারে, আয়োজনে ও আনন্দপূর্ণ ঘটনায় অংশ নিতে চায়। বাড়িতে তাদের ভালো লাগা চাই, শিশুর কল্পনা আর অনুভূতির জন্য পরিবারকে ভালো খোরাক জোগাতে হয়। সে যদি নিরন্তর আবেগগত ক্ষুধা অনুভব করে তাহলে প্রতিক্রিয়া হতে পারে তীব্র ও এমনকি প্যাথোলোজিক। এরূপ অবস্থা হলেই তারা দোকানের শো-কেসে পাথর ছুঁড়ে কাচ ভাঙতে শুরু করে, — কেবলমাত্র ঝুঁকি ও ভয়ের তীব্রতা অনুভব করার উদ্দেশ্যে। বড়রা সাধারণত বলে, 'একঘেয়েমির দরুনই তা হচ্ছে'। না, প্রকৃতপক্ষে তা নয়, এ ধরনের ক্রিয়াকলাপের পেছনে আবেগগত ক্ষুধা, আবেগপূর্ণ অনুভূতিতে চাহিদা। ইভান পাভলোভই বলেছিলেন যে মানুষের জন্য আবেগ হচ্ছে অতি প্রবল ও স্বকীয় ধরনের এক শক্তি-উৎস। তা প্রয়োজনীয়। যদি ইতিবাচক 'চার্জ্' না থেকে, তাহলে নেতিবাচক 'চার্জ্' সহজেই প্রাধান্য লাভ করে। এক বার, দু' বার, তিন বার কোন কুকাজ করার পর মানুষ তাতে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং তাতে আনন্দ উপভোগ করে, অথচ স্বাভাবিক, নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা লজ্জা আর ঘৃণার উদ্রেক করে।

লোকে বিভিন্নভাবে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে। এমনকি এমনও ঘটে থাকে যে নির্দিষ্ট মুহূর্তে মানুষ যা ভাবে বা অনুভব করে তা তার আচরণের সঙ্গে একেবারে মিলে না। এই সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক আপাত-বৈপরীত্যের কথা সবাই জানে, তাতে একটি আবেগ কেন যেন অন্য — এবং সময় সময় সম্পূর্ণ বিপরীত — আবেগের পোশাক পরিধান করে। (রুক্ষতার আড়ালে থাকতে পারে স্নেহ, লোক-দেখানো কুণ্ঠাহীনতার আড়ালে থাকতে পারে ভীরুতা ও লাজুকতা, আর প্রথম বার প্রেমে পড়ার লক্ষণগুলো সময় সময় তীব্র অসদয়তার মতো দেখায়।) অনুরূপ বৈপরীত্য দেখা দেওয়া উচিত

নয়, এবং আমাদের মতে তা-ও হচ্ছে অনুভূতি গঠনে কোন ভুলভ্রান্তির চিহ্ন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত হবে যে শিশুদের ক্লান্তি সহজেই উত্তেজনা আর অদম্য দুরন্তপনায় পরিণত হয়; কোন বিষয়ে দুঃখ তার প্রতি পূর্ণ উদাসীনতায় এবং অন্য কিছুর প্রতি প্রবল আগ্রহে রূপান্তরিত হতে পারে।

শিশুর মধ্যে এক আবেগ থেকে অন্য আবেগে, উচ্চতম আবেগ থেকে নিচতম, অর্থাৎ তার পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক আবেগে উত্তরণের স্থায়ী অভ্যাস গড়ে উঠতে দেওয়া উচিত নয়। আমরা এখানে বলতে চাইছি, যেমন, তার নিজের যেকোন ভুলত্রুটি আর লাজুকতাকে সহজে চারিপাশের লোকজনের বিরুদ্ধে বিরক্তি ও ক্রোধে পরিণত করার অভ্যাসের কথা। গড়া উচিত ভিন্ন, সম্পূর্ণ বিপরীত অভ্যাস, — আবেগকে নিচতম পর্যায় থেকে উচ্চতম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার অভ্যাস। যেমন, অকৃতকার্যতা থেকে — সাফল্য লাভের বাসনায়।

তাই পরিবারের আবেগগত স্বাস্থ্যের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে অনুভূতির মৌলিকতা, 'অকৃত্রিমতা', আচরণ এবং মানসিক অবস্থার মধ্যে যেন সঙ্গতি থাকে। এই সঙ্গতির সূচকগুলো হল — অনুভূতির প্রবলতার মাত্রা, প্রকৃত ব্যাপারের প্রতিক্রিয়ার আনুপাতিকতা, যুক্তিসঙ্গত আত্মসংযম ও কুশলতা, মেকি ব্যবহারের অনুপস্থিতি।

যেকোন অনুভূতির — এমনকি সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ও মহৎ অনুভূতিরও — প্রবলতার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। যেমন, ভালোবাসা জিনিসটি খুবই ভালো, কিন্তু ভালোবাসা ক্ষোভোন্মত্ত চরিত্র নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলে তা চারিপাশের লোকজনকে কত বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ করে তুলে! সেই জন্য পরিবারে অত্যধিক আবেগপূর্ণ (যেমন, মহা আনন্দ ও মহা উত্তেজনার) অবস্থার প্রতি প্রবণতা গড়া উচিত নয়। তাতে আবেগগত সম্পদ সৃষ্টি হয় না, কিছু অনুভূতির একতরফা পীড়াদায়ক তীক্ষ্ম তাই বৃদ্ধি পায়।

শিশুর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নির্দিষ্ট কোন ঘটনায়, তার নির্দিষ্ট আচরণে কীরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাতে হবে তার জন্য বড়দের সঠিক ও স্থায়ী একটা মাত্রা নির্ধারণের ক্ষমতা (অথবা অক্ষমতা)। আপনার প্রতিক্রিয়া যদি কেবল আপনার মনমেজাজের উপর নির্ভর করে (কখনও বেশি প্রবল, কখনও ভীষণ নিস্তেজ), তাহলে অনুভূতির জগতে শিশু দৈনন্দিন স্থায়ী স্থিতিবোধ থেকে বঞ্চিত হয়। তুচ্ছ ব্যাপারে উল্লাসপূর্ণ কিংবা হা-হুতাশপূর্ণ উত্তেজনা, বাইরে থেকে আনীত ক্লান্তি ও বিরক্তির

দরুন চেঁচামেচি-বকাবকি (নির্দিষ্ট ঘটনা অথবা শিশুর আচরণের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই); একই ব্যাপারে আজ ও কাল বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া প্রকাশের প্রবণতা — এক কথায় সর্বপ্রকার অস্থিরতা, ভাবপ্রবণতা, হৈচৈ ও ব্যস্ততা সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর আচরণে প্রতিফলিত হয়, তাকে মানসিক স্থিরতা থেকে বঞ্চিত করে, তাকে খিটখিটে আর জেদী করে তুলে।

শিশুকে (আর সর্বাগ্রে খোদ নিজেদেরও) অনুভূতি প্রকাশে মিতব্যয়ী ও সংযমী হতে শেখানো দরকার। আপনাদের বড় সন্তানের সামনে আপনারা যদি তার ছোট ভাইটিকে বেশি আদর করেন, সব সময় চুমু দেন, খেতে বসে যদি সহৃদয়তার বশবর্তী হয়ে ছেলেকে জোর ক'রে খাওয়ান, তাহলে নিজের ছেলে বা মেয়ের মধ্যে আপনারা অশিষ্ট আবেগ আর অনুভূতিই গড়ে তুলবেন।

পাঠক জিজ্ঞেস করতে পারেন: কোনটা তাহলে বেশি খারাপ — স্বল্পতা অথবা আধিক্য? আবেগের অপর্যাপ্তি ও জড়তা কিংবা অত্যধিক কুণ্ঠাহীনতা? খারাপ দুই-ই। কিন্তু দ্বিতীয়টি সম্ভবত বেশি বিপজ্জনক।

পরিবারের সুস্থ আবেগপূর্ণ পরিবেশ শিশুর মধ্যে সত্তার দৃঢ়তা সম্পর্কে অনুভূতির জন্ম দেয়, ভবিষ্যতে বিশ্বাস এবং আনন্দপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক জীবনের আশা গড়ে তুলে।

পিতামাতারা — সহজাত প্রবৃত্তি অথবা চেতনার দ্বারা চালিত হয়ে — সাধারণত শিশুর আশাবাদী মনোভাব সমর্থন করেন, তার মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূলে করে তুলেন যে এখন তার যতটা ভালো চলছে, পরে, বড় হলে, তার চেয়ে আরও বেশি ভালো হবে। তবে সময় সময় এমনটাও শোনা যায়: 'তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না' অথবা 'বড় হলেই জানতে পারবি কত ধানে কত চাল হয়'। এরূপ বলা অনুচিত। তাতে শিশু মন গুরুতর আঘাত পেতে পারে।

শিশু ভবিষ্যতের দিকে ছুটতে চায়, নিজের সাফল্যে এবং এমনকি... অমরত্বে বিশ্বাস করতে চায়। তার বিশ্বাস নষ্ট করা উচিত নয়। সেই জন্যই পরিবারে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা পোষণ করা উচিত, আগামী দিনে ভয় করলে চলবে না। কেবল ইতিবাচক আবেগের পরিবেশেই শিশু আশাবাদী হয়ে উঠতে পারে।

তবে নেতিবাচক আবেগের বিকাশ কীভাবে ব্যাহত করা সম্ভব? আমাদের মনে হয়, এখানে দুটো পন্থা আছে। প্রথমটি — আত্মসংবরণ করার এবং আরব্ধ বিরক্তি, রাগ, একগুঁয়েমি ইত্যাদি দমন করার ক্ষমতা।

সময় মতো নিজেকে সামলে নেওয়ার এবং মেজাজ খারাপ হতে না দেওয়ার ক্ষমতার অধিকারী হওয়া -- সে কোন মামুলি ব্যাপার নয়। সুস্থ শিশুর জন্য সমস্তকিছু নির্ধারণ করে মা-বাবার উদাহরণ, পরিবারে গৃহীত আচরণ রীতি। কেবল শান্ত পরিবেশেই শান্তি ও স্থিরতার শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। সেই জন্যই শিশু যদি ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়ে, জেদ করে, কথা না শোনে, রেগে উঠে ও উদ্ধত আচরণ করে তাহলে নিজের মধ্যে, নিজস্ব আচরণে, পরিবারের পরিবেশের মধ্যে কারণটি খুঁজবেন। নিজে আত্মসংবরণ করুন, ধীর ও স্থির হোন, শিশুর অবাধ্যতা বা জেদ দেখে সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষুব্ধ হয়ে চেঁচিয়ে উঠবেন না। কিন্তু গুরুজনরা যদি আত্মসংবরণ করতে না পারেন তাহলে শিশুর কাছ থেকে (যার আত্মসংবরণের ক্ষমতা খুবই কম বিকশিত) স্থৈর্য দাবি করা নিরর্থক এবং এমনকি অন্যায়ও।

দ্বিতীয় পন্থাটি অধিকতর গভীর ও উৎকৃষ্ট, তা হচ্ছে প্রকৃত মানসিক মহত্ত্ব ও প্রাজ্ঞতার পথ। শিশুর নেতিবাচক আবেগ স্রেফ নিজের বা পরের 'না' দিয়েই দমিত হয় না, — তা ধ্বংস করে অন্য একটি, অধিকতর শক্তিশালী, ইতিবাচক আবেগ। এই প্রক্রিয়াটি দাবি করে বিপুল সচেতনতা, আত্মসমালোচনামূলক মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপকতা, অপরকে বোঝার এবং নিজস্ব মতামত প্রকাশে ও স্বনির্ভর আচরণে তার অধিকার স্বীকার করার ক্ষমতা। অন্য কথায়, এই প্রক্রিয়াটি বড়দের প্রক্রিয়া, এবং তা পুরোপুরিভাবে সুবোধ্য কেবল আত্মশিক্ষার পর্যায়ে।

অনুরূপ ট্রেনিংয়ে সবচেয়ে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে ভয়, ক্রোধ ইত্যাদির কারণগুলো থেকে মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে ছোট ছেলেমেয়েদের শান্তকরণের সুপরিচিত পদ্ধতিটি। পদ্ধতিটি সাদাসিধে, তবে যুক্তিসঙ্গত। শিশু সম্পর্কে এরূপ ভাবা অনুচিত: 'ঠিক আছে, একটু কাঁদুক না, ওতে ওর কিছু হবে না।' সেটা ভুল, ওতেই কিছু হবে। স্বভাবসিদ্ধ আবেগ দেখা দেয় তাড়াতাড়ি এবং কম গুরুত্বপূর্ণ কারণে, তা সহজেই স্বল্পোন্নত আবেগকে কোণঠাসা করে দেয়। শিশুকে তার নেতিবাচক আবেগ সমেত নিরালয় রেখে আপনারা তার সেই আবেগকে বাড়তে, দৃঢ় হতে ও মনঃপ্রকৃতিতে দাগ ফেলতে সাহায্য করেন। তার পৌনঃপুনিক আবির্ভাব ঘটলে অশ্রুপাত, রাগ আর একগুঁয়েমির অভ্যাস গড়ে উঠে, অর্থাৎ নেতিবাচক আবেগের প্রবলতা বৃদ্ধি পায়। অন্য দিকে, শিশুর মনোযোগ সরিয়ে নিলে সে নেতিবাচক আবেগের পরিবর্তে ইতিবাচক আবেগের প্রভাবে পড়ে, প্রথমটি দীর্ঘতা আর নিশ্চলতা হারায়।

এরূপ বাহ্যিক আবেগান্তর রীতিসিদ্ধ হয়ে ভালো কাজ করে। আমরা নিজেরাই প্রতিদিন এর আশ্রয় নিই। রাগ করলে, দুঃখিত হলে কাজে হাত দিই, বই পড়তে আরম্ভ করি, সিনেমায় চলে যাই।

— কেউ চায় না যে তার ছেলে বা মেয়ে যেন কৃপণ, লোভী, অভদ্র ও বদমেজাজী হয়ে উঠে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরূপ ছেলেমেয়ে দেখা যায়, এবং এমনকি ভালো ভালো পরিবারেও।

— তার মানে মা-বাবারা বোঝেন না উদারতা, স্বার্থপরতা, মানবিকতা আর নিষ্ঠুরতা কোত্থেকে আসে।

— সন্তান মানুষ করা চাট্টিখানি কথা নয়। অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

— ভালো, যদি সে ত্যাগ যুক্তিসঙ্গত হয়। উদাহরণস্বরূপ মন্দ অভ্যাসগুলো ত্যাগ করুন।

কিন্তু অনুভূতির প্রকৃত সংস্কৃতি অর্জিত হয় পরবর্তী পর্যায়ে, অভ্যন্তরীণ আবেগান্তরে। কিছুর জন্য ঈর্ষা হল — সেই ঈর্ষাকে তা অর্জনের বাসনায় পরিণত করুন। আপনাদের সঙ্গে কেউ অন্যায় ব্যবহার করলে — নিজের মধ্যে তার কারণের একাংশ খুঁজে বার করুন ও তা ধ্বংস করুন। কেউ কোন ভুল করলে — সবদিক না ভেবে, নিজের বিচারের নিরপেক্ষতা যাচাই না ক'রে তাকে দোষারোপ করবেন না, বুঝতে চেষ্টা করবেন কেন সে এমনটা করেছে এবং দরকার হলে সাহায্য করবেন। তুচ্ছ কারণে রাগ করেছেন — নিজের বিরক্তি জনিত নীচতার জন্য লজ্জাবোধ করবেন।

প্রসঙ্গত, নীচতার বিষয়ে। এই জঘন্য ও পীড়াদায়ক গুণ এখনও বেশ টিকে আছে দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত হীন 'নীতিনিষ্ঠতার' জন্য। নিজেদের ছেলেমেয়েদের কখনও এরূপ 'নীতিনিষ্ঠতার' এমনকি সামান্যতম উদাহরণও দেখাবেন না। তাদের ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে, উদার হতে শেখান। হীন 'নীতিনিষ্ঠতার' অন্যতম নিয়ম হচ্ছে: 'তুমি আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছ আমিও তোমার সঙ্গে ঠিক সেরূপ ব্যবহার করব।' আপনারা হয়তো একাধিক বার এ ধরনের কথা শুনে থাকবেন: 'ও যেহেতু ও কাজ করেছে সেই হেতু আমিও এখন তা করতে পারি...' অথবা 'আমি কখনও তা করতাম না, কিন্তু সে যা করেছে তার পরে...' কিন্তু আপনারা যদি সৎ-এর সঙ্গে সৎ, আর অসৎ-এর সঙ্গে অসৎ হন, তাহলে নিজে আসলে কীরূপ? কোনরূপই না? অপরের আচরণের প্রতিফলন? শিশুকে বোঝান যে সে তার নিজের 'অহং'-এর প্রতি, ভালো ও মন্দ সম্পর্কে নিজস্ব

চিন্তাধারণার প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য। তার এটা হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে অন্যের অসাধুতা, হীনতা ও অশিষ্টতা মানুষকে তার জবাবে হীন ও অসাধু হওয়ার কোন নৈতিক অধিকার দেয় না।

আপনাদের ছেলে বা মেয়ে যদি নীচতা ঘৃণা করতে শেখে, তাহলে পরে তারা বিনা কারণে অথবা তুচ্ছ ব্যাপারে রাগবে না, মন খারাপ করবে না। তারা সর্বদা দুঃখজনক ও বিরক্তিকর ব্যাপারকে বড় কোনকিছুর সঙ্গে, তাদের জীবনে প্রকৃত মূল্যবান কোনকিছুর সঙ্গে তুলনা করে দেখে এবং সুস্থ মস্তিষ্কে তার গুণাগুণ নির্ণয় করে। আপনাদের ছেলেমেয়ে যদি নিজের জন্য উদারতার নিয়মগুলো রপ্ত করে ফেলে, তাহলে কারো আচরণে তাদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া অনেক সহজেই অধিকতর শক্তিশালী ও সাধারণ ইতিবাচক অনুভূতিতে রূপান্তরিত হবে। আর এটা হচ্ছে সেই যাত্রাপথের শুরু যা মানুষকে নিয়ে যায় উপলব্ধ নৈতিক উচ্চতার দিকে।

নৈতিক অনুভূতি গঠন

এমনও মা-বাবা আছেন যাঁরা নিশ্চিত যে ছেলেমেয়েরা ভালো বা খারাপ হয় নিজে থেকে। কিন্তু এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। মা-বাবার প্রভাব নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। অবশ্য কিণ্ডারগার্টেন, প্রাঙ্গণ, স্কুল, রেডিও, টেলিভিশন, বইপত্র, বন্ধুবান্ধব আর পাড়াপড়শীরাও রয়েছে, — এক কথায়, চারিপাশের সমগ্র বিশাল বিশ্বের প্রভাবই আছে। কিন্তু তার বিশালতা সত্ত্বেও শিশুর সমস্ত বাহ্যিক উপলব্ধি, জগৎ সম্পর্কে তার সমস্ত ধারণা ও অনুভূতি পুরোপুরিভাবে প্রায় পরিবারের উপরই নির্ভর করে। সহৃদয়তা, সংবেদনশীলতা, স্বার্থপরতা, মানবিকতা, সমাজপ্রিয়তা, আত্মবদ্ধতা, সততা, উদারতা, কৃপণতা, উদাসীনতা, পরার্থপরতা ইত্যাদির মতো চারিত্রিক গুণগুলো এবং অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ মানবীয় গুণ বিচার করলে সহজেই দেখা যাবে যে সবগুলো গুণই অবস্থান করছে 'অহং' এবং 'না-অহং'-এর সীমানায়, চারিদিকের বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য ও সহযোগিতার সীমারেখায়।

অন্য ব্যক্তি নিজের জন্য তেমনি 'অহং' যেমন আপনার 'অহং' আপনার জন্য — এ ধারণাটিতে অস্বাভাবিক কোনকিছু নেই। কিন্তু তার জ্ঞান ও উপলব্ধির মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যবধান আছে। হয়তো সেই ব্যবধানের সর্বাধিক

হ্রাসকরণই হচ্ছে লালনপালন আর শিক্ষাদীক্ষার সবচেয়ে প্রধান উদ্দেশ্য। তখনই আপন জনের প্রতি আগ্রহ আর শ্রদ্ধা জন্মলাভ করে, তার নিজস্ব মতামত ব্যক্তকরণের অধিকার স্বীকৃত হয়, তার প্রয়োজন আর চাহিদার দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়, — এক কথায়, অনুসৃত হয় 'মানুষ মানুষের বন্ধু, সাথী ও ভাই' নামক নীতিটি।

এই নীতি দাবি করে সততা, নারীর প্রতি পুরুষোচিত ব্যবহার, মাতাপিতার দায়িত্ব পালন, দাবি করে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি (যেমন, কান্তিগত, দলগত অনুভূতি ইত্যাদি), সামাজিক-রাজনৈতিক আদর্শ, নির্দিষ্ট জ্ঞান, চরিত্রের দৃঢ়তা। একদিক থেকে শিশু খুবই সংবেদনশীল, বিশ্বাসপ্রবণ, মিশুক, সরল, অকপট ও উদার। অন্যদিকে তার সহজাত গুণ হচ্ছে স্বার্থপরতা আর আত্মকেন্দ্রিকতা। এবং কেবল সহজাতই নয়, কিছু অর্থে প্রয়োজনীয়ও। কারণ বিশাল পৃথিবীতে শিশুকে অচিরেই চারিপাশের বাস্তবতা থেকে নিজেকে আলাদা করে নিতে হবে, নিজস্ব ব্যক্তিগত 'অহং' গড়তে হবে।

খোদ নিজের প্রতি মনোযোগ ব্যতিরেকে, আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনা ব্যতিরেকে মানুষের ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হতে শুরু করবে না।

এমন মা-বাবা নেই যাঁরা ইচ্ছা করে তাঁদের সন্তানকে নির্দয়, অভদ্র ও বদমেজাজী করে তুলেন। না, তাঁরা অন্তর দিয়ে চান যে সে যেন স্নেহপরায়ণ, সংবেদনশীল ও উদার হয়, এবং অবসর পেলে শক্তি ও সাধ্য মতো তাঁরা তার মধ্যে সদ্‌গুণে গড়ার কাজে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কোন কোন মা-বাবা শত চেষ্টা করেও এ ব্যাপারে কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেন না। আর কোন কোন মা-বাবার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রচেষ্টা ছাড়াই সমস্তকিছু ভালো এগুয়। তার মানে, শেষোক্তদের পরিবারে ভিন্ন, অর্থাৎ অধিকতর সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ। কিন্তু এ ছাড়া শিক্ষাদীক্ষার সাফল্যের মানে হচ্ছে এই যে শিশু তার জন্মের পর থেকেই পরিবারের আবেগগত গঠনে সঠিক স্থান অধিকার করে নিয়েছে এবং মা-বাবা ও অন্যান্য আপন জন তার সঙ্গে মেলামেশার সঠিক উপায় খুঁজে পেয়েছেন।

পরিবারে শিশু যদি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে বেশি মনোযোগের পাত্র হয়ে উঠে, তাকে ঘিরে যদি সমস্ত ঘটনা ঘটতে থাকে এবং সে কীলক ও ভিত্তি হয়ে উঠে তাহলে ব্যাপার-স্যাপার খারাপ বুঝতে হবে। সবই শুরু হয় সাধারণভাবে। যেমন, পরিবারে প্রশ্নোত্তরের খেলা চালু করা হয়। 'কাকে ভানিয়া সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে? মাকে? আর তারপর? বাবাকে?

ঠিক বলেছ, লক্ষ্মীটি। আর বাবার পরে? আচ্ছা, দিদিমাকে! আর দিদিমার পরে ভেরা মাসিকে? আর আমরা সবাই দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি ভানিয়াকে!' নয়-দশ বছর কেটে যাওয়ার পর দেখা যায় যে ভানিয়াও সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে ভানিয়াকেই।

— চারিপাশের লোকজনের প্রতি আগ্রহ, সংবেদনশীলতা, উদারতা। শিশু সর্বদা এই সমস্ত গুণের অধিকারী। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে কেন এই গুণগুলো হারিয়ে ফেলে?

— যেকোন ভালো গুণ বদ্ধমূল করে তুলতে হয়।

— এখানে আসল হচ্ছে — বড়দের উদাহরণ?

— কেবল তা-ই নয়। আন্তন মাকারেঙ্কোর ভাষায়, নৈতিক আচরণে শিশুর নিজস্ব অনুশীলনও প্রয়োজন।

ছোট্ট মানুষটিকে ভালোবাসা উচিত। তদুপরি তাকে শ্রদ্ধা করাও উচিত। সবচেয়ে বেশি স্নেহশীল মা-বাবারা প্রায়ই তা জানেন না এবং শিশুর প্রতি অত্যধিক পরিমাণ মমতা দেখাতে গিয়ে তাঁরা অনেক সময় তার মর্যাদার অবমাননা করেন, তাকে খেলনা হিশেবে দেখেন। বড়দের কোন মতেই শিশুকে উপেক্ষা ও নির্যাতন করা উচিত নয়। নির্যাতন বলতে আমরা বোঝাতে চাইছি: শিশুকে সব সময় তার অধীন অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া, তার উপর নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার, খুব বেশি শাস্তি দান ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য, শিশুকে গুরুজনদের কথা শোনা উচিত, তবে তাদের দাস হলে চলবে না, তাকে পারিবারিক নিয়মশৃঙ্খলা মানতে হবে যা (এবং এটা তাকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার) পরিবারের সমস্ত সদস্যের উপর কিছু-না-কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত করে। শিশুর থাকা চাই নিজস্ব শিশু জীবন যাপনের অধিকার; তবে তার মানে এ নয় যে সে মা-বাবাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবন থেকে বঞ্চিত করবে এবং তাঁদের অস্তিত্বের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত হবে।

সন্তান পালতে ও মানুষ করতে গিয়ে অনেক সময় অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এমন কিছু ত্যাগ আছে, যা সত্যিই তার জন্য প্রয়োজনীয়, তবে এরূপ ত্যাগও আছে যা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ও এমনকি ক্ষতিকর। 'গৃহ প্রশিক্ষণের' একটি গলদ হচ্ছে এই যে মা-বাবা বেশির ভাগ সময় ঠিক অপ্রয়োজনীয় ত্যাগই স্বীকার করেন। কেবল শিশুর জন্য অতিরিক্ত সুস্বাদু খাদ্য, বেশি দামের আরও একটা খেলনা যা থেকে

অচিরেই তার রুচি উঠে যাবে, নিজের ক্ষতি ক'রে, পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু একটা না কিনে আরও একটা নতুন জামা — শিশু এ সমস্তকিছু ছাড়া ভালোই চলতে পারবে এবং তাতে সে মনের দিক থেকে স্বাস্থ্যবানও হবে।

কী কী ত্যাগ হিতকর? যেমন, এরূপ ত্যাগ। নিজের চরিত্রের সমস্ত দোষত্রুটি দূর করুন যাতে ছেলেমেয়েরা খারাপ উদাহরণ না পায়। ক্ষতিকর অভ্যাসাদি বর্জন করুন। টেলিফোনে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় এবং তাস বা ডোমিনো খেলায় সময় নষ্ট না ক'রে শিশুর সঙ্গে কোন চিত্তাকর্ষক ও হিতকর কাজে মন দিন, তাকে বই পড়ে শোনান, তাকে কোনকিছু শিখিয়ে দিন...

আপনি সম্ভবত নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানেন যে কিছু লোকের সঙ্গে মেলামেশা করার পর মনের মধ্যে কী অদ্ভুত ও অপ্রীতিকর এক ছাপ থেকে যায়। চারিপাশের লোকজনের সঙ্গে ব্যবহারে তারা তাদের স্বভাবসিদ্ধ 'অমনোযোগিতার' পরিচয় দেয়: কোন অনুরোধ করলে খুব সহজেই তা ভুলে যায়, নিজের উদ্যোগে সচরাচর কারো পক্ষ সমর্থন করে না, কোনকিছু করতে গিয়ে অন্যদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে না (এবং তা সর্বদা যে নিছক নির্দয়তার জন্যই ঘটে থাকে তা নয়, সময় মাথায়ই আসে না)।

এই মানসিক অন্ধতার উৎস কোথায়? শিশুর মধ্যে সংবেদনশীলতা আর সহৃদয়তা বিকাশের ব্যাপারে যত্নশীল না হলে একেবারে ছোটবেলায়ই এই অন্ধতা দেখা দেয়। অথচ সংবেদনশীলতা ও সহৃদয়তা শুরু হয় অতি সাধারণ, তবে শুভ পর্যবেক্ষণশীলতা থেকে, আপন জন ও অপরের চাহিদা বোঝার এবং তাদের প্রয়োজন অনুমান করার ক্ষমতা থেকে। এরূপ পর্যবেক্ষণশীলতা শেখাতে হয়, বিকশিত করতে হয়। এমনকি প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরা অনেক সময় বিষয়মুখ হতে পারে না, তারা অন্যের অবস্থা বুঝতে এবং নিরাবেগে নিজের ও ঘটনাবলির মূল্যায়ন করতে অক্ষম। শিশুর পক্ষে তা আরও বেশি কঠিন, তা শেখাতে হয়।

বলাই বাহুল্য, চারিপাশের লোকজনের প্রতি পর্যবেক্ষণশীলতা আর মনোযোগ কোনরূপ ফাঁকা, নিষ্ক্রিয় কৌতূহল হলে চলবে না। তা শেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে — সংবেদনশীলতা, সহৃদয়তা আর উদারতা গড়ে তোলা। শিশু হামেশা পরিবারে নিজের প্রতি যত্ন এবং আপন জনদের পরস্পরের প্রতি যত্ন লক্ষ্য করে। উদাহরণের শক্তি বিপুল ও সংক্রামক। কিন্তু তা সত্ত্বেও

এক উদাহরণই যথেষ্ট নয়। দেখতে হবে, শিশু যেন নিজেও অন্যদের জন্য কোনকিছু করে।

শিশুকে আপনার প্রতি, বন্ধুবান্ধবদের প্রতি, জীবজন্তুর প্রতি উদার হওয়ার সুযোগ দিন। তাকে কোনকিছু দান করার স্বাধীনতা দিন। তাতে সে জড়ভরত আর হাবারাম হয়ে উঠবে — এরূপ ভয়ের কোন কারণ নেই।

জ্যেষ্ঠ সন্তানের মধ্যে শুভ অনুভূতি জাগরণের পক্ষে বিপুল সম্ভাবনা দেখা দেয় পরিবারে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্ম হলে। তবে একই সঙ্গে তাতে আগের 'আবেগগত ছাঁচ' ভেঙে যায় এবং সেই হেতু যে-সমস্ত সংকট দেখা দেয় তা ভালোভাবে বিচারবিবেচনা ক'রে দেখা প্রয়োজন হয়। সম্প্রতি যে ছিল সবার ভালোবাসার পাত্র সেই ভানিয়াকে এবার শুনতে হচ্ছে: 'জ্বালাতন করিস না... সর এখান থেকে... এখন আমাদের কাছে আসল হচ্ছে — তানিয়া।'

অবশ্যই এ কোন সাধারণ ব্যাপার নয়, আমরা তা বুঝি। দ্বিতীয় সন্তানকে নিয়ে মায়ের অনেক কাজ, অনেক ঝামেলা। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ একজনের জ্যেষ্ঠ সন্তানের দিকে খেয়াল রাখা দরকার। বাবাই এ কাজ করতে পারেন। অন্যথায় — এবং তা কোন বিরল ব্যাপার নয় — জ্যেষ্ঠ সন্তানের মধ্যে নবজাতকের প্রতি (যে তাকে সবার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে) তীব্র ঈর্ষা, এমনকি বৈরভাবও দেখা দিতে পারে। আগে থেকে, ধীরে ধীরে শিশুর খেলা এমনভাবে পুনর্গঠন করা উচিত যাতে সে নিজেকে পূর্বাপেক্ষা অধিক স্বনির্ভর অনুভব করে, যাতে সেই খেলায় মায়ের চেয়ে বাপের অংশগ্রহণই বেশি কাম্য হয়। তাছাড়া নবজাতকের সেবাযত্নের কিছুটা দায়িত্ব সঙ্গে সঙ্গেই জ্যেষ্ঠ জনের উপর ন্যস্ত করা উচিত। সে এখানে হোক সবার বিস্মৃত নির্বাক দর্শক নয়, পারিবারিক শ্রমে সমানাধিকারসম্পন্ন সহকারী। তবে তাকে কঠিন ও অপ্রীতিকর কোন কাজ দেওয়া ঠিক হবে না। ছোট বোনকে নিয়ে ঝামেলা তাকে যেমন ব্যস্ত রাখবে, তেমনি আনন্দও দেবে।

এ ধরনের খেসারতমূলক ব্যবস্থার সাহায্যে আপনি আবেগগত পরিবর্তনের পরিণাম এড়াতে পারবেন। জ্যেষ্ঠ সন্তান কনিষ্ঠের জন্য সহজেই হয়ে উঠবে বন্ধু, রক্ষক আর পৃষ্ঠপোষক। আর সে নিজের জন্য লাভ করবে উদারতার সুন্দর শিক্ষা, অসহায় ও দুর্বলের প্রতি দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা।

উদারতা আর সংবেদনশীলতা সম্পর্কে শিক্ষা লাভের সময়, ভালো ও মন্দ সম্পর্কে ধারণা গড়ার সময় শিশুর মধ্যে বিবেকও গড়ে উঠে।

অসঙ্গত আচরণের জন্য লজ্জাবোধ হচ্ছে সর্বোচ্চ মাত্রায় হিতকর এক ব্যাপার। তা জেনেই অনেক মা-বাবা সুযোগ পেলেই দীর্ঘ নিন্দা আর ব্যাখ্যার (কেন ও কীসের জন্য লজ্জা হওয়া উচিত) মাধ্যমে শিশুর লজ্জাবোধ বৃদ্ধি ও সুদৃঢ় করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বিবেক, লজ্জা — সে হচ্ছে গুপ্ত অনুভূতি, তা কেউ সবার সামনে প্রদর্শন করতে চায় না, বরং লুকিয়ে রাখারই চেষ্টা করে। এই অন্তরতম বস্তুকে স্পর্শ করা উচিত কুশলতার ও সতর্কতার সঙ্গে এবং স্পর্শন হওয়া উচিত সংক্ষিপ্ত। আপনারা দীর্ঘ সময় ধরে যদি শিশুকে লজ্জা দেন ও বোঝাতে থাকেন তাহলে তার বিবেক জোরে সাড়া দেওয়ার পরিবর্তে প্রায়ই একেবারে নীরব হয়ে যায় এবং সে তখন বিরক্তি প্রদর্শন করে।

চারিপাশের লোকজনের প্রতি সরল ও শুভেচ্ছা প্রণোদিত বিশ্বাস পোষণ করে না এরূপ শিশু খুব কমই আছে। কিন্তু তার মধ্যে সর্বদাই সহজাত সতর্কতা বিরাজ করে। অপরিচিত লোক দেখে সে ভয় পেতে পারে। এই অনুভূতিটিকে প্রশ্রয় দেবেন না। শিশুকে বোঝাবেন যে মানুষ মাত্রেই ভালো, সে তার কোনকিছু করবে না, আর খারাপ লোক হচ্ছে বিরল ব্যতিক্রম। যেমন, আপনাদের সন্তান নতুন কোন লোকের দিকে হাত বাড়াল — তাকে বাধা দেবেন না, তাকে বলবেন না: 'কিরে, কী করছিস! ইনি বাবা নন, অন্য লোক!' অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখে সে যদি আপনার কোলে উঠে তার মুখটি আপনার কাঁধে লুকিয়ে ফেলে তাহলে আনন্দিত হওয়ার ও তাকে প্রশংসা করার কোন কারণ নেই। শিশুকে বোঝাবেন যে ভয়ের কিছু নেই, অন্যথায় তার মনে ভীরুতা আর অবিশ্বাস দেখা দেবে।

অনেক মা-বাবা প্রায়ই তাঁদের ছেলেমেয়েদের চাপা হতে ('নিজেদের ব্যাপার বাইরের লোককে বলিস না'), সমবয়সীদের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে মুনাফা উঠাতে ('পুতুলের বদলে বল দিলি কেন? পুতুলটির দাম তো বেশি!') শেখান। জীবনের প্রথম পর্যায়ে শিশুদের মধ্যে সর্বতোপায়ে সরলতা, সমাজপ্রিয়তা আর উদারতা গড়ে তোলার চেষ্টা করা উচিত। পরে, যখন বোঝার বয়স হবে, তখন তারা গুরুজনদের সাহায্যে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করবে, কতটা সরল ও উদার হওয়া উচিত। তাই প্রথমে শেখান নিয়ম, আর তারপর ব্যতিক্রম...

কিশোর যাতে সঙ্গ দোষে খারাপ না হয়, সে যাতে অকাজে সময় নষ্ট

না করে তার জন্য কী করা প্রয়োজন? সর্বাগ্রে জানা উচিত বিভিন্ন দলে ও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে তার আচরণ কীরূপ। দলের মধ্যে সে কী ভূমিকা পালন করে: কোথায় উদ্যোগী, আর কোথায় নির্বাহক? আপনারা যাকিছু জেনেছেন তা তুলনা করতে এবং প্রধান প্রশ্নটির উত্তর পেতে চেষ্টা করবেন: আপনাদের সন্তানের নিজস্ব দৃঢ় 'অহং' আছে কি না? সে কি সর্বদা সমবয়সীদের সঙ্গে স্রেফ অভ্যস্ত হয়ে উঠার চেষ্টা করছে না? কত সহজে সে নিজের আগ্রহ ও রুচি বর্জন ক'রে পরের আগ্রহ ও রুচি (যা তার প্রবণতার বিরোধী) গ্রহণ করে?

আমরা সময় সময় মৌলিক ও স্বকীয় ব্যক্তিত্ব গঠনের তাৎপর্য খাটো ক'রে দেখি। অল্প বয়সেই আমরা শিশুকে আমাদের কল্পিত আদর্শ অনুসরণ করতে তাড়া দিই, তাকে 'সবার মতো' হতে বাধ্য করি ('কেউ তা করে না!' 'চেয়ে দ্যাখ্, আর কেউ এ রকম ব্যবহার করছে?')। তাকে বাধ্য করতে গিয়ে আমরা কেবল নিজেদের সুবিধার জন্য জনমতের কথা উল্লেখ করি: লোকে কী বলবে, তারা এটা ভালো চোখে দেখবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। পরবর্তী কালে আমরা শিশুকে স্বাধীন চিন্তা ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করি ('ইশ, কী ভেবেছে দ্যাখো!', 'তুই কি মনে করিস যে অন্যরা তোর চেয়ে বোকা?', 'তোর এখনও অতশত ভাবার সময় হয় কি'...)। শিশু অন্যের মতামত উপেক্ষা করবে, অথবা সঙ্গে সঙ্গেই কোনকিছু না ভেবে অন্যের মতামত মেনে নেবে — এমনটাও বাঞ্ছিত নয়। শিশু ও কিশোর জীবনের পরিধিতে জনমত হতে পারে বিভিন্ন রকমের।

দৃঢ় ব্যক্তিত্ব গঠনের অন্য একটি শর্ত —গভীর ও স্থায়ী আগ্রহ বিকাশ। সমান আগ্রহ বা আসক্তির ভিত্তিতে বহু ক্ষেত্রে সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে দৃঢ় ও হিতকর বন্ধুত্ব গড়ে উঠে, পরস্পরকে প্রকৃতভাবে সমৃদ্ধ করতে পারে এরূপ মেলামেশার বুনিয়াদ সৃষ্টি হয়। সেই জন্যই শিশুর দক্ষতা ও প্রবণতা বিকাশের জন্য যথাসম্ভব বেশি বাস্তব সুযোগ দানে কুণ্ঠিত হবেন না। তাকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বইপত্র ও মাছ ধরার সাজসরঞ্জাম কিনে দিন। আপনাদের ছেলে বা মেয়ের বন্ধুরা যদি আপনাদের বাড়িতে আসে তাহলে আপত্তি করবেন না।

প্রত্যেক মানুষই অন্যের জন্য কৌতূহলজনক। তবে কারো কাছে সে কৌতূহলজনক নির্দিষ্ট একটি সময় অবধি — যতক্ষণ পর্যন্ত সে নতুন, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রভাব তাজা। অন্যরা দেখে, তার

অন্তর্জগৎ কীরূপ। প্রথমোক্তদের তাড়াতাড়ি লোক অপছন্দ হতে শুরু করে, এবং তারা ক্বচিৎ কারো সঙ্গে দীর্ঘকাল সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে।

শেষোক্তরা — ঠিক তার উল্টো, তারা পুরনো পরিচয়ের মূল্য বোঝে। তারা বন্ধুত্বে অধিকতর স্থায়ী, এবং তাদের এ স্থায়িত্বের ভিত্তি হচ্ছে — মানুষের মধ্যে ক্রমশই নতুন নতুন আত্মিক গুণ আবিষ্কারের ক্ষমতা। তারা পরস্পরকে উত্ত্যক্ত করে তুলে না, তাদের অনুরাগ দৃঢ়, অনুভূতি নির্ভরযোগ্য। এটা বলার কোন প্রয়োজন নেই যে মানুষের অতুলনীয়তা বা অদ্বিতীয়তার সামনে আগ্রহ ও বিস্ময়, তাকে শেষ অবধি জানার অদম্য বাসনা, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির প্রয়াস অনুভূতিকে দ্রুত অসাড় হতে দেয় না এবং ঠিক এই গুণগুলোই ভবিষ্যৎ পরিবারে পারস্পরিক সমঝোতা ও দৃঢ় সম্পর্ক গড়ার কাজ সহজ করে তুলে।

সবশেষে যে-বিষয়ে বলতে চাই তা হল — 'চাইতে' পারার বিষয়।

— ছেলেমেয়েদের ইচ্ছার অন্ত নেই। চারিদিকে কত প্রলোভন, এবং তারা সবকিছুই চায়!

— যদি একসঙ্গে সবকিছুই পেতে চায় তার মানে বিশেষভাবে কিছুই চায় না। শিশু ও কিশোর চাইতে জানে না, চাইতে পারে না।

— চাইতে জানে সবাই! কিন্তু ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে প্রত্যেকে যা চায় তা পায় না।

— খুব কম লোকই প্রকৃতভাবে চাইতে জানে! খুব কম লোকই অভীষ্ট লাভের পর পুরোপুরিভাবে ও দীর্ঘকাল ধরে তা উপভোগ করতে পারে!

তা মানব জীবনকে খুবই অসার করে তুলে।

শিশুকে অন্তত স্কুলের বয়স থেকে বর্তমান সমস্ত সম্ভাবনার ভেতর থেকে সবচেয়ে মূল্যবান এবং তার দক্ষতা আর প্রবণতার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী সম্ভাবনাটিই বাছতে শেখানো উচিত। নির্ধারিত লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সমস্তকিছু সে যেন বর্জন করে। তার মধ্যে অটলতা, একাগ্রতা ও বদ্ধপরিকরতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। তার মধ্যে নিজেতে এবং অভীষ্টলাভের সম্ভাবনায় যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস প্রতিপাদন করতে হবে, তাকে বোঝাতে হবে যে মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নির্মাতা, আর অকৃতকার্যতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার নিজস্ব দুর্বলতা, আলস্য ও অস্থিরতার ফল।

আমরা বুঝি যে এ সমস্তকিছু শেখানো খুবই কঠিন কাজ। সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পরামর্শ দেওয়াও সম্ভব নয়। তবে একটা কথা মনে রাখবেন: এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করবে আপনার নিজস্ব জীবন, আপনার

ব্যক্তিগত উদাহরণ, কথা ও কাজের মধ্যে সঙ্গতি। পরিবারে যদি মনোবল বিরাজ করে, যদি ভবিষ্যতে আস্থা থাকে, যদি মা-বাবারা বাধাবিপত্তি দেখে ভয় না পান এবং বিজয়ের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করতে জানেন তাহলে তাঁদের ছেলেমেয়েরাও তদ্দারা সংক্রামিত হবে, সহজে 'চাইতে জানার' ব্যাপারটি আয়ত্ত করবে। তাছাড়া, শিশুর ক্রিয়াকলাপের প্রতি, তার গুণাবলির প্রতি মনোযোগ প্রদানও অত্যাবশ্যক।

জীবনে শিশুকে স্বস্থানে পেতে হলে তাকে বিভিন্ন কাজের আস্বাদ লাভ করতে হবে। তা উপকারী, তা দৃষ্টিভঙ্গির পরিধি বিস্তৃত করে, কল্পনা ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটায়। শিশুর ক্রিয়াকলাপের প্রতি, তার বন্ধুত্বের প্রতি মনোযোগ আর শ্রদ্ধা থাকা চাই, প্রয়োজন বোধে — পিতামাতার ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ ও সতর্কতাপূর্ণ সহায়তাও বাঞ্ছনীয়।

লালনপালনের কলাকৌশল

প্রতিদিনের শিক্ষা

সমগ্র লালনপালন প্রক্রিয়াটি নির্ধারিত হয় সন্তান জন্মের আগেই পরিবারে প্রতিষ্ঠিত জীবনযাত্রার দ্বারা। মা-বাবারা পরিবারে মেলামেশার যে-রীতি গ্রহণ করেন তা তাঁদের কাছে আসে পূর্বপুরুষের কাছ থেকে এবং নিজেদের শৈশব থেকে। নিজেদের আচরণে তাঁরা প্রায় সর্বদাই সেই প্রশিক্ষণ অভিজ্ঞতা অনুসরণ করেন যা তাঁরা পেয়েছেন অনিচ্ছাকৃতভাবে নিজের মা-বাবা আর দাদা-দিদিমাকে অনুকরণ ক'রে।

দু'টি মত রয়েছে। 'প্রশিক্ষণের ব্যাপারে প্রস্তুত কোন পরামর্শ নেই এবং থাকতেও পারে না। প্রশিক্ষণ বিদ্যা — এ হচ্ছে সৃজনশীল ও দ্বান্দ্বিক বিজ্ঞান। সমস্তকিছু নির্ভর করে অবস্থার উপর, নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর'; 'প্রশিক্ষণ বিদ্যা — এ হচ্ছে ব্যবহারিক বিজ্ঞান এবং তা গঠিত হয় নিয়ম, উপদেশ আর সুপারিশ নিয়ে'। সম্ভবত আপোসমূলক সমাধানও থাকতে পারে। নিয়মের প্রশিক্ষণ বিজ্ঞান রচনা করার মানে এ নয় যে পাঠককে 'বই পড়ে' সন্তান মানুষ করতে হবে, — এখানে তাঁর উপর কোনকিছু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না।

এরূপ আপাত-বিপরীত মতও শোনা যায়: লালনপালনের কাজ শিখতে হলে প্রশিক্ষণ বিজ্ঞানের কথা ভুলে যাওয়া উচিত। এ কথায় আছে প্রশিক্ষণমূলক বাঁধাবুলির বিরুদ্ধে, প্রশিক্ষণমূলক হিতোপদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এরূপ প্রতিবাদ মেনে নেওয়া যায়। তবে একটি শর্তে: কেবল শিক্ষাদীক্ষার নিয়মাবলি সম্পর্কে লব্ধ জ্ঞানই শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন করতে সাহায্য করতে পারে। কোন অভিজ্ঞতাই, কোন প্রাজ্ঞতাই এই জ্ঞানের অভাব

পূরণ করতে সক্ষম নয়। অভিজ্ঞতা, জ্ঞান আর মানব প্রাজ্ঞতার মিশ্রণ — এই-ই হচ্ছে সেই প্রশিক্ষণ বিজ্ঞান, যা প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয়।

— লালনপালনের পদ্ধতি জানা, শিশুকে অনুভব করতে ও বুঝতে পারা — শিক্ষাকার্যে সাফল্যের জন্য আর কী চাই?

— সম্ভবত, শিশুদের সঙ্গে মেলামেশার প্রতি মিনিটে, প্রতি ঘণ্টায়, প্রতিটি দিনে নিজের অনুভূতিগুলোও নিয়ন্ত্রণ করতে পারা চাই। অন্য কথায়, যেকোন কাজের মতোই লালনপালনের ব্যাপারেও দৈনন্দিন মেলামেশার প্রকৌশল অপরিহার্য।

সকাল

দিন শুরু হচ্ছে। আপনার হাতে অনেক কাজ। সময় নির্দয়ভাবে ক্রিয়াকলাপের গতি নির্ধারণ করে। প্রাতরাশ তৈরি করতে হবে, ঘরদোর গুছাতে হবে, দু'একটা কথা বলতে হবে, কাউকে কোনকিছু স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, সময় মতো কাজে পেঁৗছতে হবে — এক কথায়, হাজার খুঁটিনাটি ব্যাপার, হাজার সংঘর্ষ, হাজার প্রত্যাশা। তার উপর এত সব কাজকর্ম আর নির্ভরতার মধ্যে রয়েছে — আপনার সন্তান। তাকে ঘুম থেকে উঠাতে হবে, খাওয়াতে হবে, পরাতে হবে, স্কুলে পাঠাতে হবে। আপনি কত কাজ করছেন বুঝতেই পারছেন না: অনেক আগেই এ সমস্তকিছুতে আপনার অভ্যাস হয়ে গেছে এবং আপনি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। তা কী ধরনের অভ্যাস? প্রাতরাশ তৈরির কাজে আপনার সন্তান অংশগ্রহণ করেছে কি? টেবিলটি থেকে কাপ-প্লেট সরাতে সাহায্য করেছে কি? স্কুলে যাওয়ার আগে তার মনের অবস্থা কীরূপ? আপনার শেষ মন্তব্যে কীরূপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে? আপনি কীরূপ মানসিক অবস্থা নিয়ে কাজে যাচ্ছেন?

সকাল হয় আপনার মন আনন্দে ভরপুর করে তুলে, নয় অনাদর আর বেদনায় ব্যতিব্যস্ত করে রাখে।

পরিবার হয় তিন ধরনের: অতি আদর্শ পরিবার — প্রত্যুষ নিয়ে আসে সুখ, আশার আনন্দ; মাঝারি ধরনের পরিবার — প্রত্যুষ মোটের উপর ব্যথিত করে না, সবকিছুই চলে আপন গতিতে, এবং প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে; ঝগড়াটে-খিটখিটে পরিবার — সকাল থেকেই সম্পর্ক বিষাক্ত, প্রত্যক্ষ অথবা লুক্কায়িত বিদ্বেষে পরিপূর্ণ।

আসুন সম্পর্কের তিনটি মডেলই একটু ভালো ক'রে দেখা যাক, — তাতে দৈনন্দিন মেলামেশার প্রকৌশলের ভালো-খারাপ সব দিকই বুঝতে সহজ হবে।

আদর্শ পরিবার। আপনার ছেলে আপনায় সামান্য স্পর্শ করতেই আপনার ঘুম ভেঙে গেল। সে বলছে: 'মা, উঠো। আমি চায়ের জল বসিয়ে দিয়েছি। টেবিলে খাবার তৈরি। রাত্রে যেমনটি বলেছিলাম, আজ সকাল সকাল উঠে গেছি — পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম...' প্রাতরাশ খেতে খেতে বাবা তাঁর কর্মদিনের বিষয়ে বললেন... দিদিমাকে: 'আজ পথ বরফে পিছলা — তুমি দোকানে যেও না। কী কিনতে হবে লিখে দাও...' মাকে: 'তুমি এবার যাও, নতুবা দেরি হয়ে যাবে, আমি নিজেই কাপ-প্লেট ধুয়ে রাখব...'

মাঝারি ধরনের পরিবার। প্রথমে উঠলেন দিদিমা। প্রাতরাশ প্রস্তুত। উঠলেন মা, ছেলে ও স্বামীর পেণ্টগুলো ইস্ত্রি করতে লাগলেন। বাবাকে জাগালেন। বাবা মুখ-হাত ধুয়ে একা খেলেন এবং চুপচাপ চলে গেলেন। মা ছেলেকে তুলে দিতে গেলেন: 'এই উঠ্।' ছেলে: 'আরও একটু।' দিদিমার সঙ্গে মা'র সামান্য কথা কাটাকাটি হয়, একটু ঝগড়া হয়। দিদিমা নাতিকে বলেন: 'উঠে পড়...' নাতি উঠল। হাতমুখ ধুল। চুপচাপ খেয়ে চলে গেল।

নেতিবাচক মডেল — ঝগড়াটে পরিবার। বিরাগ, বিদ্বেষ, ভুল বোঝাবুঝি। সবার ঘুম থেকে উঠতেই আধঘণ্টা লাগে। দিদিমা নাতিকে জাগাতে পারেন না। মা রেগে উঠেন: 'এ কী হচ্ছে? আর কতদিন এভাবে চলবে!' ছেলে বলে: 'আমার পেট ব্যথা করছে।' মা চেঁচিয়ে উঠেন: 'মিছে কথা বলছিস!' ছেলে উঠতে উঠতে জবাব দেয়: 'মিছে কথা বলছ তুমি, আমি নই।' সে বাথরুমে যায়। 'কি রে, ওখানে কতক্ষণ বসে থাকবি?' — চেঁচান মা ও দিদিমা। 'পেট ব্যথা করছে,' — আওয়াজ আসে ভেতর থেকে। হুমকি, গালাগালি।

'আমি খাব না!' — ঝগড়া। 'আমি ফার্স্ট পিরিওডে ক্লাসে যাব না!' — ঝগড়া। 'আমি এই শার্ট পরব না!' — ঝগড়া। তিনটে ঝগড়া। এবং দিদিমার কান্না: 'হায় ভগবান, কী আপদ...' আর 'আপদ' আরও একবার — চতুর্থ বার — ঝগড়া বাধাতে প্রস্তুত। সে মায়ের মুখের উপর মাফলারটি ছুঁড়ে ফেলল। দরজাটি এমনভাবে ধড়াম ক'রে বন্ধ করল যে দেয়াল কাঁপতে লাগল। সিঁড়ি দিয়ে শব্দ করতে করতে চলে গেল...

আপনার পরিবারে সম্পর্ক যদি প্রথম মডেলের মতো আদর্শ হয়ে থাকে,

তাহলে এ অধ্যায় আপনায় কিছুই দেবে না। আপনাদের সম্পর্ক যদি দ্বিতীয় মডেলের মতো হয়ে থাকে তাহলে বলব: 'পড়তে থাকুন।' নিজের জন্য হয়তো কোনকিছু পেতে পারেন। আর আপনার পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক যদি দ্বিতীয় ও তৃতীয় মডেলের মাঝামাঝি কোথাও হয়, তাহলে আসুন, একসঙ্গে ভেবে দেখি আপনাদের ভুলভ্রান্তির উৎসগুলো কোথায়।

তাহলে আমাদের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে — পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'ঝগড়াটে মডেল' থেকে আদর্শ মডেলের দিকে এগুনো। আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প রূপসমূহের ভেতর থেকে আপনি সেগুলো বেছে নিতে পারেন যেগুলো আপনার সন্তানের পক্ষে, তার বয়স ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের পক্ষে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। লালনপালন আর শিক্ষাদীক্ষা সর্বদাই পদ্ধতি, ধারা ও উপায় নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত।

পৃথিবীতে এমন কোন শিশু নেই যে যদি আগে থেকে জানে যে সকালে তার জন্য প্রীতিকর ও বাঞ্ছিত কোনকিছু অপেক্ষা করছে আনন্দের সঙ্গে ঘুম থেকে উঠবে না। শিশুরা সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন তাদের মনের মতো কোন কাজ পায় তখন তারা কত খুশি হয়। তাদের ইতিবাচক আবেগের উচ্ছ্বাস দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। আনন্দের প্রশিক্ষণমূলক তাৎপর্যটিই হচ্ছে এই যে তা মানুষকে শুভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় প্রণোদিত করে, সক্রিয় শ্রমের জন্য অনুপ্রাণিত করে, আপন শক্তিতে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলে।

পৃথিবীতে এমন শিশু নেই যার আনন্দদায়ক কোন প্রিয় কাজ থাকতে পারে না। আপনাদের সন্তানের সুখই নিহিত রয়েছে তার কৃত কাজের জন্য তৃপ্তি ও আনন্দ লাভের এই চমৎকার গুণটিতে। এই মহত্তম দক্ষতাটি ব্যবহার করুন! শিশুকে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রস্তুত করুন যাতে সে বুঝতে পারে যে আসন্ন দিনটি তার জন্য আনন্দময় হবে। তাহলে সে নিজেই ঘুম থেকে উঠবে। হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসবে, — কোনকিছু বলতে হবে না। সম্ভবত নিজে কাপ-প্লেটও ধুয়ে রাখবে।

কাজ হতে হবে সম্পাদনযোগ্য, — যা শিশুর পক্ষে করা সম্ভব। আরও একটা কথা মনে রাখবেন: সময় সময় আনন্দের উৎস থাকে কেবল শ্রমেই নয়, শ্রম বা ক্রিয়াকলাপের সময় প্রয়োজনীয় আদান-প্রদান আর মেলামেশায়ও। অনেক সময় তা হয় কোন ধরনের ক্রিয়াকলাপে অকৃতকার্যতার জন্য সান্ত্বনা বা ক্ষতিপূরণ। যেমন ধরুন, ছেলেটি পড়াশোনায় খারাপ এবং কিছুতেই নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না। অথচ শ্রমের ক্ষেত্রে সে দেখাতে

পেরেছে তার কত দক্ষতা আছে। এই জিনিসটি তাকে অপরিসীম আনন্দ দান করে।

অত্যধিক অধ্যবসায়ের সঙ্গে লালনপালন করা একেবারে লালনপালন না করার মতোই বিপজ্জনক। শিশুর উপর জীবনের অত্যন্ত দ্রুত গতি চাপিয়ে দিলে তা তার পক্ষে সর্বনাশা হতে পারে। সুদীর্ঘ বছর ধরে গঠিত অভ্যাসগুলোর শারীরিক ভিত্তিও আছে। এই সমস্ত অভ্যাস নির্মূল করা উচিত ধীরে ধীরে। চারটি প্রাতঃকালীন সংঘর্ষের জায়গায় যদি দু'টি ঘটে তাহলে তা সাফল্য বলেই, নিজের বিরুদ্ধে শিশুর বিজয় বলেই মনে করতে হবে। আপনাদের এমনভাবে নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে এগুতে হবে যাতে শিশুর মধ্যে আনন্দবোধ বজায় থাকে। আপনারা যদি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন এবং শিশুর সঙ্গে ঝগড়া করেন, তাহলে এর দ্বারা সেই ইতিবাচক আবেগগুলোও বিনাশ করবেন যা আপনাদের উপরোক্ত আদর্শ মডেলের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

— জীবনে আপনি কখনও আদর্শ পরিবার দেখেছেন?

— বহু বার। আমি মনে করি আদর্শ আচরণকে 'অনাদর্শ' আচরণ থেকে পৃথক করা উচিত নয়। আমরা সময় সময় আমাদের ছেলেমেয়েদের আচরণে ইতিবাচক দিকগুলো লক্ষ্য করি না এবং কোন নেতিবাচক দিক নজরে পড়লে খুবই তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখাই।

— তাহলে কি বলতে চান যে নেতিবাচক ব্যাপারাদিতেও নিজস্ব ইতিবাচক দিক রয়েছে?

— শিশুদের মধ্যে, প্রত্যেক শিশুতেই আশা বাস করে, এবং আপনার ছেলে বা মেয়ের মহৎ গুণাবলিতে আপনার যদি বিশ্বাস না থাকে, তাহলে লালনপালনে ও শিক্ষাদীক্ষায় ভালো ফল পাবেন বলে মনে হয় না।

আনন্দ — সে হচ্ছে সামাজিক ধর্ম। শিশু অবশ্য নিরালায়ও আনন্দ উপভোগ করতে পারে। কিন্তু সে সাধারণত নিজের আনন্দ অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করার চাহিদা অনুভব করে। শিশুর সাফল্য অথবা আনন্দ নজরে পড়া উচিত। তা গুরুত্বপূর্ণ। তা মুক্ত ও দৃঢ় প্রত্যয়যুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলে, পরিবারে প্রয়োজনীয় সদ্ভাব সৃষ্টি করে।

আপনাদের লক্ষ্য — লেখাপড়ার ক্ষেত্রে ছেলের উন্নতি দেখতে চান এবং সে জন্য পড়া তৈরি করতে তাকে আপনারা অনেক সাহায্য করেছেন। এবার আপনারা অবশ্যই তার শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলুন: তিনি যেন ক্লাসে আপনাদের ছেলেকে পড়া জিজ্ঞাসা করেন এবং তাকে অনেকটা এ ধরনের

কথা বলেন: 'দেখা যাচ্ছে, ইচ্ছে করলে তুমি ভালো উত্তরই দিতে পার...' এরূপ পরিস্থিতিতে সমবয়সীরাও খুব সদয় ও উদার হয়। আপনাদের সন্তান তাদের দৃষ্টিতে ও তাদের মন্তব্যে এই উদারতা অনুভব করবে। তখন তার অন্তর-মন কী বিপুল আনন্দে ভরে উঠবে — এবং সে হবে আপনাদের ও আপনাদের ছেলের উল্লেখযোগ্য এক সাফল্য। অবশ্য এটাও ঠিক যে সময় সময় শিক্ষককে তার অমনোযোগী ছাত্রের প্রশংসা করতে রাজী করানো সহজ নয়, — কারণ ওর সম্পর্কে খারাপ ধারণা সবার মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। তবুও চেষ্টা করবেন। কিন্তু শিক্ষককেও ভুল বুঝবেন না।

আপনাদের ছেলের সম্পর্কে শিক্ষকের নেতিবাচক মনোভাব থাকলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেতনায় কোন পরিবর্তন ঘটানো অত সহজ কাজ নয়। সেই জন্যই তাঁর উপর খুব একটা চাপ দেবেন না, তবে নিজের অভিপ্রায় ছেড়ে পিছুও হটবেন না।

যেকোন শিক্ষা পদ্ধতি শিশু যেন আপনাদের ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক গতি হিশেবে গ্রহণ করে। সে যদি টের পায় যে বিশেষ পদ্ধতিতে তার শিক্ষাদীক্ষা চলছে তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই আপত্তি তুলবে। সে নিজে নিজেকে সৃষ্টি করতে ভালোবাসে, সে আপনাদের লক্ষ্য (এবং তা যতই মহৎ ও সুন্দর হোক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না) অর্জনের উপায় হতে অনিচ্ছুক।

শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে তুচ্ছ জিনিস বলে কিছু নেই। বড় কারো কাছে যা তুচ্ছ শিশুর কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান হতে পারে। শিশুর পক্ষে জুতোর ফিতে বাঁধতে শেখা খুবই জটিল এক কাজ। তাকে বার বার তা শেখানো হয়েছে, কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে ফিতেটি কিছুতেই ছিদ্রে ঢোকাতে পারে না। তখন বড়রা রেগে জিজ্ঞেস করে: 'তুই এই তুচ্ছ ব্যাপারটি কেন বুঝিস না?' এটা সবচেয়ে প্রশিক্ষণবিরোধী একটি প্রশ্ন। আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেককিছুই তুচ্ছ ব্যাপারাদি নিয়ে গঠিত। শিশু যদি মোটেই নিজের কোন কাজ করতে পারে না তাহলে তাকে ধীরে ধীরে দৈনন্দিন শ্রমে অভ্যস্ত করানো উচিত। প্রথমে সে ঘরের সমস্ত জিনিসপত্রের উপর থেকে ধুলোবালি না-ই বা মুছল, — আগে এক টেবিলই মুছুক, এবং তা-ই যথেষ্ট হবে। পরে না হয় অন্যান্য জিনিস মুছবে। এরূপ ধীরতা কীসের জন্য? বাধ্যও তো করা যায়!

প্রথমত, যেখানে 'ঝগড়াটে মডেল' রয়েছে সেখানে বাধ্য করা তেমন সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত এরূপ পদ্ধতির ফলপ্রসূতা

সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। জোরজবরদস্তি অবশ্যই শিশুর ব্যক্তিত্ব ধ্বংস ও বিকৃত করে।

সম্পাদিত কাজের জন্য তৃপ্তি ও আনন্দ, চারিপাশের লোকজনের দ্বারা এবং শিশুর নিজের দ্বারা তার কৃত কাজের মূল্যায়ন চাহিদা সৃষ্টির জন্য ভিত্তি গড়ে তুলে। শ্রমে চাহিদা যাতে অদম্য এক শক্তি হয়ে উঠে সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের তৃপ্তিপ্রদ শ্রম-প্রয়াসের পৌনঃপুনিক অবতারণা প্রয়োজন। ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে চাহিদা আপনা-আপনি শিশুর দ্বারা উপলব্ধ হয় না: তা অভ্যাস ও প্রেরণার সঙ্গে যুক্ত। শিশু কোনকিছু করতে চায় — সে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। ক্রিয়াকলাপের চাহিদা সর্বদা মানুষের বিভিন্ন ধরনের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত।

ধরুন, আপনাদের সন্তান পড়াশোনায় খুবই ভালো, কিন্তু বাড়িতে সে কিছুই করে না — এর মানে হচ্ছে এই যে তার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও কর্তব্যবোধ বিকশিত এবং তা একমাত্র তার নিজের জন্যই কাজ করছে।

এক মেয়ে বাড়িতে কারো — মা, বাবা বা দিদিমার — অসুখ করলে ধৈর্যহারা হয়ে পড়ত। ওই দিনগুলোতে সে দেরি করে বাড়ি ফিরত। কাউকে সাহায্য করতে হবে, অর্থাৎ এমনি সময় 'নষ্ট' করতে হবে — এই কথাটি ভাবতেও সে ভয় পেত। মেয়েটি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত এবং দায়িত্ব সহকারে স্কুলের সমস্ত কাজ করত: সবার নেক নজরে থাকতে তার ভালো লাগত।

বাড়িতে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের চাহিদার মূলে রয়েছে আপন জনকে আনন্দ দানের চাহিদা।

শিশুর বোঝা উচিত যে সে ঘরটি সাফ করছে কেবল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই নয়, তাতে মা-দিদিমার পরিশ্রমও কমছে। মানুষের প্রতি ভালোবাসা — একটি উচ্চতম মানবিক গুণ, এবং তা শেখানো — এ হচ্ছে লালনপালন আর শিক্ষাদীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

শিশুরা প্রায়ই মনভোলা হয়। আপনাদের ছেলে যদি ঘরে ঝাড়ু না দেয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই ভেবে নেবেন না যে সে আপনাদের ভালোবাসে না অথবা দিদিমাকে দেখতে পারে না। আর তারও চেয়ে বড় কথা, এ বিষয়ে তাকে কোনকিছু বলবেন না। আপনাদের প্রতি তার ভালোবাসা সম্পর্কে কোন কথা না বলাই ভালো। ভালোবাসা হয় আত্মপ্রকাশ করে, নয় একেবারেই থাকে না। একই বিষয়ে বার বার শিশুকে স্মরণ করিয়ে দিলে তাতে আপনাদের প্রতি তার সম্পর্ক বদলাবে না। শিশু তা শুনে শুনে অভ্যস্ত

হয়ে যায় এবং কথায় গা করে না। স্মরণ করিয়ে দেওয়া সম্ভব — এবং প্রয়োজনও — বিভিন্নভাবে। মাঝেমধ্যে মনে করিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি বদলানো উচিত। এক মেয়ে সব সময় ঘরময় জিনিসপত্র ছড়িয়ে রাখত, আর মা সব সময় তা তুলে জায়গায় জায়গায় রাখতেন। একদিন তিনি ভীষণ বিরক্ত হলেন — মেয়েকে কোনকিছু স্মরণ করিয়ে দিলেন না এবং ছড়ানো জিনিসগুলোও তুললেন না, বরং তিনি নিজেই তাঁর এবং মেয়ের জিনিসপত্র সারা ঘরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন। 'মা, তুমি কী করছ?' — মেয়ের তা পছন্দ হল না। 'তোর দেখাদেখি আমিও জিনিস ফেলছি,' — জবাব দিলেন মা।

চাহিদা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাস গঠনেরও প্রক্রিয়া চলে। স্মরণ করানো ছাড়া এ প্রক্রিয়া প্রায় অসম্ভব। অভ্যাস সর্বদাই হচ্ছে পুনরাবৃত্তির ফল, — এবং প্রায়ই যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির ফল। আর ব্যাপারটি যেহেতু এরূপ, সেই হেতু ক্রিয়াকলাপে শিশুর কাছে পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়তা দাবি করা কি সম্ভব? এরূপ স্বয়ংক্রিয়তা কতটা ভালো সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

বর্ণিত নেতিবাচক মডেলে বিচ্ছিন্নতা এবং একের অন্যতে অপ্রয়োজনীয়তা আমাদের ভীত করে। এরূপ মা-বাবাকে জিজ্ঞেস করুন: তাঁরা কি তাঁদের স্বৈরাচারী সন্তানকে ভালোবাসেন? বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শুনবেন: 'খুবই ভালোবাসি।' এবং তা ঠিকই। কিন্তু কেন এ ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে? অত্যধিক ভালোবাসার দরুন? মা-বাবার কাছে প্রশ্রয় পাওয়ার দরুন? সম্পর্কের চরিত্রের দরুন? সমস্ত চাহিদা পূরণ না হওয়ার দরুন? আর হয়তো বা একসঙ্গে এ সমস্তকিছুর দরুন?

সে যা-ই হোক না কেন, বিচ্ছিন্নতা আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, এবং এবার তার কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক। আমাদের প্রথম উপদেশ — নৈতিক দাবিদাওয়ার ক্ষেত্রে আপোসহীনতা। শিশুর জঘন্য আচরণের জন্য কোন যুক্তি, ভালো কারণ নেই এবং থাকতেও পারে না। আর তা সমর্থন করার তো কোন প্রশ্নই উঠে না। শিশু চরিত্রের নেতিবাচক গুণাবলি প্রায়শই পরিবারে বেঠিক পারস্পরিক সম্পর্কের ফল। শিশুর অবাধ্যতা, প্রতিবাদ এবং মা-বাবার বিরোধিতার পেছনে সর্বদা অধিকতর বড় কারণ থাকে — আত্মিক বিচ্ছিন্নতার কারণ। কেবল ভয় করলেই যে শিশু আপনাদের কথা শুনবে তা ঠিক নয়, আপনাদের প্রতি তার শ্রদ্ধাও থাকতে হবে। শ্রদ্ধাবোধ শাস্তির ভয়ের চেয়ে ঢের বেশি ফলপ্রসূ।

মনে রাখবেন: শিশু সর্বদা আপনাদের সঙ্গে মেলামেশার জন্য তীব্র চাহিদা অনুভব করে। তবে মাঝেমধ্যে তাকে এটাও উপলব্ধি করতে দেওয়া প্রয়োজন যে সে মা-বাবার অনুরাগ হারাতে এবং তাঁদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারে। শিশুকে শ্রমের আনন্দ, তার প্রথম সাফল্যের আনন্দ উপভোগ করতে দিয়ে আপনারা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পথে কয়েকটি পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই করেছেন। কিন্তু মেলামেশার কোন আনন্দই শিশুর আচরণে বদ্ধমূল অনৈতিকতা দূর করতে পারে না।

নৈতিকতা সর্বদা জড়িত রয়েছে নির্বাচনের সঙ্গে, মর্মপীড়ার সঙ্গে এবং, বলতে পারেন, জ্বালা-যন্ত্রণার সঙ্গে। মহৎ অনুভূতি প্রায়ই কষ্টলভ্য। শিশু যাতে বিবেকের দংশন অনুভব করতে পারে সে ব্যাপারে আপনাদের যত্নশীল হওয়া উচিত। এখানে অনেককিছুই নির্ভর করবে আপনাদের স্বজ্ঞার উপর, শিশুর সঙ্গে আপনাদের মেলামেশার কলাকৌশলের উপর। আসুন, কয়েকটি পরিস্থিতি দেখা যাক।

শিথিল সম্পর্কের পরিস্থিতি। যেমন, শিশু কর্তৃক আনন্দের মুহূর্তগুলো উপভোগের পর সঙ্গে সঙ্গেই আপনি নিজের মধ্যে ডুবে যাবেন। মুখ কালো করে বসে থাকুন। কোন অভিনয় করবেন না: সন্তানের সঙ্গে খারাপ সম্পর্ক হেতু আপনি তো সত্যিই ব্যথিত। নিজের হাবভাবে তাকে এরূপ প্রশ্ন করতে বাধ্য করুন: 'কী হয়েছে, মা?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবেন না। কিংবা ফাঁকি-দেওয়া প্রশ্ন ক'রে শিশুর কৌতূহল বৃদ্ধি করার চেষ্টা করবেন: 'তা তুই নিজে জানিস না কী হয়েছে? তোর কী মনে হয়?' শিশু যদি তার প্রশ্নের কথা ভুলে যায় এবং কোনকিছু জানার চেষ্টা না করে তাহলে দুঃখিত হবেন না। সেই মুহূর্তের অপেক্ষা করুন যখন আলাপ শুরু করার সুযোগ মিলবে। যদি দিদিমার কথা উঠে, তাহলে তাঁর বার্ধক্য, ব্যাধি আর নিঃসঙ্গতার ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করবেন। শিশুর মনে সমবেদনা উদ্রেক করুন। তার মধ্যে যদি অন্তত সামান্যতম বোধ শক্তিও জাগে এবং নিজের আচরণ পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যায় তাহলে তাকে সাহায্য করুন, তার অকৃত্রিম আবেগটি লক্ষ্য করুন। শিশু প্রথম বার একটি সৎ কাজ করুক এবং তাতে আনন্দিত হোক।

বিচ্ছেদের পরিস্থিতি। বিচ্ছেদ ঘটাতে চেষ্টা করবেন না, তবে তার জন্য প্রস্তুত থাকুন। শিশুকে আপনার ন্যায়পরতার শক্তি, আপনার সংস্কৃতির শক্তি, আপনার মনের শক্তি এবং আপনার অটলতা উপলব্ধি করতে হবে। একই সঙ্গে শিশুর উপর সমস্ত দাবি চাপিয়ে দেবেন না। এরূপ বলা

উচিত নয়: 'আজ থেকে তোকে সমস্ত ব্যাপারে গুরুজনদের কথা শুনতে হবে।' তবে আসল জিনিসটি অবশ্যই দাবি করবেন: 'আমি হয়তো তোকে বেশি প্রশ্রয় দিয়ে ভুলই করেছি। আমরা সবাই তোকে লাই দিয়েছি। আমি বলছি না যে সঙ্গে সঙ্গেই তোকে তোর আচরণ বদলাতে হবে, তা হয়তো সম্ভবও নয়। কিন্তু তুই যদি আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চাস, তাহলে আজ থেকে তোকে বাড়িতে কিছু-না-কিছু করতেই হবে।'

শিশু যদি বলে: 'করব না, করতে চাই না, কেন করব', তাহলে আপনার অটলতা উপলব্ধি করতে দিন। তাকে বলুন: 'তাহলে তোর-আমার বলার কিছুই নেই।'

যুগপৎ ক্রিয়াকলাপের পরিস্থিতি। মনে রাখবেন, আপনি যদি একেলা কাজ করেন তাহলে আপনি হয়তো হেরে যাবেন। শিশু যদি বিচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত থাকে, তাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলে রাখার অধিকার আপনার নেই। তা খুবই বিপজ্জনক। আপনাকে যুগপৎ ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা করতে হবে, কেউ যেন তাকে বিচ্ছেদের পরিস্থিতিটি ব্যাখ্যা করে, তার ভুল দেখিয়ে দেয়। ওই কাজটি বাবা, দিদিমা, শিক্ষক অথবা তার সহপাঠীকে দিয়ে করাতে পারেন। বিচ্ছেদের পরিস্থিতিতে শিশুর মনমেজাজ ভীষণ খারাপ: বস্তুত বিচ্ছেদের তীব্রতা তাকে নৈতিক প্রভাবের জন্য প্রস্তুত করে তুলে। এই প্রস্তুতিটি সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগানো উচিত। শিশুকে আপনার কাছে তার ভুল স্বীকার করতে হবে।

সম্ভাব্য আপোসের পরিস্থিতি। অবস্থা বিবেচনা ক'রে আপোস করা সম্ভব। শিশু ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিন। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও পরিষ্কার বলে দেবেন: 'তোর ক্ষমা প্রার্থনায় আমার প্রয়োজন নেই। আসল কথা হচ্ছে ভবিষ্যতে তুই আমাদের কথা কতটা শুনবি এবং এত বছর সে নিয়েই তো আমাদের মধ্যে আলাপ চলছে।' অন্যান্য কথা বলার দরকার নেই। এখন তা অপ্রাসঙ্গিক। তার চেয়ে বরং অভিন্ন কোন কাজে মন দিন। বলুন: 'ভালো কথা। তোর যদি সত্যিই সদিচ্ছা থাকে এবং তুই সর্বান্তকরণে বলিস যে আমাদের কথা শুনবি, তাহলে আয় কাজ করা যাক। আচ্ছা, গণিতের খাতাটা নিয়ে আয় তো...' অথবা 'আয় ঘরগুলো সাফ করি।' কাজের সময় শিশুকে প্রেরণা দানের চেষ্টা করবেন: 'এই তো দ্যাখ না, তুই সবই পারিস...'

মেলামেশায় শিশুর চাহিদা স্নেহ লাভের চাহিদার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিশু যদি আপনাদের মায়ামমতা না পায়, তাহলে সে অধীর হয়ে

উঠে, রূঢ় কথা বলে, কী করবে বুঝতে পারে না। এই 'স্নায়বিক উত্তেজনা' — স্নেহ লাভের স্বকীয় এক দাবি। স্নেহ স্বভাব শান্ত করে, প্রয়োজনীয় যোগাযোগ স্থাপন করে, সেই জরুরী ভারসাম্য সৃষ্টি করে যা ছাড়া ফলপ্রসূ মেলামেশা সম্ভব নয়। শিশু আপনাদের সংস্পর্শে আসতে চায়, সে আপনাদের শুভ দৃষ্টি ও মিষ্ট কথার আকাঙ্ক্ষী। সে স্বার্থপরের মতো অটলভাবে নিজের প্রতি ভালো সম্পর্ক দাবি করে। স্নেহ দানে উদার হোন। কেবল আপনাদের স্নেহ এবং সহৃদয়তাই আপনাদের সম্পর্কে যে-বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে তা দূর করতে পারে। মনে রাখবেন, আপনাদের হাতগুলো প্রভাবের এমন এক মায়াবী শক্তির অধিকারী যা সময় সময় কথার চেয়ে, দীর্ঘ আলাপের চেয়ে ও উপহারের চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রসূ। কেউ এখনও মানবীয় স্পর্শনের ভৈষজ্য গুণটি অধ্যয়ন করে নি। শিশু মায়ের স্নেহপূর্ণ স্পর্শ, বাবার করমর্দনের পুরুষোচিত কোমলতা, বন্ধুত্বপূর্ণ পিঠ চাপড়ানো ইত্যাদি ভালোই অনুভব করতে পারে।

শিশু অনুভূতির দ্বারা জগৎকে উপলব্ধি করে। কোন কোন ক্ষেত্রে কথার চেয়ে অনুভূতিই তাকে ঢের বেশি তথ্য জোগায়। যদি কথা না বলে অঙ্গভঙ্গি, হাবভাব আর স্পর্শ দিয়ে নিজের সম্পর্ক বোঝানোর সম্ভাবনা থাকে তাহলে নির্ভয়ে ও ঘন ঘন তা-ই করবেন। আপনাদের সক্রিয় মেলামেশায় স্নেহের ভাব থাকতে হবে। যেমন, আপনি ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে বার হলেন। তার মাফলারটি ঠিক করতে করতে ঘাড় ও কানটি একটু স্পর্শ করুন, কাঁধগুলো ছোঁন, চুলগুলো ঠিক করে দিন। আপনি বই পড়ছেন, এবং যখন প্রয়োজন মনে করবেন তার পিঠে হাত বুলিয়ে একটু আদর করুন। আপনি দেখলেন শিশুর গরম লাগছে, সস্নেহে তার শার্টের কলারের বোতামটি খুলে দিন। শিশু যদি আপনার আদর পেতে চায় কিংবা বাপের সঙ্গে একটু শক্তি পরীক্ষা করতে চায়, তাকে বিমুখ করবেন না, জড়িয়ে ধরুন: শিশু আপনার দেহের শক্তি ও উত্তাপ অনুভব করুক। এ ধরনের যোগাযোগ নিরাপত্তাবোধ স্বস্তি আর উন্মুক্ত স্বাধীনতার অনুভূতি জাগায়।

ছেলেমেয়ের সঙ্গে বহু সংঘর্ষই বাধে মা-বাবার দোষে — তাঁরা সময় মতো সন্তানের প্রতি সম্পর্ক পুনর্গঠন করতে পারেন না। তাঁরা তাঁদের সন্তানের মধ্যে ঘটমান পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করেন না। শিশুর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার দাবি-দাওয়া বাড়ে, স্বাবলম্বী হওয়ার বাসনা প্রবল হয়ে উঠে। মা-বাবা প্রায়ই এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে সন্তানের তাঁদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে পড়ার প্রয়াস বলে গণ্য করেন। শুরু হয় সংঘর্ষ। শিশু তার পাল্টা

প্রতিক্রিয়ায় ততটা রক্ষণশীল নয়, কিন্তু মা-বাবা নিজের পদ্ধতিতে খুব বেশি রক্ষণশীল। এই রক্ষণশীলতাই অনেক অনর্থের মূলে।

যেমন, আপনাদের মেয়ের কথাই ধরুন। জনসমক্ষে তাকে চুমু দিলে সে তা পছন্দ করে না। সে তা পছন্দ করে না এই জন্য নয় যে আপনাদের স্নেহ তার কাছে অপ্রীতিকর। এর প্রকৃত কারণটি হচ্ছে: সে এখন বুঝতে পারছে যে তার বয়সে ভিন্ন ধরনের মনোযোগ প্রয়োজন, যেমন, আন্তরিক ও স্নেহভরা দৃষ্টি, মমতাভরা স্পর্শ। সে চায় যে তার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবকিছুই বড়দের মতো হবে।

অথবা ধরুন, শিশুকে চেঁচিয়ে বকলেন, এবং সে রাগ করল না। কিন্তু ১৪ বছর বয়সে আপনাদের প্রতিটি চিৎকার তার মনে গভীর রেখাপাত করবে।

কিশোরের প্রতি আপনাদের সম্পর্কের চরিত্র সময় মতো বদলাতে চেষ্টা করুন। প্রতি বছর তার কাছে নিজস্ব দাবি-দাওয়া উপস্থাপনের পদ্ধতিগুলো পুনর্বিবেচনা করে দেখুন।

এমনভাবে কাজ করবেন যাতে শিশু আপনাদেরকে আপনাদের পদ্ধতি বদলাতে বাধ্য না করে; আপনারা নিজেই যেন আপনাদের দাবিগুলো পরিবর্তন ও জটিল ক'রে শিশুকে তার আচরণ বদলাতে বাধ্য করেন। আপনাদের পদ্ধতিগুলো শিশুর বিকাশকে সামান্য ছাড়িয়ে গেলে কোন ক্ষতি হবে না, বরং পিছিয়ে থাকলেই খারাপ হবে। তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে আপনাদের একই নিয়ম অনুসরণ করা উচিত: 'এবার তুমি বড় হয়েছ, বুদ্ধিশুদ্ধিও হয়েছে, এ কাজটি তুমি নিজেই কোরো...' শিশু যেন ক্রমশই অধিক আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠে সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

বিরোধের মীমাংসা ছাড়া যেমন মেলামেশা অসম্ভব, তেমনি সংঘর্ষ ব্যতিরেকে লালনপালন আর শিক্ষাদীক্ষাও সম্ভব নয়। সংঘর্ষ — এ হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি, রুচি ও ধারণার সংঘাত। সংঘর্ষ — এ হচ্ছে মানুষের বিকাশের সেই ছোট্ট গ্রন্থিটি যা না খুলে এগুনো সম্ভব নয়। সংঘর্ষ — এ হচ্ছে সর্বদা কোনকিছুর পুনর্বিবেচনা। তা সর্বদা নবায়নের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে জড়িত।

সমস্ত সংঘর্ষে এবং ওগুলোর মীমাংসার পদ্ধতিতে অভিন্ন কোনকিছু আছে বলে মনে হয়।

যেকোন সংঘর্ষে অন্ততপক্ষে কয়েকটি ধারা থাকে।

যেমন ধরুন, আপনাদের ছেলে স্কুলের কাজের ক্ষতি ক'রে কল্পকাহিনী পড়তে শুরু করেছে। আপনারা চান যে সে অনিয়ম না করুক, স্কুলের পড়া তৈরি করুক, — সে খুবই ভালো কথা। কিন্তু শিশুর কাছ থেকে বই ছিনিয়ে নিলে আপনারা ঝুঁকি নেবেন: তাতে বইটির প্রতি শিশুর আগ্রহ আরও প্রবল হয়ে উঠবে কিংবা বইয়ের প্রতি শিশুর অতি গুরুত্বপূর্ণ আগ্রহ লোপ পাবে। শিশুর অবস্থাও কম জটিল নয়: সে কল্পকাহিনীর রোমাঞ্চকর ঘটনাবলিতে একেবারে ডুবে আছে, — এবং তা চমৎকার। আর এদিকে দায়িত্ববোধ তাকে বিব্রত করে তুলছে: 'পড়া তৈরি করা দরকার, কাল সকাল সকাল উঠতে হবে...' অথচ সে বইটি বন্ধ করে রেখে দিতেও পারছে না। সেই জন্যই যে তার পড়ার কাজে বাধা দেবে তার সঙ্গেই সে আবেগবশত সংঘর্ষে নামতে প্রস্তুত। দেখতেই পাচ্ছেন, সংঘর্ষ বহুস্তর বিশিষ্ট। আপনারা যদি ছেলের কাছে গিয়ে বলেন: 'হয়েছে, অনেক পড়েছিস!' এবং বইখানি কেড়ে নিয়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে যান, তাহলে কোন ফল হবে না। এরূপ স্বৈরাচার নতুন সংঘর্ষ বাধাবে। বিরোধটি অন্যভাবে মীমাংসা করার চেষ্টা করুন। ছেলের কাছে গিয়ে বলুন: 'বইটি পড়তে খুব মজা লাগছে নিশ্চয়ই।' শিশু আপনাদের কথায় নিশ্চয়ই সাড়া দেবে। শিশু যখন কোনকিছুতে আনন্দ উপভোগ করে সে সাধারণত কারো সঙ্গে নিজের আনন্দ ভাগাভাগি করতে চায়। সে খুব সম্ভব বলবে: 'খুবই মজার বই।' বিস্ময়সূচক মন্তব্য করে তার আগ্রহ প্রবল করে তুলুন: 'আচ্ছা, তাই বুঝি!' এই ভাবে আপনারা বইয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহের ভাগী হলেন এবং তার মনোযোগ একটু অন্য ধরনের লক্ষ্যের দিকে — যেমন বইটি সম্পর্কে তার ধারণা, বিষয়বস্তুর গুণাগুণের দিকে — সরিয়ে নিয়ে গেলেন। আপনারা যখন নতুন প্রশ্ন করেন: 'সম্ভবত সবচেয়ে মজার জায়গায় থেমেছিস্?' অথবা 'আচ্ছা, বইটি কি এতই রোমাঞ্চকর?' — সে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করে। এই যোগাযোগ ঘটাতে শিশু আপনাদের প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তটিই পরোক্ষভাবে মেনে নেয়: কাল অবধি পড়া স্থগিত রাখা যাক। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আপনারা সংঘর্ষের সম্ভাবনা এড়াতে সক্ষম হলেন।

মাকারেঙ্কো। কঠোরতা ও স্নেহ — এ হচ্ছে সবচেয়ে জটিল প্রশ্ন। ...বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লোকে কঠোরতা আর স্নেহের মাত্রা নির্ধারণ করতে জানে না, অথচ লালনপালন আর শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে তা জানাটা খুবই প্রয়োজনীয়। ...লোকে এই সমস্ত প্রশ্ন

বোঝে, কিন্তু ভাবে: এটা ঠিকই যে কঠোরতার মাত্রা থাকা চাই, স্নেহের মাত্রা থাকা চাই, তবে তা তো প্রয়োজন তখন, যখন শিশুর বয়স ৬-৭ বছর, আর ৬ বছর বয়স অবধি মাত্রা ছাড়াই চলে। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষাদীক্ষার আসল ভিত্তি গড়ে উঠে ৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই...

মা-বাবা। আপনি কঠোরতার মাত্রা সম্পর্কে বলছেন। কিন্তু সর্বপ্রকার কঠোরতা ছাড়াও তো সন্তান মানুষ করা যায়। আমরা যদি সমস্তকিছু সুচিন্তিতভাবে ও সস্নেহে করি, তাহলে জীবনে কখনও শিশুর সঙ্গে ব্যবহারে কঠোরতা অবলম্বন করার প্রয়োজন হবে না।

মাকারেঙ্কো। কঠোরতা বলতে আমি কোনরূপ ক্রোধ বা ক্ষোভোন্মত্ত চিৎকার বোঝাতে চাইছি না। মেটেই তা নয়। কঠোরতা ভালো, যদি তাতে ক্ষোভের কোন লক্ষণ না থাকে। আপনার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার দৃঢ় সিদ্ধান্ত যদি সস্নেহে ব্যক্ত করতে সক্ষম হন তাহলে তা আরও বেশি কাজ দেবে।

সকাল — শিশুর পক্ষে সবচেয়ে জটিল ও কঠিন সময়। প্রত্যেকের জন্য তা বিভিন্ন রকমের। কোন শিশু ঘুম থেকে উঠে সানন্দে, এবং নিদ্রার সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটতে মুহূর্তকালও লাগে না। অন্য শিশুর অনেকখন ধরে হুঁশ আসে না: এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যেতে তার কষ্টই হয়। কোন শিশু তখন সহজেই ব্যায়াম শুরু করতে পারে, অন্যের জন্য তা হচ্ছে ভারী এক বোঝা। কিন্তু এমনও ঘটে যে এই দ্বিতীয় জনই কিছুকাল পরে প্রবল ও সুদীর্ঘ মানসিক আর শারীরিক চাপ সহনের পক্ষে অধিকতর প্রস্তুত প্রতিপন্ন হয়। শিশুদের দৈহিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যাবলি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। তবে তারও চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে — সকাল বেলা প্রত্যেকটি লোকের, এ ক্ষেত্রে শিশুর, অভিন্ন বৈশিষ্ট্যটি কী তা জানা।

সকাল — সে হচ্ছে সর্বদা আশা, আনন্দের প্রতীক্ষা। সকালে শিশু নিজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। মিষ্টি ঘুমে শিশু কর্তৃক উপলব্ধ অঢেল আন্তরিকতা এবং কর্মভারাক্রান্ত দিনের মধ্যে বেশি ব্যবধান থাকা উচিত নয়। সকালের কাজের ঘণ্টাগুলো শিশুকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাবে কর্মদিনের পরিবেশে। শান্ত পরিবেশে প্রাতরাশ খাওয়া, বই-খাতা কালি-কলম ইত্যাদি গুছানো, কাপড়-চোপড় পরা — এ সমস্তকিছুই সম্পন্ন হওয়া উচিত কোনরূপ ব্যস্ততা ছাড়া, তবে অবশ্যই সামান্য দ্রুত গতিতে।

পরিবারে যখন মন কষাকষি হয় তখন দুই পক্ষ থাকে: 'অপমানকারী' আর 'অপমানিত'। মাঝেমধ্যে পরিবারের বড় সদস্যারা পালা ক'রে

'অপমানকারী' ও 'অপমানিতের' ভূমিকা গ্রহণ করে। তা স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপারে পরিণত হয়। কেউ একজন অন্য জনের প্রতি সামান্য উদাসীনতা দেখাল, এবং এই অন্য জন যদিও রাগ করে নি, কিন্তু নিজেকে অপমানিত বোধ করল। বাস, এবার সারা দিন ধরে অপমানিতের ভূমিকা প্রদর্শনের প্রক্রিয়া চলছে, আর 'অপমানকারী' ব্যাপারটি কী তা না জেনে একটার পর একটা ভুল করেই চলেছে। তারপর শুরু হয় সুদীর্ঘ মিটমাট আর মাফ চাওয়া-চাওয়ির পালা। বড়রা অনেক সময় অবচেতনভাবে শিশুদের সঙ্গে মেলামেশায়ও এই শৈলীটির আশ্রয় নেয়। যেমন ধরুন, রাত্রি বেলায় মা ও মেয়ের মধ্যে কথা হয়েছে যে মেয়ে সকাল বেলা উঠে চা তৈরি করবে। আর মেয়ে সে কথা ভুলেই গেছে। সকালে সে দুধ খেয়ে নিল। মা রেগে অপেক্ষা করছেন, কখন মেয়ের মনে হবে যে সে তাঁর কথা ভাবে নি। এক দিন যায়, দু' দিন যায় — মা'র রাগ কমে না। মেয়ের আর সহ্য হয় না: 'মা, তোমার কী হয়েছে, মন খারাপ কেন?' এই প্রশ্নটি মাকে আরও বেশি অপমানিত করে, এবং তিনি ভাবেন: 'ও এত নির্মম কেন?' অথচ শিশু মোটেই নির্মম নয়। তার জীবনের গতি দৌড়ের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আর দৌড়ে কি পলকহীন পর্যবেক্ষক হওয়া যায়? আপনারা যদি শিশুকে ধাবনে 'থামতে' না শেখান, মানুষের মনের অবস্থা বোঝার জন্য তাকে যদি অন্যের কথা শুনতে, অন্যের চোখ দেখতে না শেখান, তাহলে আপনারা সদয় ও সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষ গড়তে পারবেন না।

শিশুকে এই জটিল বিষয়টি শেখাতে হলে প্রাজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন, অপেক্ষাকৃত শান্ত হওয়া প্রয়োজন এবং নিজের শিক্ষামূলক কার্যপ্রণালীর যুক্তিসিদ্ধতায় দৃঢ় বিশ্বাসী হওয়া প্রয়োজন। অপমানিতের ভূমিকা গুরুজনকে হীন করে, তার অবস্থানকে অসহায় ও দুর্বল করে তুলে।

নিজের দুর্বলতা অবশ্যই কোন কোন সময় শিশুর কাছে ব্যক্ত করা যায়। তার সমর্থন লাভের আশায় তার কাছে খোলাখুলিভাবে নিজের দোষও স্বীকার করা যায়। তবে তা করা উচিত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে — সব সময় নয়। শিশুর সহৃদয়তা জাগিয়ে তোলার হাতিয়ার হিশেবে প্রতি বার নিজের দুর্বলতা ব্যবহার করা কিছুতেই কাম্য নয়।

সংঘর্ষে বড়কে পরিস্থিতি সামলাতে হবে। তাকে সংঘর্ষের উৎস খুঁজে বার করতে হবে। সংঘর্ষের মীমাংসা দীর্ঘ হলে চলবে না, শিশুর জীবনের দ্রুত গতির সঙ্গে তার সঙ্গতি থাকতে হবে। আপনারা যদি মনোযোগ

সহকারে নিজের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে তা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘর্ষ নিয়েই গঠিত।

আপনাদের স্বয়ং-পরিবেশনের সমস্ত অভ্যাস গড়ে উঠেছে বহু বছর ধরে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রক্রিয়াসমূহ থেকে। তবে এই সমস্ত অভ্যাসের উপর আপনারা কোন গুরুত্ব আরোপ করেন না, আপনারা ভাবেন যে এই অভিজ্ঞ-তা — খুবই তুচ্ছ ব্যাপার এবং শিশু মায়ের কোল থেকেই তা আয়ত্ত করতে পারে। সেই জন্যই আপনারা বার বার বলেন: 'সত্যিই কি তুই এই মামুলি কাজটি করতে পারছিস না? এ যে একেবারে তুচ্ছ ব্যাপার, এটাও করতে পারলি না!' অথচ সত্যিই শিশুর পক্ষে এই মামুলি কাজটি করা সম্ভব হয় নি: কিছু একটা যেন তাকে বাধা দিচ্ছিল, কিছু একটা যেন তাকে ভীত করছিল। কোনকিছুতে তার প্রত্যয় ছিল না। কী যেন ভয় করছিল: জানি, উৎরাবে না। শিশুর ভয় বহুবিচিত্র। এই ভয় অনেক সময় সুদীর্ঘ কাল ধরে পরিবারে গড়ে উঠা রীতিনীতির সঙ্গে জড়িত।

...মা ক্লাস টিচারের কাছে নিজের মেয়ের বিষয়ে অভিযোগ করছেন:

— আমার আসিয়া নিজে কিছুই করে না। দিদিমা তার জন্য সমস্তকিছু করে দিতেন এবং সে তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন সে আমার কাছ থেকেও অনুরূপ 'সেবা' চায়। কিন্তু আমি চাকরি করি, তার দেখাশোনা করার মতো সময় আমার নেই। আমি তা করতেও চাই না, তাকে নিজেকেও তো কিছু একটা শিখতে হবে। তাকে তো একাও বাস করতে হবে: মা ও দিদিমা তো আর চিরকাল থাকবেন না!

— আচ্ছা বলুন তো, ও ঠিক কী পারে না?

— কিছুই পারে না। ঝাড়ুটি কীভাবে ধরতে হয় তা পর্যন্ত জানে না। ঘুম থেকে উঠার পর বিছানা গুছায় না। এমনকি দিয়াশলাই ধরাতেও ভয় পায়। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, কীভাবে দিয়াশলাই ধরাতে হয় তাকে তা শেখানোর জন্য আমরা কতকিছু করেছি। ও বাড়িতে একা ফিরে। ওর খাবার গরম করা দরকার, চা তৈরি করা দরকার — এ জন্য কি আমায় বার বার কাজ থেকে আসতে হবে। ও যে এখন বড় মেয়ে!

যেকোন শিশুই একটু চরমাবস্থা ভালোবাসে। আর মা-বাবারা সাধারণত শিশুকে দিয়ে হুকুম খাটাতে ভালোবাসেন: 'এটা নিয়ে আয়', 'ওটা দেয়', 'এটা ঢাল', 'ওটা ধুয়ে রাখ', 'দরজা বন্ধ কর', 'দোকানে যা'। তবে এক সময় আসে যখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 'পূর্ণ' কাজে হাত দেওয়া উচিত:

সারা ঘরটি ঝাড়ু দেওয়া, প্রাতরাশ প্রস্তুত করা, ছোট ভাইকে বা বোনকে স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি করা ইত্যাদি।

ক্রীড়ারত ছেলেমেয়েরা কীরূপ আচরণ করে তা স্মরণ করুন। ক্রীড়ারত খোকাখুকীদের মধ্যে কেউ যদি কেবল 'সহায়কের কাজ' করে, তাহলে তার জন্য খেলা বন্ধ হয়ে যায়। প্রত্যেকেই বাড়ি বানাতে চায়, কেবল এক-একটি ইট দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চায় না।

আসিয়াকে যখন সকালে একটু আগে উঠে প্রাতরাশ তৈরি করতে বলা হল, সে বলল: 'ঠিক আছে, তোমাদের ঘুম থেকে উঠার আগে আমি খাবার তৈরি করে রাখব।' অবশ্যই সেই সকালে বড়দের কেউ-ই ঘুমাচ্ছিল না। প্রত্যেকেই ভাবছিল, ও রান্নাঘরে কী করছে; কীভাবে পরিজ, সালাদ আর চা তৈরি করছে। আর ছোট্ট গৃহিণীর চিন্তা হচ্ছে — কীভাবে সবকিছু সময় মতো শেষ করতে হবে এবং বড়দের কেউ নির্ধারিত সময়ের আগে রান্নাঘরে না এলেই হয়।

— আমাদের যখন খেতে ডাকা হল, আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আসিয়াকে দেখতে পেলাম, — পরে গল্প করেন মা। — আমার আগের অসহায় আসিয়ার কিছুই ওর মধ্যে ছিল না। রান্নাঘরে ব্যস্ততাবশত ছোটাছুটি করছিল ছোট এক নারী। তার চেহারায় এমন প্রীতিকর এক উত্তেজনা ফুটে উঠেছিল যে আমি নিজেকে আর সামলাতে না পেরে তাকে ধরে চুমু দিতে আরম্ভ করি। সে আমাদের প্রশংসার অপেক্ষা করছিল। আমরা পঞ্চমুখে তার প্রশংসা করেছি। পরিজটা অবশ্য সামান্য পুড়ে গিয়েছিল, তবে আমরা তা লক্ষ্য করি নি।

বলাই বাহুল্য, খোদ প্রাতরাশ তৈরির কাজে খেলার কিছু উপাদান ছিল। তবে পারিবারিক জীবনে ঠিক এ ধরনের খেলাই প্রয়োজন। ঠিক এরূপ খেলাই পারস্পরিক সম্পর্ককে মধুর ও সুন্দর করে তুলে, অক্রীড়ামূলক ক্রিয়াকলাপ শিখিয়ে দেয়, যা পরে চাহিদা হয়ে যায়, অভ্যাসে পরিণত হয়।

মনে রাখবেন, খেলা থেকে কাজে আসতে কিছুটা বিরতিরও দরকার।

...কয়েক দিন ধরে আসিয়া নিজে ঘুম থেকে উঠেছে, মাকে ফ্ল্যাট পরিষ্কার করতে সাহায্য করেছে, প্রাতরাশ তৈরি করেছে। আর গতকাল সে ডেকচিটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, মা'র সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেছে এবং বলেছে আর কখনও রান্নাঘরে পা দেবে না! ...প্রাতরাশ তৈরির খেলায় তার আর আগের মতো উৎসাহ নেই। এবং সব সময়ই ভুল করে: লবণের

বদলে চিনি ঢেলে দেয়, কখনও দুধ ফুটে উপচে পড়ে যায়, গ্যাসের উনুনে ঠিক কোন্ বার্নারে আগুন ধরাতে হবে তা ঠিক করতে পারে না...

আর মা এর জন্য ক্রমশই ধৈর্যচ্যুত হচ্ছেন এবং মেয়েকে গালি দিচ্ছেন।

আসুন, এবার দেখা যাক মা ও মেয়ের সম্পর্কে আসল গোলযোগ কোথায়। গোড়াতেই বলা দরকার যে মা — আন্না ইভানোভনা — মেয়েকে স্বয়ং-পরিবেশনের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে বস্তুত খেলার পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন। যেকোন খেলার মতো এই খেলাটিও আগ্রহ আর আনন্দের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে; তার জন্য মেয়েটিকে অনেক শক্তি খরচ করতে হয়েছে, বিপুল প্রয়াস ও বুদ্ধি খাটাতে হয়েছে। আমরা জানি যে এই খেলার আগে সে কিছুই জানত না, এমনকি দিয়াশলাই পর্যন্ত ধরাতে পারত না। এবং হঠাৎ এরূপ আমূল পরিবর্তন: সে প্রকৃত ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে চলে এসেছে। খেলা দিয়ে শুরু না করলে আসিয়া এখন যাকিছু করেছে তা কিছুতেই করতে পারত না। তদুপরি আসিয়ার মা এ কথা ভাবেন নি যে মেয়ে খেলায় কিছুটা ক্লান্ত হয়েছে। স্বাভাবিক বিরতির প্রয়োজন ছিল। দিন তিনেক পর তাকে বলা উচিত ছিল: 'তুই হয়তো ক্লান্তি বোধ করছিস। কাল আমি নিজেই সকালের খাবার তৈরি করব।'

আসিয়া সম্ভবত বলত: 'না, আমি ক্লান্ত নই।' মোটের উপর, শিশুর কাছ থেকে এরূপ প্রতিবাদই আশা করা উচিত। কিন্তু এরূপ জবাব না পেলেও দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নেই: শিশু সত্যিই ক্লান্তি বোধ করছে এবং কোন প্রকারে 'সম্পাদিত খেলাটির' কথা তার ভুলে যাওয়া উচিত। এই প্রস্থান তার কৃত কাজের খতিয়ান করার জন্য ব্যবহার করলেই সবচেয়ে ভালো হয়। আসিয়ার পূর্ববর্তী প্রাতঃকালীন শ্রমের ঘণ্টাগুলো যেন বাড়িতে আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। ঠিক ওই সময়ই বলা উচিত, সে টেবিল মুছতে, বাসনপত্র ধুতে কী কী ভুল করেছে। তিন-চার দিন সামান্য ঢিলা দিন, এবং তারপর আবার ক্রিয়াকলাপের —তবে এবার অক্রীড়ামূলক ক্রিয়াকলাপের — নতুন গতিতে চলে আসবেন। একদিন সকালে তাকে রান্নাঘরে আসতে বলবেন এবং যাকিছু করা প্রয়োজন তা দেখিয়ে দেবেন। আপনি শিশুকে চা বানানোর সমস্ত রহস্য বলে দিন। তা উদ্ঘাটনে চিত্তাকর্ষক এবং এমনকি রোমাণ্টিক অনেককিছু আছে। আপনি তাকে সালাদ তৈরির সবচেয়ে মজার মজার পদ্ধতিগুলো বাৎলে দিন। আমরা যাকে রুচি বলে অভিহিত করি তার সামনে বাস্তবতা উপলব্ধির সেই ক্ষেত্রটি খুলে দিন।

আপনি যখন রেগে চিৎকার শুরু করেন তখন আপনার শিক্ষাদীক্ষার

সমস্ত ফলই বিনাশ হয়ে যায়। শিশুকে উদ্দেশ্য ক'রে চিৎকার করা অন্যায়, অপমানজনক এবং আসল কথা — তাতে খারাপ বই ভালো হয় না। মা ও সন্তান উভয়েরই মন বিগড়ে যায়। শত্রুতার ভিত্তি গড়ে উঠে, যা চিরকালের জন্য বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। কিন্তু আপনি তা চান না, এবং সেই জন্যই চিৎকার করার অভ্যাস একেবারেই ত্যাগ করা উচিত। চিৎকার করা মানুষের পক্ষে অশোভন।

সকালে যে-শিশুকে চেঁচিয়ে গালাগালি দেওয়া হয়, তার আর স্কুলে পাঁচ-ছ'টা ঘণ্টা ক্লাসে শান্তভাবে বসে থাকার অবস্থা থাকে না। তা অবশ্যই সহপাঠীদের সঙ্গে, শিক্ষকের সঙ্গে তার ব্যবহারকে প্রভাবিত করে, — সে অভদ্র আচরণ করে, অন্যকে অপমানিত করে, ঝগড়া বাধায়।

তাই শিক্ষাদীক্ষার কাজে প্রতিরোধ দূর করতে হলে শিশুর সঙ্গে আচরণে রুক্ষতা থাকলে চলবে না।

প্রাতরাশের সময় এ ধরনের সংঘর্ষ প্রায়ই চোখে পড়ে:

— আমি খাব না, — বলে মেয়ে।

— নে, অন্তত এটা খেয়ে নে... — জোর করেন মা।

— খাব না...

— তা অন্তত চা-টা তো খাবি...

— চা-ও খাব না...

— তাহলে স্কুলে পড়াশোনা করবি কী করে? এ যে একেবারে অসম্ভব...

শুরু হয় নাটক, যাতে প্রত্যেকের আছে নিজস্ব ভূমিকা: লাঞ্ছিত মা এবং বিজয়িনী কন্যা। লক্ষ্য করুন, মা যত বেশি জোর করছেন, মেয়ে তত বেশি প্রতিরোধ দিয়ে যাচ্ছে। শিশু যে ভালো মতো নিজের ভূমিকা পালন করছে এবং মায়ের কাকুতিমিনতি থেকে সে যে এক ধরনের আনন্দও পাচ্ছে তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এরূপ ছেলেমেয়ে আছে যারা খেতে বসার আগে এমনকি ভীষণ ক্ষুধার্ত হলেও কয়েক বার 'আমি খাব না' কথাটি না বলে পারে না। আর এই আপত্তিটি খাওয়ার আগে এক ধরনের ভূমিকার মতো শোনায়। বলল 'খাব না' এবং এর পর পুরো খাবারটুকুই খেয়ে নিল। সেই জন্যই শিশু-চিকিৎসকরা বলেন যে শিশুকে খেতে বাধ্য করা উচিত নয়, তার পরিবর্তে বরং ওর সামনে খাবার রেখে সম্ভব হলে কিছুক্ষণের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়াই ভালো। অবশ্য এমন কোন নিশ্চয়তা নেই যে প্রথম সকালেই শিশু খেতে আরম্ভ করবে। বরং উল্টো,

আচরণের ধরন বদলালে কোন কোন ক্ষেত্রে সে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে — না খেয়েই চলে যাবে। কিন্তু এমনকি এরূপ পরিস্থিতিতেও আপনার প্রশিক্ষণমূলক জিত হবে: গড়ে উঠা কু-অভ্যাসে ভাঙন ধরবে এবং নতুন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ভিত্তি প্রস্তুত হবে। আসুন, এরূপ একটি চরম অবস্থা বিচার করা যাক।

প্রাতরাশের সময় আসিয়ার সঙ্গে সম্ভাব্য সব রকমের আলোচনা নিয়ে আন্না ইভানোভনার সঙ্গে আমাদের বিশদ কথাবার্তা হল। আমাদের অনুমান অনুসারে, নতুন ধরনের আচরণে আসিয়ার বিক্ষুব্ধ হওয়ার কথা। ঘটলও ঠিক তাই।

খাবার টেবিলে, কিন্তু আন্না ইভানোভনা মেয়েকে খেতে বললেন না। আসিয়া রান্নাঘরে ঘুর-ঘুর করছে, তবে খেতে বসতে পারছে না: অনভ্যস্ত একটি ভাব, মা'র কাকুতিমিনতি নেই।

— মা, কী খাওয়া যায়? — জিজ্ঞেস করল আসিয়া, কণ্ঠে জেদী সুর।

— সবই টেবিলে রাখা, — মেয়ের কাছে না এসেই বললেন মা।

আসিয়া কাঁটা দিয়ে পরিজ খুঁটল:

— আচ্ছা এতে কালো এগুলো কী?

মা প্রশ্নের উত্তর দিলেন না।

— তা চা-টা মিষ্টি? — আসিয়া থামে না।

— খেয়ে দ্যাখ...

বিক্ষুব্ধ আসিয়া খাবার ফেলে মাকে কোনকিছু না বলেই চলে গেল। সে নিজেকে ভীষণ অপমানিত বোধ করল।

বিকালে আসিয়া মাকে বলল:

— ক্লাসে আমার পেট ব্যথা করছিল এবং মাথা ঘুরছিল। আমি আজ পড়া মোটেই বুঝি নি...

— তা পেট ব্যথা করবে কেন? — জিজ্ঞেস করেন মা।

— আমি সকালে কী খেয়েছি? এক ঢোক চা — ব্যস শেষ।

পরদিন সকালে পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হল। মা সস্নেহে মেয়েকে বললেন: 'ভালো ক'রে খেয়ে নে, নতুবা আবার পেট ব্যথা করবে,' — এবং ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সেই সকালে আসিয়া প্রথম বারের মতো মা'র কাকুতিমিনতি ছাড়া ভালো ক'রে খাবার খেল, কাপ-প্লেট ধুয়ে রাখল এবং নীরবে স্কুলে চলে গেল।

ক্লাস টিচার এই ঘটনাটির কথা অন্য এক মাকে বললেন। ওঁর মেয়েও সকালে জেদ করত।

— আরে ওতে কিছুই হবে না, — বললেন তিনি। — আমার সুভেতো বরং তাতে আনন্দিতই হবে এবং খাবে না। ও খেতেই চায় না — এতেই যত আপদ। এখানে জেদের কথাই উঠে না। তাছাড়া আমার সুভেতো এমনিতেই ভীষণ দুর্বল, হাত দু'টো এত রোগা।

— আচ্ছা বলুন তো, যখন আপনার মেয়ের বয়স ৫ বছর ছিল, তখনকার তুলনায় খাবার সময় ওর প্রতি আপনার আচরণ কতটা বদলেছে? — জিজ্ঞেস করেন শিক্ষক।

মা একটু ভেবে বললেন:

মোটেই বদলায় নি।

— আপনি কি মনে করেন যে ১০ বছরের মেয়ের সঙ্গে পাঁচ বছরের মেয়ের মতো আচরণ করাটা ঠিক হচ্ছে?

পরদিন মা মেয়েকে বললেন: 'তুই এখন বড় হয়েছিস। তোর যেভাবে ইচ্ছে হয় সেই ভাবেই খা...' এ কথা শুনে মেয়ে মাকে বার কয়েক চুমু দিয়ে বলল: 'তাহলে এখন তুমি বুঝলে যে আমাকে বাচ্চার মতো জোর করে গেলানো উচিত নয়,' — এবং সে ভালো ক'রে সকালের খাবার খেল।

দু'-তিন দিন পর মা ফের আগের মতো আচরণ করতে লাগলেন এবং মেয়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে জোর ক'রে স্যান্ডউইচ খাওয়াতে চেষ্টা করলেন। তখন সুভেতো বলল: 'আমাদের যে কথা হয়েছে আমি আমার ইচ্ছে মতো খাব, অথচ তুমি সেই আগের মতো বলছ: 'আরও এক টুকরো খেয়ে নে...''

আত্মনির্ভরতার বিকাশ বৃদ্ধিমান মানুষের প্রতি সযত্ন মনোযোগ এবং তার আত্মশিক্ষার ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গত নেতৃত্ব দাবি করে। এ ছাড়া, বলাই বাহুল্য, আত্মনির্ভরশীল হওয়া কঠিন।

দ্বিপ্রহর

দিনের দ্বিতীয় ভাগে শিশুর আচরণের তিনটি মডেল এবং তার উপযোগী পারিবারিক সম্পর্কের নমুনাগুলো গড়ার চেষ্টা করা যাক।

আদর্শ মডেল। আপনি কর্মক্ষেত্রে। আপনার সন্তান মন দিয়ে পড়াশোনাও করেছে এবং পুরো একটা ঘণ্টা স্কুলের বাগানেও ভালো

খেটেছে। আড়াইটার সময় সে বাড়ি ফিরল। কাপড় ছাড়তে দু' মিনিট লাগল। তারপর ফ্ল্যাট ঝাড়াই-মোছাই: ধুলোবালি নেই, সমস্তকিছু তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে। মাঝেমধ্যে খাদ্যদ্রব্য কিনতে দোকানে যেতে হয়। সাড়ে তিনটা থেকে সাড়ে ছ'টা অবধি — পড়া তৈরি করার সময়। বই, খাতা, পাঠ্যপুস্তক, রঙীন পেন্সিল, রুলার, কম্প্যাসেস — সমস্তকিছু টেবিলের উপরে। সহ-পাঠী এল। দু'জনে মিলে কঠিন একটি অংক করল। পরে কবে দেখা হবে তা ঠিক ক'রে সহপাঠী চলে গেল। পড়া তৈরি, রাতের খাবার গরম করা হয়েছে, এবার খেতে বসতে হবে...

মাঝারি মডেল। তিনটার সময় শিশু বাড়িতে। টিভি চালু করল। মন দিয়ে দেখে। চারটার সময় তার প্রিয় অনুষ্ঠানটি শেষ হয়ে যায়। বন্ধুকে ফোন করল।

পরের দৃশ্য। আপনার সন্তান তার বন্ধুর বাড়িতে। ভীষণ জোরে রেকর্ড-প্লেয়ারটি চলছে। সন্ধ্যা ৬টা — ছেলে দু'টির টনক নড়ল: শিগগিরই মা-বাবা কাজ থেকে ফিরবেন। ছ'টা কুড়িতে আপনার সন্তান বাড়িতে। খেল। তারপর পড়া তৈরি করতে বসল, তবে সঙ্গে সঙ্গে টিভি আর টেপ-রেকর্ডারও চালিয়ে রাখল। পড়া তৈরি করছে। মা এলেন। তিনি আনন্দিত: 'আমার খোকন কী করছে শুনি?' জবাব: 'পড়া তৈরি করতে আমায় বাধা দেবে না।' — 'ক্ষুধার্ত নিশ্চয়ই? আমি তা জানতামই: পরিজ গরম করিস নি, পিঠে দেখিস নি, দই খাস নি। এক্ষুনি আমি তোকে তাড়াতাড়ি খাওয়াচ্ছি... তা কাপড় কেন ছাড়িস নি?..'

নেতিবাচক মডেল। আপনি কাজে। মাথায় সব সময়ই দুর্ভাবনা: 'ও এখন কোথায়? কার সঙ্গে? গত কাল হেড মাস্টার আমায় স্কুলে ডেকেছিলেন: ও আজকাল পড়া তৈরি করছে না। ক্লাসের সময় ক্লাস থেকে বেরিয়ে যায়। দেরি করে বাড়ি ফিরেছিল, রেইনকোটটিতে ছিল কাদার দাগ। কুলাঙ্গারটি একেবারে জ্বালিয়ে মারল। বাপ হাতে ছড়ি নিতেই মুখের উপর বলে দিল: 'মারলে বাড়ি থেকে চলে যাব।' প্রথম বার বাপকে কড়া কথা বলল।

আপনাদের সম্পর্ক যদি নেতিবাচক মডেলের দিকে মোড় নেয়, তাহলে সন্তানের 'ব্যাধির' সঠিক কারণটি খুঁজে বার করুন। তাকে ঠিক রোগীই ভাববেন এবং তার সঙ্গে তদনুযায়ী আচরণও করবেন। রোগীদের তো আর তিরস্কার ও প্রহার করা হয় না। তাদের চিকিৎসা করা হয়। দীর্ঘকাল চিকিৎসা করা হয় — একেবারে পুরোপুরি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত। প্রস্তাবিত

ব্যবস্থা ও পরামর্শগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে — মাঝারি মডেল থেকে আদর্শ মডেলে আসতে সাহায্য করা। এই ভাবে, আমরা কাজ করব নেতিবাচক মডেল নিয়ে এবং তাকে প্রথমে মাঝারি ও পরে আদর্শ মডেলে রূপান্তরিত করার উপায় খুঁজে বার করতে চেষ্টা করব। শিশু সম্পর্কে আপনি আশাবাদী হোন। প্রশিক্ষণমূলক আশাবাদ স্কুল ছাত্রের ব্যক্তিত্বের বিকাশের মুখ্য বিরোধগুলো মীমাংসা করার পদ্ধতিসমূহের জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। মনে হতে পারে, ইতিবাচক সমস্তকিছুর উপর নির্ভর করা — এতে নতুনত্ব আর কী আছে, এ তো সেই বহু ব্যবহৃত সূত্র! কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা বাস্তবায়িত করা খুবই কঠিন।

তাই আসুন, 'কঠিন' শিশুর নেতিবাচক মডেলে ইতিবাচক যাকিছু আছে তা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 'কঠিন' ছেলেমেয়েরা শেষ পর্যন্ত ভালো লোক, নিপুণ কর্মী ও যত্নশীল সংসারী হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে জীবনে তারা এমনকি তাদের সেই প্রাক্তন সহপাঠীদেরও ছাড়িয়ে যায় যাদের মধ্যে এককালে আদর্শ মডেলের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলো মূর্তরূপ লাভ করেছিল।

অনেক 'কঠিন' ছেলেমেয়ের মধ্যে কী কী সদর্থক গুণ গড়ে উঠে?

তারা অফুরন্ত জীবনী শক্তি আর জীবনোৎফুল্লতার অধিকারী। তাদের যতই তিরস্কার করুন না কেন, যতই গালাগাল দিন না কেন, সে সবকিছু সত্ত্বেও তারা নিজের মধ্যে বিস্ময়কর সেই শক্তিটি টিকিয়ে রাখে যা তাদের নতুন নতুন 'অ্যাডভেঞ্চারে' মাতিয়ে তুলে। তারা সাধারণত শারীরিক দিক থেকে পোড়-খাওয়া, খুবই কষ্টসহিষ্ণু, এবং এই দু'টি গুণ আপন সঙ্গীসাথীদের সমাজে তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভে সহায়তা করে, তাদের মধ্যে এই আশা বদ্ধমূল করে তুলে যে তারা একদিন-না-একদিন পৃথিবীতে যোগ্য স্থান অধিকার করবেই। তথাকথিত কঠিন শিশুরাই সঙ্গীসাথীদের আস্থার মূল্য দেয় পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি, এবং সেই জন্যই খারাপ পরিস্থিতিতে সর্বদা তাদের উপর ভরসা করা যায়। ঝুঁকির প্রতি তাদের অতিরিক্ত প্রবণতার পেছনে থাকে সঠিক হিসাব।

পিতা। আয়ত্তের একেবারে বাইরে চলে গেছে। সারা দিন টো-টো ক'রে বেড়ায়। আপনি জানেন আমাদের পাড়ার ছেলেগুলো কী রকম? কে জানে ওরা একসঙ্গে মিললে কী করে? ওদের মধ্যে সম্ভবত হাঘরে ছেলেরাও আছে। তা আপনি আমার ছেলেটাকে ধরে রাস্তার ছোকরাগুলোর হাত থেকে বাঁচান, ফের ওকে আপনার প্রশিক্ষণ-রজ্জু দিয়ে বেঁধে রাখুন, আমায় শিক্ষাকার্য চালিয়ে যেতে দিন।

মাকারেঙ্কো। কিছু মা-বাবা তাঁদের ছেলেমেয়েদের বাস্তব জীবনের প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে এবং সামাজিক শিক্ষাদীক্ষার পরিবর্তে তাদের খেলা-দেখানো পশুর মতো বাড়িতে ব্যক্তিগত তালিম দিতে চেষ্টা করেন। এরূপ প্রচেষ্টা যেমন অর্থহীন, তেমনি নৈরাশ্যজনক। তাতে অকৃতকার্যতা অনিবার্য: হয় শিশু গৃহ-কারা ত্যাগ ক'রে চলে যাবে, নয় তাকে মানসিক দিক থেকে পঙ্গু করে ছাড়বেন।

আমরা যখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে বহু দিনের পদযাত্রায় বেরিয়ে পড়তাম, তখন ঠিক এই 'কঠিন' ছেলেগুলোই হামেশা পুরোভাগে থাকত: তারা তাঁবু খাটাত, সবচেয়ে ভারী ন্যাপস্যাকগুলো বইত, যারা কমজোর তাদের সাহায্য করত। প্রায়ই তাদের আদর্শ মডেলের লক্ষণযুক্ত 'বিরোধী চরিত্রে' প্রতিফলিত হত উপস্থিত বুদ্ধি, নৈপুণ্য আর গতিশীলতা।

শিশু চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটিই হচ্ছে এই যে তা অত্যন্ত নমনীয় — অবিশ্বাস্য রকম নমনীয়। সবচেয়ে নির্দয় ছেলেও চিত্তাকর্ষক কাজে যেকোন সময় সাড়া দেবে।

আপনার সন্তান যদি ঠিক মতো পড়াশোনা করে না এবং স্কুল কামাই করে, তাহলে বুঝবেন যে সে নিজের শক্তিতে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। তার মানে, লেখাপড়ায় সে এতই পিছিয়ে পড়েছে যে তার পক্ষে পুরনো সমস্ত বিষয়বস্তু আয়ত্ত করা অসম্ভব। জিজ্ঞাসিত হওয়ার ভয় তাকে অস্থির করে তুলে। ভাইবন্ধুদের সামনে, শিক্ষকদের সামনে এবং নিজের সামনে তার লজ্জা হয়। দিনে দিনে ভয় বাড়ে, এবং তা থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে শিশু আত্মরক্ষার অবস্থান নিতে শুরু করে। তখনই শিক্ষক ও মা-বাবার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। শিশুর কাছে যে-সমস্ত দাবিদাওয়া হাজির করা হয় তা সাধ্যাতীত ও দুর্বহ মনে হয়। সে নৈতিক বিচ্ছিন্নতা হেতু যন্ত্রণা ভোগ করে। সে অরক্ষিত।

শিশু যদি আপনাকে বাড়ির কাজে সাহায্য না করে তাহলে এর পেছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে। আপনি যা চান তা সে করতে পারে না। সে কাজ করতে অভ্যস্ত নয়। দীর্ঘকাল তাকে বাড়ির কাজে আকৃষ্ট করা হয় নি। পারিবারিক বিচ্ছিন্নতাও এর কারণ হতে পারে: প্রত্যেকে বাস করছে নিজের মতো, বিচ্ছিন্নভাবে, প্রত্যেকের আছে নিজস্ব অভ্যন্তরীণ জীবন। আপনার সন্তান যদি ভালো ক'রে পড়াশোনা করে, কিন্তু আপনায় রূঢ় কথা বলে, তাহলে বুঝবেন যে আপনাদের সম্পর্কে কোথাও গলদ আছে। পরিবর্তিত সম্পর্কের কারণ খুঁজে বার করা উচিত, অন্যথায় এরূপে সম্পর্ক

আগে হোক আর পরেই হোক শিক্ষাকার্যে ব্যাঘাত ঘটাবেই।

অন্য রকম দৃশ্যও দেখা যায়। শিশু পড়াশোনায় খারাপ করছে, বাড়ির কাজকর্মে কোন সাহায্য করে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও সুসম্পর্ক বজায় রয়েছে। এটা ঠিক যে এই 'ভালো' সম্পর্কে কারো কোন লাভ হয় না। কিন্তু তাহলেও সুসম্পর্কে এমন কিছু ইতিবাচক উপাদান থাকে যার ভিত্তিতে প্রকৃত ফলপ্রসূ আদান-প্রদান শুরু হতে পারে।

তবে স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত কারণও থাকতে পারে। এমতাবস্থায় স্বভাবতই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে 'কঠিন' শিশু (তবে সে যদি সুস্থ থাকে) তখনই 'কঠিন' হয় যখন লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ে। সেই জন্যই মেয়ে বা ছেলের সঙ্গে আপনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কের বিকাশ নির্ভর করবে কীভাবে আপনি তাদের ফলপ্রদ ক্রিয়াকলাপ, এবং সর্বাগ্রে শিক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপ, সংগঠন করছেন তার উপর।

শিশুর কাজ, তার চিন্তা আর উদ্বেগের প্রতি উদাসীন থাকবেন না। অধিকাংশ মা-বাবাই এই ভুলটি করে থাকেন — সাহায্যের পরিবর্তে তাঁরা হাজারো দাবি হাজির করেন: 'পড়তে বস্!', 'কখন স্কুলের পড়া তৈরি করবি?' শিশু তখন তার স্বভাবসিদ্ধ যুক্তি দেখায়: 'আরে এখনও সময় আছে', অথবা 'এই এক্ষুনি!' কিংবা 'আজ আমাদের বাড়ির কাজ দেওয়া হয় নি'।

শিশুকে এভাবেই বললে ভালো হয়: 'আচ্ছা আয় তো দেখি, রুশ ভাষায় কী করতে হবে? বেশ। অনুশীলনী। ভালো কথা। তা করতে আমাদের কতক্ষণ লাগবে? আধ ঘণ্টা। চমৎকার। আর গণিতে কী আছে? দু'টি অঙ্ক? কী কী? আচ্ছা এগুলো... ঠিক আছে, নিজে চেষ্টা করে দ্যাখ। না পারলে একসঙ্গে ভেবে দেখব...'

মা-বাবা যদি চান যে তাঁদের সন্তান পড়াশোনায় ভালো হোক তাহলে তাঁদের আধুনিক পাঠ্যসূচি জানা দরকার। অন্তত পক্ষে প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্যসূচি। শিশু যদি ভালো মতো প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্যসূচিটি আয়ত্ত করতে পারে তাহলে তার মধ্যে অবশ্যই নিয়মিত পড়াশোনার অভ্যাস, মানসিক পরিশ্রমের ক্ষমতা এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছে নিজের মানমর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে উঠবে।

আপনি যদি নিজের সন্তানকে সাহায্য করতে চান তাহলে আপনাকে

তার চিন্তাভাবনার বিষয়গুলো অধ্যয়ন করতেই হবে। স্কুল আপনার সন্তানের কাছে যে-সমস্ত দাবি হাজির করে তা আপনার জানা উচিত।

শিক্ষা লাভের প্রক্রিয়া — মানুষের জীবনে সবচেয়ে কঠিন কাজ। সেই জন্যই কঠিন কাজে শিশুকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

খুব অল্প দিয়েই শুরু করুন। ধরুন, প্রথমেই আপনি শিশুর মধ্যে তার আপন শক্তিতে অন্তত কিছুটা প্রত্যয় জাগানোর কাজে হাত দিতে পারেন। এমন কোন শিক্ষামূলক কাজ খুঁজে বার করুন যাতে তার মধ্যে প্রস্তাবিত কাজের প্রতি অন্তত সামান্য আগ্রহও সঞ্চারিত হবে। আপনার সন্তান যদি অঙ্কে দুর্বল হয়ে থাকে, তাহলে তার সঙ্গে বসে অঙ্ক করার চেষ্টা করবেন। আপনার প্রথম প্রশিক্ষণমূলক প্রয়াসের উদ্দেশ্য হবে শিশু যেন তার কাজটা করে উঠতে পারে, আর তারপর যেন নিয়মিতভাবে পড়া তৈরি করে।

ধরুন, আপনার ছেলে ইতিহাসে, ভূগোলে ও প্রকৃতিবিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় এই সব বিষয়ে কীভাবে তার মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করা যায়? পাঠ্যসূচিটি দ্যাখুন, বাড়িতে করার জন্য যে কাজ দেওয়া হয়েছে তা বোঝার চেষ্টা করুন। গ্রন্থাগারে গিয়ে আপনার ছেলে যে-বিষয়টি অধ্যয়ন করছে সে বিষয়ে কোন বই দিতে বলুন। অন্তত কয়েকটি অধ্যায় পড়ে নিন। আপনি যাকিছু জেনেছেন তা ছেলেকে বুঝিয়ে দিন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো তাকে পড়ে শোনান। পড়ার জন্য নির্ধারিত অংশে সবচেয়ে মজার জায়গাটিতে থামুন এবং শেষ অবধি ছেলেকেই পড়তে দিন। কয়েক বার এভাবে চললে সে অবশ্যই ক্লাসে পড়া বলতে পারবে, এবং তার প্রতি শিক্ষয়িত্রী আর ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাবে। সে নিশ্চয়ই ভালো নম্বর পাবে। তবে আসল ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে আপনার ছেলে তারও চেয়ে বেশিকিছু অর্জন করবে, এবং তা হল — আপন শক্তিতে দৃঢ় প্রত্যয়। ভয় কেটে যাবে অথবা হ্রাস পাবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, অভিন্ন কাজ এবং লক্ষ্যার্জনের যৌথ প্রয়াস সেই কার্যকর, মানবিক ও সৃজনধর্মী পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলবে যা ব্যতিরেকে শিক্ষাকার্য চালানো সম্ভবই নয়।

'স্নায়বিক জেদীপনা' এবং অহেতুক সংঘর্ষ এড়িয়ে চলবেন। আপনি শিশুকে কোনকিছু শেখাচ্ছেন বা বোঝাচ্ছেন। ধৈর্যচ্যুত হবেন না, হাসিখুশি ও সহৃদয় ব্যবহার করবেন, তবে সেই সঙ্গে সামান্য কঠোরতাও বজায় রাখবেন। ধরুন, আপনি মেয়েকে শ্রুতলিপি লিখতে বললেন: 'চারিদিকে

ঘন কুজ্ঝটিকায় ঢাকা', কিন্তু আপনার মেয়ে লিখল: 'চারিদিকের বাড়ি-ঘর ঘন কুয়াশায় ঢাকা'। এরূপ রচনা শক্তির জন্য অবশ্যই তার প্রশংসা করবেন, তবে পরে বলবেন: 'ভালো কথা, এসো এবার তাহলে 'কুজ্ঝটিকা' শব্দটি ব্যবহার করেই বাক্যটি লেখা যাক। শব্দটি কিন্তু বেশ কঠিন।' শিশুর কল্পনার ব্যাপারে সতর্ক ও যত্নশীল থাকবেন। তা পূর্ণ নিরাপত্তা ও মুক্তির পরিবেশ গড়ে তুলবে।

প্রথম সাফল্য বলতে কী বোঝায়?

সাফল্যের নিম্ন সীমানা — শিশু পড়াশোনা করতে বসল। সে পড়াশোনা করতে বসে এমনকি কিছু যদি না-ও করে, নিরাশ হবেন না। তাকে বলবেন: 'খুবই ভালো কথা যে তুই পড়তে বসেছিস। আজ বেশিকিছু করতে পারলি না, তবে সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা, তোর মধ্যে দায়িত্ব বোধ এসেছে...'

শিক্ষাকার্যে ছোট এবং বড় সাফল্যের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। ছোট ছোট সাফল্য লাভের পর মনে মানবীয় শক্তির সীমাহীনতায় বিশ্বাস ক্রমশই বাড়তে থাকে।

শিশুর মধ্যে নিজস্ব মর্যাদা বোধ, মানুষ যে সমস্তকিছুই করতে পারে তাতে দৃঢ় প্রত্যয় জাগিয়ে তোলা উচিত। অন্যথায় কোন শিক্ষাকার্যই সম্ভব নয়।

ভালো পালক — সর্বদা ধৈর্যবান ও ভালো গবেষক। আপনি পাঠ্যসূচি অধ্যয়ন করেছেন, এবার প্রশিক্ষণমূলক সাহিত্য পড়ছেন এবং নিজের পারিবারিক জীবনের প্রশিক্ষণমূলক গঠন নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছেন, — তার মানে, আপনি অবশ্যই একজন গবেষকে পরিণত হচ্ছেন।

এখানে এ কথাটি জোর দিয়ে বলা দরকার: শিশুকে নিয়ে খাটা তাস বা ডোমিনো খেলা কিংবা টিভি-র সামনে বসে থাকার চেয়ে অধিকতর চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। আপনার প্রথম প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। আবার চেষ্টা করুন, — হয়তো একটু অন্যভাবে। সামান্য কষ্ট স্বীকার ক'রে নিজের পরবর্তী পদক্ষেপটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করে দ্যাখুন। যদি আপনাকে দশ বার চেষ্টা করতে হয়, তা-ই করবেন।

আপনার সন্তান যদি ঠিক মতো পড়াশোনা না করে, শিক্ষাদীক্ষায় অবহেলিত থাকে, তাহলে, এ কথাটি নিশ্চয়ই মানবেন, আমন্ত্রণ ছাড়া তার স্কুলে যেতে আপনার লজ্জা হবে।

আপনার সন্তানের একটু অগ্রগতি হলেই আপনি তার শিক্ষকের কাছে যেতে পারেন। এই অগ্রগতিই হবে আপনাদের প্রশিক্ষণমূলক আলোচনার বিষয়। আপনার স্কুলে আগমনের উদ্দেশ্যটিও হবে স্পষ্ট ও সঠিক, কারণ আপনি জানেন যে শিক্ষকের কাছে আপনার কী প্রয়োজন এবং আপনি তাঁর কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করেন। আপনি শিক্ষকের সঙ্গে কেবল কথা বলতেই চান না, তাঁকে এ কথাটিও জানাতে চান যে ভবিষ্যতে আপনি আপনার ছেলেকে এই-এই বিষয়ে সাহায্য করতে আগ্রহী। কিন্তু আপনি তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে চাইছেন: কী কী অংক করা উচিত, কী কী অনুশীলনী করা দরকার।

আসুন, এ নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। আপনার সন্তান যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, আপনি তখন নিজের হাজারো কাজ ছেড়ে তার চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় মন দেন। লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়া ইনফ্লুয়েঞ্জা, মাম্প্‌স অথবা স্কার্লেট পীড়ার চেয়েও অধিকতর মারাত্মক রোগ। কোনকিছুতে পিছিয়ে পড়লে মানুষ মানসিক দিক থেকে ভীষণ ভুগে। তা তার মন ভেঙে দেয়।

কোন কোন মা-বাবা মনে করেন যে শিশুর পড়াশোনা আর স্কুলে সাফল্য লাভ — সে হচ্ছে শিক্ষকের, স্কুলের দায়িত্ব। কিন্তু এ হচ্ছে ভ্রান্ত ধারণা। তাছাড়া, ক্ষতিকরও।

লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়াকে ফের রোগের সঙ্গে তুলনা করা যাক। শিশুর অসুখ যত বেশি গুরুতর হয়, আপনি ততই বেশি দৃঢ়তার সঙ্গে ও সক্রিয়ভাবে ভালো ডাক্তার-বিশেষজ্ঞ খুঁজেন। আপনি সর্বতোপায়ে চেষ্টা করেন যাতে আপনার সন্তান দ্রুত আরোগ্য লাভ করে।

আপনি যদি চান যে আপনার ছেলে ভালো ক'রে পড়াশোনা করুক, তাহলে যারাই তাকে সাহায্য করতে পারে তাদের সবাইকেই কাজে লাগানো উচিত: ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের, সঙ্গীসাথীদের, আত্মীয়স্বজনদের। তা করতে গিয়ে শিশুকে কখনও অপ্রয়োজনীয় নীতিবাক্য শুনাবেন না এবং অপ্রয়োজনীয় লজ্জাদানেও বিরত থাকবেন: 'দেখেছিস, কী অবস্থাটা হয়েছে... একটু বুদ্ধিশুদ্ধিও নেই...'

কিন্তু বাইরের লোককে এ ব্যাপারে আকৃষ্ট করতে গিয়ে ভুলে যাবেন না যে আপনিই হচ্ছেন সেই প্রধান ব্যক্তি যাঁর উপর নির্ভর করছে শিশুর অদৃষ্ট।

শিক্ষাদীক্ষার কাজে প্রশিক্ষণমূলক নেতৃত্ব শিশুর স্বনির্ভরতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুবিবেচিত নেতৃত্ব শিশুকে স্বাবলম্বী করে তুলে

(এবং এটাই হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য)। আপনার নেতৃত্ব একই সঙ্গে ভারী ও হালকা হোক; যাতে যেকোন ক্ষেত্রেই শিশুর আত্মনির্ভরতা স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে।

প্রথম স্বনির্ভর প্রচেষ্টায় কিছু-না-কিছু ভুলভ্রান্তি হবেই। মনে রাখবেন যে শিশুর ভুল করার অধিকার আছে; ভুলত্রুটি ছাড়া শিশুর উদ্দাম ক্রিয়াকলাপ সম্ভব নয়; ভুলভ্রান্তি ব্যতিরেকে নতুন কিছু শেখা অসম্ভব আর লেখাপড়া করা তো বটেই।

প্রশিক্ষণমূলক নেতৃত্ব এবং স্বনির্ভরতার ঐক্যে কিছু নেতিবাচক শক্তিও নিহিত থাকে। শিশু নেতৃত্বে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং কেবল গুরুজনের উপস্থিতিতেই স্বনির্ভরতা প্রদর্শন করে। ধীরে ধীরে তাকে প্রকৃত স্বনির্ভরতায় অভ্যস্ত করানো উচিত।

শিশুর সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে — অতি সামান্য ও অবশ্যই সম্পাদনযোগ্য কোনকিছু দিয়ে শুরু ক'রে — আপনি তার মধ্যে ক্রিয়াকলাপের চাহিদা গড়ে তুলেন। এই ক্রিয়াকলাপ যদি স্বনির্ভর শ্রম প্রয়াসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তৃপ্তি আর আনন্দের সঙ্গে জড়িত থাকে, তাহলে তা অবশ্যই শিক্ষাদায়ক মৈত্রীপূর্ণ কার্যকর পারস্পরিক সম্পর্ক বিকশিত করে তুলে। ক্রিয়াকলাপ এবং সঠিক সম্পর্কের সংশ্লেষ ছেলেমেয়েদের নৈতিক গুণাবলি গঠন করে ও তাদের উপলব্ধি ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়।

পঞ্চম কিংবা দশম দিনে আপনার ছেলে যদি স্বনির্ভরভাবে সামান্য কোনকিছুও করতে পারে, তাহলে বুঝবেন যে সে তদ্দ্বারা আপনার প্রতি, সঙ্গীসাথীদের প্রতি ও শিক্ষকের প্রতি তার মনোভাব পরিবর্তিত করেছে। এই সমস্ত পরিবর্তন অতি ক্ষুদ্র, কেবল অনুভব করা যায়। তবে তা যে ঘটেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শিশু যদি ২০ কিংবা ৩০টি ছোট কাজ নিজে করে ফেলে, তাহলে তার আত্মবোধে তীব্র পরিবর্তন ঘটবে। তার মনে এমনকি অহঙ্কারও দেখা দেবে। কিছুকাল পরে এই বালকসুলভ এবং এরূপ স্বাভাবিক দম্ভ আর থাকবে না।

তার এরূপ প্রত্যয়পূর্ণ আত্মবোধ আপনার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। এই প্রত্যয়-ক্ষমতাকে এক ধরনের সম্ভাবনা হিশেবে গণ্য করবেন যা দিয়ে আরও কোনকিছু করা যাবে। খেয়াল রাখতে হবে, অর্জিত এই নতুন অনুভূতিটি যেন আত্মবিশ্বাসে রূপান্তরিত না হয়। 'নিজেতে বিশ্বাসের' এই শক্তিটি যদি

অন্যান্য ধরনের ক্রিয়াকলাপেও প্রভাব ফেলে তাহলে খুবই ভালো হয়। আপনি জিজ্ঞেস করবেন, কোন্ কোন্ ক্রিয়াকলাপে? সর্বাগ্রে — শ্রমে। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে অন্য কোন কাজ করার চেষ্টা করুন। যেমন, শিশুকে বলুন: 'আমরা বেশ ভালোই পড়াশোনা করলাম, এবার আয় দু'জনে মিলে খাবারটা তৈরি করে নিই। তুই রুটি আর দুধ কিনে নিয়ে আয়, আর আমি ততক্ষণে কাটলেট ভেজে নিচ্ছি। যদি চাস তো আমিও যেতে পারি, তাহলে তুই কিন্তু কাটলেট ভাজবি।' শিশু যদি কিছুই করতে না চায়, জোর করবেন না, তাকে কেবল বলবেন: 'ঠিক আছে, একটু জিরিয়ে নে। পরে আমরা একসঙ্গে মেঝেটি মুছব।'

এক কথায়, আপনাদের যৌথ কাজকে, আর ঠিক ক'রে বললে, তার পদ্ধতিগুলোকে শিক্ষাদানের গণ্ডির বাইরেও নিয়ে যেতে হবে। অন্য দিকে, সন্তানের সঙ্গে বেড়ানোর সময়, সিনেমা-থিয়েটারে গিয়ে আপনি যে-আনন্দ উপভোগ করেন তা শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন।

শিশুকে নিয়ে পড়াশোনার কাজ তো করবেনই, তবে সেই সঙ্গে তাকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে যেতে, শরীরচর্চা করতে ভুলবেন না। শ্রমও তার পক্ষে অপরিহার্য। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কয়েকটি জিনিস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে সময় মতো খাওয়া, সময় মতো ঘুমানো, চলাফেরা করা এবং নির্মল বায়ু সেবন করা। বিশেষ গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে যে শহুরে ছেলেমেয়েরা নির্মল বাতাসে কম ভ্রমণ করে, দিনে ২-৩ ঘণ্টার ব্যায়াম ও শারীরিক শ্রমের পরিবর্তে তারা পায় কুল্লে ২০-৩০ মিনিটের অনিয়মিত চাপ। তাতে দেহযন্ত্র সৃজনশীল মানসিক শ্রমের জন্য প্রস্তুত হতে পারে না। সেই জন্যই শিশুর দেহের শক্তি, মনের প্রফুল্লতা আর বুদ্ধির স্পষ্টতা বজায় রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। আপনার ছেলে বা মেয়ের শারীরিক বিকাশের জন্য সমস্ত সম্ভাবনাই কাজে লাগান। সম্ভব হলে, শরীরচর্চার সাজসরঞ্জাম (ডাম্বেল্, স্কিপিং রোপ, এক্সপ্যান্ডার ইত্যাদি) কিনে দিন।

মা। আমার এক মেয়ে, ওর বয়েস ৬ বছর। আমি ওকে ভালো ও সাহসী দেখতে চাই। কিন্তু আমার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ও ভীরুই থেকে যাচ্ছে। অথচ আমি ওকে কখনও কোন ভয় দেখাই নি। ঘুমোতে যাওয়ার সময় সর্বদা আমায় জিজ্ঞেস করে: 'আজ রাত্রে আমি কী স্বপ্ন দেখব?' সে যেন স্বপ্নকে ভয় করে। ...শিশুর মধ্যে সাহসিকতা কীভাবে গড়া যায়?..

মাকারেঙ্কো। আপনি জিজ্ঞেস করছেন, কীভাবে আপনার মেয়ের মন থেকে ভয় দূর করা যায়? এখানে ভয়ের কোন কারণ নেই। ছ' বছর বয়সে মেয়েরা প্রায়ই ও

রকম হয় — তখন সর্বকিছুতেই তারা ভয় পায়, উদ্বিগ্ন হয়। ৬-৭ বছর বয়সে মেয়েরা নির্ভীক হয় না। তবে ১১ বছর বয়সে আপনার মেয়ে এমন গুন্ডা হবে যে আপনি তাকে সামলাতেই পারবেন না। আপনার পরিবারে বা প্রতিবেশীদের মধ্যে এমন কোন লোক আছে যে বিভিন্ন রকমের ভয়ের গল্প শোনাতে পারে? কীসে তার ভয়? আমি ভাবতেও পারছি না, সে আবার কী ধরনের ভয়। আর হয়তো বা তা ওর কল্পনা প্রসূত ভয়? সময় সময় শিশুদের কল্পনা শক্তি খুবই বিকশিত। এ ব্যাপারে ডাক্তারই বেশি সাহায্য করতে পারেন... স্নায়ু-রোগের কোন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

মেলামেশার মাধ্যমে শিশুর আত্মমর্যাদা বোধ বিকশিত করবেন। সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণা লব্ধ ফলাফল দেখে বোঝা যায়, যে-সমস্ত লোক নিজেদের অকেজো মনে করে তারা কোন কাজেরই নয়, আপন অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য তারা কোনকিছু করতে পারে না। অন্য দিকে, যে-সমস্ত লোক নিজেদের উচ্চ মূল্য দেয় তারা সাধারণত নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে কাজ করতে ভালোবাসে, তারা লক্ষ্য অর্জনের জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করে না। এরূপ লোকেরা বিপদ দেখে হাল ছেড়ে দেয় না, — ও কাজ করতে তাদের মর্যাদায় বাধে। আত্মমর্যাদা বোধ হচ্ছে দক্ষতা বিকাশের মাপকাঠি, মানুষের আত্মবোধ ও নিজস্ব মূল্যবোধের মাপকাঠি।

উচ্চ আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন শিশু মনে করে: 'অন্যরা পারলে আমিও পারব।' আত্মমর্যাদা বোধ সম্পর্কে স্বল্প সচেতন শিশু সন্দেহ-প্রবণ এবং পিছু হটে যায়: 'আমি ও-কাজ কখনই করতে পারব না।'

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, যে-লোকের আত্মমর্যাদা বোধ কম সে এমন কোন কাজে হাত দিতে চায় না, যার সাফল্যে খুব একটা বিশ্বাস নেই। তার ক্রিয়াকলাপের নেতিবাচক মূল্যায়ন তার ভীষণ গায়ে লাগে। কোন মন্তব্যে হয়তো সে কোন প্রতিক্রিয়া দেখাবে না, তবে তা তার মনে গভীর রেখাপাত করবে। সে দুর্বল। কেউ যদি তাকে বলে: 'তোমার এ কাজটি তেমন উৎরাল না', তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়: 'ঠিক আছে, আমি আর কখনও এই কাজে হাত দেব না...' যখন তাকে বলা হয়: 'চেষ্টা করলে তুমি এ কাজটি আরও ভালো ক'রে করতে পারতে', তখন সে এই মন্তব্যকে চরম অপমান বলে গণ্য করে এবং নিরাশ হয়ে পড়ে।

স্বল্প আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন শিশু যদি কোন একটি কাজ খুব সুন্দর ক'রে করে, এবং সে দিকে কেউ নজর না দেয়, তাহলেও সে ভীষণ আঘাত পায়। তখন যেন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে ঠিক করে ফেলে: 'বেশ, আর

করব না।' এ ধরনের শিশুর মনে হয় যে সে সমস্তকিছুই করে নিজের জন্য নয়, কেবল অন্যদের জন্য।

শিশুর আত্মমর্যাদা বোধ যদি অবিকশিত হয় এবং তার উপর যদি সে চারিদিক থেকে খোঁটা খায়, কটূক্তি শোনে, তাহলে এমতাবস্থায় শিশুর মধ্যে 'প্রতিহিংসার শক্তি' সঞ্চিত হতে শুরু করে। এ হচ্ছে অত্যন্ত মারাত্মক এক প্রক্রিয়া। শিশু তখন মনে মনে বলে: 'ঠিক আছে, তোমাদের আমি দেখাব!' শিশু তার কোন সাথীর উপর প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ খুঁজে, — সে ভাবে, ওই সাথী তার যথেষ্ট কদর করে না। যে-সমস্ত আত্মীয়স্বজন তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে সে তাদের কাছে কিছু একটা প্রমাণ করতে চায়। সে শিক্ষকদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার মুহূর্তের অপেক্ষায় থাকে, — সে মনে করে, কম নম্বর বসিয়ে ওঁরা তার প্রতি খুবই অবিচার করেছেন। এরূপ প্রবণতা প্রায়ই মানুষের প্রতি বিদ্বেষের ভাব বৃদ্ধি করে।

উচ্চ আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন শিশুর ('উচ্চ' কথাটি আমরা ব্যবহার করছি 'স্বাভাবিক' অর্থে) মনঃপ্রকৃতি এরূপ দুর্বল হয় না। তার বিকাশ ঘটে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিত্তিতে।

এরূপ শিশুর মিথ্যা কথা বলার, ভান করার ও শাস্তির ভয় থাকার কোন কারণ নেই। সে যদি স্কুলে খারাপ নম্বর পায়, সে জানে যে মা-বাবা অবশ্য এর জন্য তার প্রশংসা করবেন না, তবে কারো কাছ থেকে তিরস্কার কিংবা অপমানও সইতে হবে না। সে নির্ভয়ে ও সহজে বলতে পারবে, কেন ও কীসের জন্য খারাপ নম্বর পেয়েছে, কারণ বাড়িতে অকৃতকার্যতার কথা বলতেও কারো বাধে না। সে মা-বাবার মতোই আচরণ করবে, কেননা ওঁদের ক্ষেত্রেও তো মাঝেমধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে থাকে।

অসাফল্যে এরূপ শিশু হতাশ হয় না। অপ্রীতিকর কোন ব্যাপার ঘটলে সবারই মতো তারও খারাপ লাগে, তবে তা তাকে বেগোছ করে দিতে পারে না। কঠিন অবস্থা কাটিয়ে ওঠার উপায় সে খুঁজে বার করবেই, এতে তার কোন সন্দেহ থাকে না। সে তাড়াহুড়ো না ক'রে কাজে হাত দেয়। সময়ের সঠিক হিসাব রাখে।

এমনকি কঠোর কঠোর পরিস্থিতিতেও সে অপরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। মনের এই ব্যাপকতা আর উদারতায়ই তার উচ্চ আত্মমর্যাদা বোধের অভিব্যক্তি ঘটে। শক্তিহীনের কষ্ট হলে সে অন্যের উপর রাগ ঝাড়ে, আর শক্তিশালী ও মহৎ ব্যক্তি তার নিজের দুঃখকষ্ট ও অসাফল্যের মুহূর্তেও অন্যের প্রতি সযত্ন মনোযোগ প্রদান করে।

সে সবার সঙ্গে সমান ব্যবহার করে। যারা বয়সে তার চেয়ে অনেক ছোট (একেবারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে ভালোবাসে), এবং যারা বয়সে তার চেয়ে অনেক বড় তাদের সবার সমাজেই তার আচরণ সমান থাকে। আর এর মানেই হচ্ছে, সে তাদের সত্যিই শ্রদ্ধা করে। সে ছোট বড় সবাইকে সাহায্য করতে চায়। সে এমনকি সেই সমস্ত উপদেশও মন দিয়ে শোনে, যা তার মোটেই পছন্দ নয়।

সন্ধ্যা

শিশুর জন্য সন্ধ্যাগুলো যদি সুন্দর ও আনন্দপূর্ণ না হয়, টেবিল ল্যাম্পের উষ্ণ আলোয় যদি ঘর উজ্জ্বল হয়ে না উঠে, যদি অনুচ্চ আন্তরিক কণ্ঠের গল্প আর মধুর সঙ্গীত শোনা না যায়, যদি চলে-যাওয়া দিনটির ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা না চলে, তাহলে এরূপ শিশু অনেককিছু হারায়, আর শিক্ষাকার্য অনেক ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সন্ধ্যায় কী সবচেয়ে প্রধান? অন্তরঙ্গতার দিকটি?

১২ ঘণ্টা ব্যাপী ক্রিয়াকলাপের পর ক্লান্তি (শিশুর পড়াশোনা, মেলামেশা, শ্রম, আমাদের পারিবারিক দায়দায়িত্ব, চাকরি)?

আগামী দিনের জন্য প্রস্তুতি?

আসুন, প্রথম মডেল দিয়ে শুরু করা যাক। সেটা আদর্শ মডেলও।

৭টা থেকে ১০টা অবধি — এই তিনটি ঘণ্টা হচ্ছে অন্তরতম বাসনা, আবিষ্কার আর সাক্ষাতের সময়। বাবা, ভাই অথবা মায়ের সঙ্গে আধ ঘণ্টার ভ্রমণ। সে খুবই চমৎকার জিনিস। ভ্রমণের সময়ে অনেক বিষয়ে আলোচনা করা যায়। তখন মেয়ের কত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়: দিদিমণি ক্লাসে গালিয়াকে যখন বললেন যে সে মিথ্যা কথা বলছে তখন গালিয়া কেন কেঁদে ফেলেছিল? ছেলেরা কেন এত পাজি হয়: সব সময় আমাদের ব্যাপারে নাক গলায়, আমাদের পেছনে লাগে, এবং ওদের জ্বালায় পারা যায় না? নেপলিয়নকে অনেকে কেন ভগবান ভাবে, অথচ তিনি অন্যায় কাজ তো কম করেন নি?

এরূপ 'কেন' আছে অনেক।

এই ভাবে, আদর্শ মডেলের একটি উপাদান হচ্ছে: শিশুর সঙ্গে ভ্রমণ। আর তারপর আপনার সন্তান কোন চিত্তাকর্ষক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে:

হয়তো সে ছবি আঁকে, হয়তো বা সঙ্গীতচর্চা করে, হয়তো বা এমন কোন অঙ্ক কষে, যা কেউ এমনকি প্রতিযোগিতার সময়ও কষতে পারে নি। তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে, এবং আপনি তাকে বাধা দিতে চান না।

আর আপনি বসে বসে মজার কোন বই পড়ছেন। আপনার মনে কোন অশান্তি নেই। আপনি খুশি যে আপনার সন্তান সময় মতো পড়া তৈরি করে নিয়েছে, নানা কাজে আপনায় সাহায্যও করেছে। আপনি ফাঁকে ফাঁকে আগামী দিনের বিষয়েও কথা বলে নিচ্ছেন, সকাল থেকে কে কী করবে তা জিজ্ঞেস করছেন। ...আপনি কয়েক মুহূর্ত শিশুর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন, তার মাথায় হাত বুলান, হয়তো তাকে চুমুও দেন...

মাঝারি মডেল।

— আচ্ছা অঙ্কগুলো কেমন করলি দ্যাখা তো, — বলেন বাবা। — আবার বিশ্রীভাবে লিখেছিস। তোকে এ ছাড়া আর কী করতে হবে?

— ভূগোল পড়তে হবে, কবিতা মুখস্থ করতে হবে...

— কখন তা করবি শুনি?

— এক্ষুনি।

কুড়ি মিনিট কেটে গেল। মা ও বাবা টিভি দেখছেন। শিশু কিছুক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, পরে আস্তে আস্তে বাবার পাশে সোফায় বসে।

বাবার মনে আছে যে ছেলে এখনও পড়া তৈরি করে নি:

—কখন তুই পড়তে বসবি?

—এই এক্ষুনি, — জবাব দেয় ছেলে এবং ফিল্মটি শেষ না হওয়া অবধি এই ভাবেই বসে থাকে। রাত ন'টার সময় সে ভূগোল পড়তে বসল। ফিল্ম এবং চায়ের পর মা-বাবা পরীক্ষা করলেন ছেলে পড়া কেমন তৈরি করেছে — কিন্তু ওর কিছুই শেখা হয় নি। বাবা বকাবকি করেন। মা'র মন খারাপ হয়।

অবশেষে ছেলে মন দিয়ে বইটি পড়ল। এক ঘণ্টা বাদে পড়া তৈরি হয়ে গেল। রাত এগারোটা। ছেলে শুতে গেল।

নেতিবাচক মডেল।

মা ঘড়ির দিকে তাকান। দশটা বাজতে চলল, মেয়ে তখনও বান্ধবীর সঙ্গে বেড়াচ্ছে।

সাড়ে দশটা — মেয়ে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে। মা বালিশ থেকে মাথা তুলে জিজ্ঞেস করেন:

— তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি? পড়া নিশ্চয়ই তৈরি করিস নি...

—করেছি। খাবার কী আছে?

মা বিছানা থেকে উঠলেন। খাবার গরম ক'রে মেয়েকে খাওয়ালেন। খেয়েদেয়ে মেয়ে পড়তে বসল। যতক্ষণ না চোখ বুজে আসছিল, ততক্ষণ বইয়ের পাতা উল্টিয়েই গেল। শুতে গেল একটার পরে।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে অধিকাংশ অসুবিধা দেখা দেয় সেই সমস্ত পরিবারে যেগুলোতে একটি মাত্র সন্তান আছে। একমাত্র সন্তানের সমস্যা, পরিবার এবং ক্লাসের সমস্যা — সে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, এবং তা নিয়ে আমরা অন্যত্র বিশেষভাবে আলোচনা করব। দ্বিতীয় গ্রুপের সমস্যাগুলো জড়িত রয়েছে ছেলেমেয়েদের মেলামেশার সঙ্গে, সেই জগৎটির সঙ্গে যা ব্যক্তিত্ব গঠন করে এবং যাতে ব্যক্তিত্বের গঠিত 'অহং'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

সময় সময় শিশু পড়াশোনায় খারাপ হয় এই জন্য যে শিক্ষকের সঙ্গে, সমবয়সীদের সঙ্গে তার সঠিক সম্পর্ক গড়ে উঠে না। সন্ধ্যার পরে মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের অসুবিধা আর কষ্টকাঠিন্য বুঝতে চেষ্টা ক'রে প্রায়ই এরূপ ন্যায়সঙ্গত মন্তব্য করে থাকেন: 'মাস্টার এমন অভদ্রতা করলেন কী করে: সারা ক্লাসের সঙ্গে ছোট্ট একটি বাচ্চাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছেন!' অথবা: 'সমবয়সীরা যখন ওকে মারল, তখন মাস্টারের চোখ কোথায় ছিল?!'

পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, যে-পরিবারে বড় ভাই বা বোন আছে সেই পরিবারের শিশু সহজে তার শ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে, অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নির্ভয়ে সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়। শিশু এবং ক্লাসের মধ্যে প্রায় সর্বদাই এক ধরনের বিরোধিতা দেখা দেয়। সে বিরোধিতা অনিবার্য। তা মনে রাখা উচিত।

ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে ৭ বছর বয়সী প্রতিটি মানুষ তার সমবয়সীদের দলে নিজের বিশেষ একটা বিশ্ববীক্ষা নিয়ে আসে। সারা ক্লাসের 'অহং'-এর সঙ্গে শিশুর অন্তর্জগতের সংঘর্ষ বিপুল সংখ্যক সমস্যা সৃষ্টি করে, এবং তার মধ্যে প্রধানতম একটা সমস্যা: ছোট্ট মানুষটির ব্যক্তিগত দক্ষতা বিকশিত হতে পারবে কি অথবা তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

শিক্ষাবিদরা এই সমস্যাটি নিয়ে ভাবছেন, বিজ্ঞানীরা তার বিষয়ে অনেককিছু লিখছেন ও বলছেন, এবং তা নিয়ে মা-বাবাদেরও প্রায় অনুরূপভাবে চিন্তা করা উচিত। একমাত্র সন্তান সাধারণত অধিকতর দুর্বল, সেই জন্যই দলের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলে সে বিশেষ কষ্টে আরও একটি মনস্তাত্ত্বিক বিরোধ দমন করে। সেটি হচ্ছে স্বার্থ এবং ভয়ের মধ্যে বিরোধ। ব্যাপারটি আসলে কী? শিশু স্রেফ মেলামেশার তীব্র চাহিদাই অনুভব

করে না, সে নিজের দক্ষতা, স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে তার বাইরে যাকিছু জেনেছে ও শিখেছে তা প্রদর্শন করতেও চায়। সেই সঙ্গে সবকিছু বুঝতে সক্ষম ৭ বছর বয়সের মানুষটি হাস্যাস্পদ হতে ভীষণ ভয় পায়, কেননা সে দেখতে পাচ্ছে যে ক্লাসের ছেলেমেয়েরা আলাদাভাবে প্রত্যেকের অনুভূতি খুব একটা পরোয়া করে না এবং যার কথা তাদের কাছে শোনার ও শ্রদ্ধার অযোগ্য বলে মনে হয় তাকে নিয়ে তারা সহজেই হাসাহাসি করে। এই ভাবেই দেখা দেয় নিজেকে প্রকাশ করার, নিজের অন্তর্জগৎ প্রকাশ করার ভয়, এবং তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের বেলাই ঘটে থাকে যারা স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে অবধি প্রধানত স্নেহশীল ও প্রশ্রয়দানকারী গুরুজনদের মাঝখানে থেকেছে।

সমবয়সীদের জগতে এসে আমাদের ছেলেমেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে মিশতে শুরু করে, কিন্তু দু-তিন বার যখন 'আঘাত' পায়, সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে পড়ে (বাড়ির পরিবেশে, বড়দের সমাজে যা দেখে তারা অভ্যস্ত নয়), তখন শিশুসুলভ বদ্ধপরিকরতা ও নীতিনিষ্ঠতার সঙ্গে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়: 'ঠিক আছে, যাক গে, ওদের আমার চাই না।' আর 'ওদের' মানে — ক্লাস। শিশু নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে, এবং তা খুবই অমঙ্গলকর পরিণাম ডেকে আনতে পারে। নিরালায় ক্রিয়াকলাপহীন সুদীর্ঘ অবস্থান বিভিন্নভাবে শিশুর ক্ষতি করে, আর সময় সময় সে জন্য মনোরোগও দেখা দেয়।

কী করা? এরূপ পরিস্থিতিতে কী উপায় থাকতে পারে? মনে হয়, উপায় আছে কেবল একটি — শিশুকে এমন সঙ্গ পেতে সাহায্য করা উচিত যা তার বিকাশের উপর অনুকূল প্রভাব ফেলবে। বহু মা-বাবা তাঁদের ছেলেমেয়ের বন্ধুদের নিজের বাড়িতে আসতে নেমতন্ন করেন কিংবা তাদের নিয়ে বেড়াতে যান। সময় সময় তাঁরা একসঙ্গে সিনেমা-থিয়েটারও দেখেন।

আপন সন্তানের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মা-বাবার ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলে খুবই ভালো হয়। তাতে সমবয়সীদের দলে কীরূপ আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কে নিজের ছেলে বা মেয়েকে সতর্ক করে দেওয়া সম্ভব হয়।

শিশুর মধ্যে আপনাকে সংবেদনশীলতা ছাড়া মানসিক দৃঢ়তাও গড়ে তুলতে হবে। স্বভাবতই, সন্ধ্যা বেলা, অবসর সময়ে শিশুর সঙ্গে কেবল মেলামেশার প্রক্রিয়াই চলে না, তখন যেন খোদ মা-বাবাদের দ্বারা শিক্ষাদীক্ষার নিজস্ব একটি তত্ত্বও রচিত হয়, পারিবারিক প্রশিক্ষণের প্রধান দিকগুলোও নির্ধারিত হয়। একটি মানুষের মধ্যে কী ক'রে

সঙ্গতিপূর্ণভাবে মানসিক সূক্ষ্মতা, সমবেদনার ক্ষমতা আর সংবেদনশীলতার সঙ্গে মনোবল, মানসিক অটলতা ও পোক্ততার মিলন ঘটানো যায়?

আমরা শিশুর মধ্যে সহৃদয়তা, সংবেদনশীলতা ও নম্রতা গড়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যতই বলাবলি করি না কেন, আমাদের প্রত্যেকেই কিন্তু চায় যে তার সন্তান এই মহৎ গুণাবলি অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা একরোখা ও প্র্যাকটিকেল হোক, ঘুষির সাহায্যে সু-কে কু-এর কবল থেকে রক্ষা করতে শিখুক। তার মানে, কথা হচ্ছে ব্যবস্থা নিয়ে: সামান্য নিষ্ঠুরতা, সামান্য উদারতা? অবশ্যই না, ব্যাপারটি বেশ জটিল।

অতি উদার ও সংবেদনশীল ছেলেমেয়েরা প্রায়ই তাদের কিছু সমবয়সীর মনে বিরক্তির উদ্রেক করে। মা-বাবার স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা আর আদরের পরিবেশ থেকে স্কুলে এসে শিশু নিজেকে এক গতিশীল জগতে আবিষ্কার করে। এই জগতে সমস্তকিছুই ঘটছে ভীষণ দ্রুত গতিতে, এবং সময় সময় এই দ্রুততা নিষ্ঠুরতায়ও পর্যবসিত হয়। শিশুর শক্তি পরিপক্ক নাগরিকতায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় সেই নাগরিকতাকে প্রকৃত মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা পরিপূর্ণকরণের মধ্য দিয়ে। এ হচ্ছে স্কুলের শিক্ষাদীক্ষার অন্যতম কর্তব্য।

শত লাঞ্ছনা, লজ্জা আর অবমাননা সত্ত্বেও শিশুকে উচ্চতম মানবিক মূল্যবোধ রক্ষা করতে শিখতে হবে।

স্নেহশীল ও বন্ধুভাবাপন্ন ব্যক্তি গড়তে গিয়ে আপনি ভালো একজন সংসারী লোকেও গড়ছেন।

আমরা যখন নিজেকে প্রশ্ন করি, কীসের জন্য আমরা ছেলেমেয়ে মানুষ করি, আমরা অবশ্যই এরূপ জবাব দিই: সুখের জন্য, শ্রমের জন্য। আমাদের ছোট্ট শিশুটির পাশে ‘পরিবার’ কথাটির মতো এত গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ একটা ধারণা স্থাপন করতে আমাদের কেমন যেন ভয় হয়।

আপনার মেয়ের বয়স যদি এখন ১৫ বছর হয়, তাহলে খুব শিগগিরই তার বিয়ে হতে পারে এবং তারপর সে ছেলেমেয়ের মা হবে। তার অতি গুরুত্বপূর্ণ এই দায়িত্ব দেখার জন্য আপনাকে প্রতিদিন প্রস্তুতি নিতে হবে।

তবে আসল কথা -- শিশুকে আপনার ভালোবাসতে শেখানো উচিত। ভালোবাসা তখনই কেবল সত্যিকার হয় যখন তা ব্যাপ্ত হয় মানুষের ক্রিয়াকলাপের বহু ক্ষেত্রে: শ্রমে, আগ্রহে, মেলামেশায়। ভালোবাসতে শেখানো — তার মানে অক্লান্তভাবে সৌন্দর্য উপভোগ করতে শেখানো।

তার মানে প্রচুর শক্তি নিয়োগ ক'রে ভালো কোনকিছু সৃষ্টি করতে, আপন জনকে আনন্দ দান করতে শেখানো।

আপনার ছেলেমেয়েরা যদি শক্তসমর্থ ও কষ্টসহিষ্ণু হয়, যদি তারা সর্বপ্রকার ক্ষতি স্বীকার ক'রে সর্বদা শক্তিহীনকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে, যদি তারা আপনার অসুখের সময় আপনার সেবাশুশ্রূষা করে, যদি তারা আপনার পরিবারের স্বার্থকে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থাপন করে, তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে এই শুভ সম্পর্কগুলো তাদের নিজেদের পরিবারেও বর্তাবে।

শিশু আসলে যেমন আছে তাকে ঠিক তেমনি রকম নিজেকে দেখতে সাহায্য করুন। দশ জন লোক যদি একই শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে, তাহলে বর্ণনায় বে-মিল থাকবেই। শিক্ষক শিশু সম্পর্কে বলবেন স্কুলে সে কেমন পড়াশোনা করে সেটা বিচার ক'রে। দাদু-দিদিমা তার মধ্যে সর্বাগ্রে লক্ষ্য করবেন সোহাগ আর বাধ্যতা, পরিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা, শ্রমশীলতা ও উদারতা। সঙ্গীসাথীরা সর্বাগ্রে দেখবে, তাদের সমবয়সী মর্যাদার 'দলীয় বিধি' কতটা মানছে। কেউ কেউ বলবে তার মন্দ দিকগুলোর বিষয়ে, আর কেউ কেউ — সদ্‌গুণের বিষয়ে।

ক্রমবর্ধমান মানুষটিকে নিজের বিষয়ে (তার নিজস্ব 'অহং'-এর বিষয়ে) কোন্ সত্যটি জানতে হবে? সে তো দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। আজ সে এক রকম। কাল অন্য রকম। পরশু সম্পূর্ণ ভিন্ন। শিশু আসলে যেমন আছে ঠিক সে বিষয়ে সমগ্র সত্যটি তাকে জানিয়ে দেওয়া — তার মানে তাকে তার প্রকৃত সম্ভাবনা সম্পর্কে বলা, তার মানে তার 'বিকাশের খুঁত' সম্পর্কে তাকে ওয়াকিবহাল করে তোলা, তার মানে শিশুকে আপন আদর্শের দিকে তার গতিটি উপলব্ধি করতে সাহায্য করা।

অনেক ছেলেমেয়েই জানে না, তারা কী করতে সক্ষম। তারা নিজেদের মাপে বা বিচার করে অন্যের কথা দিয়ে। কিন্তু যে-মানুষটি কেবল ভবিষ্যতে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করবে তার ক্ষেত্রে এই মাপ তো প্রযোজ্য নয়।

শিশু স্কুলে সর্বদা ৩ ও ৪ নম্বর পাচ্ছে (সোভিয়েত দেশের স্কুল-কলেজে ৫ হচ্ছে সবচেয়ে ভালো নম্বর। — অনুঃ)। তাই স্কুলে ভাবা হয় (বলাই বাহুল্য, কেউ মুখে কোনকিছু বলে না) যে সে পড়াশোনায় 'এক রকম', প্রায় মাঝারি ধরনের ছাত্র। বাড়িতেও সবাই ভাবে: 'পড়াশোনায় যখন তেমন একটা মাথা নেই তখন কী আর করা...' এ সমস্তকিছুর ভিত্তিতে শিশুর নিজের সম্পর্কেও অনুরূপ ধারণা গড়ে উঠে: 'তার মানে, আমি

জন্মেছিই ওই রকম। জীবনে সবাই তো আর ভাগ্যবান হয় না। ওতে করার কিছু নেই।'

নিজের সম্পর্কে গড়ে উঠা এরূপ ধারণা সঙ্গে সঙ্গে দূর করা যায় না। তবে শিশুকে অবশ্যই এরূপ সুযোগ দেওয়া চাই যাতে সে নিজেকে অন্য আলোতেও দেখতে পারে। তাকে বলা উচিত যে সে 'এক রকম' নয়, মানুষের চেহারা তখনই প্রকৃতভাবে সুন্দর হয়ে উঠে যখন তা উদ্ভাসিত হয় মহৎ অনুসন্ধান, সৃজনী উদ্যম আর শ্রমশীলতার আলোতে।

নিজের সন্দেহ প্রবণতা আর অনাস্থার দ্বারা শিশুকে যন্ত্রণা দেবেন না। 'জানেন, সম্প্রতি আমার মেয়ে প্রায়ই আমায় ফাঁকি দিচ্ছে, — নিজের সন্তানের বিষয়ে অভিযোগ করছেন মা। — এখনও আমায় ফাঁকি দিচ্ছে। আমি তো বুঝি। কোনকিছু হলে মা সব সময়ই তা ধরতে পারে...'

তা ঠিকই। সন্তানের কী হয়েছে তা মা না বুঝলে আর কে বুঝবে। এবং সন্তানেরও হামেশা কিছু-না-কিছু একটা হচ্ছে। অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা। ১২ বছরের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন কত সব অসাধারণ ব্যাপার ঘটে থাকে। একটা মেয়ে তার সবচেয়ে বড় দুঃখের কথাটি বলে এভাবে: 'আমি আমার বান্ধবী ভেরার সঙ্গে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে আমি পড়ে গেলাম। আর ভেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল।' কল্পনা করুন, এ স্রেফ সাথীতে হতাশাই ছিল না। এ ছিল বিরাট দুঃখ। সে কাঁদছিল। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা কাউকে বলতে পারছিল না। মা-ও বলছিলেন যে মেয়ের 'কিছু একটা হয়েছে'। কথা টেনে বার করতে চাইলেন। জোর করলেন। কিন্তু মেয়ে নীরব থাকল। মা'র প্রশ্ন তাকে আরও বেশি মনমরা করে তুলছিল।

শিশুর জীবন সম্পর্কে জানার আগ্রহ থাকাটা দূষণীয় কিছু নয়। তবে শিশুদের সঙ্গে আচরণে অমায়িক হতে পারাটাও প্রয়োজন।

মনে রাখবেন যে শিশুর অনুকরণ ক্ষমতা তার সৃজন ক্ষমতার মতোই স্বাভাবিক। আপনার সন্তান কাকে এবং কী অনুকরণ করছে? নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি নেই? খুবই সম্ভব। সে তাদেরই অনুকরণ করে, যাদের মধ্যে বাস করে: একসঙ্গে সমস্ত সমবয়সীদের। সে চায়, তার সমস্তকিছু যেন সবার মতো হয়। জিন্স, জ্যাকেট, শার্ট, জুতো — সমস্তকিছুই সবার মতো হতে হবে। আর গতিভঙ্গি, কথা বলার ধরন, প্রশ্ন করা, জিজ্ঞাসা করা ও হাসার ধরন — এ সমস্তকিছু সে নিজেই আয়ত্ত করতে চেষ্টা করবে। এ

ব্যাপারে কিন্তু সে সবকিছুই ঠিক জানে ও বোঝে। কোত্থেকে জানল? আবার সেই 'সবার কাছে'।

শিশুরা অনুকরণ না করে পারে না। অনুকরণ ক'রে তারা পরিবেশের পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়ায়।

অনেক ক্ষেত্রেই শিশু অনুকরণ করে অনভিপ্রেতভাবে। যেমন, বই বাছার ব্যাপারে, পোশাক, সঙ্গীত ও আচরণের ধরন বাছার ব্যাপারে। মা-বাবাদের কী করা উচিত? নিজের সন্তানকে বলবেন: 'তুই তোর সমবয়সীদের দেখাদেখি সমস্তকিছু করতে চাস। কিন্তু মানুষের মূল্য অপরকে অনুকরণে নয়, তার স্বকীয়তায়। তোর নিজের যাকিছু সত্যিই পছন্দ হয় তা নিয়ে ভাবতে চেষ্টা কোর। অন্যদের যাকিছুতে অনুকরণ করিস্ তার থেকে নিজেরটাকে আলাদা ক'রে দেখতে চেষ্টা কোর।' তাকে মাথা ঘামাতে দিন। ঘন ঘন ও বিভিন্ন আকারে এ ধরনের প্রশ্ন আর প্রস্তাব উপস্থাপিত করবেন। তা শিশুর মনে কিছু একটা প্রভাব ফেলবেই। এক মা তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন: 'ভালো কথা, এটা তোকে বাবা শিখিয়েছেন, আর এটা — আমি, আর এটা — স্কুলের মাস্টার। আচ্ছা বল তো, নিজে তুই কী শিখেছিস?!' এ হচ্ছে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন।

অতিরিক্ত আদর ও প্রশ্রয় শিশুর পক্ষে অপকারী। শিশুর নিজস্ব মর্যাদা বোধ — তা সর্বদাই পরিবারের জীবনের রীতিনীতির প্রতিফলন। পরিবারের লোকেরা শিশুকে যদি ভালোবাসে এবং তার যোগ্যতা অনুযায়ী অতিরিক্ত প্রশংসা না ক'রে তার চালচলন মূল্যায়ন করে তাহলে সে আপন শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠে। পরিবারে যদি কাউকে উপেক্ষা করা হয় (যেমন, দাদু, দিদিমা আর ছোট ভাইকে উপেক্ষা করা হয়, তাদের নিয়ে হাসাহাসি করা হয়, তাদের কথায় কেউ কান দিতে চায় না, সময় সময় তাদের উচ্চ কণ্ঠে তিরস্কারও করা হয়ে থাকে) তাহলে তা শিশুর শিক্ষাদীক্ষায় খারাপ প্রভাব ফেলবেই। শিশুর জন্য যদি এরূপ নিয়ম করে দেওয়া হয়: 'যা ইচ্ছে তা-ই করুক!', তাহলে তা প্রায়ই ব্যক্তিত্বের কয়েকটি দিককে বিকৃত করে দেয়। ফলে বাড়িতে সমস্তকিছু করতে দেওয়া এবং অন্য পরিবেশে অনেককিছু করতে না দেওয়ার মধ্যে যে-ফাটল দেখা দেয় তা আত্মপ্রত্যয়হীনতা আর নিজে যে অপকৃষ্ট এরূপ ধারণার জন্ম দেয়।

বাবা। শিশুদের শ্রদ্ধা পাওয়ার অধিকার — এর মানেটা কী?

কর্চাক। শিশু হচ্ছে বিদেশী, সে ভাষা বোঝে না, সে কীভাবে রাস্তা চলতে হয়

তা জানে না, নিয়ম ও রীতি-রেওয়াজ সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নেই... তার একজন গাইড প্রয়োজন, যে বিনীতভাবে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবে।

তার অজ্ঞতাকে শ্রদ্ধা করুন!..

উপলব্ধির শ্রমকে শ্রদ্ধা করুন!..

অকৃতকার্যতা ও অশ্রুকে শ্রদ্ধা করুন!..

শিশুর সম্পত্তি ও বাজেটকে শ্রদ্ধা করুন!..

বিকাশের কঠিন কাজের রহস্য ও বিচ্যুতিকে শ্রদ্ধা করুন!..

বর্তমান ঘণ্টা এবং আজকের দিনকে শ্রদ্ধা করুন! আজ যদি আমরা শিশুকে সচেতন ও দায়িত্বপূর্ণ জীবন যাপনের সুযোগ না দিই, তাহলে সে আগামী কাল কী ক'রে বাঁচতে পারবে? পদদলিত করবেন না, কর্তৃত্ব ফলাবেন না, আগামী দিনের দাসত্বের মধ্যে ফেলে দেবেন না, শীতল করবেন না, তাড়াহুড়ো করবেন না ও তাড়া দেবেন না। প্রতিটি আলাদা মিনিটকে শ্রদ্ধা করুন, কেননা তা মরে যাবে এবং আর কখনও তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না, এবং এটা সর্বদা সত্যি: আহত মিনিট থেকে রক্ত পড়বে, নিহত মিনিট খারাপ স্মৃতির অপচ্ছায়া দিয়ে উদ্বিগ্ন করবে। আসুন, শিশুদের সকালের আনন্দ উপভোগ করার ও বিশ্বাস করার সুযোগ দিই। শিশু ঠিক সেটাই চায়।

ধরুন, শিশু গায়ের জ্যাকেটটি বাইরে ফেলে এল, আর প্রাঙ্গণে অন্ধকার ও বৃষ্টি, এবং আপনি তাকে (তার ভয় সত্ত্বেও) বাইরে গিয়ে জ্যাকেটটি খুঁজতে বলছেন। আপনি কিন্তু ঠিকই করছেন, কেননা আপনি শিশুকে তার নিজেরই ভীতি থেকে রক্ষা করছেন। তার নিজেকে সংযত করা এবং সমস্ত ছেলেমেয়ে যে অন্ধকারের ভয়ে ভুগে তা দমন করা উচিত।

শিশু যদি পড়া তৈরি না করে এবং আপনি তাকে এক ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে তুলে দেন (অথচ তার আরও একটু ঘুমানোর ইচ্ছা আছে এবং তাকে জাগাতে আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে), তাহলে তার মানে এ নয় যে ব্যক্তি হিশেবে আপনি তাকে অপমানিত করছেন। বরং উল্টে আপনি ক্লাসে তার রক্ষার জন্য লড়ছেন। সে পড়া জানবে এবং নির্ভয়ে ক্লাসে বসতে পারবে। সম্ভাব্য উপহাস এড়াতে সক্ষম হবে।

ধরুন, রবিবার দিন শিশু তার ঘরটি পরিষ্কার করল না, এবং তা না করা অবধি আপনি তাকে সিনেমায় যেতে দিচ্ছেন না। এমতাবস্থায় আপনি উচিত কাজই করছেন, — এর দ্বারা আপনি তার মধ্যে দায়িত্ব ও শৃঙ্খলা বোধ গড়ে তুলছেন।

দুর্বল মানুষ নয়, শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব গড়তে চেষ্টা করুন।

'শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব' কথাটিতে আমরা দু'টি প্রধান মর্মবস্তু লক্ষ্য করি।

এক দিকে, তা হচ্ছে সুন্দরের পৃথিবীকে (সহৃদয়তা, ন্যায়পরতা, শ্রমের সৌন্দর্য) বোঝা ও উপলব্ধি করার ক্ষমতা, অন্য দিকে — এই পৃথিবীকে রক্ষা করার প্রস্তুতি ও ক্ষমতা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতা। অন্যায় দমন করার ক্ষমতা। এর জন্য চাই বুদ্ধির শক্তি, অনুভূতির শক্তি, ক্রিয়াকলাপের শক্তি এবং সমালোচনামূলক বিচারের শক্তি।

আমরা যখন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের কথা বলি, আমরা অবশ্যই স্বাস্থ্যের সমস্যায় ফিরে আসি। শিশু যদি ছোটবেলা থেকে মজবুত হয়ে উঠে (ভিজে গেলে তার সর্দি লাগে না; সহজে শীত সহ্য করতে পারে; হেমন্ত কালে তাঁবুতে রাত কাটায়; দূর দূরে স্থানে পদব্রজে ভ্রমণ করতে যায়), তাহলে এই মজবুতি তাকে নির্ভীক ও শারীরিক দিক থেকে শক্তিশালী করে তুলবে।

আমরা যখন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের কথা বলি, তখন আমরা মনোবল, নৈতিক অটলতা আর বিশ্বাসের দৃঢ়তার উপর জোর দিই।

আমরা যখন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের কথা বলি, তখন আমরা বোঝাতে চাই বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, মানুষের সৃজনী ক্ষমতা, যা পারিপার্শ্বিক বিশ্বকে উজ্জ্বলতর করে তুলে আর মানুষকে করে তুলে আত্মিকভাবে সমৃদ্ধতর। শিশু যদি বুদ্ধিমান হয়, কৌতূহলী হয় এবং হামেশা 'নিজেকে ও অপরকে হতভম্ব করে', তাহলে তা তার নিজস্ব বিকাশেরই সহায় হবে।

সন্ধ্যা — সে সর্বদা আগামী দিনের ভাবনা। যথাসাধ্য চেষ্টা করুন, আগামী সকাল যেন সুখী ঘটনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

দৈনন্দিন জীবনের কয়েকটি নিয়ম।

বেশি রাত্রে নৈতিকতা বিষয়ক কোন তীব্র আলোচনা শুরু করা উচিত নয়। তা রাত সাত-আটটার মধ্যেই শেষ করতে চেষ্টা করবেন। নিদ্রা যাওয়ার আগে শেষ দু'টি ঘণ্টা ধরে শিশুর শান্ত থাকা উচিত। তখন তাকে আগামী দিনের জন্য প্রস্তুত হতে শেখানো যায়। এ ব্যাপারে খুঁটিনাটি কোনকিছু নেই। শিশু তার বই আর খাতাগুলো গুছিয়ে নিক, পেন্সিল-কলম প্রস্তুত ক'রে রাখুক। স্কুলের পোশাকটি দেখে নিক, এবং প্রয়োজন হলে নিজেই বোতাম সেলাই করুক কিংবা পেণ্টটি ইস্ত্রি করুক। অবশেষে, সবচেয়ে আসল কাজ — সময় মতো শুতে যাওয়া।

শিশু সর্বদা নির্দিষ্ট এক সময়ে নিজের বিছানা পাততে শিখুক। এ ক্ষেত্রেও সেই 'প্রাতঃকালীন' 'আমি নিজে' নামক সূত্রটি পুরোপুরিভাবে কাজে লাগানো উচিত। তবে শিশুকে অতিরিক্ত উত্তেজিত হতে দেওয়া-ও

ঠিক নয়। রাত্রে কোন মতেই হত্যাকাণ্ড তদন্তযুক্ত ডিটেক্‌টিভ ফিল্ম তার দেখা উচিত নয়।

নিদ্রা যাওয়ার আগে শিশুকে কফি বা ঝাল-দেওয়া কোন জিনিস খেতে দেওয়া, হৈ-হল্লা ক'রে খেলতে দেওয়া কিংবা তাকে ভূতপ্রেত আর দস্যিদানবের বিভীষিকাময় কাহিনী বলা নিতান্তই অনুচিত। আপনার পরিবারে যদি কোন সংঘর্ষ বাধে এবং আপনি নিজেদের মধ্যে তার একটা নিষ্পত্তি ঘটাতে চান, তাহলে একটু অপেক্ষা করুন, — শিশুকে ঘুমিয়ে পড়তে দিন। আপনার বাড়িতে বাইরের লোকজন থাকলে শিশুকে সময় মতো শোয়াতে চেষ্টা করবেন।

ঘুমানোর আগে সেরা কাজ হচ্ছে — হাওয়া খেতে বার হওয়া। তখন আগামী দিনের বিষয়ে কথাবার্তা বলা যায়। ওই সময় একটু 'খেলা' করাও সম্ভব। আপনি যদি শিশুকে জিজ্ঞেস করেন: 'এবার কী করা, ঘুমাবি? না তুই আমায় ভূগোলের পড়া বলবি?', সে প্রথমটিই বেশি পছন্দ করবে — ঘুমাতে চাইবে। সে এই চিন্তা মাথায় নিয়ে ঘুমাতে যাক যে কাল সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে তাকে আরও একবার ভূগোলের পড়াটি দেখতে হবে।

শিশুকে এক কথায়, এক স্পর্শনে নতুন শক্তি ও অনুপ্রেরণা জোগাতে পারাটা কত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। হয়তো এই শব্দগুলোতে এরূপ একটি সুর শোনা যাবে: 'আজ তুই অনেককিছু করেছিস। এমনকি আমিও অবাক হচ্ছি, কী ক'রে তুই এতকিছু করতে পারলি। ...তবে অবশ্য চেষ্টা করলে কাজটি তুই আরও ভালো ক'রে করতে পারতিস...'

এরূপ স্পর্শনে শিশু কোন কাজ ঠিক মতো করতে না পারার জন্য আপনার যে-পরিতাপ রয়েছে সম্ভবত তা অনুভব করতে পারবে।

আপনার ক্রিয়াকলাপে এমন এক গতি থাকা চাই যা শিশুকে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত করবে: 'আমার মা আমায় বোঝেন, সেজন্য আমি তাকে কত ভালোবাসি। ...কাল অবশ্যই আমি তাঁর কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করব আমি কী করতে সক্ষম, তাঁর আস্থা রক্ষা করব...'

প্রশিক্ষণবিদ্যায় সুদীর্ঘ কাল ধরে একাধিক বার জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে ক্রিয়াকলাপ — এবং একমাত্র ক্রিয়াকলাপই — ব্যক্তিত্ব গঠন করে। তা না মেনে পারা যায় না। তবে ক্রিয়াকলাপ কথাটিতে সেই আন্তরিক মেলামেশাও থাকুক যা নৈতিক বিধিসমূহ আয়ত্তকরণে, পিতামাতার প্রতি আপন

কর্তব্য উপলব্ধি করতে এবং মন ও প্রাণ দিয়ে উচ্চ নৈতিক আদর্শাবলি অর্জনে সহায়তা করে।

এই আদর্শে পেঁছার পথ হচ্ছে — ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সহৃদয় ও দাবিযুক্ত সম্পর্ক, শিশুর সৃজনী শক্তিতে বিশ্বাস।

বিকাশ এবং শিক্ষাদীক্ষার পথে বাধাবিপত্তি

বয়সের সঙ্কট কাল

ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রক্রিয়ায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু পর্যায় রয়েছে যা বস্তুত প্রতিটি শিশুকেই অতিক্রম করতে হয়। মানুষের গঠনের এই চূড়ান্ত পর্যায়গুলোকে সাধারণত বয়সের সঙ্কট কাল বলে অভিহিত করা হয়, কেননা ওগুলো নির্দিষ্ট বয়সের সঙ্গে জড়িত।

— শিক্ষাদীক্ষার একই ধরনের পদ্ধতি এক ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ, আর অন্য ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ নয়। তা কেন হয়?

— তা হয় এই জন্য যে আমরা মা-বাবারা বিভিন্ন রকমের, এই জন্য যে ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন রকমের, এবং এই জন্য যে প্রতিটি পরিবারের জীবনের ধরন বিভিন্ন রকমের। এই পরিবারে মা একা মেয়েকে মানুষ করছেন, কাজটি মোটেই সহজ নয়। অন্য পরিবারে — মাকে সাহায্য করছেন দাদু-দিদিমা, তবে এখানেও তেমন ভালো ফল মিলছে না। কখনও গুরুতরভাবে অসুস্থ হন মা অথবা বাবা, আর কখনও অসুস্থ থাকে শিশু।

— বিভিন্ন রকমের ছেলেমেয়ে, বিভিন্ন রকমের পরিবার। ...লোকে সম্ভবত ঠিকই বলে: যতগুলো পরিবার ততগুলো সমস্যা। কিন্তু আমরা মা-বাবারা যখন এই সমস্ত সমস্যা সমাধান করি, আমরা কি সর্বদা ঠিক?

২ থেকে ৪, ৭ থেকে ৯ এবং ১৩ থেকে ১৬ বছর অবধি বয়স কালে শৈশবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কটগুলো দেখা দেয়। ওই সময় দেহযন্ত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু পরিবর্তন ঘটে। তার মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিগোচর পরিবর্তনটি হচ্ছে — দ্রুত বাড়। বাড় চড়ার সময় কার্ডিওভাস্কুলার ব্যবস্থা, শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যবস্থা, স্নায়ু ব্যবস্থা ও অন্যান্য ব্যবস্থার উপর অধিকতর চাপ

পড়ে। বিভিন্ন দৈহিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সাময়িক অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। তার ফলে অসাধারণ অভ্যন্তরীণ অনুভূতি, অধিকতর শ্রান্তি আর বিরক্তির আবির্ভাব ঘটে। মনের অবস্থা সব সময় বদলায়। তখন ছেলেমেয়েদের অসুখ করার সম্ভাবনা বেশি এবং তারা অল্প কিছুতেই ভীষণ আঘাত পায়। ঠিক ওই বয়সগুলোতেই লোকে সাইকোনিউরোলোজিস্টদের কাছে সাহায্য চায় সবচেয়ে বেশি। পরীক্ষার পর দেখা যায় যে অধিকাংশ শিশুই বস্তুতপক্ষে সুস্থ। কিন্তু মা-বাবাদের উদ্বেগও বুঝতে হয়: শিশুর আচরণ ভীষণ বদলে যাচ্ছে, সে অবাধ্য হয়ে উঠছে। তদুপরি প্রতিটি বয়সের সংকট কালের আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

২ থেকে ৪-৫ বছর বয়স অবধি অধিকাংশ শিশুর চরিত্রেই একগুঁয়েমি আর অবাধ্যতা দেখা দিতে শুরু করে। ৭ থেকে ৯ বছর বয়সের মধ্যে আত্মমূল্যায়নে প্রথম দোদুল্যমানতা আসে: 'বাড়িতে আমি ভালো, স্কুলে খারাপ।' অথবা: 'বাড়িতে আমি খারাপ, স্কুলে ভালো। কিন্তু আসলে আমি কীরূপ?' কৈশোরে চরিত্রে আরও কিছু নতুন জটিলতা দেখা দেয় — ধৃষ্টতা, মাননীয় ব্যক্তিদের প্রতি অবহেলা, অবাধ্যতা... আর তার উপর আছে যৌন পরিণতির সঙ্গে জড়িত পরিবর্তনও। ভালোবাসা, আনুগত্য, জীবন এবং মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তাভাবনা — মানব সত্তার দর্শনের প্রতি প্রথম আগ্রহ।

তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উপরোক্ত সংকটজনক বয়সগুলোর অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চরিত্রের পরিবর্তন, যা আচরণের স্বাভাবিকতা নষ্ট করতে পারে। কিন্তু এ হচ্ছে সমস্যার কেবল একটি দিক (যদিও তা মা-বাবাদের জন্য হয়তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক)। সংকট কালের অধিকতর অভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলি হিশেবে গণ্য হতে পারে শিশুর অভ্যন্তরীণ জীবনের নতুন গুণ, তার আচরণের নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহের উৎপত্তি ও গঠন।

শিশু সত্যিই বিকাশ লাভ করছে, বড় হচ্ছে, এবং তার চরিত্রে নতুনের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। গঠনরত ব্যক্তিত্বের জটিলতা আর সমৃদ্ধির পর্যায়টি সর্বদা নির্ঝঞ্ঝাট নয়। কিন্তু অন্য রকম হতেও পারে না। শৈশব — তা স্রেফ খেলাধুলা আর দুরন্তপনাই নয়, তা — শিক্ষাও। শিশু তার অজানা এক পৃথিবীতে প্রবেশ করে, এবং অটলভাবে তার জটিলতাসমূহ উপলব্ধি করতে থাকে। সেই জন্যই ভুলভ্রান্তি এবং পুনর্মূল্যায়ন ঘটবেই।

সংকটজনক সময়ের জটিলতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমরা অনিচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যার কথা ভাবি — কীভাবে শিশুকে

'কাবু' করা যায়, আর খোদ শিশুর অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলি যেন আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়। তাই শিশু যদি হাসিখুশি ও সন্তুষ্ট থাকে এবং জেদ না করে তাহলে বুঝতে হবে, যেন কোন সংকটই নেই।

এখানে অবশ্য আপত্তি ক'রে বলা যেতে পারে যে এমতাবস্থায় সঙ্কট কাল সম্পর্কিত ধারণাটি অত্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়ে উঠে। শিশুর মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে নতুন কোনকিছুর আবির্ভাব ঘটে এবং সে সব সময় সংকটের অবস্থায় বাস করে; আর যেহেতু নতুনের জন্ম সর্বদা হয় বাধাবিপত্তির মধ্যে সেই হেতু আমরা এরূপে সিদ্ধান্তে উপনীত হই: শিশু হওয়া কত কঠিন!

শিশু বিকশিত হয় নিরবচ্ছিন্নভাবে, এবং সেই সঙ্গে অসমমাত্রিকভাবেও। স্বল্প দৃষ্টিগোচর পরিবর্তনগুলো সঞ্চিত হয়ে নতুন গুণাবলির জন্ম দেয়। বাইরে থেকে তা বিকাশের ক্ষেত্রে এক ধরনের লম্ফের মতো দেখায়। নবায়ন সাধনকারী এরূপ লম্ফকে সংকটজনক পর্যায় বলে অভিহিত করা যায়।

কিন্তু এখানেও প্রশ্ন দেখা দেয়। কী ধরনের লম্ফের বিষয়ে বলা হচ্ছে? একমাত্র সেগুলোর বিষয়ে যা দেহযন্ত্রে বহুমুখী পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল, অথবা সেগুলোর বিষয়েও যা কেবল ক্রিয়াকলাপ ব্যবস্থার (ফাঙ্কশোন্যাল সিস্টেম) সঙ্গে — কথা বলা, হাঁটা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত?

এ ব্যাপারে একাধিক মতবাদ আছে। কিছু গবেষকরা মনে করেন, যেকোন ক্রিয়াকলাপের গঠনে — হোক তা গতি, দর্শন বা শ্রবণ ভিত্তিক উপলব্ধি, ভাষা অথবা মনন — নিজস্ব সঙ্কটজনক পর্যায় রয়েছে, এবং অবিশেষজ্ঞের কাছে তা সর্বদা বোধগম্য ও দৃষ্টিগোচর নয়। অন্য গবেষকরা সংকট বলতে কেবল ক্রিয়াকলাপের শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিকসমূহের ক্ষেত্রে ঘটমান সামূহিক পরিবর্তনই বুঝেন। এখানে সবচেয়ে সুস্পষ্ট হচ্ছে — ২ থেকে ৪ এবং ১৩ থেকে ১৬ বছর অবধি পর্যায়গুলো।

তাব এরূপে মতবাদও আছে যা অনুসারে সংকট কাল — এ ততটা পরিবর্তন ও নবায়ন নয়, যতটা ক্রিয়াকলাপের নতুন পদ্ধতি, নতুন অভিজ্ঞতা রপ্তকরণের জন্য সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রস্তুতি। শিশু জন্মসূত্রে অসহায়, তাকে সমস্তকিছু শিখতে হবে। প্রত্যেক ধরনের অভিজ্ঞতার জন্য বিশেষ অনুকূল সময় আছে যখন তা সবচেয়ে ফলপ্রসূভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। যেমন ধরুন, জীবনের প্রথম ৩-৪ বছর যদি শিশুর ভাষা বিকাশের দিকে মনোযোগ

দেওয়া না হয় তাহলে পরবর্তী কালে এই ক্রিয়াকলাপ গঠনের ব্যাপারে অনেক বেগ পেতে হবে।

— আমার তিন সন্তান। আমি একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছি: প্রায় ৩ বছর বয়সে প্রতিটি বাচ্চাকে যেন কেউ বদলে দেয়। সে একগুঁয়ে, অবাধ্য আর খামখেয়ালী হয়ে উঠে, তবে বছর বাদে সবই স্বাভাবিক হয়ে যায়। ব্যাপারটি আসলে কী?

— ২ থেকে ৪ বছর অবধি সমস্ত শিশুর প্রথম শারীরিক সংকট কাল চলে। ওই সময় ভেজেটেটিভ ও এন্ডোক্রিনিক ব্যবস্থাগুলোর পুনর্গঠন চলতে থাকে, দেহ দ্রুত লম্বা হয়, অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি ঘটে, স্নায়বিক-মানসিক গঠনে পরিবর্তন আসে। ওই সময় (এবং মা-বাবাদের তা মনে রাখা উচিত) স্নায়বিক-মানসিক রোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

আমরা যে-মতই গ্রহণ করি না কেন, একটি জিনিস কিন্তু অপরিবর্তিত থেকে যায়: ওই পর্যায়গুলোতে আমাদের সঠিক কিংবা বে-ঠিক শিক্ষামূলক প্রভাবের সুদূর প্রসারী পরিণাম থাকতে পারে।

শিশু নবীন হচ্ছে... আর মা-বাবারা? কোন্ ব্যাপারটিকে সংকট বলে গণ্য করা উচিত সে সম্পর্কে যে-তর্কটি চলছে তা স্রেফ তত্ত্বগত কিছু নয়। তার অনেক ব্যবহারিক তাৎপর্যও আছে। মা বা বাবার পক্ষে শিশুর আচরণে কেবল বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে পারাটাই যথেষ্ট নয়, এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের হেতুও তাঁদের বোঝা দরকার। তদুপরি, ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত থাকা উচিত এবং শিশুকেও প্রস্তুত করা প্রয়োজন। যদি চার বছরের শিশু আমাদের চোখের সামনে অতি দ্রুত স্বার্থপর হয়ে উঠে, তখন হতবুদ্ধি হওয়াটা আশ্চর্যের কিছু নয়। আমরা তো মোটেই তা চাই নি! কিন্তু শিশুর মধ্যে স্বার্থপরতার প্রবণতা আগে থেকেই দেখা সম্ভব ছিল — এরূপই হচ্ছে বিকাশের নিয়ম। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রথম বার শিশুর মধ্যে দেখা দেয় সরল, অতিরঞ্জিত ও সময় সময় কিছুটা ব্যঙ্গের আকারে। যেমন, আমাদের অধিকাংশই নিজেদের স্বার্থপর মনে করে না। আমরা চাই না, অন্যরা আমাদের সম্পর্কে সেরূপ ভাবুক। কিন্তু কে বলতে পারে যে সে নিজেকে মোটেই ভালোবাসে না, নিজের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন? তাছাড়া অনুরূপ মনোভাব যুক্তিসঙ্গতও কি না? যেমন, সামাজিক মনস্তত্ত্ব প্রমাণ করে, যে-সমস্ত লোকের আত্মমর্যাদা বোধ কম এবং যারা নিজের মূল্য অল্পই বোঝে, তারা

আপন কর্মিদলে তেমন সম্মান পায় না এবং কর্মক্ষেত্রে প্রায়ই স্বল্পফলপ্রসূ হয়ে থাকে। তাই নিজের প্রতি ভালো মনোভাব পোষণ করা — সে হচ্ছে অতি গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যাপার। আর ছোট্ট শিশু নিজের প্রতি 'প্রথম প্রেমের' সময়ে সরল ও অকপট হয়: 'আমি সবচেয়ে ভালো! নিজের প্রতি ভালোবাসা দাবি করছি! তোমরা আমার পূজো কোরো!'

সঙ্কট কালে ঘটমান জীবতাত্ত্বিক ও শারীরিক পরিবর্তনাদি সর্বদা চোখে পড়ে না। চরিত্রে ও আচরণে যে-সমস্ত পরিবর্তন ঘটে তা অনেক সহজে প্রকটিত হয়। এমনকি যৌন পরিণতিও প্রায়ই নিজের সম্পর্কে গোড়াতে জানান দেয় দৈহিক লক্ষণের মাধ্যমে নয়, মনস্তাত্ত্বিক লক্ষণের মাধ্যমে। আমরা সর্বদা তা সঠিকভাবে বুঝি না এবং বোঝার জন্য নিজেরা মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতিও নিই না। ছেলের গোঁফ উঠছে দেখে আমরা ঠিক করি যে তার যৌন পরিণতি শুরু হয়েছে। অথচ ভেতরে ভেতরে তার পরিবর্তন শুরু হয়েছে তারও আগে! সম্ভবত, সে নিজেও জানতে পারে নি তার কী ঘটছে।

এই ভাবে, সঙ্কট কালের জন্য পারস্পরিক বা দ্বিপাক্ষিক প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। অথচ ঘটমান ব্যাপারাদির অনির্দিষ্টতা ও অবোধ্যতা আমাদের প্রায়ই ভীত করে। এমতাবস্থায় শিশুর সম্পর্কে কী-ই বা বলা যায়? সে তো যাকিছু ঘটছে তা একেবারেই বুঝতে পারে না এবং তার সবচেয়ে আপন লোকেরা — মা-বাবা — তাকে মোটেই বোঝে না বলে সে দ্বিগুণ বেশি কষ্ট ভোগ করে।

ব্যক্তিত্ব গঠনে সঙ্কটজনক বয়সের সঙ্গে জড়িত অসুবিধাগুলো সময় সময় দেখা দেয় খোদ সঙ্কটের জন্য নয়, তার অভিব্যক্তিতে আমাদের প্রতিক্রিয়ার ফলে। শিশুর গুণাগুণ বিচারে নিরপেক্ষতার অভাব হেতু আমাদের প্রতিক্রিয়া নির্ভুল হয় না। তা খুবই বোধগম্য। মা-বাবার পরিচিত বিশেষ প্রশিক্ষণ পদ্ধতিগুলো ভালোবাসা, আক্ষেপ (যদি কোন ভুল হয়ে থাকে), উদ্বেগ আর হতবুদ্ধিতার কাছে প্রায়ই হার মানে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সঙ্কট কালের জন্য প্রস্তুত থাকলে ঘটনা প্রবাহের যুক্তিসঙ্গত মূল্যায়ন আমাদের দুশ্চিন্তার দরুন তেমন একটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

শিশুর জীবনের প্রথম বছরগুলো। সঙ্কটের পর্যায়গুলোতে আমাদের সামনে থাকে একাধিক মনস্তাত্ত্বিক ফাঁদ, মনস্তাত্ত্বিক বাধা। আমাদের প্রায়ই কেবল শিশুর প্রতিরোধ আর অবোধ্যতাই নয়, নিজের ব্যক্তিগত প্রতিরোধ আর অবোধ্যতাও অতিক্রম করতে হয়। ব্যাপারটি যাতে আরও পরিষ্কার

হয়, সেজন্য খুবই অজটিল একটি সংকটজনক পর্ব বিচার করে দেখা যাক। সে হচ্ছে হাঁটতে শেখার পর্ব।

শারীরবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে হাঁটা হচ্ছে খুবই জটিল এক প্রক্রিয়া, এমনকি বিশেষজ্ঞদের কাছেও তা পুরোপুরিভাবে বোধগম্য নয়। তবে শিশুর মনস্তাত্ত্বিক অসুবিধাগুলো অতি সাদাসিধে, আর আসল কথা, আমাদের নিজস্ব প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট স্পষ্ট। শিশু প্রথম বার পদক্ষেপ করে। তাতে আমরা আনন্দিত হই, তা দেখার জন্য আমরা অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের ভয়ও হয়: হঠাৎ যদি শিশু পড়ে যায়, চোট লাগবে। তবে উৎকণ্ঠা বোধ এখানে যাকিছু ঘটছে তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে বাধা দেয় না। বলাই বাহুল্য, এখানে কিছু সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়, তবে প্রত্যেক মা বা বাবা নিজের ভয় দমন ক'রে ঘন ঘন শিশুকে স্বনির্ভর ক্রিয়াকলাপে প্রণোদিত করেন: চেষ্টা কোরো, ঝুঁকি নাও, উন্নতি লাভ কোরো। আমাদের মধ্যে অনেকেই তখন এমনকি জানেও না যে শিশু যদি এই সঙ্কটজনক সময়ে হাঁটতে না শেখে, তাহলে পরে তা শিখতে অনেক কষ্ট হবে। সময় হয়েছে — কাজ করা দরকার। শিশু হাঁটছে আনাড়ির মতো, অনিপুণভাবে — এক কথায়, কুৎসিতভাবে। কিন্তু তা-ও আমাদের বিভ্রান্ত করে না। সে ভয়ঙ্কর কিছু নয়! আসল কথা — শুরু করা! আরও একটি লক্ষণীয় ব্যাপার: শিশুকে কীভাবে হাঁটতে শেখানো যায় আমরা এমনকি তা জানিও না। অবশ্য বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে: 'সোজা হয়ে চলো, কুঁজোটে হয়ো না, মাথা সোজা রাখো, পা বাঁকাবে না!' কিন্তু শিশু পরামর্শের অর্থ বোঝে না (সে নিজের জন্য হাঁটে, গতির সৌন্দর্যে সে মোটেই আগ্রহী নয়), এবং পরামর্শ মতো কাজ করা তার পক্ষে সম্ভবও নয়। আমরা যে পদ্ধতিগুলোর আশ্রয় নিই তার মধ্যে প্রধান হল — সমর্থন, অনুমোদন, অকৃতকার্যতায় সান্ত্বনা দান এবং অবশ্যই খেলা (কে তাড়াতাড়ি পারে, কার বেশি জোর আছে ইত্যাদি), অর্থাৎ যৌথ ক্রিয়াকলাপ।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে এই গোটা পরিস্থিতিতে মা-বাবার আচরণ বস্তুত নিখুঁত: উপলব্ধি, স্বজ্ঞা, কৌশলতা, উপস্থিত বুদ্ধি সবই আছে। কিন্তু শিশু বড় হচ্ছে, এবং আমাদের প্রশিক্ষণ বোধ হঠাৎ আমাদের পরিত্যাগ করে। ব্যাপার কী? ব্যাপারটি সম্ভবত এই যে আমরা প্রায়ই নিজেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি: শিশু ছোট্ট, তবে পূর্ণাধিকারী মানুষ থেকে কখনও পরিণত হয় ভালোবাসার বস্তুতে, আর কখনও 'শিক্ষাদানের ইউনিটে'।

তাহলে ঘটমান সমস্তকিছু সম্পর্কে আমাদের সেই মানবীয় উপলব্ধিটি কোথায়, যা হাঁটিতে শেখার সময় এত স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হয়েছিল?

— আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের বেশি লাই দিই। সম্ভবত সেই জন্যই ছোটবেলা থেকে তারা জেদী ও একগুঁয়ে হয়ে উঠে। যা প্রয়োজন তা হল একটু বেশি কঠোরতা এবং শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে একটু কম পারিবারিক তর্কবিতর্ক। সারা জীবন কষ্ট ভোগ করার চেয়ে একবার ঠিক মতো শাস্তি দেওয়া অনেক ভালো!

— দু'-তিন বছর বয়সের শিশুর একগুঁয়েমি — খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তাতেই নিহিত রয়েছে বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কটজনক পর্বের তাৎপর্য। আর একগুঁয়েমি প্রকাশের মাত্রা নির্ভর করে প্রশ্রয়ের পরিমাণের উপর। তবে ছোট্ট শিশুর একগুঁয়েমি পুরোপুরিভাবে দমন করা অনুচিত: শৈশবের প্রাথমিক একগুঁয়েমি থেকে গড়ে উঠে সাবালকের লক্ষ্যনিষ্ঠতা ও আত্মনির্ভরশীলতা।

সত্যিই, ২-৪ বছরের শিশুর অতি গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কট কালে আমাদের আচরণ কীরূপ হয় সে দিকে একবার দৃষ্টি দেওয়া যাক। এই পর্যায়ে শিশুর ক্ষেত্রে কী ঘটে? অধিকাংশ শিশু-মনস্তত্ত্ববিদ এই মত পোষণ করেন যে নির্দিষ্ট পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক পরিবর্তন ছাড়াও গঠিত হয় 'অহং' বোধ, নিজের ব্যক্তিত্ব ও নিজের সমগ্র সত্তার অনুভূতি। শিশু যেন সেই ঐন্দ্রজালিক 'আমি আছি!' ধারণাটির ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠে, এবং সে সর্বতোপায়ে নিজের অস্তিত্বের কথা জানাতে চেষ্টা করে। এবার প্রথম স্থানে — 'আমি': 'আমি চাই, আমি চাই না, আমি নিজে, আমি ভালো, আমি ভয় করি...'। ব্যক্তিত্বের প্রথম সমস্যাগুলোতে থাকে বাসনার সরল আত্মকেন্দ্রিকতা। সে একগুঁয়ে, কারণ তার বাসনাই হচ্ছে তার কাছে সবচেয়ে প্রধান জিনিস। সে জেদী, কেননা তার বাসনা পরিবর্তনশীল। সে প্রশংসা আর বাধ্যতা দাবি করে, কেননা সে খুব ভালো এবং তাকে সবার ভালোবাসা উচিত। এই একই কারণে সে হিংসুক ও ঈর্ষালু হতে পারে। নিজের সম্পর্কে উদ্বিগ্নতায় প্রায়ই অমূলক ভয় থাকে: সে যা জানে না এবং যা তার পছন্দ হয় না তা তাকে ভীত করে। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ক্ল্যাসিকেল উপায়গুলো হচ্ছে — চিৎকার, বিক্ষোভ, অশ্রু, আর সময় সময় তোষামোদ। চতুর ভণ্ডামিও দেখা যায়।

অনেকেরই সম্ভবত শিশুর এরূপ 'মডেল' পছন্দ হয় না। এখানে অবশ্য এটা বলে রাখা যায় যে সমস্ত শিশুর ক্ষেত্রে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু যদি সবার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা না যায়, তাহলে এ সমস্তকিছু কি স্বাভাবিক?

মার্জিত বড় কারোর দৃষ্টিতে তা অবশ্য ভালো নয়। কিন্তু ২-৪-৫ বছর বয়সে শিশুর ব্যক্তিত্বের কাঠামো শিশুর আঁকা ছবির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যাতে অনুপাতে গরমিল থাকে, আর বিভিন্ন রঙ সন্ধিস্থলে মিশ খায় না। কালো — কালোই, লাল — লালই। সমস্তকিছু পরিষ্কার। কেবল পরবর্তী কালেই শিক্ষাদীক্ষা এবং জীবন বহিঃরেখাগুলোকে অধিকতর সুন্দর আর রঙের মিলকে অধিকতর সূক্ষ্ম করে তুলে। তাই কেন আমরা এ কথাটি ভাবতে পারি না যে স্বার্থপরতা থেকে গড়ে উঠে আত্মসম্মান, একগুঁয়েমি থেকে গড়ে উঠে এত প্রয়োজনীয় অটলতা, জেদ থেকে — অনুভূতির নমনীয়তা, প্রশংসা লাভের চাহিদা থেকে — লোকের কাছে পছন্দ হওয়ার ও তাদের কাছে উচ্চ মূল্যে পাওয়ার বাসনা। অবশেষে, ভয়ও কিয়ৎ পরিমাণে প্রয়োজনীয়। বিপদ বোধ তেমন অপকারী কিছু নয়, তা প্রায়ই আমাদের — বড়দের — নানা দুর্ঘটনা এড়াতে সাহায্য করে। তবে চিৎকার, অশ্রু আর ভণ্ডামি — এ সমস্তকিছু হচ্ছে একটু বাড়াবাড়ি।

আমাদের প্রত্যেকে কিন্তু ঘটনা প্রবাহের এরূপ পরিবর্তন দেখার জন্য প্রস্তুত নয়। সেই জন্যই শিশুর স্বার্থপরতা, জেদ আর একগুঁয়েমিকে আমরা মোটেই হাঁটিতে গিয়ে অনিবার্য পতন ও চোট বলে গণ্য করি না, খারাপ কোনকিছু বলে গণ্য করি, এবং তার বিলোপ ঘটাতে সচেষ্ট হই।

আমরা ইতিমধ্যে ভুলে গেছি যে এই কিছুকাল আগেও শিশুর হয়ে কোনকিছু করার কথা আমাদের মাথায়ও আসত না। আর এখন আমরা তার হয়ে তার খেলনাগুলো মেঝে থেকে তুলি, তাকে চামচ দিয়ে খাওয়াই। ও যে এখনও ছোট! তাছাড়া, নাকে মুখে গায়ে পরিজ লেগে যেতে পারে। প্রসঙ্গত, অনেক মা-বাবার ভয় থাকে, শিশু যেন খেতে গিয়ে হাতমুখ কাপড়জামা নোংরা না করে ফেলে। তবে এরূপ ভয় অমূলক। আমরা তো আর চুণকাম মিস্ত্রিকে বলি না যে কাজের সময় তার পোশাকে যেন একফোঁটা রঙও না পড়ে, আর খনি শ্রমিককে বলি না যে তার মুখে যেন একটি কালো দাগও না লাগে। শিশুও তো কাজ করছে — সে পারিপার্শ্বিক বিশ্বকে উপলব্ধি করছে, এবং উপলব্ধি করছে সক্রিয় ক্রিয়াকলাপে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাহায্যে। পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস অবশ্যই থাকা দরকার। কিন্তু এক বছরের শিশু যেমন বোঝে না কুঁজো হয়ে চলা কেন ভালো নয়, তিন বছরের বাচ্চাও তেমনি পারিপাট্যের কথা ভাবে না।

২-৪ বছর বয়সের শিশুকে ব্যক্তিগত উদাহরণের দ্বারা আমরা সচেতনভাবে খুব কম প্রভাবিত করি এবং ক্বচিৎ তাকে যৌথ ক্রিয়াকলাপে

আকৃষ্ট করি। সময় সময় আমরা এমনকি ভুলেও যাই যে আমাদের ব্যক্তিগত উদাহরণ শিশুর পক্ষে আগেরই মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ। সেই জন্যই হঠাৎ দেখা যায় যে শিশু তুচ্ছ ব্যাপারে (মায়ের মতো) উঁচু গলায় কথা বলছে, অথবা রেগে গিয়ে (বাপের মতো) টেবিলে ঘা মারছে। যৌথ ক্রিয়াকলাপও সর্বদা আমাদের পছন্দ হয় না। প্রত্যেকেই বোঝে এখানে আমাদের জন্য কত অপ্রীতিকর ব্যাপার রয়েছে: শিশু প্লেটটি ভেঙে ফেলতে পারে, প্রয়োজনীয় স্ক্রুটি হারিয়ে ফেলতে পারে, দরকারী কাগজটি নষ্ট করে দিতে পারে। আমরা এখানে অনিচ্ছাকৃতভাবে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিই।

প্রথম শ্রেণীর ছাত্রের পরস্পরবিরোধী ভূমিকা। শিশুরা দ্রুত বিকাশ লাভ করে, এবং সেই জন্য প্রায়ই এমনও ঘটে যে এক সঙ্কটজনক পর্বের অসুবিধাগুলো পরবর্তী বয়সের সংকটের জন্য পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। তা বিশেষ স্পষ্টরূপে প্রকটিত হয় অল্প বয়সের স্কুল ছাত্রদের ক্ষেত্রে। স্কুলে ভর্তি হওয়া — সে হচ্ছে চিন্তাহীন শৈশব থেকে দায়িত্ববোধে পরিপূর্ণ শৈশবের দিকে গুরুত্বপূর্ণ এক পদক্ষেপ। শিশুকে তখন নতুন পরীক্ষার জন্য, নতুন জীবন ধারার জন্য মনের দিক থেকে প্রস্তুত হতে হয়। এখানে কেবল মানসিক বিকাশের যথোচিত মানই যথেষ্ট নয়, নৈতিক গুণাবলি আর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাও প্রয়োজন।

শিশু জীবনে প্রথম বার স্কুলের পথে রওয়ানা দিয়ে কত মধুর স্বপ্ন দেখে। কিন্তু পরে দেখা যায় যে সময় সময় স্কুলে খুব একটা মজা নেই, আর ক্লাসগুলো কখনও কখনও একঘেয়ে। বোঝা দায়, এ সমস্তকিছু কীসের জন্য। তার উপর আবার পুরো একটি পিরিওড চুপচাপ বসে থাকতে হয়! কিন্তু এখানেই ঝামেলার শেষ নয়। স্কুলের দিদিমণি আর ছেলেমেয়েরা — তাঁদের নিয়ে আরও বড় সমস্যা। পাটীগণিতের সূত্র মুখস্থ করা যায়, অঙ্ক নিজে নিজে করা সম্ভব, — অসুবিধা হলে বাড়িতে মা-বাবা দেখিয়ে দেবেন; কিন্তু দলের মধ্যে শিশু একাকী অনেকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হয়।

দেখা দেয় ভালো ও খারাপ ছাত্রছাত্রী, তবে শিক্ষিকা ও খোদ ছাত্রদের মূল্যায়ন এখানে সর্বদা মিল খায় না। শিশুর বিশ্বানুভূতি সময় সময় দ্বিখণ্ডিত হতে শুরু করে: মা-বাবা ও শিক্ষক তাকে এক রকম উপদেশ দেন, আর স্কুল জীবন তাকে অন্য জিনিস শেখায়। পিছিয়ে-পড়া, দুর্বল

ও অপটু ছাত্রদের দলে অন্তর্ভুক্ত হতে কি ভালো লাগে? এমনকি অনেক বয়ঃপ্রাপ্ত লোকেও অকৃতকার্যতার সময় নিজের সমস্ত শক্তি একত্র এক ক'রে সাফল্য অর্জনে সক্ষম নয়। তাহলে শিশুর বিষয়ে কী-ই বা বলা যায়? সে মনমরা ও বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, কান্নাকাটি আরম্ভ করে, সকালে স্কুলে যেতে চায় না, সামান্য সুযোগ পেলেই পড়াশোনায় ফাঁকি দেয়। অথবা কখনও কখনও এই নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে: 'সেরা ছাত্ররাই সেরা নম্বর পাবে, আর আমি খারাপ ছাত্র, তাই খারাপ নম্বরই তো পাব!.. যত চেষ্টাই করি না কেন কোথাও-না-কোথাও ভুল হবেই!'

মনস্তত্ত্ববিদদের ভাষায়, শিশু তখন নির্দিষ্ট সামাজিক ভূমিকা আয়ত্ত করতে শুরু করে, যেমন, সেরা ছাত্রের ভূমিকা, মাঝারি ধরনের ছাত্রের ভূমিকা, নিষ্কর্মার ভূমিকা ইত্যাদি। এই প্রক্রিয়াটি জটিল এবং সময় সময় কষ্টদায়ক। বস্তুত তাতেই নিহিত রয়েছে সঙ্কটজনক পর্বের তাৎপর্য।

এমন এক শিশুর কথা ভাবা যাক যে বাড়িতে সবার ভালোবাসার পাত্র। অত্যধিক স্নেহশীল ও উদার মা-বাবা সংবেদনশীলতা, আত্মসমালোচনা ও আত্মসংযম কী জিনিস তা তাকে কখনও শেখান নি। কল্পনা করতে কষ্ট হয় না, স্কুলে এরূপ শিশুর অদৃষ্টে অনেক দুর্গতি আছে! বাড়িতে সে সবার মনোযোগের কেন্দ্রস্থলে থাকতে অভ্যস্ত, কিন্তু স্কুলে শিক্ষয়িত্রী এমনিতেই তাকে ফার্স্ট বয় ও সবচেয়ে ভালো ছেলে বলে মেনে নিতে পারেন না — তা কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করতে হবে। পরিশেষে, বাড়িতে সে সর্বদা হুকুম দিত, কিন্তু স্কুলে এমন ছেলেমেয়ে অনেক আছে যারা তার হুকুম তামিল করতে মোটেই প্রস্তুত নয়। সংঘর্ষ বাধে। শিশু কীভাবে তা থেকে বেরিয়ে আসবে? সম্ভবত, তাকে নতুন ভূমিকা বাছতে হবে, নিজের স্বভাব বদলাতে হবে। কিন্তু তা সহজ কাজ নয়: শিশু যেরূপ আছে সে ঠিক সেরূপই থাকতে অভ্যস্ত।

জীবন থেকে দেখা গেছে যে অনুরূপ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রকমের সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব (অবশ্য 'সমাধান' কথাটা এখানে খুব একটা খাটছে না, কেননা অল্পবয়সী ছাত্র এখনও সুস্পষ্টরূপে কর্তব্য স্থির করতে ও ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে সক্ষম নয়)। যেমন ধরুন, স্কুলে শিশু বিপুল অধ্যবসায়ের সঙ্গে বাধ্য ও পরিশ্রমী ছাত্রের ভূমিকা পালন করছে, সর্বদা নিজের বিদ্যা জাহির করতে সচেষ্ট, সাগ্রহে অন্যদের সমালোচনা করে, সময় সময় দিদিমণির তোয়াজ করে। এটা হচ্ছে প্রথম ভূমিকা — শিক্ষয়িত্রীর জন্য। কিন্তু এমনতর আচরণ করলে ক্লাসে লিডার হওয়া কঠিন — ছেলেমেয়েরা

যে অকপটতা, উদারতা আর নিঃস্বার্থপরতার কদর করে। তাই ক্লাসের জন্য গড়ে উঠে দ্বিতীয় একটা ভূমিকা — বেছে বেছে সবচেয়ে শান্ত, সদাশিব ও বাধ্য ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা, যাদের দিয়ে হুকুম তামিল করানো যায়। এই ভূমিকাটি আয়ত্ত করা যায় প্রাঙ্গণেও: ওখানে শিশু এমন একটি দল বাছে যাতে ছেলেমেয়েরা বয়সে তার চেয়ে ছোট, এবং সে তাদের নেতৃত্ব করে। আর বাড়িতে পূর্বেকার নিয়মগুলো পূর্ববৎ-ই থেকে যায়, সময় সময় এমনকি কঠোরও হয়ে উঠে। শিশু স্কুলে যে-সমস্ত 'অপমান' আর 'অনাদর' সহ্য করে তার জন্য সমস্ত রাগ ঝাড়ে মা-বাবার উপর।

— আমি কিছুতেই বুঝি না, কী ক'রে সংকট কালের জন্য প্রস্তুত হওয়া যায়, এবং তার উপর আবার শিশুকেও তার জন্য প্রস্তুত করতে হয়। সংকট কাল — সে হচ্ছে বিকাশের ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় পর্যায়, এবং তা এড়িয়ে যাওয়ার মানে হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করা।

— প্রকৃতির প্রাজ্ঞতা দেখে অবশ্যই মুগ্ধ হওয়া যায়, কিন্তু সেই প্রাজ্ঞতাকে বড় করে দেখা উচিত নয়। তাছাড়া, শিশুর বিকাশ — স্রেফ জীবতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া নয়। পরিবেশ এবং সর্বাগ্রে শিক্ষাদীক্ষার পরিস্থিতি বিকাশের সাধারণ ভিত্তি গড়ে। শিক্ষাদীক্ষা গঠন করে মানুষের ব্যক্তিত্ব। কেবল এরূপ মতাবস্থান থেকেই সংকট কালের এবং শৈশবের সংকটজনক পর্বগুলোতে প্রশিক্ষণমূলক ব্যবস্থাদির মূল্যায়ন করা সম্ভব।

ঘটনা প্রবাহ অন্য দিকেও মোড় নিতে পারে। যদি পড়াশোনায় ভালো করার জন্য ধৈর্য ও দৃঢ়তায় না কুলায়, অথচ নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের খুব ইচ্ছা থাকে, তাহলে ছাত্র নিয়মিতভাবে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে শুরু করে। সে ধীরে ধীরে ভাঁড় ও সঙের ভূমিকা আয়ত্ত করে এবং তার কাছ থেকে যেকোন সময় যেকোন ধৃষ্টতা আশা করা যায়। এরূপ ছাত্রকে যখন ব্লেক-বোর্ডে ডাকা হয়, তখন সারা ক্লাসে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়: এক্ষুনি কিছু একটা করে বসবে! এবং তা তার খুব ভালো লাগে। সঙ্গীসাথীদের দলেও ভাঁড়ের ভূমিকা পালন করা যায়। কিন্তু বাড়িতে সেই খোশ মেজাজ আর থাকে না, তখন শুরু হয় কেবল জেদ, দাবিদাওয়া, চিৎকার: শিশু যেন সঙের মুখোশ ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং 'বিশ্রাম' করে।

আমরা ইচ্ছে করেই এমন সব উদাহরণ নিয়েছি যাতে শিশুর ভূমিকা-গুলো কুৎসিত দেখায় এবং খোদ তাকেও কোন আনন্দ দেয় না। এমনকি বাড়িতেও — যেখানে সে স্বীকৃত গৃহকর্তা — আর পূর্ণ তৃপ্তি মিলছে

না। স্কুলে অকৃতকার্যতা আর বাধাবিপত্তি বাড়ির যেকোন ভালো পরিবেশ-কেও নিরানন্দ করে তুলে। শিশু পরিস্থিতির কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে আচরণের একটা ধারা গড়ে তুলে যা তার ব্যক্তিত্ব পুনর্গঠন করে। সেই জন্যই তো লোকে বলে: অভ্যাস থেকে গড়ে উঠে চরিত্র, আর চরিত্র নির্ধারণ করে অদৃষ্ট। স্কুলের প্রথম ভূমিকাগুলো পরবর্তী কালে জীবনের প্রধান ভূমিকায় পরিণত হতে পারে।

পরিবার, স্কুল এবং প্রাঙ্গণের সঙ্গী দল — এ-ই হচ্ছে শিশুর ক্রিয়া-কলাপের প্রধান তিনটি ক্ষেত্র, তিনটি 'বাড়ি' যেখানে সে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে। প্রায়ই এমনও হয় যে ক্রিয়াকলাপের এই তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে কোন মিল থাকে না, যার দরুন শিশুকে তিনটি চেহারা ধারণ করতে হয়। স্কুলে এরূপ ছাত্র বাড়ির অভ্যাস হারায়, বাড়িতে — স্কুলের অভ্যাস, আর সঙ্গীসাথীদের দলে — বাড়ির ও স্কুলের অভ্যাস দুই-ই হারায়।

প্রথম শ্রেণীগুলোতে চরিত্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন শুরু হয়, এবং বলাই বাহুল্য, তার সবগুলো নেতিবাচক নয়। একাধিক সদ্‌গুণ গড়ে উঠে, যেমন: আত্মশৃংখলা, নীতিনিষ্ঠতা, সাথীত্ব বোধ। স্কুল ছাত্র বুঝতে আরম্ভ করে যে জ্ঞানার্জনের জন্য নির্দিষ্ট চেষ্টা-প্রচেষ্টা প্রয়োজন এবং অনেক সাফল্যই নির্ভর করে তার নিজের উপর, মা-বাবা কিংবা সদয় শিক্ষয়িত্রীর উপর নয়। কিন্তু আমরা ইচ্ছে করেই নেতিবাচক মুহূর্তগুলোর উপর মনোনিবেশ করলাম, কেননা ওগুলোই সংকটজনক পর্বের অসুবিধাসমূহের চরিত্র নির্ধারণ করে। তাছাড়া অনেক মা-বাবা সন্তান মানুষ করতে গিয়ে সর্বাগ্রে মনোযোগ দেন তার আচরণের ত্রুটিবিচ্যুতির দিকে এবং কোনকিছু না বুঝেশুনেই ধরে নেন যে এই সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করতে পারলে ইতিবাচক গুণাবলি আপনা-আপনিই গড়ে উঠবে। কিন্তু নেতিবাচক গুণসমূহ প্রায়ই দেখা দেয় এই জন্য যে ইতিবাচক গুণসমূহ ঠিক মতো বিকশিত নয়। শিশুর নিষ্ঠুর হওয়ার পক্ষে সময় সময় তার মধ্যে কেবল উদারতা বোধ গড়ে না তোলাই যথেষ্ট। এমনকি সামান্য অপ্রীতিকর ব্যাপারও তার মধ্যে আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম। তাই মা-বাবাদের কেবল শিশুকে 'মন্দ' প্রভাব থেকে রক্ষা করলেই চলবে না, বরং অবাঞ্ছিত ও অজ্ঞাত প্রভাবের বিরুদ্ধে তার মধ্যে অনাক্রম্যতা শক্তি গড়ে উঠতে সাহায্য করা উচিত। যেমন, প্রাক্‌স্কুলবয়স্ক শিশু যদি বাড়িতে ন্যায়পরতা সম্পর্কে এমনকি অতি সাধারণ ধারণাগুলোও আয়ত্ত না করে, তাহলে স্কুলে তাকে অনেক অমূলক অপমান সইতে হবে ('আমি

এত পড়লাম, কিন্তু দিদিমণি আমায় কিছু জিজ্ঞেস করলেন না! আমার খাতায় কেবল একটি মাত্র ভুল — সে জন্য আমায় দশের মধ্যে ছয় নম্বর দিয়েছেন, আর মিশার খাতায় দু'টি ভুল, কিন্তু ও পেয়েছে আট নম্বর!..')। আর ভিত্তিহীন অপমান থেকে শুরু হতে পারে অনেকগুলো অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকূল অনুভূতি।

আমরা মা-বাবারা প্রায়ই নিজেদের বিশ্বোপলব্ধি শিশুর উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করি, শিশুর সাফল্য কিংবা অসাফল্য বিচার করি নিজেদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। কিন্তু অন্য দিকে আমরা অক্লান্তভাবে বার বার এ কথাটিও বলি: 'ও এখনও ছোট, অতকিছু বুঝবে না।' সংকট কালে আমাদের দুমনা ভাবটি বিশেষ স্পষ্ট হয়ে উঠে। ধরুন, তিন বছরের শিশু ভীষণ একগুঁয়ে হয়ে উঠছে। তার এই আচরণ আমরা দ্বিবিধভাবে গ্রহণ করি। তার একগুঁয়েমি আমাদের বিরক্ত ও ভীত করে: 'কী বদ! ওকে নিয়ে মরণ আর কি!' শিশু সামাজিকভাবে ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এখনও অপরিণত, এবং তার পক্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হচ্ছে — কাউকে গ্রাহ্য না করা, যেন-তেন প্রকারেণ নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা। সে 'অকারণে' ও বিনা লাভে কেবল জেদই করে না, এমনকি বোঝেও না যে সে জেদ করছে। সে বাস করে, পারিপার্শ্বিক বিশ্বকে উপলব্ধি করে।

তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমাদের কাছে শিশুর আচরণের এরূপ অপ্রীতিকর বৈশিষ্ট্য নিয়মিতভাবে নির্মূল করা নয়, শিশুর কাছে তার একগুঁয়েমির অর্থহীনতা ব্যাখ্যা করা নয়। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এই বৈশিষ্ট্যটি যাতে অটলতা ও দৃঢ়তায় রূপান্তরিত হয় — সে দিকে খেয়াল রাখা।

মাঝেমধ্যে অল্প বয়স্ক স্কুল ছাত্রের আচরণ মূল্যায়নেও অনুরূপ দুমনা ভাব লক্ষ্য করা যায়। এক দিকে, তার কুঁড়েমি, পড়া শিখতে অনিচ্ছা আমাদের দুঃখিত কিংবা বিরক্ত করে, আর অন্য দিকে, এই বলে তার দোষ ক্ষালন করি যে সে এখনও বোঝে না কীসের জন্য শিক্ষালাভ করা প্রয়োজন। কিন্তু ৮ বছরের বাচ্চার কাছ থেকে জীবনের স্পষ্ট কর্মসূচি আশা করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। শিশু সম্ভবত এই জন্য পড়াশোনা করতে চায় না যে পড়াশোনা করতে তার ভালো লাগে না, কোন অভ্যন্তরীণ প্রেরণা নেই, শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠে নি অথবা ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তেমন বনিবনাও নেই।

কঠিন কিশোরকিশোরী। অধিকাংশ ছেলেমেয়ে বেশ কুশলেই উপস্থিত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে। শিশু স্বাভাবিকভাবে পড়াশোনা করে, স্কুলে ও বাড়িতে ভালো আচরণ করে, সে পরিশ্রমী... কিন্তু প্রাক্‌স্কুল বয়সে ও নিম্নতম শ্রেণীগুলোতে শিশু যদি কম ঝামেলা করে, তাহলে কৈশোরে সে আমাদের জ্বালিয়ে মারে — তখন পরিবর্তনগুলো হয় খুব অপ্রত্যাশিত। কিশোর বয়সের সংকট কালের জন্য আমাদের অপ্রস্তুতি প্রায়ই আচরণ এবং চরিত্রের জটিলতা গভীর করে তুলে।

কৈশোরের সংকটজনক পর্বে কী ঘটে? সর্বাগ্রে, দ্রুত সাবালকত্ব আসে। আগে শিশু স্রেফ বয়সের দিক থেকে বড় হয়েছে, এখন সে বড় হয়েছে আত্মিক ও শারীরিক দিক থেকে।

কৈশোরে প্রাক্‌স্কুল পর্বের সংকট কালের বৈশিষ্ট্যসমূহের কিছুটা পুনরাবৃত্তি ঘটে, — যেমন, একগুঁয়েমি, স্বেচ্ছাচারিতা, আত্মনির্ভরতার জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস, আত্মকেন্দ্রিকতা। তবে এ সমস্তকিছুর আবির্ভাব ঘটে অধিকতর জটিল আকারে। প্রাক্‌স্কুলবয়স্ক শিশু যদি এই জন্য আত্মকেন্দ্রিক হয় যে সে এই প্রথম বার নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুভব করল, তাহলে কিশোর অত্যধিক আত্মবিশ্বাসের অধিকারী হয় এই জন্য যে সে এই প্রথম বার নিজেকে ব্যক্তিত্ব হিশেবে উপলব্ধি করল। দ্রুত বিকাশ লাভ করে আত্মবিশ্লেষণ এবং মা-বাবা ও অন্যান্য লোকের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন। মানুষের মূল্যায়ন ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়। কোন সাথী কোন কাজে সাহায্য করল — ও চমৎকার লোক। কয়েক দিন বাদে ঝগড়া হয়ে গেল — ওকে আমি দু' চোখে দেখতে পারি না, ও প্রকৃত বন্ধু হতে পারে না।

কিশোর সাধারণত পরস্পরবিরোধিতা ভালোবাসে না, সেই জন্যই খুব ঘন ঘন সমালোচনা করে। মা-বাবাদেরও কম খোঁটা খেতে হয় না। কোন ব্যাপারে তাঁরা কথা রাখলেন না, পরস্পরতা বজায় রাখলেন না — এ সমস্তকিছুর জন্য তাঁদের খোঁটা দেওয়া হয়। শিক্ষকদের সমালোচনা করা হয়। বইয়ের নায়কদের সমালোচনা করা হয়। প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এ সমস্তকিছু স্রেফ যুক্তিহীন বিদ্বেষ ভাব নয়, খেলাচ্ছলে সমালোচনা নয়। না, শিশু অশান্তভাবে সমস্ত ব্যাপারে অনুকরণযোগ্য প্রকৃত বীরকে খুঁজছে, কেননা সে মানুষের মতো মানুষ হতে চায়।

কিশোরের অবাধ্যতাকে 'ক্রম অবনতির' লক্ষণ হিশেবে, অসৎ সঙ্গের

প্রভাবের ফল হিশেবে কিংবা আমাদের প্রশিক্ষণমূলক প্রয়াসের ব্যর্থতা হিশেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। হাজার হলেও কিশোর এখনও অনেক ব্যাপারে শিশুর মতোই সাবালকত্বের তাৎপর্য উপলব্ধি করে।

একদল বালক তাদের এক লাজুক সাথীকে খাড়া পাড় থেকে জলে লাফ দিতে বাধ্য করে -- আর এর পরিণাম হয় দুর্ঘটনা। কিশোরেরা বড়দের মতো মদ্যপানের আসর বসায় — পরে শুরু হয় মাতাল ছেলেদের লড়াই।

অনুরূপ সমস্ত ঘটনায় আমরা আত্মসমর্থনে সর্বদা একই যুক্তি শুনতে পাই: 'আমি তো তা চাই নি! আমি কি ভেবেছিলাম যে এমনটা ঘটবে?' ছেলেমেয়েরা সম্ভাব্য মারাত্মক পরিণাম সম্পর্কে সাবধানবাণীকে অতি বিমূর্ত কোন ব্যাপার বলে মনে করে; তারা ভাবে যে তা ব্যক্তিগতভাবে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে মাথা নিচের দিকে ক'রে নির্ভয়ে লাফ দেওয়া, এক গ্লাস মদ খেয়ে নেওয়া — তা খুবই চিত্তাকর্ষক ও প্রলোভনজনক, আত্মমর্যাদা বোধ সুদৃঢ় করে। শিশু যদিও বা কোন ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকে, তাহলে তা মা-বাবা যাতে জানতে না পারেন সেই চিন্তা -- জানলে রক্ষে থাকবে না। অন্যান্য সমস্ত পরিণাম অবাস্তব বলে মনে হয়। কিশোরেরা আমাদের বড়দের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক জিনিস ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। তাদের বিশ্বানুভূতি সবেমাত্র গড়ে উঠছে। সেই জন্যই তারা কোন শৃঙ্খলা ছাড়া একসঙ্গে বহু বিষয়ে মেতে উঠতে পারে, যেমন, নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে, সিনেমায়, টেলিপ্যাথিতে, প্রাচীন ইতিহাসে। এই সমস্ত আগ্রহে ভবিষ্যতের কোন লক্ষ্য প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে: তাতে মজা লাগে — ব্যস এই টুকুই। কিশোর-কিশোরীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে সাবালক জীবনের বাহ্যিক ধর্মগুলো: পোশাকপরিচ্ছদ, কেশসজ্জা, প্রসাধন দ্রব্য, ধূমপান, মদ্যপান... তার উপর, কিশোর এখনও মানবীয় সম্পর্কের সমস্ত জটিলতা ভালো ক'রে বোঝে না। বড়রা যে-সমস্ত নিয়ম ও বাধানিষেধ মেনে চলে তার অনেকগুলোই কিশোরের কাছে কল্পিত, অস্বাভাবিক ও একঘেয়ে বলে মনে হয়। তা এমনকি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও প্রকাশ পায়: 'সবাইকে কেন নমস্কার বলব? আমি কেবল তাঁদেরই নমস্কার বলি যাঁদের আমার ভালো লাগে।'

সাবালকত্ব শুরু হয় সাবালক জীবনের বাহ্যিক দিকসমূহে অনুকরণ দিয়ে, আর আত্মনির্ভরশীলতার জন্য প্রয়াস পর্যবসিত হয় অসংখ্য ভ্রম আর ভুল বোঝাবুঝিতে। এরূপ অধিকাংশ ভুলভ্রান্তি অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সমাজবিরোধী ব্যাপার বলে বিবেচনা করা উচিত নয়। তবে এই সমস্ত

ক্রিয়াকলাপের যোগ্য মূল্য দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। কিশোর কবে সাহসিকতা ও ধৃষ্টতা, স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে পার্থক্য বুঝবে আমরা সেই আশায় চুপচাপ বসে থাকতে পারি না।

তাহলে আমাদের কী করা দরকার? এক দিকে, বল প্রয়োগ করা অনুচিত, আর অন্য দিকে — চুপচাপ বসে নিরীক্ষণ করাও যায় না। প্রশ্নটি সত্যিই খুব জটিল।

— আগে ছেলেমেয়েদের বলা হত: 'এটা করা উচিত নয়!' আর এখন এ কথাটি বেশির ভাগ সময়ই ব্যবহার করা হয় মা-বাবাদের ক্ষেত্রে। শিশু সংকটজনক পর্বে উপনীত হয়েছে। তার মানে কি এই যে সে মাথায় চড়ে যাবে?

— নিশ্চয়ই না। তবে শিক্ষাদীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সব সময় দমিয়ে রাখা ও বাধানিষেধের দ্বারা নাজেহাল করে তোলা নয়, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্রের প্রাথমিক প্রবণতাকে সঠিক পথে চালিত করা। সংকটজনক পর্ব — এ হচ্ছে ঠিক সেই সন্ধিক্ষণ যার পর শিক্ষাদীক্ষা অনুসারে ভবিষ্যৎ বিকাশ চলতে পারে বিভিন্ন পথে।

আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বজ্ঞা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমরা অবশ্য পুরোপুরিভাবে কিশোরের পক্ষ সমর্থন করতে চেষ্টা করি নি। তাছাড়া ব্যাপারটি এখানে স্বজ্ঞায় নয়। বহু মা-বাবার প্রধান শিক্ষাগত ভুলটি হচ্ছে এই যে তাঁরা তাঁদের সন্তানের উপর নিজেদের ও মানবজাতির অভিজ্ঞতার ফলাফল চাপিয়ে দিতে প্রয়াস পান। কিন্তু একেবারে ছোটবেলা থেকেই শিশুর নিজের অভিজ্ঞতায় সমস্তকিছু উপলব্ধি করার অদম্য বাসনা থাকে। সেই জন্যই প্রস্তুত সত্যকে সে গ্রহণ করে অনিচ্ছায়, নিষ্ক্রিয়ভাবে, তদ্দ্বারা সে সর্বদা অনুপ্রাণিত হয় না। তাই দেখা যায়, আমাদের বহু বাধানিষেধ আর হিতোপদেশে কান দিলেও শিশুর নিজে নিজে জানার প্রলোভন কিন্তু থেকেই যায়। তবে আসল কথা, ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে সক্রিয় ক্রিয়াকলাপের মধ্যে, নিয়ম মুখস্থ করার মধ্য দিয়ে নয়। তা হচ্ছে বিকাশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সেই জন্যই বস্তুত প্রত্যেক শিশুই প্রায়ই মা-বাবার বাধানিষেধ অমান্য করে: সাধারণত — গোপনে, কচিৎ — প্রকাশ্যে। গোপনে অমান্য ক'রে পরে অবশ্য সমস্তকিছু খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে নিতে পারে। কিশোর বয়সের বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে এই যে তখন অনেক নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় খোলাখুলিভাবে, সবার সামনে। শিশুর উদারতা, স্বনির্ভরতা ও ন্যায়পরতার শিক্ষা পাওয়া উচিত পুরো শৈশব ধরে। কিন্তু কেবল পিতামাতা আর শিক্ষকের উপদেশ স্মরণ রাখার মধ্য দিয়ে তা শেখা যায় না। সর্বাগ্রে

পরিবারের দৈনন্দিন জীবনই শিশুর মধ্যে এই গুণগুলো গড়ে তুলবে। উদারতা ও ন্যায়পরতার অনুভূতি যদি বিকশিত না হয়, তাহলে আত্মনির্ভরতা অর্জনের প্রয়াস সহজেই দায়িত্বহীন বিদ্রোহ আর অর্থহীন হামলার আকার ধারণ করতে পারে।

কৈশোরে উদারতা ও ন্যায়পরতা শেখানো কি সম্ভব, তখন দেরি হয়ে যায় না? না, দেরি হয়ে যায় না! মানুষ উদারতার চাহিদা অনুভব করে সারা জীবন। ন্যায়পরতা হচ্ছে কিশোরের জন্য সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শক্তি ও যুক্তি, যেহেতু সে শক্তিকে শ্রদ্ধা করে এবং পরস্পরবিরোধিতা ভালোবাসে না। কেবল আসল কথা হচ্ছে এই ন্যায়পরতা বোধগম্য হওয়া উচিত। তবে তার মানে এ নয় যে ন্যায়পরতাকে একেবারে সহজ ও সরল করে তুলতে হবে: কিশোরের জটিল হয়ে-উঠা বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে মিল রেখে মা-বাবাদেরও নিজেদের যুক্তি জটিল করে তোলা প্রয়োজন।

জেদ এবং নিউরোসিস

রবিবার। চার বছরের ভলোদিয়া বাবার সঙ্গে চিড়িয়াখানায় যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে।

— জন্তুগুলো ভালো? — জিজ্ঞেস করে ভলোদিয়া।

— ভালো।

বাবার সময় নেই। তাঁকে রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।

— আচ্ছা, আজ না গিয়ে সামনের রবিবার গেলে কেমন হয়? — বলেন তিনি।

— না আজ, না আজ যাব! তুমি যে কথা দিয়েছ!

চিড়িয়াখানায় ছোট্ট ভলোদিয়ার সবকিছুই ভালো লাগে, সে বার বার বাবাকে প্রশ্ন করে: 'আর এটা কী?', 'আর এটা এরূপ কেন?' বাবা তাঁর রিপোর্টের কথা ভাবছেন, অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিচ্ছেন।

এই তো তাঁরা এলেন হিংস্র জন্তুদের খাঁচাগুলোর কাছে। বাবা ক্লান্ত, বার বার ঘড়ি দেখছেন।

— বাবা দ্যাখো — কী বড় বেড়াল!

— এটা সাধারণ বেড়াল নয়, বনবেড়াল!

বনবেড়ালটি খাঁচায় দূরের একটি কোণে শুয়ে ছিল।

— এই বনবেড়াল, আমাদের কাছে আয়!

বনবেড়ালটি উঠল, অলসভাবে লোহার শিকগুলোর কাছে এসে দাঁড়াল।

— বাবা দ্যাখো, বনবেড়ালটি আমার কথা শুনছে!

ভলোদিয়া লক্ষ্য করে নি, রাগে কীভাবে বনবেড়ালের নাসারন্ধ্র ফুলে উঠছিল, কীভাবে বিদ্বেষের সঙ্গে তার গোঁফ কাঁপছিল, কীরূপ উত্তেজনাপূর্ণ ছিল তার গতি। ভলোদিয়া নির্ভয়ে খাঁচার দিকে, বনবেড়ালের দিকে এগিয়ে গেল। বনবেড়ালটি হঠাৎ দাঁত দেখাল এবং রাগে বিকট গর্জন করতে লাগল। ভলোদিয়া আতঙ্কে মাটিতে পড়ে গেল, তার পাগুলো একেবারে অসাড় হয়ে পড়ল, সে নিজে উঠতে পারল না, বাক্‌শক্তি লোপ পেল, সে কেবল নীরবে মুখটি খুলছিল। অ্যাম্বুলেন্স কার এল। ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। সে হাঁটতে ও কথা বলতে পারছিল না!

আমরা এখানে মা-বাবাদের দোষে যে-সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটে থাকে তার একটি মাত্র উদাহরণ দিলাম। ভলোদিয়ার রোগটি চিকিৎসাযোগ্য, কিন্তু তা তো না-ও হতে পারত।

সত্যিই, চিড়িয়াখানায় ছেলেটি সজীব, হাসিখুশি ও কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল, তার এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে জন্তুরা 'ভালো, উদার', আর বাঁদরেরা এমনকি 'সমস্তকিছু বোঝে', কিন্তু ছেলের প্রশ্ন আর বিচার-বিশ্লেষণের দিকে বাপের কোন খেয়ালই ছিল না। সম্ভবত, সে দিন হিংস্র জন্তুদের খাঁচার কাছে যাওয়াটাই উচিত হয় নি, কিন্তু যখন তাঁরা গেলেনই তখন বাবার ভলোদিয়াকে বলা উচিত ছিল হিংস্র জন্তুরা কীরূপ আচরণ করতে পারে, ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলতে পারতেন যে ওদের ভয় করার কোন কারণ নেই, খাঁচার শিকগুলো যথেষ্ট মজবুত...

বনবেড়ালটি প্রথম দিকে 'ভালো ও উদার' ছিল, ভলোদিয়ার কথা শুনল, খাঁচার ধারে এসে দাঁড়াল। কিন্তু জন্তুটি রেগে গিয়ে গর্জন করতে আরম্ভ করলে ব্যাপারটি ভলোদিয়ার কাছে অপ্রত্যাশিত, অবোধ্য মনে হল, তার পূর্ব 'অভিজ্ঞতার' সঙ্গে এর কোন মিল থাকল না। বনবেড়ালের আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া তার পক্ষে অত্যধিক উত্তেজক ছিল, তাতে সে স্নায়ু-রোগে আক্রান্ত হয়।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভয়ই হচ্ছে শিশুদের স্নায়ু-রোগের প্রধান কারণ, বিশেষত প্রাক্‌স্কুল বয়সে।

ভয় উদ্রেক করতে পারে অতি অভাবিত ব্যাপারাদিও, যেমন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ — ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড, মোটর দুর্ঘটনা। তবে প্রায়শই ভয়ের

প্রধান কারণ হচ্ছে মা-বাবাদের বেঠিক আচরণ: ঝগড়া, মারামারি, মাতাল বাপের হামলা। অনুভূতিপ্রবণ ছেলেমেয়েরা এমনকি সার্কাসের অ্যাক্রোবেটদের খেলা দেখলেও ভয় পেতে পারে।

ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে প্রাক্‌স্কুল বয়সে অভিজ্ঞতার অভাব, যাকিছু ঘটছে তার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের অসম্ভবতা, সময় সময় সঠিক তথ্যের অভাব হেতু কোন ঘটনা, প্রাত্যহিক জীবন শিশুর জন্য অত্যধিক উত্তেজক হয়ে উঠতে পারে।

তখনই তা সবচেয়ে বেশি ঘটে যখন মা-বাবারা নানা রকমের ভয় দেখান, যেমন, এ ধরনের ভয়: 'ভালো হয়ে না চললে ডাক্তারবাবু তোমায় ইনজেকশন লাগিয়ে দেবেন', অথবা 'কথা না শুনলে কুকুর এসে নিয়ে যাবে'।

সেই জন্যই দেখা যায়, নিরীহ কুকুরটি শিশুর কাছে এলে সে তার পক্ষে অতি উত্তেজক হয়ে উঠে, আর ডাক্তার অসুস্থ শিশুকে দেখতে এলে তার মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। শিশুর দৃষ্টিতে এ সবই হচ্ছে অদ্ভুত ব্যাপার, সে তা রাত্রে স্বপ্নে দেখে এবং ভয়ে তার ঘুম ভেঙে যায়, সে চিৎকার করে, অনেকখন শান্ত হতে পারে না। ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে যে-আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয় তা প্রায়ই নিউরোটিক প্রতিক্রিয়ার কারণ হয়ে উঠে।

— সব শিক্ষাবিদই বলেন যে সমস্ত ছেলেমেয়ের জন্য লালনপালনের অভিন্ন কোন পদ্ধতি বাৎলে দেওয়া সম্ভব নয়। সেই জন্যই মনে স্বাভাবিক একটি প্রশ্ন জাগে: প্রশিক্ষণমূলক ও চিকিৎসামূলক তথ্যাদির দ্বারা মা-বাবাদের ভারাক্রান্ত করে তোলার কোন প্রয়োজন আছে কি? তাঁরা যদি নিজেদের স্বজ্ঞা অনুসারে চলেন এবং সর্বাগ্রে আপন কাণ্ডজ্ঞানে আস্থা রাখেন তাহলে কি কোন ক্ষতি হবে?

— নিঃসন্দেহেই, স্বজ্ঞা হচ্ছে চমৎকার জিনিস। তবে শিশুর স্নায়ু-রোগের কারণ সম্পর্কিত জ্ঞান অবশ্যই সেই সমস্ত ভুলভ্রান্তি এড়াতে সাহায্য করবে যা সর্বোচ্চ স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপে বিঘ্ন ঘটায়, আর নিউরোসিসের মূল কারণ সম্পর্কিত জ্ঞান সময় মতো রোগের প্রথম লক্ষণগুলো সনাক্ত করতে সহায়তা করবে। ঠিক এখানেই স্বজ্ঞার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়, কেননা মা-বাবাদের তখন প্রশিক্ষণমূলক ও চিকিৎসামূলক নির্দেশগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয় না, তার পরিবর্তে প্রতিটি বিশেষ ক্ষেত্রে নির্দেশগুলোর সৃজনশীল প্রয়োগ মাধ্যমে তা কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করতে হয়।

কেবল ভয়ই নয়, পরিবারে ঘন ঘন ঝগড়াবিবাদ আর মারপিটও (এ সমস্তকিছু শিশুর মনকে আহত করে) স্নায়ু-রোগের কারণ হতে পারে। শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে মা-বাবার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিও প্রায়ই ছেলেমেয়েদের

নিউরোসিস বিকশিত করে। যেমন ধরুন, বাবা খুব কড়া, তুচ্ছ ব্যাপারে শিশুকে সাজা দেন, আর মা শিশুর সমস্ত আবদার শুনেন। তা-ও সব নয়, মা-বাবারা অনেক সময় সন্তানের সামনে লালনপালনের পদ্ধতি নিয়ে তর্কে লিপ্ত হন, ঝগড়া করেন, পরস্পরকে গালাগাল দেন। বাবা মায়ের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেন, আর মা বাবার অনুপস্থিতে শিশুকে তাঁর নির্দেশ পালন না করতে অনুপ্রাণিত করেন। আর মা-বাবার মধ্যে একজন যখন শিশুকে অন্য জনের বিরুদ্ধে উস্কানি দেন তার চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। এরূপ উস্কানির ফলে শিশুর স্নায়বিক প্রক্রিয়াসমূহ বিকল হয়ে পড়ে।

শিশুর স্বনির্ভরতা ও স্বাধীনতা লাভের বাসনাকে দমিত করলে, কঠোর বাধানিষেধের দ্বারা তার সক্রিয়তা আর তৎপরতাকে রোধ করে রাখলে নিউরোটিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

পরিবারে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম কিছু ছেলেমেয়ের মধ্যে গভীর মর্মপীড়া উদ্রেক করে। পরিবারে আরও একটি শিশুর জন্ম হল। আগে মা-বাবার সমস্ত মনোযোগ ছিল প্রথম সন্তানের দিকে। কিন্তু এবার সেই মনোযোগ চলে গেল নবজাতকের দিকে। ও কাঁদে, রাত্রে চেঁচায়, কাউকে শান্তিতে থাকতে দেয় না, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর 'সাত খুন মাফ'। আর বড় সন্তানটি সন্ধ্যার পরে একটু জোরে কথা বললে কিংবা সশব্দে দরজা বন্ধ করলেই বলা হয় যে সে ছোটটিকে তুলে দেবে। মা-বাবা সময়ের আগেই তাকে ঘুমাতে পাঠিয়ে দেন। অগ্রগণ্যতা হারিয়ে ছেলেটি ভীষণ মর্মাহত হয়, ছোটটির প্রতি মা-বাবার আদর-যত্ন দেখে সে ঈর্ষা বোধ করে, বিভিন্ন উপায়ে নিজের দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। তখন ভলোদিয়া মরে যাবে ঠিক করল: খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেবে। তাকে যখন খেতে ডাকা হল সে সরাসরি বলে দিল যে খাবে না। 'আঃ, খেতে চাস না', — মা রেগে গেলেন এবং ছুটে এসে তাকে এক চড় দিলেন। ছেলেটির তা সহ্য হল না, স্নায়ু-ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে মেঝের উপর পড়ে গেল, হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে মাথা দিয়ে আঘাত করতে লাগল। তাঁর কান্না, অস্পষ্ট চিৎকার আর উচ্চ ফোঁপানি থেকে কেবল এই দুটো কথাই বোঝা যাচ্ছিল: 'আমার কোন ভাই চাই না... ওকে বেচে দাও...' মা-বাবা ছেলেকে যত বেশি সান্ত্বনা দেন, সে ততই জোরে চেঁচাতে থাকে, ততই জোরে মাথা আর পা দিয়ে আঘাত করে। যখন একেবারে শক্তিহীন হয়ে পড়ল, একমাত্র তখনই শান্ত হল। কিন্তু কিছুক্ষণ

পরে আবার ধড়ফড়ানি শুরু হল, এর পর আরও কয়েক বার তার পুনরাবৃত্তি ঘটল।

স্নায়ু-ব্যবস্থা অচল হওয়ার দরুন ছেলেটি মূর্ছা যাওয়ার পরই মা-বাবা অবশেষে তার দিকে মনোযোগ দিলেন, তার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হলেন, এবং ছেলে আবার তাঁদের স্নেহ ও যত্ন অনুভব করল। এই ভাবে, ফিট হয়ে, নিউরোটিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সে তাই অর্জন করল যা অন্য কোন উপায়ে অর্জন করতে পারে নি। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে ছেলেটি পরে আরও বহু বার ফিট হয়েছিল।

আপনাদের পরিবারে অনুরূপ কোনকিছু যাতে না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে শিশুকে তার ভাই বা বোনের জন্মের ব্যাপারে আগে থেকেই প্রস্তুত করা উচিত। কনিষ্ঠ সন্তানের সেবাযত্নে তাকেও আকৃষ্ট করা দরকার, এবং তাকে বোঝাতে হবে যে এবার সে জ্যেষ্ঠ সন্তান, সে 'বড় হয়েছে', তাকেই ছোট ভাই বা বোনটিকে রক্ষা করতে হবে, তার দেখাশোনা করতে হবে। নিউরোসিস একমাত্র তখনই দেখা দেয় যখন জ্যেষ্ঠ সন্তানের প্রতি মা-বাবার সম্পর্কে তীব্র পরিবর্তন ঘটে, শিথিলতা আসে, এবং তাঁদের সমস্ত মনোযোগ চলে যায় কনিষ্ঠ সন্তানের দিকে। কিন্তু তা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়!

আরও একটি প্রশ্ন আছে যা নিয়ে মা-বাবারা প্রায়ই ভাবেন: ক্ষুধা হ্রাস বা ক্ষুধামান্দ্য কি নিউরোসিস? অথবা তা স্রেফ জেদ?

হ্যাঁ, তা নিউরোসিসই বৈকি। ক্ষুধা হ্রাস বা ক্ষুধামান্দ্য — এ হচ্ছে প্রাক্‌স্কুলবয়স্ক ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে পরিচিত নিউরোটিক প্রক্রিয়াগুলোর একটি। সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত রোগ সম্পর্কে কোনকিছু বলা যায় না। আপনাদের তো মনেই আছে, নিজের দিকে মা-বাবার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কীভাবে ভলোদিয়া খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয় প্রতিবাদের প্রতিক্রিয়া হিশেবে। শিশুর আত্মনির্ভরতা আর সক্রিয়তা দমনের দরুনও ক্ষুধা হ্রাস পেতে পারে। এমতাবস্থায় ক্ষুধা হানি পরিণত হয় নিজের 'অহং' প্রতিষ্ঠার উপায়ে (সময় সময় একমাত্র উপায়ে)। মা-বাবা যদি অনতিবিলম্বে লালনপালনের পদ্ধতি পরিবর্তন না করেন তাহলে শিশু নিউরোটিক রোগে আক্রান্ত হবে।

প্রায়ই এই রোগ দেখা দেয় আহারের প্রশ্নাদিতে এবং খাদ্য গ্রহণের খোদ প্রক্রিয়াটির প্রতি পিতামাতার অত্যধিক মনোযোগের ফলে। স্নেহময়ী মা সন্তানকে যে-পরিমাণ খাদ্য দেন সময় সময় সে তা খেতে পারে না। ক্ষুধা নিয়ে স্থায়ী উদ্বেগ, খাওয়ার জন্য বার বার কাকুতিমিনতি — এ সমস্তকিছু

অনেক সময় শিশুর জন্য অশুভ ক্রীড়ায় পরিণত হয়, শিশু ক্ষুধামান্দ্যকে পরিবারে বিশেষাধিকারযুক্ত অবস্থা লাভের জন্য ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। তখন শর্তসাপেক্ষ বাঞ্ছনীয়তার নিউরোটিক মেকানিজম চালু হয়ে যায়।

শিশুর ক্ষুধা হ্রাস পেলে কী করা দরকার? প্রথমত যা প্রয়োজন তা হল: ক্ষুধামান্দ্য লক্ষ্য না করতে শেখা, শিশু যদি খাদ্য সমেত থালাটি সরিয়ে দেয় তাহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া না দেখানো। খেতে চাইছে না — শান্তভাবে ও বন্ধুভাবাপন্নভাবে তাকে টেবিল ছেড়ে যেতে দিন, সন্ধ্যা অবধি না খেয়ে থাকুক। শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক স্বজ্ঞাই জয়ী হবে এবং শিশু খেতে চাইবে। তবে সন্ধ্যার আগে কোন মতেই তাকে খেতে দেবেন না, এমনকি সে যদি খেতে চায়ও। সস্নেহে বুঝিয়ে দেবেন যে খাবার খেতে হয় নির্দিষ্ট সময়ে। তবে সে দিন রাতের খাবার অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু আগেই দেবেন, — ক্ষুধার্ত শিশুর সহনশীলতা পরীক্ষা করে কোন লাভ নেই। প্রখ্যাত মার্কিন শিশু-চিকিৎসক বেঞ্জামিন স্পক-ই তো লিখেছেন যে পালকের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুকে খেতে বাধ্য করা নয়, সেই পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে সে নিজে থেকেই খেতে চাইবে।

ধরুন, দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে এল, কিন্তু ছেলেটির সে দিকে কোন খেয়ালই নেই, সে ড্রাইভার-ড্রাইভার খেলছে, ঘরময় গাড়িটি চালিয়ে বেড়াচ্ছে। দিদিমা তার খেলায় বাধা না দিয়ে নিজে তাতে যোগ দিলেন: 'জানিস, তোর গাড়িতে পেট্রল শেষ হয়ে গেছে। এখন পেট্রল ঢালতে হবে। তা তুই নিজেও চায়ের দোকানে গিয়ে কোনকিছু খেয়ে নিলে মন্দ হয় না, — সত্যিকারের ড্রাইভাররা তা-ই করে।' ব্যস, ছেলেটিকে যা দেওয়া হল তা-ই সে তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে নিল, কারণ ওই মুহূর্তে সে যে-সে লোক নয়, একজন ড্রাইভার, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি যার ফের গাড়ি নিয়ে যাওয়ার তাড়া রয়েছে।

কিন্তু পাঠক জিজ্ঞেস করবেন, আপনারা নিজেরাই তো কিছু মা-বাবার সমালোচনা করে বলেছেন যে তাঁরা শিশুকে খাওয়ানোর জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত। প্রকৃত পক্ষে আপনাদের এই দিদিমাও তো এ ব্যাপারে কোন ব্যতিক্রম নন। আপনাদের কথায় কোন পরস্পরবিরোধিতা নেই কি?

না, কোন পরস্পরবিরোধিতা নেই। এখানে যে-দিদিমার কথা হচ্ছে তিনি শিশুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি শিশুকে ভর্ৎসনা

করেন নি, কাকুতিমিনতি করেন নি, বাধ্য করেন নি, তার সৃজনী কল্পনাকে ব্যবহার করে খেলার পরিবেশ গড়ে তুলেন। হ্যাঁ, গড়ে তুলেন! তা-ও আবার শিশুর অজ্ঞাতসারে। সে টেরই পায় নি যে তার সামনে কোন 'নাটক অভিনীত হচ্ছে'।

সত্যিই, এরূপ একটি পরিস্থিতির কথা কল্পনা করা যাক: খাওয়ার সময় হয়ে আসছে, কিন্তু শিশু খেলায় মজে আছে। তাকে বাধা দেওয়া উচিত কি: খেলা রাখ, হাত ধুয়ে আয়? তার চেয়ে বরং নিজেও খেলায় যোগ দিয়ে ঘোষণা করুন যে নির্মাণ ক্ষেত্রে এবার খাওয়ার বিরতি হবে অথবা বিমানে এখন প্রাতরাশ খাওয়ার সময় হয়েছে। তাতে খেলায় সবচেয়ে মজার জায়গাতে বাধা পড়লেও খাবারের প্রতি শিশুর প্রতিকূল কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না।

শিশুর জীবনে খেলার তেমনি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে, যেমন বড়দের জীবনে কাজ, ক্রীড়া, শিকার, মাছ ধরা ইত্যাদির তাৎপর্য...

বিজ্ঞানীরা বলেন, শিশু খেলায় যেমন হবে জীবনে এবং শ্রমেও তেমন হবে। শিশু যদি একটি কাজও শেষ না করে এক খেলা ছেড়ে অন্য খেলায় মেতে উঠে, খেলায় যদি সে স্বনির্ভরতা না দেখায়, নিষ্ক্রিয় হয় ও তাড়াতাড়ি পরের অধীন হয়ে যায়, যদি সে সংগ্রাম ও সাফল্যের প্রতি উদাসীন হয়, তাহলে আপনাকে বিশেষ সতর্ক হতে হবে, এ সমস্তকিছু সংশোধন করতে হবে। এবং তা-ও আবার খেলার মাধ্যমে।

এই ভাবে, শিশুদের খেলাধুলা হচ্ছে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, শিক্ষাদীক্ষার নির্ভরযোগ্য ও পরীক্ষিত উপায়।

তবে কেবল শিক্ষাদীক্ষারই উপায় নয়, চিকিৎসারও উপায়। বহু পীড়াদায়ক স্নায়বিক ব্যাপারই খেলার সাহায্যে দূর করা সম্ভব।

এখানে শিশুর সঙ্গে খেলার কলা সম্পর্কেও কয়েকটা কথা বলতে চাই। হ্যাঁ, খেলার কলা সম্পর্কে! আপনি যদি খেলায় যোগ দেন, তাহলে আপনার পুরোপুরিভাবে খেলায় মেতে উঠা উচিত, আপনাকে আত্মবিস্মৃত হয়ে, সোৎসাহে, মনপ্রাণ দিয়ে খেলতে হবে। একমাত্র তাহলেই আপনি আত্মিক ও আবেগপূর্ণ যোগাযোগ প্রত্যাশা করতে পারেন, একমাত্র তাহলেই আপনি ফলপ্রসূভাবে শিশুর উপর সেই নৈতিক, মানসিক, শিক্ষামূলক ও চিকিৎসামূলক প্রভাব বিস্তার করতে পারেন যা অন্য কোন উপায়ে করা সম্ভব নয়।

ধরুন, শিশু একা বাড়িতে থাকতে ভয় পায়। তার সঙ্গে প্রহরী-প্রহরী

খেলা জুড়ে দিন, তাকে খেলনার জায়গাটি পাহারা দেওয়ার কাজে নিযুক্ত ক'রে নিজে অন্য চৌকিগুলো দেখতে চলে যান।

আপনার ছেলে বা মেয়ে অন্ধকার ভয় করে। এমন কোন খেলা ভেবে বার করুন যার জন্য অন্ধকার ঘর প্রয়োজন। এরূপ ঘরে খেলার পরিস্থিতিতে শিশু ধীরে ধীরে অন্ধকারের ভয় অতিক্রম করতে শিখবে।

স্নায়বিক রোগগ্রস্ত শিশুদের শিক্ষা ও চিকিৎসা অতি দুরূহ ব্যাপার। তাদের শিক্ষাদানের প্রধান অসুবিধাটি হচ্ছে এই যে সর্বাগ্রে শিক্ষা ও পুনঃশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন শিশুদের নয়, মা-বাবাদের।

শিশুদের স্নায়ু-রোগের মূল কারণ হচ্ছে শিক্ষাদানের ভুলভ্রান্তি। যদি কোন ভুল বা বেঠিক পদ্ধতির জন্য নিউরোসিস দেখা দেয়, তাহলে এটা বুঝতে নিশ্চয়ই কষ্ট হয় না যে নিউরোটিক প্রতিক্রিয়া দূরীকরণের জন্য সেই সমস্ত ভুল সংশোধন করা উচিত যা রোগের জন্ম দিয়েছে, অর্থাৎ শিশুর প্রতি আচরণে আমূলে পরিবর্তন ঘটানো চাই, পরিবারের গোটা জীবনধারা পুনর্গঠিত করা চাই। সবচেয়ে বড় কথা: নিজের ভুল, নিজের অন্যায় বুঝতে পারা প্রয়োজন। কিন্তু এ কাজটি মোটেই সহজ নয়!

তার উপর, পুনর্গঠন চলবে ধীরে ধীরে, শিশুর অজ্ঞাতসারে। চরমাবস্থা থেকে চরমাবস্থায় — অত্যধিক কঠোরতা থেকে অত্যধিক স্নেহে — লাফ দেওয়া অনুচিত। এরূপ উঠা-নামার দরুন নিউরোসিস তীব্র আকার ধারণ করতে পারে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম মনে রাখা প্রয়োজন, এবং সেটা হচ্ছে: নিউরোটিক লক্ষণ 'লক্ষ্য না করতে' শেখা, কষ্টদায়ক খুঁতগুলোর দিকে শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ না করা। পেশীর খেঁচুনি, তোতলামি কিংবা ক্ষুধামান্দ্যের প্রতি বাহ্যিক কোন প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত নয় এবং ভেতরেও নিজেকে তাতে অভ্যস্ত করানো দরকার, — নিরাশ হলে চলবে না।

আপাতত আমরা প্রাক্‌স্কুলবয়স্ক শিশুদের, অল্প বয়সের বাচ্চাদের স্নায়ু-রোগের বিষয়ে বলেছি। তা বেশি বয়সের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যাপার কীরূপ?

বস্তুতপক্ষে স্কুলের বয়স থেকেই প্রকৃত নিউরোসিস শুরু হয়। ইতিপূর্বে আমরা কেবল নিউরোটিক প্রতিক্রিয়ার কথাই বলেছি। বিজ্ঞানীরা বলেন যে নিউরোসিসের উৎপত্তির জন্য ব্যক্তিত্বের নির্দিষ্ট একটা পরিণতি প্রয়োজন, তা চারিপাশের লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক এবং ওই সম্পর্কের গুরুত্ব

উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। মনস্তত্ত্ববিদদের তথ্য অনুসারে, কেবল ৬-৭ বছর বয়স থেকেই 'শিশুর মধ্যে তার চারিপাশের লোকজনের সম্পর্ক উপলব্ধির, আচরণের সামাজিক উদ্দেশ্য, নৈতিক মূল্যবোধ, সংঘর্ষজনক পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধির ক্ষমতা গড়ে উঠে'। অল্পবয়সী স্কুল ছাত্রদের জন্য তথাকথিত স্কুল নিউরোসিস হচ্ছে টিপিকেল ব্যাপার।

একটা ঘটনার কথা বলি। কোন এক হাসপাতালে আট বছরের এক ছেলেকে ভর্তি করা হল। তার নাম সাশা। সে খুবই অদ্ভুত এক রোগে ভুগছিল। কয়েক মাস ধরে প্রতি দিন সকালে তার দেহের তাপমাত্রা বেড়ে ৩৮-৩৯ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড অবধি পেশছে যেত, আর দুপুরের দিকে কমে স্বাভাবিক হয়ে আসত।

হাসপাতালের সেরা চিকিৎসকরা সাশাকে ভালো ক'রে দেখলেন, গবেষণাগারে জটিল পরীক্ষানিরীক্ষা চালালেন। কিন্তু তাঁরা কোন রোগই ধরতে পারলেন না। তখন ঠিক করা হল যে ছেলেটিকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। আর সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানোর পক্ষে সব কারণই বর্তমান ছিল। ছেলেটি ছিল ভীষণ উচ্ছৃঙ্খল ও জেদী। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে নিজের জন্য আলাদা একটি ঘর চাইল, খুব দম্ভ দেখাতে লাগল। দাবি করল, মা যেন সব সময় তার কাছে থাকেন। এটা চাই সেটা চাই বলে তাঁকে একেবারে নাজেহাল করে দিয়েছিল। সময় সময় তার দাবিগুলো ছিল দুষ্কর। তার ইচ্ছা পূরণে সামান্যতম অনিচ্ছা দেখালেই সে হাউমাউ ক'রে কান্নাকাটি জুড়ে দিত, চিৎকার করত: 'আমি শিগগিরই মরে যাব! এটা হয়তো আমার শেষ ইচ্ছা!'

যখন সাইকিয়াট্রিস্ট মাকে বললেন যে একমাত্র উপায় হচ্ছে ছেলেকে সাইকোনিউরোলজিকেল হাসপাতালে ভর্তি করানো, তখন প্রথমে ভদ্রমহিলা ভীষণ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সাশাকে সাইকোনিউরোলজিকেল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ডাক্তাররা তাকে বললেন যে সে এখানে থাকবে সবার মতো, আলাদা ঘর পাবে না এবং পুরোপুরিভাবে আরোগ্য লাভ না করা পর্যন্ত মাকে তার কাছে আসতে দেওয়া হবে না। 'অপ্রত্যাশিত' ব্যাপার ঘটল। সাশা আরোগ্য লাভ করল। তার দেহের তাপমাত্রা সব সময় স্বাভাবিক থাকল।

এত 'সাংঘাতিক' রোগের, তার এত সুদীর্ঘ অস্তিত্বের ও এত দ্রুত আরোগ্যের কারণটি কী?

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য পরিবারে ছেলেটির জীবনের পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

ছেলের যখন জন্ম হল, সে সঙ্গে সঙ্গেই পরিবারের লোকজনের ভালোবাসার পাত্র হয়ে উঠল। শিশু যা চাইত তা-ই পেত, তার যেকোন ইচ্ছা পূরণ করা হত। স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে অবধি সে সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশা করে নি বললেই চলে, অতি অল্প বয়সে পড়তে শিখেছিল এবং সাত বছর বয়স নাগাদ অনেক বই পড়ে ফেলেছিল। খেলত কেবল মা কিংবা দিদিমার সঙ্গে, খেলায় সর্বদা বিজয়ী হতে ভালোবাসত, মা ও দিদিমা ইচ্ছে করেই তার কাছে হার মানতেন।

সাশা স্কুলে ভর্তি হতে চায় নি। স্কুলের পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে তার বেশ কষ্ট হয়েছিল। দিদিমা তাকে হাতে ধরে স্কুলে নিয়ে যেতেন এবং স্কুল থেকে বাড়ি নিয়ে আসতেন। পড়াশোনায় সে ভালোই ছিল। দিদিমণি তাকে খুব মেধাবী ছাত্র বলে গণ্য করতেন। কিন্তু সাশা সর্বদা আলাদা আলাদা থাকত, কারো সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল না, যৌথ খেলায় অংশগ্রহণ করত না, কারণ সে ছিল আনাড়ি, জড়ভরত, ছেলেরাও তাকে ডাকত না। বিরতির সময় সে সাধারণত এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকত, আবার ক্লাসে ঢোকার জন্য ঘণ্টির অপেক্ষা করত। ছেলেমেয়েরা তাকে বিরক্ত করত, তাকে নিয়ে হাসাহাসি করত, একদিন এমনকি ধরে মারলও, কারণ সে তাদের অঙ্ক নকল করতে দেয় নি। স্কুলে যাওয়াটা তার কাছে ছিল শাস্তি স্বরূপ। সহপাঠীদের সে ঘৃণা করত, তবে ওদের ভয়ও করত। একদিন তার জ্বর উঠলে সে খুব আনন্দিত হল: তাকে স্কুলে যেতে হবে না। তখন থেকেই সাশা অসুস্থ হয়ে পড়ল। রোগের জন্য তাকে কম ঝামেলা পোয়াতে হয় নি: বার বার ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছে; অসংখ্য পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য উপস্থিত থাকতে হয়েছে, এবং অবশেষে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রোগাক্রান্ত হয়ে সে বেশকিছু সুবিধাও পেল: প্রথমত, স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না, আর দ্বিতীয়ত, ছেলেটি পরিবারে আরও বেশি সুবিধা উপভোগ করতে লাগল, সবাই তার খুব সেবাযত্ন করতে শুরু করল, সে রোগী হয়ে উঠল যার জন্য কোন বাধানিষেধ থাকতে পারে না।

পাঠক প্রশ্ন করবেন: এটা হয়তো কোন রোগই নয়? ছেলেটি হয়তো স্রেফ রোগের ভান করছিল?

না। সাশা ভান করছিল না। সে সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।

অনেক নিউরোসিস বিকাশ লাভ করে শর্তাধীন বাঞ্ছনীয়তার মেকানিজম অনুযায়ী। কিছু কিছু ছেলেমেয়ের হাত 'অসাড়' হয়ে যায়, আর কারো কারো স্কুলে যাওয়ার আগে ভীষণ বমির ভাব দেখা দেয় অথবা খুব কাশি শুরু হয়। কল্পিত অন্ধতা আর বধিরতার ঘটনাও বিরল নয়। এরূপ সমস্ত ক্ষেত্রেই বুঝতে হবে যে ছেলেমেয়েরা নিউরোসিসে — স্কুল নিউরোসিসে ভুগছে। এরূপ নিউরোসিসে আক্রান্ত হয় সাধারণত বেশি আদুরে ও জেদী ছেলেমেয়েরা, স্কুল যাদের বাড়ির সমস্ত সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করে। মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন যে বেঠিক লালনপালনের ফলে এ ধরনের শিশুদের 'দাবিদাওয়ার পরিমাণ' কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যায়। মা-বাবাদের দ্বারা বেশি প্রশংসিত ও প্রশ্রিত হওয়ার দরুন তারা শিশু সমাজে সাধারণ পরিবেশে অনেক কাল নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না।

যে-সমস্ত ছেলেমেয়েকে সামান্যতম ভুলের জন্য মা-বাবারা শাস্তি দিতেন তাদের পক্ষেও স্কুল জীবনের রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হওয়া খুবই কঠিন। এরূপ শিশুরা হয় লাজুক, ভীতু ও অনোদ্যোগী। তারা নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েরা প্রায়ই তাদের নিয়ে হাসাহাসি ও ঠাট্টাতামাসা করে। এ সমস্তকিছু তাদের এমনিতেই দুর্বল মনঃপ্রকৃতিকে আরও বেশি আহত করে, নিউরোসিস ডেকে আনে।

অন্যান্য ভুলভ্রান্তি অথবা প্রতিকূল পরিস্থিতির দরুনও স্কুল নিউরোসিস দেখা দিতে পারে। সময় সময় ক্লাসে সাধারণ শ্রুতলিপি অথবা পরীক্ষাও নিউরোসিসের কারণ হতে পারে। একদিন এক মা তাঁর মেয়েকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে এলেন — প্রতিটি ক্লাস টেস্টের আগে মেয়েটির ভীষণ বমি হত। নিউরোসিস দেখা দেয় প্যাথোলজিকেলি সুদৃঢ় শর্তাধীন যোগাযোগের মেকানিজম অনুসারে। এক ক্লাস টেস্টের আগে সকাল বেলা মেয়েটির বমি হল (তার খাবারে ভেজাল ছিল)। মেয়ের বমন দেখে মা খুব ভয় পেয়ে গেলেন। ডাক্তার মেয়েটিকে দেখলেন। তাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। সে স্কুলে গেল না। কঠিন পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকল। পরে তার বমি হত প্রতিটি পরীক্ষার আগে, এমনকি স্কুলেও এবং এমনকি তখনও যখন সে নিজের জ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকত।

অথবা অন্য একটা ঘটনা: স্কুলের সান্ধ্যানুষ্ঠানের পর এক মেয়ে তার কণ্ঠস্বর হারিয়ে বসল। সে ওই অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিল। মেয়েটি দেখতে সুন্দর ছিল না, তার মুখটি ছিল ছুলিতে ভরা, তার চোখগুলো ছিল টেরা। কিন্তু তার গলাটি ছিল অতি সুন্দর ও সুরেলা, সঙ্গীত শ্রুতি

ছিল অসাধারণ। তার গান গাওয়ার সময় এক ছেলে জোরে একটি কটু মন্তব্য করল: 'দ্যাখ্, মেয়েটি কী বিশ্রী, কিন্তু গাইছে খাসা!' মেয়েটি এই মন্তব্য শুনতে পেল, মঞ্চ থেকে ছুটে পালিয়ে গেল, তারপর অনেকখন কাঁদল, তার মন কিছুতেই প্রবোধ মানছিল না। ফলে সে কণ্ঠস্বর হারাল, এমনকি কথাও বলতে পারত না। চিকিৎসার পর মেয়েটি বাক্‌শক্তি ফিরে পেল, তবে সেই তখন থেকে গানবাজনা কিন্তু একেবারে ছেড়ে দিল।

স্কুল নিউরোসিস সর্বদা অথবা প্রায় সর্বদাই চিকিৎস্যযোগ্য। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা সহজে সারানো যায়। কিন্তু এই সমস্ত নিউরোসিস অনেক সময় অন্যান্য রোগের আকার নিয়ে থাকে, তাই সঙ্গে সঙ্গে ধরা যায় না, ফলে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এমতাবস্থায় সময় সময় সুদীর্ঘ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

উচ্চ শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের নিউরোসিসের (তা অল্পবয়সী স্কুল ছাত্রদের নিউরোসিসের মতো নয়) নিজস্ব বিশেষত্ব আছে: এই সমস্ত নিউরোসিস প্রায়ই বড়দের নিউরোসিসের মতো চলে। তবে এই বয়সের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তা নিয়েই সংক্ষেপে হলেও কিছু বলতে চাই। আমাদের রোগী ভলোদিয়ার কথা আপনার মনে আছে, পরিবারে দ্বিতীয় সন্তান জন্ম হওয়ার পর যার মূর্ছা শুরু হয়? পরে সে মূর্ছা যেতে লাগল তার পক্ষে যেকোন সংকটজনক পরিস্থিতিতে, ছেলেটি খিট্‌খিটে ও একগুঁয়ে হয়ে উঠল। মাথা ব্যথা শুরু হল। একদিন স্কুলে টেস্টের সময় অঙ্ক করতে না পেরে সে শিক্ষয়িত্রীকে বলল যে তার খুব মাথা ব্যথা করছে এবং সেই জন্য অঙ্ক কষা তার পক্ষে সম্ভব নয়। শিক্ষয়িত্রী তাকে বললেন যে অঙ্ক না কষলে সে গোল্লা পাবে। তখন ক্লাসেই সে ফিট হয়ে গেল। প্রধান শিক্ষকের কক্ষে তার আচরণ নিয়ে আলোচনার সময়ও অনুরূপ ঘটনা ঘটে।

রোগের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির চরিত্রে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যও দেখা দেয়, যেমন: মিথ্যা কথা বলার প্রবণতা, স্বার্থপরতা, বাইরের প্রভাবের প্রতি ঝোঁক। তর্কের সময় তাকে কোনরূপ আপত্তি জানালে সে উত্তেজিত হয়ে উঠত, ক্ষেপে যেত, কাঁপতে আরম্ভ করত, চোখমুখ আগুনের মতো লাল হয়ে উঠত, আত্মহারা হয়ে হাতের কাছে যা পেত তা-ই তুলে নিত, প্রতিপক্ষের উপর হামলা করত। একদিন এমনকি অল্পের জন্য নিজের সহপাঠীকে খোঁড়া করে দেয় নি! কেবল এই ঘটনাটির পরই ছেলেটিকে সাইকিয়াটিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তখন ভীষণ দেরি হয়ে গিয়েছিল!

প্রাক্‌স্কুল বয়সে অথবা স্কুলের নিম্ন শ্রেণীগুলোতে আরব্ধ দীর্ঘকালীন

স্নায়ু-রোগগুলো কিশোরের গঠনরত ব্যক্তিত্বের উপর পীড়াদায়ক ছাপ রেখে যায়। এই সমস্ত রোগের মধ্যে রয়েছে: তোত্‌লামি, রাত্রিবেলা ঘুমের মধ্যে বিছানায় প্রস্রাব, পেশীর খেঁচুনি (ফাংক্‌শোন্যাল টিক), ভীতির নিউরোসিস ইত্যাদি।

এই সমস্ত নিউরোসিস কিশোরের মনে নিজের অপকৃষ্টতা সম্পর্কে তীব্র দুর্ভাবনা জাগায়। নিজস্ব অপকৃষ্টতা বোধ কিশোরের পক্ষে দুর্বহ এক ব্যাপার, সে কোন-না-কোনভাবে খুঁতটি গোপন রাখতে এবং সেই কষ্টদায়ক খুঁত জনিত ক্ষতিটি পূরণ করতে চেষ্টা করে।

যেমন, পেশীর খেঁচুনি অথবা তোত্‌লামির জন্য বদনাম হওয়ার ভয়ে অনেক কিশোর-কিশোরী তাদের যোগাযোগের পরিধি সীমিত রাখে। অনুরূপ স্বেচ্ছামূলক বিচ্ছিন্নতার ফলে প্রায়ই এ ধরনের কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠে: অত্যধিক অনুভূতি প্রবণতা, সহজে দুঃখ পাওয়ার প্রবণতা, সন্দেহ প্রবণতা, ইচ্ছাশক্তিহীনতা, সাহসহীনতা, লাজুকতা, অসামাজিকতা, নিষ্ক্রিয়তা, নিরবচ্ছিন্ন বিষণ্ণতা। অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজস্ব অপকৃষ্টতা বোধ ভালোভাবে কথা বলতে সক্ষম সুস্থ সমবয়সীদের প্রতি ঈর্ষা এবং কখনও কখনও এমনকি বিদ্বেষও উদ্রেক করে। এরূপ নিউরোটিক কিশোরদের চরিত্রে প্রাধান্য লাভ করে আক্রমণ প্রবণতা, ক্রোধ, সন্দেহ প্রবণতা, আবেগগত অস্থিরতা, কল্পিত অথবা প্রকৃত অপমানকারীকে নিষ্ঠুরভাবে শায়েস্তা করার প্রবণতা।

কিশোর যদি রাত্রিবেলা ঘুমের মধ্যে বিছানায় প্রস্রাব করে তাহলে এ ব্যাপারটিও তার যোগাযোগের পরিধি সীমিত করে দেয়, এবং তার ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রটিকে সঙ্কীর্ণ করে রাখে। এই রোগ কিশোরদের দূর যাত্রায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে, অন্যান্য শহর ভ্রমণের সুযোগ থেকে এবং পাইওনিয়র অথবা ক্রীড়া শিবিরে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে।

কিশোররা স্নায়ু-রোগে তখনই আক্রান্ত হয়, যখন তাদের চারিপাশের পারস্পরিক সম্পর্কের জগৎটি তাদের মনঃপূত হয় না। পরিবারে দীর্ঘ কাল ধরে প্রতিকূল পরিস্থিতি (পিতামাতার মদ্যপান, ঝগড়াবিবাদ, মারামারি, পরিবারের ভাঙ্গন ইত্যাদি) এবং লালনপালনের বেঠিক পদ্ধতি (শিশুকে প্রহার, দমনের পরিবেশ, ক্রমবর্ধমান কিশোরকে বাচ্চা বলে গণ্য করা, খুব বেশি বাধানিষেধ ইত্যাদি) হামেশা শিশুর স্নায়ু-ব্যবস্থাকে বিকল করে তুলে, স্নায়ু-ব্যবস্থার ক্ষতিপূরণ ক্ষমতা নিঃশেষ করে দেয়, মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজে ব্যাঘাত ঘটায় — এক কথায়, স্নায়ু-রোগের জন্য

অনুকূল 'ভিত্তি' গড়ে তুলে। পরিবর্তনশীল 'ভিত্তির' কল্যাণে অনেক সময় সামান্য রাগও মারাত্মক ব্যাপারে পরিণত হয়ে প্রতিবাদের প্যাথোলজিকেল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

কোন কোন ক্ষেত্রে কিশোরের মধ্যে প্রতিবাদের প্যাথোলজিকেল প্রতিক্রিয়া বিকাশ লাভ করতে পারে আকস্মিক ও কঠোর মানসিক আঘাতের ফলে (যেমন, কিশোরের ব্যক্তিগত জীবনে মা-বাবাদের নোংরা হস্তক্ষেপের দরুন, হঠাৎ কিশোরের কোন গোপনীয় ব্যাপার ফাঁস হয়ে গেলে)।

মা-বাবারা যখন কিশোর সন্তানদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিশেবে দেখেন (যা তাঁরা ইচ্ছাখুশি ব্যবহার করতে পারেন) তখনও পরিবারে সংঘর্ষ দেখা দেয়। এটা অবশ্য ঠিক যে জীবনের প্রথম বছরগুলোতে শিশু দুর্বল, অসহায় এবং পুরোপুরিভাবে মা-বাবার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ১২-১৫ বছর কেটে যাওয়ার পর শিশু স্বনির্ভর ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। তখনও অপরিণত ও অদৃঢ়, কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যক্তিত্ব! অথচ পিতামাতার কার্যপ্রণালীতে বস্তুত পক্ষে কোন পরিবর্তন ঘটে না। তখনই সংঘর্ষ বাধে। সময় সময় মারাত্মক সংঘর্ষ।

পাঠক আপত্তি তুলতে পারেন: তাহলে কি বলতে চান যে ছেলেমেয়েদের কোনকিছুই বলা উচিত নয় এবং তাদের যা খুশি তা-ই করতে দিতে হবে?

নিশ্চয়ই না। ভুল করলে অবশ্যই বলবেন, অনুচিত কাজ করতে অবশ্যই বারণ করবেন, বাধ্যতা অবশ্যই দাবি করবেন, তবে পূর্বেকার বয়সগুলোর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারে।

কর্কশ ও কঠোর আদেশ নয়, সমান ও শান্ত কণ্ঠ; হুকুম নয়, অনুরোধ, কিশোরের প্রতি মৈত্রীপূর্ণ মনোভাব। কিশোরের প্রতি, তার মতামত ও বিচারবিবেচনার প্রতি (তা যতই অপরিণত হোক না কেন) শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব — এই বয়সে ঠিক সেটাই দরকার।

কৈশোরে গড়ে উঠে চরিত্র, গঠিত হয় ব্যক্তিত্ব, স্থাপিত হয় ভবিষ্যৎ নাগরিকের ভিত্তি। আমাদের ছেলেমেয়েরা কীরূপ হবে তা অনেকাংশেই নির্ভর করে আমাদের বড়দের উপর।

কঠোরতা অথবা কোমলতা?

ভলোদিয়া ক্রীড়া শিবির থেকে চলে যাচ্ছিল সন্ধ্যা বেলা, যখন সবাই খেতে বসেছিল। সে চলে যাচ্ছিল তাড়াহুড়ো ক'রে, পেছন পানে না তাকিয়ে,

যেন তার ভয় হচ্ছিল তাকে ফিরতে বাধ্য করা হবে। কেবল শিবিরের সীমানা ছাড়ার পরই ভলোদিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

বৃদ্ধ ফার গাছ, দীর্ঘ দেবদারু, বার্চ আর অ্যাস্প বৃক্ষগুলো তীব্র নিন্দার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ভলোদিয়ার দিকে।

ভলোদিয়ার মা থেমে পেছন পানে তাকালেন।

— দ্যাখ্, এখানে কী সুন্দর! — বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন তিনি। — পরে তোর নিজেরই আফসোস হবে...

— মা-মণি, চলো বাড়ি যাওয়া যাক! — মিনতি ক'রে বলে ভলোদিয়া। — আমি বাড়িতে থাকতে চাই, তোমার সঙ্গে!

— ঠিক আছে; ঠিক আছে, আবার সেই আগের কথা বলতে হবে না, — ক্লান্তভাবে বললেন মা। — শান্ত হ' তো, আমরা বাড়ি যাচ্ছি।

চারিদিকে পাখির কলকাকলি। কিন্তু ভলোদিয়া তা শুনছিল না, চারিপাশের সৌন্দর্য দেখছিল না। সে মাটির দিকে তাকিয়ে চুপি চুপি চোখের জল মুছতে মুছতে চলছিল। ক্বচিৎ থামছিল। মা-মণি, আমি কত সুখী! — বলল সে। — ওখানে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব... ভীষণ মন খারাপ হত... তুমি আমায় বুঝতে পারছ?'

মা ধীরে ধীরে মাথাটি নাড়লেন। ভলোদিয়া যদি এখন তাঁর মনের ভেতরে উঁকি দিতে পারত, তাহলে দেখত যে তিনি নিজেই তার সঙ্গে কেঁদে ফেলতে প্রস্তুত। দুই ঘণ্টা বাদে তাঁরা বাড়ি পোঁছবেন, বাবার সঙ্গে দেখা হবে। তিনি কী বলবেন, ভলোদিয়ার শিবির জীবনের এই অপ্রত্যাশিত সমাপ্তি দেখে কী মনে করবেন? মা যেন স্বামীর কণ্ঠ শুনতে পেলেন: 'এই-ই হচ্ছে তোমার শিক্ষার ফল! ছেলে নয়, মেয়ে মানুষ করছ। এ সব কী হচ্ছে? যেন ও এখনও দুধের বাচ্চা। ওকে বাড়িতে নিয়ে আসার কী দরকারটা ছিল? আর তুমি-ই বা কেন শিবিরে গিয়েছিলে? ওর কিছুই হত না, আরও এক-দু' দিন কেঁদে ঠিক হয়ে যেত। পুরুষ মানুষকে আরও কতকিছুতে অভ্যস্ত হতে হয়। তুমি ওকে দিয়ে ন্যাকড়া বানিয়ে ছাড়বে!' ফের তাঁদের মধ্যে সেই একই কথাবার্তা শুরু হবে: মা ছেলেকে ভীষণ লাই দেন, তার সমস্ত দোষ ক্ষমা করেন, নিজের কোমলতা আর করুণা দিয়ে ওকে কেবল দুর্বলই করছেন, সেই জন্য তার চরিত্রটিও নাকি পুরুষের মতো হচ্ছে না...

— বাবাকে কড়া হতে হবে। অপরাধ করলে বাবা কিশোর ছেলেকে শাস্তি দেবেনই — নতুবা ওর মধ্যে দায়িত্বহীনতা বাসা বাঁধবে।

— অনুশোচনা ছাড়া শাস্তিতে কোন কাজ হয় না। শিশু যদি নিজের দোষ না বোঝে এবং তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে না চায় তাহলে শাস্তি তাকে কিছুই শেখাবে না, বরং তাকে চটিয়ে তুলবে।

ভলোদিয়ার বাবা যদি স্বৈরাচারী, বেশি কঠোর হতেন, যদি তিনি সেই স্বামী ও পিতাদের মতো হতেন যাঁরা নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই গ্রাহ্য করে না, তাহলে সমস্ত ব্যাপারই সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু ভলোদিয়ার বাবা মনেপ্রাণে ছেলের মঙ্গল কামনা করেন, তিনি চান সে যেন মানুষের মতো মানুষ ও পুরুষের মতো পুরুষ হয়ে উঠে। সেই জন্যই ভলোদিয়ার মা এখন দুশ্চিন্তায় মরছেন: স্বামীর কথায় সর্বদাই যে কিছুটা সত্য রয়েছে তা তিনি লক্ষ্য করেছেন।

এখন তাঁর মনে পড়ল সেই অন্তহীন পারিবারিক সংঘর্ষগুলোর কথা যা দেখা দিত ভলোদিয়ার জীবনের যেকোন প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। সংঘর্ষগুলো সাধারণত বাধত খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়েই! সন্ধ্যায় ভলোদিয়া পা ধুচ্ছে — বাবা চান সে যেন অবশ্যই ঠান্ডা জল দিয়ে পা ধোয়, পুরুষকে ছেলেবেলা থেকেই মজবুত হয়ে উঠতে হবে। কিন্তু মা ঠিক উল্টোভাবে চিন্তা করেন: কী ক'রে ছেলেটিকে বরফের মতো ঠান্ডা জলে পা ধুতে দেওয়া যায়, যদি এমনিতেই ও বছরে চার-পাঁচ বার ভুগে? ভলোদিয়া স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে — মা ছেলেকে সাহায্য করতে ছুটেন, কিন্তু বাবা তাঁকে থামিয়ে দেন: 'আর কত দিন ও-ভাবে মদদ করবে? দশ বছর তো হয়ে গেল, এখন নিজেই নিজের কাজ করুক! নিজেই নিজের পেন্ট ইস্ত্রি করুক, নিজেই কাপড়চোপড় পরুক, আর আহ্লাদে কাজ নেই।' 'ও নিজে কী ক'রে পেন্ট সাফ ও ইস্ত্রি করবে? — ভাবেন মা। — ওকে স্কুলে পেঁাছে না দিয়ে এলে নিজে কী ক'রে যাবে? ওকে একা ছেড়ে দিলে বেচারা সারা দিন না খেয়ে থাকবে, কাপড়চোপড় নোংরা হয়ে যাবে। বড়দের সবাই নিজেদের দেখাশোনা করতে পারে না, আর ও তো নেহাত কাঁচ ছেলে...' ঝগড়ার আরও একটি নিত্য কারণ — ভলোদিয়া রাত্রিবেলা তার ঘরের দরজা খোলা রাখতে বলে; তাতে তার সহজে ঘুম আসে, সে বড়দের চাপা কণ্ঠ শুনতে পায় এবং নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে। 'কী বিলাসিতা! — ক্ষেপে যান বাবা। —

দরজা বন্ধ ক'রে ঘুমো! তাহলে তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে!' আর ভলোদিয়ার মা ভাবেন যে বাপ দেখতে পাচ্ছেন না ছেলেটা কত একেলা, সে ঘুমানোর সময়ও মা-বাবার সঙ্গে থাকতে চায়। এতে খারাপের কী আছে? এরূপ তুচ্ছ ব্যাপারেও কেন ছেলেটিকে সরাসরি না করে দেওয়া হবে? আর ভলোদিয়ার প্রতি মায়ের স্নেহ নিয়ে কত কথা শোনা যায়! মা কাজ থেকে এলে ভলোদিয়া তাঁর কাছে ছুটে যায়, তাঁকে চুমু দেয়, জড়িয়ে ধরে, কারণ সারা দিন তিনি কাছে ছিলেন না বলে তার মন কাঁদছিল। কিংবা সে বসে থাকে, বই পড়ে, পড়া তৈরি করে। মা কাছে এসে একবার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। এবং স্বামীর সঙ্গে কথা শুরু হয়: 'তুমি এত মায়া দিয়ে দিয়ে ওকে একেবারে তুলোর মতো নরম করে ফেলছ। পুরুষের এত স্নেহমমতার দরকার নেই! ছেলের সঙ্গে আচরণে রুক্ষতা, কঠোরতা আর সংযম থাকা চাই!' 'তা ছেলেটিকে একটু বেশি আদর আর চুমু দিলে ক্ষতি কী? — কিছুতেই বুঝতে পারতেন না ভলোদিয়ার মা। — ওর সঙ্গে তো সেরূপ আচরণই দরকার — গালে একটি চুমু দিলে, মাথায় হাত বুলালে সে খুশি, আনন্দিত ও শান্ত হয়, মন দিয়ে কাজ করে। তখন সব কাজই ভালো উৎরোয়... শিশুটিকে কী ক'রে অতি সাধারণ মনোযোগ, আদর, আন্তরিকতা আর স্নেহমমতা থেকে বঞ্চিত করা যায়?' এটা গোপন করে লাভ নেই যে অনেক সময় বাড়ি থেকে বাবার চলে যাওয়ার পর মা ছেলেকে তার ইচ্ছামতো টিভি দেখতে, সোফায় শুয়ে শুয়ে বই পড়তে দিয়েছেন, ভলোদিয়ার সমস্ত আবদার আর অভিমানের কথা শুনেছেন। ...স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করছেন বলে তাঁর একটু বিবেকে বাধছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মায়ের মন বাধা আর কঠোরতা সইতে পারে না: ছেলের জন্য কষ্ট হয়।

তাহলে ব্যাপারটি এরূপ দাঁড়াচ্ছে — বাপও ঠিক, মা-ও ঠিক। কিন্তু আসল সত্যটি কোথায়? ছেলের সঙ্গে সর্বদা লোহার মতো শক্ত ও কঠোর হতে হবে — মা এ ব্যাপারে স্বামীর সঙ্গে কিছুতেই একমত হতে পারেন নি। অথচ তাঁদেরই পরিচিত এক পরিবারে বাবা ছেলেকে 'লৌহ' পুরুষ করে তুলছেন। সে চমৎকার খেলোয়াড়, তার সাহসও প্রচুর। তার জীবনটি চলছে স্পষ্ট ও পরিষ্কার গতিতে। নিজের চিন্তাধারা ও ক্রিয়াকলাপে সে অটল, দোদুল্যমানতা কী জিনিস তা জানে না। কিন্তু তার সঙ্গীসাথীরা বলে যে ছেলেটি সে রুক্ষ, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে এবং কাউকেই গ্রাহ্য করে না। এ-ও আবার খারাপ। ভাবতে কষ্ট হয়, কিন্তু সত্যিই বাপের প্রতি ভলোদিয়ার খুব একটা টান নেই, সে তাঁকে

বাঘের মতো ভয় করে। এমনকি এখনও, পথ চলার সময়, বাপের সঙ্গে আসন্ন সাক্ষাতের কথাটি ভাবতেই সে ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে যায়। বাড়িতে ছেলে বড় হচ্ছে, বাপের প্রতি তার বেশি টান থাকার কথা, সে এখন আর কচি শিশুটি নয়, মায়ের সামনে তার ও বাপের পুরুষের সংহতি থাকা দরকার। কিন্তু সমস্তকিছুই অন্য রকম দাঁড়াচ্ছে! বাপকে ছেলে ভয় করে, তাঁকে সে এড়িয়ে চলে, তাঁর সঙ্গে খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারে না; কিন্তু মা'র সঙ্গে তার আছে প্রকৃত, আন্তরিক ও মৈত্রীপূর্ণ সংহতি। সে সর্বান্তঃকরণে মাকে ভালোবাসে, নিজের সমস্ত দুর্বলতা নিয়ে তাঁর কাছেই যায়। বিকাল বেলা মা'র অপেক্ষায় বসে থাকে: কখন তিনি কাজ থেকে ফিরবেন। মা বাড়ি ফিরলে তাঁকে সে সমস্তকিছু বলে। কারণ সে জানে: মা'র কাছে সহানুভূতি ও সমর্থন মিলবে।

— শিশুদের প্রায়ই অনাদর সইতে হয়, নিজেকে অপমানিত বোধ করতে হয়, কিন্তু সময় সময় তার উপকারিতাও আছে: এরূপ অনাদর আর অপমান মনকে শক্ত করে। শিশুর সঙ্গে কঠোর হতে ভয় করবেন না — জীবন তার প্রতি আপনার চেয়ে বেশি কঠোর হবে...

— শিশুর প্রতি অবিচার? প্রায়ই তা অবিচার বলে মনে হয় মাত্র। আসলে তা হচ্ছে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কঠোরতা। এই সমস্ত অনাদরকে ভয় করার প্রয়োজন নেই: ওগুলো মনকে শক্ত করে।

— শক্ত করে কি? শিশুরা দুর্বল, বড়দের সামনে তারা অসহায়। বড়রা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই নিষ্ঠুর হয়ে উঠে। দায়িত্বহীনতা প্রায়ই নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়। শিশুর প্রতি অবিচার — সে মারাত্মক জিনিস, তা তার মনকে গভীরভাবে আহত করে, নৈতিক অনুভূতিকে বিকৃত করে।

কেন এরূপ ভাবা হয় যে করুণা মানুষকে অবমানিত করে? উল্টোটাও তো ঘটে — করুণা রক্ষা করে, বাঁচতে সাহায্য করে, আর যে-ব্যক্তি করুণা দেখায় করুণা তাকে মানবিক গুণে মহীয়ান করে তুলে। আর শিশুদের প্রতি করুণা, বিশেষত মায়ের করুণা, সম্ভবত পৃথিবীতে সবচেয়ে সঙ্গত ব্যাপার। যে-সমস্ত পুরুষ নিজের স্ত্রীদের এই গুণটি দম্ভভরে উপেক্ষা করেন তাঁদের কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। জীবনে এবং সাহিত্যে এমন বহু ঘটনার নজির রয়েছে যখন সন্তানের প্রতি মায়ের ঠিক স্নেহপূর্ণ ও সোহাগ-ভরা সম্পর্কই মা এবং ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপূর্ব ও পারস্পরিক সমঝোতাপূর্ণ সম্পর্কের মঙ্গলজনক ভিত্তি গড়ে দিয়েছে। উল্টো দিকে, বাপের অত্যধিক শুষ্কতা ও কঠোরতা কেবল উদাসীনতা আর অনাত্মীয়তারই

জন্ম দিয়েছে। কোমলতা আর দরদ শিশুর মধ্যে এই বিশ্বাস জাগায় যে সে সহানুভূতি পাবে, নম্র ও আন্তরিক সম্পর্ক তাকে মেলামেশা করতে ও আস্থা পোষণ করতে উদ্বুদ্ধ করে, আর চির কঠোরতা শিশুকে ভীত করে ও দূরে সরিয়ে দেয়।

এমনটা অবশ্য ঘটে যে ছেলেমেয়েরা ক্রীড়া শিবিরে মিলেমিশে থাকতে পারে না: কারোর সঙ্গে বন্ধুত্ব হল না, স্বভাবের দিক থেকে আত্মবদ্ধ, হৈ-হল্লা পছন্দ করে না, দৈনন্দিন জীবনের কঠোর নিয়মে অভ্যস্ত নয়। তবে ভলোদিয়ার ব্যাপারটি, মা এখন যেমনটা বুঝতে পারলেন, ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। জীবনে সেই প্রথম বার ছেলেটিকে ক্রীড়া শিবিরে পাঠানো হয়েছিল। সে তাতে অভ্যস্ত ছিল না, তাই সঙ্গে সঙ্গে তার মনমেজাজ বিগড়ে গেল, নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করল এবং একেবারে নিরাশ হয়ে পড়ল। সমস্ত ভুলভ্রান্তি বিবেচনা ক'রে আগামী বছর আগে থেকে, শীত কাল থেকে, ভলোদিয়াকে ক্রীড়া শিবিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে হবে; প্রস্তুত করতে হবে সর্বাঙ্গীণভাবে; যেন স্বয়ংপরিবেশনে অভ্যস্ত হয়, যেন মিশুক হয়, যেন স্বার্থপর না হয়। এক বছরে একটু বড়সড় হবে, অনেককিছু বুঝতে শিখবে। এখন সে আনন্দিত মনে বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এবং তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে সে খুব সুখী। কিন্তু মা'র মন ভার। ভলোদিয়া জীবনে এই প্রথম বার অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছে, সে শেষ অবধি বাধাবিপত্তি অনুভব করে নি, তা অতিক্রম করতে পারে নি, মা বস্তুতপক্ষে সমস্যার বেঠিক সমাধানে ছেলেকে সমর্থন জুগিয়েছেন, তাকে শেষ অবধি ব্যাপারটি বুঝতে দেন নি — এ সমস্তকিছু মানুষের মনকে শক্ত করে না, দুর্বলই করে। আজ মা হয়তো ঠিকই করছেন: ব্যাপার-স্যাপার চরমাবস্থা অবধি, সঙ্কট অবধি নিয়ে যাওয়া উচিত নয় (তিনি দেখেছেন, তাঁর ছেলে ঠিক সংকটজনক অবস্থায়ই ছিল)। কিন্তু ভবিষ্যতে কী করা? সম্ভবত, বাবা-মা দু'জনকেই ছেলের প্রতি তাঁদের আচরণ বদলাতে হবে। বাবা তাঁর রুক্ষতা, শুষ্কতা ও কঠোরতা কিছুটা সীমিত করবেন, আর মা তাঁর করুণা ও অত্যধিক কোমলতা কিছুটা কমাবেন। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা প্রায়ই অন্ধ... প্রাচীন ভারতীয় প্রবচনে অকারণে বলা হয় নি: 'পাঁচ বছর অবধি ছেলেকে রাজা ভাববে, পাঁচ থেকে পনেরো বছর অবধি তাকে গোলাম ভাববে, আর পনেরো-র পর থেকে তাকে বন্ধু ভাববে।' কিশোর ছেলের সঙ্গে নিজের সমস্ত পারস্পারিক সম্পর্কে যুক্তি মেনে চলা ও অটল থাকা

খুবই কঠিন কাজ। কথাগুলো অত্যন্ত সত্যি, এবং শিশুর দুর্বলতার প্রতি কঠোর, যুক্তিনিষ্ঠ, খুঁতখুঁতে, সংযমী ও অসহিষ্ণু হওয়া যতই কঠিন হোক না কেন, তা কিন্তু সর্বাগ্রে শিশুর জন্যই প্রয়োজনীয়। বাহ্যিক সংযম ও নীতিনিষ্ঠতার আড়ালে আন্তরিকতা বজায় রাখা, পূর্ণ যুক্তিনিষ্ঠতা ও কঠোরতার আড়ালে স্নেহপূর্ণ ও সাগ্রহ মনোযোগ প্রদান, শিশুর মানবীয় দুর্বলতাগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ এবং সেই দুর্বলতা থেকে তার মুক্তি লাভের জন্য প্রকৃত সহায়তা দান — ঠিক এই ভাবেই নিজের শিক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি গড়া উচিত। অবশ্যই, সন্তানের জীবন ও শিক্ষার সঙ্গে জড়িত সমস্ত ব্যাপারে মা-বাবার একমতাবলম্বী হতে চেষ্টা করা প্রয়োজন।

'আপনার ছেলেটি এত সোহাগী!'

শনিবারের মজার সফরটি মাঝ পথেই বাদ দিতে হল — ভ্লাদিমির শহর থেকে অনতিদূরে ঘটল মোটর দুর্ঘটনা। সবাই বেঁচে গেছে এবং খুব একটা জখম হয় নি। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা লেওনিয়ার: তার একটা পা ভেঙে গেছে — জটিল ফ্র্যাকচার। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শক্ত বিছানায় তাকে প্রায় নিশ্চল অবস্থায় শুয়ে থাকতে হত। পায়ে ভার বেঁধে দেওয়া হয়। লেওনিয়ার খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছিল, — ভীষণ জোরে, গলা ফাটিয়ে, যাতে মা শুনতে পান। কিন্তু মাকে রাখা হয়েছিল অন্য হাসপাতালে, এবং ছেলের অভিযোগ শোনা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

দুর্ঘটনার পর দু'দিন কেটে গেল। তিন দিনের দিন বিকালে এক নার্স এসে লেওনিয়াকে একখানা লেফাফা দিলেন:

— তোর জন্য চিঠি। তোর মা'র সঙ্গে হাসপাতালে দেখা হয়েছে, তিনিই দিয়েছেন। উত্তর দিতে বলেছেন। আমি নিয়ে যাব।

মা লিখেছেন: 'প্রাণপ্রিয় খোকা আমার! আমাদের ভাগ্যটা খুবই খারাপ! কিন্তু করার কিছু নেই, জীবনে এমনটা ঘটে! আমি জানি, তোর এখন ভীষণ ব্যথা হচ্ছে। তবে ডাক্তারবাবু বলেছেন যে সবই সেরে যাবে, কোন চিহ্নই থাকবে না; ছোটাছুটি, লাফালাফি ও নাচানাচি — সবই করতে পারবি। বাবা আমার, আমি তোকে প্রতিদিন লিখব এবং তোর চিঠির অপেক্ষায় থাকব। মারিয়া মাসি আমার কাছে আসা-যাওয়া করবেন বলেছেন।

খুবই দুঃখের কথা যে আমি তোর কাছে আসতে পারছি না: আমায়ও হপ্তা দুয়েক হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। অনেক স্নেহ ও ভালোবাসা রইল।'

লেওনিয়া লিখেছে: 'মা, ডাক্তাররা আমার পায়ে নয় কিলোগ্রাম ওজনের কী একটা জিনিস ঝুলিয়ে দিয়েছেন। নড়াচড়া করার কোন উপায় নেই। এমনকি সুপও খাই শুয়ে শুয়ে। পা ব্যথা করছে, রাত্রে ঘুমাতে অসুবিধা হয়। তুমি এখন কেমন আছ?'

— আপনার ছেলেটি এত সোহাগী, ভীষণ সোহাগী! — লেওনিয়ার চিঠি দিতে গিয়ে মাকে বললেন নার্স। — ডাক্তার বা নার্স কেউ কাছে এলেই ও কাঁপতে শুরু করে!

— ও এখনও ছোট, মারিয়া পেত্রোভ্‌না!

— অত আর ছোট নয়, এগারো তো হয়ে গেল। আমাদের হাসপাতালে ওর চেয়ে ছোট ছেলেমেয়েরাও থাকে। ওদের কেউ এতটা মনমরা হয় না। একটু কাঁদার পরই ঠিক হয়ে যায়। আর আপনার ছেলে মোটেই প্রবোধ মানছে না!

— ওর নিশ্চয়ই ব্যথা করছে!

— আরে ব্যথা কবে কমে গেছে। ও নিজেই নিজেকে কষ্ট দিচ্ছে। একেবারে জেরবার হয়ে যাবে — ওকে হাসপাতালে অনেকদিন থাকতে হবে। তাহলে, চলি এবার। চিঠি লিখেছেন?

— হ্যাঁ, এই নিন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ!

'আপনার ছেলেটি এত সোহাগী!' দেখা যাচ্ছে যে এই কথাগুলো সম্পূর্ণ অসাধারণ, এমনকি অপমানকর অর্থ বহন করতে পারে। মারিয়া পেত্রোভ্‌না কথাগুলো উচ্চারণ করেন নিন্দার সঙ্গে: আদুরে, বলহীন, দুর্বলচিত্ত, তাই কি? তা কি সত্যি? না। মা তা মেনে নিতে পারলেন না। আমার লক্ষ্মী খোকা লেওনিয়া! হয়তো একটু বেশি আদর পেয়ে গেছে, তবে ছেলেটি কিন্তু বড় ভালো। সময় সময় সব মায়ের মতো তিনিও ঈর্ষান্বিত মনে লেওনিয়াকে তার সমবয়সীদের সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখতেন এবং অন্তরে ছেলের জন্য গর্ববোধ করতেন। কিন্তু এখন, এই প্রথম অগ্নিপরীক্ষার সময়, মা'র কাছ থেকে আলাদা হয়ে সে অন্যদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ করছে কেন? এটা সত্যি যে তার কষ্ট হচ্ছে, এরূপ অবস্থায় অভ্যস্ত নয়। কিন্তু অন্যরাও তো কষ্ট ভোগ করছে।

এবং হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল। তখন লেওনিয়ার বয়স ছিল ছ' বছর। সে

প্রাঙ্গণে খেলছিল, হঠাৎ পড়ে গেল এবং ধারাল পাথরে লেগে কপালটি কেটে গেল। ছেলেরা তাকে বাড়ি নিয়ে এল, এবং তিনি সন্তানের রক্তাক্ত মুখ দেখে ভীষণ চিৎকার শুরু করলেন। ওই মুহূর্ত অবধি নীরব লেওনিয়া মা'র দেখাদেখি নিজেও গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল। ছেলেগুলো সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালাল। মা লেওনিয়াকে কোলে তুলে নিয়ে ছুটতে ছুটতে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে পৌঁছলেন। ডাক্তার ক্ষতস্থানটি তাড়াতাড়ি জল দিয়ে ধুয়ে দেখে বললেন যে মারাত্মক কিছু হয় নি, তবে দু'টো সেলাই লাগবে বৈকি। পরে তিনি মা'র দিকে তাকিয়ে কঠোর সুরে যোগ করলেন: 'আপনি নিজেকে সামলান, বুঝলেন? নতুবা আমার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে কার চিকিৎসা দরকার — ছেলের না আপনার?' লেওনিয়া দোষীর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল — সে মাকে এত ভয় পাইয়ে দিয়েছে!

পরে একবার লেওনিয়া কাচ দিয়ে হাত কেটে ফেলেছিল। বেশ কিছুটা কেটেছিল। যখন তার হাতটি ব্যাণ্ডেজ করা হচ্ছিল, সে মাকে বার বার বলছিল: 'মা, তুমি চিন্তা কোরো না! কাচ আমার হাতে ঢুকে নি!' কিন্তু মা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। মিনিটে মিনিটে কপাল স্পর্শ করছিলেন: জ্বর উঠে নি তো? জিজ্ঞেস করছিলেন, কোথাও খোঁচা লাগছে কি না। তখন লেওনিয়াও ভয় পেয়ে গেল এবং জিজ্ঞেস করতে লাগল: কাচ যদি সত্যিই হাতে ঢুকে থাকে তাহলে কী হবে?

মায়ের মনে পড়ল যে ক্ষত, রক্ত আর রোগ দেখলে কখনও তিনি তাঁর ভয় গোপন করতে পারেন নি এবং চেষ্টাও করেন নি। এমনিতে তিনি জানেন কীভাবে দৃঢ় ও বদ্ধপরিকর হতে হয়, কিন্তু এখানে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েন। লেওনিয়াও ধীরে ধীরে সে রকম হয়ে উঠে। তিনি নিজের ভয় দেখতে পেতেন ছেলের বিস্ফারিত চোখে, নিজের অঙ্গভঙ্গি দেখতে পেতেন ছেলে যখন সামান্য আঁচড় পেয়ে আঙুলগুলো কামড়াত।

তার মানে, গলদ গোড়াতেই। ...কত বার তিনি ছেলেকে 'সাহস' কথাটি বলেছেন: সত্য কথা বলার সাহস যেন থাকে! দোষ করলে দোষ স্বীকার করার সাহস যেন থাকে! ভুলিস না যে তুই পুরুষ! সবই ঠিক। কিন্তু কথাটির সবচেয়ে সোজা অর্থে সেই সাধারণ 'সাহসটি' কোথায়? নিজের ভয় দমন করতে, নিজের বেদনা গোপন করতে, নিজের অশ্রু আটকাতে পারার ক্ষমতা কোথায়? তিনি আগে কখনও কেন এ নিয়ে ভাবেন নি? তাঁরই দোষে লেওনিয়া এখন ব্যথাকে এত ভয় করে, নিজেকে অসহায় ও দুর্বল বোধ করে...

মায়ের চিঠি: 'আমার আদরের লেওনিয়া! তুই কেমন আছিস? জানিস, পাশের কামরা থেকে প্রায়ই একটা মেয়ে আমাদের কাছে আসে। ওর নাম তানিয়া, তোরই সমবয়সী। ও প্রায় ছ' মাস হাসপাতালে আছে। তানিয়ার রোগটি খুব জটিল। ইতিমধ্যে ওর তিনটি অপারেশন হয়ে গেছে, আর একটি অপারেশন বাকী আছে। দেখলি তো? তিন-তিন বার কঠিন অপারেশন সহ্য করেছে। প্রতিটি অপারেশনের পর মাস খানেকের মতো নড়চড় না ক'রে বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। আবার সে আরও একটি অপারেশনের জন্য তৈরি হচ্ছে। তানিয়া যখন এত শান্তভাবে আসন্ন অপারেশনের কথা বলে তখন আমরা সবাই অবাক হয়ে যাই। আমি ওকে জিজ্ঞেস করি: 'তোর মোটেই ভয় করে না?' ও মাথাটি নাড়াল। পরে আমার কাছে এসে চুপিচুপি বলল: 'আমি আপনায় কানে কানে বলব, কেমন? আমায় যখন অপারেশনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আমি কল্পনা করি যে এই আমি — আমি নই, কোন বীর পুরুষ, যে কোনকিছুই ভয় করে না!'

তাই আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছি: আমার লেওনিয়া এখন নিজেকে কার মতো ভাবছে? হয়তো, দ্য'আর্তানিয়ানের মতো? মনে আছে, তুই সম্প্রতি আমায় 'তিন বন্দুকধারী'র গল্প বলেছিলি? ওরা কী নির্ভীক লোক ছিল! কত বার তারা আহত হয়, কিন্তু কিছুই তাদের দমিত করতে পারে নি! তোকে আমি চুমু দিচ্ছি, আমার প্রিয় দ্য'আর্তানিয়ান।'

লেওনিয়ার চিঠি: 'মা-মণি! তুমি ভুলে গেলে? দ্য'আর্তানিয়ানকে কেবল একবার আহত করা হয়েছিল, তা-ও খুব সামান্য। তা কোন জখমই নয়। তবে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল আতোস আর পর্তোস। আজ আমায় দু'টো ইনজেক্শন দেওয়া হয়েছে এবং পায়ে আরও এক কিলোগ্রাম ওজন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কেবল পাঁচ দিন কাটল, অথচ আরও পুরো একটি মাস হাসপাতালে থাকতে হবে! কিন্তু যদি আরও বেশি থাকতে হয়?!'

মায়ের চিঠি: 'একত্রে আমার প্রিয় আতোস আর পর্তোস! তোমাদের জখম কেমন আছে? লক্ষ্মীটি আমার, তোমায় ধৈর্য ধরতে হবে, ভালো হয়ে চলতে হবে। তুমি গুণছ তোমায় কতটা ইনজেক্শন দেওয়া হচ্ছে। পুরুষের পক্ষে কিন্তু তা একদম শোভা পায় না! তানিয়াকে তোমার চিঠি পড়ে শোনাতে আমার এমনকি একটু লজ্জাই হল। তানিয়া সর্বদাই আমার কাছে তোমার খোঁজখবর নেয়।'

লেওনিয়ার চিঠি: 'মা-মণি, আমি এখন হাতগুলো দিয়ে এবং

ভালো পা'টি দিয়ে ব্যায়াম করছি। ডাক্তার তা করতে বলেছেন। শুয়ে শুয়ে ব্যায়াম করা মোটেই সহজ নয়, তবে আমি সব ব্যায়ামই ঠিক মতো করছি। তোমার কী মনে হয়, স্কুলে আমায় ক্লাস ফাইভে তুলে দেওয়া হবে? আমি দু' সপ্তাহ পড়াশোনা করছি না। তানিয়া ভালো আছে তো?'

মায়ের চিঠি: 'স্নেহের লেওনিয়া। কাল আমাদের তানিয়ার অপারেশন হয়েছে। কেউ ওকে দেখতে আসে না। ওর মা-বাবা দূরে থাকেন, গ্রামে। তুই যদি একখানি চিঠি লিখে ওকে একটু প্রেরণা দিতে পারিস তাহলে মন্দ হয় না। ও সাহসী মেয়ে, কিন্তু এখন হয়তো ওর খুব কষ্ট হচ্ছে।

আমার মনে হয়, স্কুলের ব্যাপার নিয়ে তোর চিন্তার কোন কারণ থাকতে পারে না। নিজেকে তুই এখন ক্লাস ফাইভের ছাত্র ভাবলে ভুল হবে না। আজ এখানেই শেষ করছি, আমার প্রিয়, আমার সাবালক বাপটি।'

লেওনিয়ার চিঠি: 'মা, আমরা কামরার সবাই তানিয়াকে চিঠি লিখব ঠিক করেছি। আজ আমায় একটি ইনজেক্‌শন দেওয়া হয়েছে। আমি তাকিয়ে দেখছিলাম। সিস্টার বলেছেন যে আমি লক্ষ্মী ছেলে। মা-মণি, তাড়াতাড়ি সেরে উঠো! তোমাকে দেখার জন্য আমার মন ভীষণ ছট্‌ফট্‌ করছে।'

শিগগিরই, খুব শিগগিরই মা ছেলেকে দেখতে পাবেন। তিনি ছেলেকে কল্পনা করছেন: রুগ্ন, ফ্যাকাশে, একটা পা অচল... তাঁর চোখ ছল্‌ছল্‌ করে উঠল। না, এমনটা ঠিক হবে না। তিনি হাসিখুশি ও শান্ত মুখে লেওনিয়ার কাছে যাবেন। আর করুণা তাঁর মনের মধ্যেই থাকুক। যখন একেলা থাকবেন, তখনই তিনি একসঙ্গে কেঁদে নেবেন।

'কেমন আছিস, বাবা! — বলবেন তিনি লেওনিয়াকে। — আমি দেখতে পাচ্ছি — শিগগিরই ভালো হয়ে উঠবি!'

তিনি অবশ্যই এ কথাগুলো বলবেন।

আমাদের কর্তব্য — শিশুকে কেবল নিয়মকানুনের সংহিতাই নয় (যদিও নিয়মকানুনে তার প্রয়োজনও আছে), তাকে চিন্তা করার, অনুভব করার ক্ষমতাও জোগাতে হবে। সে যাতে কেবল সঠিকই নয়, সুন্দর সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে পারে সে ব্যাপারেও আমাদের যত্নশীল হতে হবে।

পরিবারে যখন বিপদ আসে

স্কুলের সমস্ত শিক্ষকই কুরাকিন ভাইদের পারিবারিক পরিস্থিতির কথা জানতেন। সেরিওজা পড়ত অষ্টম শ্রেণীতে, আর ভিতিয়া — ষষ্ঠ শ্রেণীতে।

ছেলেদের বাবা — যুদ্ধ-পঙ্গু, বহু বছর শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলেন। মা কাজ করতেন। শিক্ষকরা ছেলেদের উপর কোন সামাজিক দায়িত্বভার চাপাতেন না, ক্লাসের পর ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি চলে যেত। তারা রুগ্ন পিতার সেবা-শুশ্রূষা করত। এ ভাবে চলে বছরের পর বছর। ছেলেরা বাবাকে খুব ভালোবাসত এবং তারা যে-সমস্ত দায়িত্ব পালন করত তাতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

অথচ এই ছেলেদেরও প্রাঙ্গণে সমবয়সীদের সঙ্গে বল খেলার, সিনেমায় যাওয়ার অথবা ক্লাসের পর সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে একটু গল্প করার ইচ্ছে হত।

ওদের জন্য আমাদের কষ্ট হত এবং সেই সঙ্গে ওদের নিয়ে আমাদের বিস্ময়েরও অন্ত ছিল না। পিতার প্রতি এত আত্মোৎসর্গী ভালোবাসা তারা পেল কোত্থেকে, তারা কেন স্বেচ্ছাকৃতভাবে ছেলেবেলার আনন্দফুর্তি থেকে নিজেদের বঞ্চিত করছে? আর হয়তো বা স্বেচ্ছাকৃতভাবে নয়?

ছেলে দু'টি অন্যান্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে আলাদা ছিল না; তারা ছিল মিশুক, হাসিখুশি; পড়াশোনায় মন্দ ছিল না।

মা ক্বচিৎ স্কুলে আসতেন। তিনি ছিলেন অকালবৃদ্ধ ক্লান্ত এক মহিলা। তাঁর চোখের দৃষ্টি ছিল উদার। একদিন এক শিক্ষিকা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন:

— আচ্ছা বলুন তো, আপনার ছেলেরা কীভাবে এত নীরবে বাপের সেবা-শুশ্রূষা করতে পারে? আপনি তাদের বাধ্য করেন অথবা তারা নিজেরাই তা করতে চায়?

— আমরা একসঙ্গে মিলে সবকিছু ঠিক করি, — জবাব দিলেন ভদ্রমহিলা। -- অবশ্য ডাক্তাররা আমাদের বলেছেন স্বামীকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে; ওখানে থাকলে বিনা খরচে তাঁর সেবাযত্ন আর খাওয়াদাওয়া চলত। তাতে আমাদের জীবনও অনেকটা সহজ হয়ে যেত। ...আমি ছেলেদের উঠোনে ডাকলাম (ওখানেই বেঞ্চিতে বসে আমরা সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করি, যাতে রোগী কোনকিছু শুনতে না পায়) এবং বললাম: 'দেখছি, তোরা খুব হয়রান হয়েছিস। বাবাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়? ওখানে ওর সেবাযত্ন হবে, আর আমরা সময় সময় ওকে গিয়ে দেখে আসব...' অবশ্যই কান্নায় আমার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছিল, তবে আমি নিজেকে সামলে নিয়ে যথাসম্ভব শান্তভাবে মতামত ব্যক্ত করলাম। আমার শক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে। আর ছেলেদের যত দিন যাবে লেখাপড়া করা ততই কঠিন হবে, স্কুলের পাঠ্যসূচি যথেষ্ট জটিল। তারা একটু বেড়াতে যেতে পারে না, দেরি ক'রে ঘুমোতে যায়... আমরা অনেকখন বসে বসে ভাবলাম।

ওদের হুকুম দেওয়ার অধিকার আমার ছিল না, আমি বুঝতে পারছিলাম যে ওরা বড় হয়ে গেলে ওদের কাছে আমার হুকুমের কোন মূল্য থাকবে না। তখন হয়তো মনে মনে বলবে যে মা ওদের ছেলেবেলার আনন্দফুর্তি থেকে বঞ্চিত করেছে। নিজে ঠিক করুক কী করবে... এবং ঠিক করলও...

'না মা, — বলল ভিতিয়া, — বাবাকে হাসপাতালে ফেলে আসব না, ওখানে তাঁর ভীষণ খারাপ লাগবে। তাঁর তো একটি মাত্রই আনন্দ ও সুখ — আমাদের সঙ্গে থাকা।' আমরা ঠিক করলাম: অন্তত আমাদের একজনও জীবিত থাকতে বাবাকে কখনও কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হবে না। এবং জানেন, তিনজনে মিলে একজন রোগীর — সে যতই গুরুতর রোগী হোক না কেন — সেবা-শুশ্রূষা করা তেমন একটা কঠিন কাজ নয়...

তিনি নিশ্বাস ফেলে যোগ করলেন:

— তবে আমার ছেলে দু'টির জন্য আমার কোন চিন্তা নেই: ওদের দিয়ে জীবনে ভালো লোক হবে।

উদারতা... উদার ছেলেমেয়ে। মা-বাবার জন্য, চারিপাশের লোকজনের জন্য সে কত সুখের বিষয়! এই ছেলেগুলো কেন এত উদার, রোগশয্যায় শায়িত বাপের জন্য তারা কেন স্বেচ্ছায় নিজেদের সর্বপ্রকার আমোদপ্রমোদ থেকে বঞ্চিত করছে? এই জন্য যে তাদের সম্মুখে রয়েছে মায়ের আদর্শ। তিনি কোন দিকে না তাকিয়ে ও কোন কথা না ভেবে নিজেকে ও নিজের সারা জীবন স্বামীর সেবায় নিবেদন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর দুরদৃষ্ট হেতু আর্তনাদ আর অভিযোগ ছেলেরা কখনও শুনে নি। তিনি মনে করতেন যে অন্য রকম আচরণ হত অকল্পনীয় নিষ্ঠুরতা আর ভয়ংকর অপরাধের শামিল। যে দেশের জন্য, পরিবারের জন্য নিজের স্বাস্থ্য খোয়াতে এতটুকু ইতস্তত করে নি সেই হতভাগ্য মানুষটিকে, সেই যোদ্ধাটিকে আপন জনের সঙ্গে মেলামেশার সুখ থেকে বঞ্চিত করা হত তার জীবনের শেষ আনন্দটুকু ছিনিয়ে নেওয়ার শামিল।

কুরাকিনদের পরিবারের কথায় ফেরা যাক। মা প্রায়ই রাত্রের শিফ্‌টে কাজ করতেন। ছেলেরা ঘুম থেকে উঠত খুব ভোরে। তারা রোগীকে মুখ-হাত ধোওয়ার জন্য জল দিত, বিছানা ঠিক করত, সকালের খাবার খাওয়াত, বিছানার কাছে ছোট্ট টেবিলে জল ও ওষুধ রাখত এবং কেবল এর পরই নিজের নিজের কাজে মন দিত।

বিকাল বেলা, স্কুল থেকে ফেরার পর, মা রাত্রের শিফ্‌টের পর তখনও ঘুমিয়ে থাকলে, ছেলেরা আবার ঠিক তা-ই করত যা সকালে করেছিল। ঘন

খন তাদের দোকানে বা লণ্ড্রিতে যেতে হত, মাঝেমধ্যে সাদাসিধে কোন খাবারও তৈরি করে নিতে হত।

তাদের কি খুব কষ্ট হত? যে-পরিবারে সর্বদা প্রেমপ্রীতি আর ভালোবাসা বিরাজ করত সেখানে এরূপ প্রশ্ন করা উচিত হত না। এই পরিবারে একে অন্যকে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা ও হাসাহাসি করতে ভালোবাসত, এখানে কেউ কখনও কোন অভিযোগ করত না এবং কারো অনুকম্পায় প্রয়োজন বোধ করত না। মনোবল জোগাত বাপের আদর্শ, তাঁর সাহসিকতা, তিনিই তাদের দিতেন স্থৈর্য আর কৌশলতার উদাহরণ। সম্ভবত এটা ঠিক করা কঠিন, তাঁদের মধ্যে কে কাকে জীবনে বেশি সমর্থন জুগিয়েছে: মা ও ছেলেরা — বাবাকে অথবা অচল বাবা — নিজের স্ত্রী ও ছেলেদের। বাবা জানতেন কী ক'রে বাঁচতে হয়, কী ক'রে সর্বদা প্রাণোচ্ছল থাকতে হয়।

'আজ সকালটি কী সুন্দর!' — জানলা দিয়ে তাকিয়ে সহর্ষে বলতেন রুগ্ন পিতা। এমনকি হেমন্তের বাদলা দিনেও তিনি বলতেন: 'জানো বাবারা, হেমন্ত কাল হচ্ছে মানুষের জন্য সবচেয়ে কাজের সময়, কিছুই বাধা দেয় না: মনোযোগ দিয়ে কাজ করা যায়!'

ছেলেরা স্কুল থেকে ফিরলে তিনি তাদের রেডিও-তে শোনা খবর বলতেন, ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফলাফল জানাতেন।

এই সহনশীল মানুষটির উপস্থিতিতে প্যানপ্যান করা অথবা মন খারাপ করা সম্ভব ছিল কি? ছেলেরা তাঁকে ভালোবাসত, তারা এভাবে আত্মিক সমৃদ্ধি লাভ করত, কেননা উদারতার মতো আর কিছুই মানুষকে এত সমৃদ্ধ করে না এবং তাকে এত গভীর তৃপ্তি দেয় না।

প্রশিক্ষণমূলক বিরতি

শিশু অসুস্থ হলে আমরা সমস্তকিছু ভুলে যাই...

এই কথাগুলো এত মর্মস্পর্শীভাবে প্রকাশ করে মা-বাবার আত্মবিস্মৃতি, মা-বাবার ভালোবাসা, — তাই নয় কি? কিন্তু এখানে কি অতিরিক্ত প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত নেই যার জন্য আমাদের ছেলেমেয়েদের অনেক মূল্য দিতে হয়?

তা কীভাবে ঘটে আমরা বড়রা ভালোই জানি: এই কিছুক্ষণ আগেও আমাদের তানিয়া বা ইউরা ছিল হাসিখুশি ও প্রাণবান — খেলছিল, লাফালাফি করছিল, জোরে হাসছিল। কিন্তু হঠাৎ সে বিষণ্ণ ও ফ্যাকাশে হয়ে

পড়ল অথবা কেমন যেন অস্বাভাবিকভাবে লাল হয়ে উঠল। হাবভাবে অশুভের পূর্বাভাস। থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা মেপে দেখি — তাই-ই ঠিক। জ্বর—৩৮ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড। সঙ্গে সঙ্গেই মানসিক অবস্থা ও পরিকল্পনা সমস্তকিছুই বদলে যায়। থিয়েটারের টিকিটগুলো অপ্রয়োজনীয় নীল কাগজের মতো পড়ে থাকে, সপ্তাহান্তে শহরের বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায় এবং সমস্তকিছু, এমনকি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজও, নির্দিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে যায়। শিশুর অসুখ করেছে। পরে ডাক্তার আসেন। 'ডাক্তারবাবু, ওর কী হয়েছে? মারাত্মক কোনকিছু?'

— আপনি অসুস্থ শিশুকে কড়া কথা বলছেন? — এ ভীষণ নিষ্ঠুরতা!
— না, এ হচ্ছে অতি প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা খুব একটা মারাত্মক হয় না। দু'-তিন দিন একটু জ্বর থাকে, এক-দু' রাত মা'র ঘুম হয় না।... কয়েক দিন পরে শিশু খাটের উপর উঠে বসে, খেলাধুলা করে। সে আরোগ্য লাভ করে। এখন বড় কথা হচ্ছে — কোন জটিলতা যেন দেখা না দেয়। জটিলতা এড়ানোর জন্য মা-বাবারাও সাধারণত তাঁদের পক্ষে সম্ভাব্য সমস্তকিছু করে থাকেন। নির্দিষ্ট পথ্য প্রয়োজন — মা-বাবা দরকারের চেয়ে বেশি কোনকিছু দেবেন না; বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে — মা-বাবা যত দিন প্রয়োজন ঠিক তত দিনই বাচ্চাকে খাটে ধরে রাখবেন; কান বেঁধে রাখতে বলা হয়েছে — বেঁধে দেবেন। আপনার ইউরা রোগা হয়ে গেছে, ওর চোখগুলো বসে গেছে, সাম্প্রতিক রোগের দরুন ওর স্নায়ু-ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে — রোগে ভোগার সময়ের চেয়ে আরোগ্য লাভের সময়েই ও বেশি জেদ করছে। সে আপনাকে নিজের কাছে ডাকে: 'মা, আমার সঙ্গে একটু বসো।' — 'এক্ষুনি আসছি, বাবা, — বলেন আপনি, — কেবল বাসনটা ধুয়ে নিই।' কিন্তু সে অপেক্ষা করতে চায় না: 'মা, আমার খারাপ লাগছে!' অন্য সময় হলে আপনি নিশ্চয়ই আরব্ধ কাজটি শেষ করতেন, আর তারপর ছেলের সঙ্গে বসতেন। আপনি ভালোই জানেন, শিশুর প্রথম ডাকেই তার চোখের সামনে আরব্ধ কাজ ছেড়ে তার কাছে ছুটে যাওয়া কত ক্ষতিকর। কিন্তু এখন ইউরার গালগুলো পাণ্ডুবর্ণ, চোখের তলায় কালো দাগ। তাকে দেখলে কষ্ট হয়। তাছাড়া আপনি কত আনন্দিত যে সে সেরে উঠছে, এবং এই সময় প্রশিক্ষণমূলক কোন সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। ইউরার স্বাস্থ্যের সঙ্গে, আপনার সওয়া ভয়ের সঙ্গে এবং আপনার এই আনন্দের সঙ্গে তুলনায়

সমস্তকিছুই আপনার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। সেই জন্যই আপনি চামচ দিয়ে ইউরাকে খাওয়াতে আরম্ভ করেন, যদিও সে অনেক দিন নিজেই খাচ্ছে এবং এখনও অনায়াসে খেতে পারে, — সে অতটা দুর্বল হয়ে যায় নি। আপনি ভুলে যান যে তাকে খেলনাগুলো না ফেলতে, বইপত্র সযত্নে রাখতে, বড়রা যখন কথা বলে তখন তাদের বাধা না দিতে শিখিয়েছেন। এখন ইউরা তার চারিপাশে বইগুলো ছড়াচ্ছে, রঙীন পেন্সিলগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে, প্রতিবেশীর সঙ্গে আপনার কথা বলতে বার বার বাধা দিচ্ছে। কিন্তু আপনি তাকে কোন কড়া কথা বলতে চান না। পরে হয়তো আপনিই ইউরার বিছানাটি করে দেবেন অথবা জুতোগুলো সাফ করবেন, অথচ অসুস্থ হওয়ার আগে সে নিজেই এ সমস্তকিছু করত।

বলাই বাহুল্য, তাকে বিছানা করতে, জুতো সাফ করতে, নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে ও বড়দের আলোচনায় বাধা না দিতে আবার শেখানো যাবে। তবে তার জন্য কেবল গুরুজনদের তরফ থেকেই নয়, শিশুর তরফ থেকেও নতুন প্রয়াসের প্রয়োজন হবে। কাল যা করা গেছে আজ তা করা নিষেধ — এই ব্যাপারটি আয়ত্ত করতে তার কষ্ট হবে। তখন শিশুর মধ্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে এরূপ ধারণা জাগে: 'আমি যখন অসুস্থ, যখন আমার কষ্ট হয়, তখন আমার সাত খুন মাফ।'

মানুষকে চেনা যায় বিপদে — কঠিন, সংকটজনক পরিস্থিতিতে সে কীরূপ আচরণ করে তা দেখে। কোন কোন লোক চারিদিকের সমস্তকিছুর প্রতি নিজের সমগ্র আগ্রহ বজায় রাখে, নিজের কর্তব্য পালনে বিমুখ হয় না। গুরুতর রোগে পড়লেও, বিপদের মুখোমুখি হলেও সে নিজের প্রতি কঠোর থাকে, চারিপাশের লোকজনকে মান্য করে, তাদের যত্ন করে, আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করে। কোন কোন লোক অনুরূপ পরিস্থিতিতে ভিন্ন আচরণ করে: তার জন্য সমস্তকিছু তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে ও আগ্রহহীনত হয়ে যায়, পৃথিবীর সঙ্গে তার সমস্ত যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়, লোকজনের প্রতি সমস্ত কর্তব্য গুরুত্বহীন বলে মনে হয়; সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থপরতা দেখা দেয় এবং যারা তাকে সাধারণ পরিস্থিতিতে দেখেছে তাদের কাছে এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঠেকে। অথচ এ সমস্তকিছুতে সম্ভবত শৈশবের প্রভাব বেশ বড় একটা ভূমিকা পালন করেছে।

শিশু গুরুতরভাবে ও দীর্ঘকাল ধরে রোগে ভুগলে 'নৈতিক' জটিলতার সম্ভাবনা বিশেষ বাস্তব হয়ে উঠে। একবার খুব বিষণ্ণ এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। তিনি বললেন: 'আমার বড় মেয়েটির বড়ই

দুরদৃষ্ট।' — 'অসুস্থ?' — 'না, — জবাব দেন ভদ্রমহিলা, — অনেক দিন অসুস্থ ছিল, তবে এখন সুস্থ।' তারপর একটু থেমে যোগ করলেন: 'শারীরিক দিক থেকে সুস্থ, তবে নৈতিক দিক থেকে অসুস্থ।' এবং মানিজের দুঃখের কাহিনীটি বললেন।

...৮ বছর বয়সে মেয়েটির যক্ষ্মারোগ ধরা পড়ে। রোগটি কখনও চলে যেত, কখনও দেখা দিত। মেয়েকে রোগমুক্ত করার জন্য মা-বাবা চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি। তাঁরা তাকে স্বাস্থ্যনিবাসে নিয়ে গেছেন, তার সঙ্গে তুষার ভরা পাইন বনে শীতকাল কাটিয়েছেন, তার খুব সেবাযত্ন করেছেন। দুঃখের বিষয়, এ সমস্তকিছু ছাড়া আরও ছিল বিনা বাক্যে মেয়ের সমস্ত আজ্ঞা পালন; মেয়ে শত অপরাধ করলেও মা-বাবা তাকে একটা কথাও বলতেন না। এখন তাঁদের কন্যার বয়স ১৭। সে সুস্থ ও শক্তিশালী তরুণী। রোগ সেরেছে। কিন্তু মা'র দুঃখ থেকেই গেল, তবে এবারকার দুঃখটি অন্য রকম এবং আগের চেয়ে বেশি মারাত্মক। মেয়ে লেখাপড়া করতে চায় না, কাজ করতে চায় না, অশিষ্ট, নির্দয়, স্বার্থপর, কোন দায়িত্ব জ্ঞান নেই, কাউকে গ্রাহ্য করে না। মা হতভাগিণী, তাঁকে সহানুভূতি না জানিয়ে পারা যায় না। তবে তাঁর দোষও অস্বীকার করা উচিত হবে না। সন্তানকে ভালোবেসে ও তাকে করুণা দেখাতে গিয়ে তিনি গুরুত্ব সহকারে তার ভবিষ্যতের কথা ভাবেন নি। শারীরিক অসুস্থতা দেখে ভয় পেয়ে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে নৈতিক অসুস্থতা বলেও একটা জিনিস রয়েছে। অথচ যেকোন পরীক্ষার মতো রোগও শিশুর জন্য সাহসিকতা আর সহনশীলতার বিদ্যালয় হয়ে উঠতে পারে এবং হয়ে উঠেও।

সর্ষের প্রলেপ — খুবই সাধারণ ব্যাপার। সাশাকে সর্ষের প্রলেপ দিতে মা'র মোটেই ঝামেলা হয় না। তিনি শুধু বলেন: 'যতটা পারিস সহ্য কোর।' সে যতক্ষণ পারে সহ্য করতে চেষ্টা করে। 'লক্ষ্মী ছেলে, তোর বেশ সহ্যশক্তি আছে,' — মা প্রশংসা ক'রে আনন্দিত ছেলের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেন।

কিন্তু অন্য পরিবারে ছোট্ট ইউরাকে সর্ষের প্রলেপ দেওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়: সবাই নিজের কাজ ছেড়ে শশব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, আর এই ব্যস্ততায় উত্তেজিত শিশু গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে ও প্রলেপ খুলে ফেলতে বলছে।

ক্লিনিকে যে-ঘরে পরীক্ষার জন্য রক্ত নেওয়া হয় সেই ঘরটির সামনে বিভিন্ন রকমের দৃশ্য দেখা যায়। মা করিডরে নিয়ে আসেন চার বছরের ক্রন্দনরত ছেলেকে। তিনি নিজেও দুঃখিত, রুমাল দিয়ে ছেলের মুখ মুছতে

মুছতে বলছেন: 'সব শেষ বাবা, আর কেঁদো না...' আর অপর মহিলা ওই বয়সেরই একটি শিশুর সঙ্গে চলতে চলতে তাকে শান্ত ও শীতল কণ্ঠে বলছেন: 'তুই যে এমনটা করবি আশা করি নি। এই সামান্য ব্যাপারে কাঁদতে আছে?' ছেলেটি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলে।

শিশু হাসপাতালের প্রতীক্ষা ঘর যেখানে রোগীদের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসা হয়। একজন মা পড়ছেন: 'বিকাল বেলা অবশ্যই এসো, আমি তোমার অপেক্ষা করব।' মা অবশ্যই আসবেন! ইউরা তাঁকে ভালোবাসে, তাঁকে না দেখলে তার মন খারাপ হয়।

আর অন্য ছেলে — সে-ও ১২ বছরের — লিখছে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে: 'মা, আমার সবই আছে। তুমি চিন্তা কোরো না। কাজের পরে এসো না, সোজা বাড়ি চলে যেও।' মা বুঝতে পারেন: তাঁর জন্য ছেলের চিন্তা আছে, সে চায় তিনি যেন উদ্বিগ্ন না হন ও বিশ্রাম করেন...

আমরা এখানে আরও একটা ঘটনা এবং আরও একজন মায়ের কথা বলতে চাই। এই মহিলাটিকে বিরাট অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর মেয়ের হৃদয়ে অতি কঠিন একটি অপারেশন হয়, এবং বছর বাদে আরও একটি অপারেশন করতে হয়। এবার সমস্ত বিপদ কেটে যাওয়ার পর বলা যায়: এমনকি ক্লিনিকেও কম লোকই আশা করেছে যে লেনার রোগটি ভালোয় ভালোয় সেরে যাবে। মা বিপদের মাত্রা সম্পর্কে সর্বদা ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মা'র সমস্তকিছু শান্তভাবে সয়ে যাওয়ার শক্তি ছিল, তিনি সবচেয়ে সঙ্কটজনক মুহূর্তেও, এমনকি অপারেশনের আগে আর পরেও, লেনার সঙ্গে সমান আচরণ করতেন।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধৈর্যগুণ বুঝি নি ও তার কোন মূল্যে দিই নি এবং সময় সময় বিস্মিতও হয়েছি: 'আপনি কী করে লেনাকে কড়া কথা বলতে পারেন, তার প্রতি কঠোর হতে পারেন?' — 'আমি বিশ্বাস করি যে লেনা বেঁচে থাকবে, এবং চাই সে যেন মানুষের মতো বেঁচে থাকে,' — জবাব দেন মা।

এখন লেনা সুস্থ। আনন্দফুর্তি করে, খেলে, স্কি করে, সাঁতার কাটে। এর জন্য সে চমৎকার একজন ডাক্তারের নৈপুণ্য ও সাহসিকতার কাছে ঋণী। লেনা মন দিয়ে পড়াশোনা করে, ছোট ভাইয়ের দেখাশোনা করে, তার গভীর দায়িত্ববোধ আছে। এর জন্য সে তার মায়ের প্রাজ্ঞতা ও মনোবলের কাছে ঋণী।

নিজের সন্তান যখন অসুস্থ তখন সাহসী হওয়া কঠিন, খুবই কঠিন।

কিন্তু আমাদের সাহসী হওয়া একান্তই প্রয়োজন। শিশুকে ভালোবাসুন, স্নেহ করুন, বাঁচিয়ে রাখুন। কিন্তু এ কথাটিও ভুলবেন না যে স্নেহমমতার মতো আমাদের কঠোরতায়ও শিশুর প্রয়োজন কম নয়।

সতর্কতা এবং ঝুঁকি

'...আমি জানি যে মা, বাবা, দিদিমা আমায় ভীষণ ভালোবাসেন। কিন্তু এখন আমি তো আর ছোট্ট খুকী নই, আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। অথচ আমায় এখনও একা শহরে যেতে দেওয়া হয় না। ...ইচ্ছে ছিল জিমন্যাস্টিক্‌সের ক্লাসে ভর্তি হব। মা-বাবা অনুমতি দিলেন না, বললেন যে ওতে অনেক ঝুঁকি আছে। আমি বুঝতে পারছি না কী ক'রে বাঁচব। আমায় হয়তো নিমকহারাম বলবেন, কিন্তু এ কথাটি আমি বলতে বাধ্য যে তাঁদের বাধানিষেধের মধ্যে থাকতে থাকতে আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে!'

মা-বাবার স্নেহ, ভালোবাসা... তাতে আছে নিজের দুলালকে রক্ষা করার, বাঁচিয়ে রাখার প্রবল চাহিদা, জীবন্ত সমস্তকিছুকে ঐক্যবদ্ধকারী সুন্দর ও শক্তিধর এক স্বজ্ঞা। মানুষের বিকশিত চেতনা অন্যান্য প্রাণীর সামনে নির্ধারিত করেছে তার শ্রেষ্ঠতা, কিন্তু সেই সঙ্গে অনুপজাত প্রতিফলন (unconditioned reflex) ক্রিয়াকলাপের মধ্যে নিহিত অনেকগুলো সম্ভাবনা থেকে তাকে চিরতরে বঞ্চিত করে রেখেছে। বলাই বাহুল্য ব্যাপারটি আসলে অনুশোচনায় নয়। ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে আচরণের এরূপ উপায় খুঁজে বার করতে হবে যাতে আমাদের স্বজ্ঞা শিশুর মঙ্গলে সর্বাধিক মাত্রায় নিজেকে প্রকাশ করতে পারে।

এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে সম্ভাব্য বিপদের মাত্রা পরিবেশে সর্বদাই বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং সেই সমস্ত বিপদ দেখা দিচ্ছে প্রকৃতি থেকে নয়, আমাদের নিজেদের ক্রিয়াকলাপ থেকে। তা বহুবিচিত্র ও পরিবর্তনশীল। কাল প্রবাহে কিছু বিপদ পিছু হটে এবং 'দমিত' হয়ে যায়, কিছু বিপদের আবির্ভাব ঘটে এবং তা সমস্যার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। বিপদ জড়িত যানবাহনের বিকাশের সঙ্গে, নতুন পেশা সৃষ্টির সঙ্গে, নতুন ধরনের খেলাধুলা, বিশ্রামের নতুন রূপ, এমনকি নতুন ধরনের শিল্পকলা আবির্ভাবের সঙ্গে। তা হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক বিপদ। 'বাধানিষেধ' — এ হচ্ছে মা-বাবার গুপ্ত, সহজাতিক, দুঃখের ও সুখের বিষয়, নৈরাশ্যজনক

আবেগ। বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত বিপ্লবের যুগে বিপদ এড়ানোর জন্য আধুনিক মানুষের চাই 'বর্ম' নয়, খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা, প্রতিক্রিয়ার দ্রুততা, পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে গতিক বুঝে চলার দক্ষতা। কথাটি যতই অদ্ভুত শোনাক না কেন এটা কিন্তু সত্যি যে আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য 'বর্মের' চেয়ে (অর্থাৎ বাধানিষেধের চেয়ে) বেশি মারাত্মক আর কিছুই নেই।

বলাই বাহুল্য, স্রেফ স্বাস্থ্য এবং শারীরিক নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত প্রশ্নাদিতেই ঝুঁকি শেষ হয়ে যায় না। কিছু কিছু মা-বাবার জন্য ঝুঁকি সর্বাগ্রে জড়িত থাকে 'কুপ্রভাব' ও 'অসৎ সঙ্গ' এই ধারণাগুলোর সঙ্গে। উঠতি বয়সের মেয়েদের মা-বাবাদের জন্য প্রায়ই বড় 'ঝুঁকি' হচ্ছে কিশোরোচিত প্রেম এবং অসাময়িক অন্তরঙ্গতা। এমন মা-বাবা আছেন যাঁরা চান না যে তাঁদের ছেলেমেয়েরা মানসিক জখমের ঝুঁকি নিক। শিশুর স্নায়ু-ব্যবস্থাকে জখমের হাত থেকে রক্ষা করার ইচ্ছায় তাঁরা শিশুকে মানুষের বেদনা ও মৃত্যু সহ জীবনের সমস্ত নিষ্ঠুর দিক থেকে দূরে দূরে রাখেন। এই 'সূক্ষ্মদর্শী' লালনপালনকারীরা কখনও ভাবেন না যে তাঁরা ভোগবিলাসে অভ্যস্ত এমন একটি মানুষ গড়ার ঝুঁকি নিচ্ছেন, যে জেনেশুনে পরের দুঃখদুর্দশার প্রতি উদাসীন থাকবে, যে আবেগগতভাবে অবিকশিতই থেকে যাবে, এবং যার কোনকিছু দেখা ও শোনার ক্ষমতা থাকবে না।

নৈতিক শিক্ষাদীক্ষার বিষয়ে প্রবন্ধের প্রাচুর্য সত্ত্বেও মা-বাবারা আজ অবধিও, দুঃখের বিষয়, তাঁদের ছেলেমেয়েদের নৈতিক অসুস্থতার ঝুঁকি সম্পর্কে এবং সেই অসুস্থতা এড়ানোর পক্ষে প্রয়োজনীয় সতর্কতা সম্পর্কে যে কম ভাবেন এমনটা বলা যায় না। তবে তাঁদের এরূপ ভাবনায় সেই তীব্র অনুভূতিটি লক্ষ্য করা যায় না যা নিজের সন্তান-সন্ততিদের শারীরিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত ভাবনাচিন্তায় সর্বদা উপস্থিত থাকে। এ ক্ষেত্রে অস্ত্র হিশেবে গৃহীত হয় প্রবচন: 'আসল হল — স্বাস্থ্য', 'সুস্থ দেহে — সুস্থ মন'। হ্যাঁ, শারীরিক সুস্থতা মানুষের জীবনে বিপুল এক ভূমিকা পালন করে, শিশুদের স্বাস্থ্য এবং শারীরিক নিরাপত্তা সম্পর্কে চিন্তা — সে হচ্ছে আমাদের প্রথমতম কর্তব্য। তবে সেই সঙ্গে আমাদের মুহূর্তের জন্যও নৈতিক সুস্থতার কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। নিজেদের আচরণের সতর্কতা ও ঝুঁকির যুক্তিসঙ্গত সমন্বয় ঘটিয়ে শিশুদের মধ্যে দৈহিক সুস্থতার মতোই নৈতিক সুস্থতাও আমাদের লালন করতে হয়।

হ্যাঁ, ঝুঁকি প্রয়োজন। প্রতি বার আমাদের তার মাত্রা মেপে দেখা, বোঝা ও অনুভব করা দরকার। তবে আমাদের মূল্যায়ন যে সঠিক হবে এমন কোন

গ্যারাণ্টি নেই। এ ক্ষেত্রে প্রতি বার নির্দিষ্ট পরিস্থিতি বুঝে চলতে হয়।

ঝুঁকি ব্যতিরেকে শিক্ষাদীক্ষা হয় না। আসল ব্যাপারটি হচ্ছে ঝুঁকির মাত্রা কমানো নয়, ঝুঁকি যেন সার্থক হয়।

এখানে আমরা শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষার সেই দিকগুলোর প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যেগুলোতে মা-বাবা এবং শিক্ষকদের প্রায়ই সঠিক সিদ্ধান্তের সন্ধানে সতর্কতা ও ঝুঁকির মাঝখানে দোলে খেতে হয়। আশা করি, এ ব্যাপারে আমাদের সবার জানা প্রশ্নগুলো নতুন ভাবনাচিন্তার খোরাক জোগাবে এবং প্রাপ্ত সিদ্ধান্তসমূহ নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কাজে লাগবে।

বাড়িতে একা। প্রদর্শনীতে ঢোকার আগে আমাদের অনেকখন লাইনে দাঁড়াতে হল, আর যখন চিত্রশালায় ঢুকলাম তখন আমার বান্ধবী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন: 'ছবিগুলো দেখার জন্য আমার হাতে মাত্র চল্লিশ মিনিট সময় আছে। দেড়টার সময় ভাদিক স্কুল থেকে ফিরবে। জানেন, আমরা ওকে একা বাড়িতে রেখে কোথাও যাই না।'

জানি। চার বছর হল ছেলেটি কিণ্ডারগার্টেন ছেড়ে স্কুলে এসেছে, এবং দিনের বেলা একটা থেকে সাতটা অবধি — যতক্ষণ না মা-বাবা কাজ থেকে ফিরছেন — সারাক্ষণ দিদিমা নাতিকে চোখে চোখে রাখেন।

আমি বললাম:

— ওর এখন ১১ বছর হল। কারোর দেখাশোনা ছাড়া ঘণ্টা দেড়েক সময় তো একাই থাকতে পারে।

— আরে না না, — আমার বান্ধবীর কণ্ঠে উদ্বেগের সুর শোনা গেল, — তা কিছুতেই সম্ভব নয়, কোনকিছু যদি ঘটে যায়... তারপর সারা জীবন মাথা কুটব।

আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম:

— আর কত কাল ওকে ও-ভাবে পাহারা দেবেন?..

বান্ধবী দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন — তিনি অসন্তুষ্ট ও বিহ্বল:

— সে পরে দেখা যাবে।

তবে আপাতত এটাই বোঝা যাচ্ছে যে এই পরিবারে শিশুর মধ্যে স্বাবলম্বিতা গড়ার ব্যাপারে কোন উদ্যোগই নেওয়া হচ্ছে না। গুরুজনদের মাথায় কেবল একটা চিন্তা: যেভাবেই হোক না কেন ওকে রক্ষা করতে হবে। আর যদি ব্যাপারটি তলিয়ে দেখা যায়, তাহলে বোঝা যাবে যে তাঁরা নিজেদের

সম্ভাব্য নৈতিক যাতনা থেকে রক্ষা করতে যতটা প্রয়াসী শিশুকে রক্ষা করতে ততটা প্রয়াসী নন।

এরূপ মা-বাবা ও দাদু-দিদিমারা — যাঁরা শিশুর জন্য সব সময় থরথর ক'রে কাঁপেন — নিজস্ব অন্তর্জগতের প্রতিই বেশি সজাগ, তাঁরা আগে থেকেই জানেন 'কিছু একটা হলে' কী এবং কেমন অনুভব করবেন। আর শিশুর অন্তর্জগৎ তাঁদের কাছে এক গৌণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। শিশুকে তাঁরা কোন জিনিস ভাবেন: 'ও কেবল আস্ত থাকলেই হয়।'

সঙ্গে সঙ্গেই বলে রাখি: যে-শিশু একা বাড়িতে রয়েছে — তার উপর আবার নিম্ন শ্রেণীর শিশু — তার জন্য মা-বাবার উদ্বেগ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক, তাতে নিন্দনীয় কিছু নেই। আধুনিক ফ্ল্যাট — সে স্রেফ আশ্রয়ই নয়, সাধারণ নীড় নয়। সে হচ্ছে বসবাসের জটিল এক পরিবেশ, এবং ওখানে পদে পদে বিপদ রয়েছে, আছে তীক্ষ্ন ও ধারাল জিনিসপত্র, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও ঔষধপত্র, গ্যাস ও বৈদ্যুতিক উনুন, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ও প্লাগ, জানলা ও ব্যালকনি। তার উপর সে ফ্ল্যাট পাঁচ তলা, সাত তলা অথবা বারো তলায় অবস্থিত... ভাদিকের মা-বাবাকে দোষ দেওয়া হচ্ছে তাঁদের উদ্বেগের জন্য নয়, সেই অপরিণামদর্শী ও সবচেয়ে সহজ পদ্ধতির জন্য যার সাহায্যে তাঁরা নিজেদের এই উদ্বেগ থেকে মুক্ত করেন। বলাই বাহুল্য, মানুষ করা আর আত্মনির্ভরতা গড়ে তোলার চেয়ে 'চরানো' অনেক সহজ। দু' দিন পরে যে-শিশু কৈশোরে পদার্পণ করবে তাকে চব্বিশ ঘণ্টা চোখে চোখে রাখতে গিয়ে নিজেকে যদি কোনকিছু থেকে বঞ্চিতও করতে হয় বহু মা-বাবা এমনকি তাতেও রাজী থাকেন।

কিন্তু এটা মনে রাখা উচিত যে এই সহজ ও 'সঠিক' উপায় খোদ শিশুর জন্যই মারাত্মক বিপদ ডেকে আনে। তাতে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি থাকে, সে অনেক ব্যাপারে অপারগ হয়ে উঠে, পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না।

'ও কিছু না, বড় হলেই খাপ খাওয়াতে পারবে, — সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখার পক্ষপাতীরা নিজেদের সান্ত্বনা দেন। — জীবন বাধ্য করবে, একটু বুদ্ধিশুদ্ধি হলেই সবকিছু শিখে যাবে। আর আপাতত শিশুকে চোখে চোখে রাখার দরকার আছে বৈকি।'

কথাটি ঠিকই, তবে অতি সরল অর্থে। উপযুক্ত সময়ের চেয়ে কিছুটা দেরিতে ভাদিক অথবা এডিক অবশ্যই খাবার গরম করতে শিখবে, আর ষোলো বছর বয়সে এমনকি হয়তো নিজের শার্ট-পেণ্টও ইস্ত্রি করতে

পারবে — তদুপরি সে দিন যদি বিশেষ সুন্দর দেখানোর কোন কারণ থাকে। তবে তার মানে মোটেই এ নয় যে বিকাশের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার অবসান ঘটেছে এবং তরুণ মানুষটি স্বনির্ভরতার স্বাভাবিক মানের নাগাল ধরতে পেরেছে।

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে মনস্তত্ত্ব ও প্রশিক্ষণবিদ্যার ক্ষেত্রে যে-সমস্ত সাফল্য অর্জিত হয়েছে তাতে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে শিশুর বিকাশের পর্যায়ক্রমিক চরিত্র আবিষ্কার। ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে মেধাগত বিকাশ স্রেফ নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞান আর দক্ষতার সঞ্চয় নয়। প্রতিটি বয়সে ব্যক্তিত্ব বিকাশের নির্দিষ্ট একটি পর্যায় অতিক্রম করে, এবং পূর্ববর্তী ধাপে যাকিছু 'অসম্পূর্ণ' থেকে গেছে পরবর্তী ধাপে সর্বদা সম্পূর্ণ করা যায় না। এর ফলে যে অপূরণীয় ক্ষতি ঘটে তা শিক্ষক এবং, বলাই বাহুল্য, মা-বাবাদের দায়িত্ব অনেকগুণ বৃদ্ধি করে।

সন্দেহ নেই যে শিশুর মধ্যে স্বনির্ভরতার এবং পরিবেশের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক স্থাপনের দক্ষতার বিকাশ সেই নিয়মগুলোরই অধীন। তাই এ ক্ষেত্রেও যাকিছু প্রকৃতি নির্ধারিত সময়ে যথেষ্ট বিকাশ লাভ করে নি তার অনেকটাই আর কখনই সঠিকভাবে বিকশিত হবে না।

আমাদের মনে হয়, সাক্ষরতা রপ্ত করতে দেরি হলে যে-ক্ষতি হয় স্বনির্ভরতার বিলম্বিত বিকাশ তার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর, কেননা স্বনির্ভরতা বিকাশের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বিলম্ব — এ হচ্ছে পারিপার্শ্বিক জগতে দিক নির্ণয়ের স্বাভাবিক সহজাতিক ক্ষমতাগুলো দমিয়ে রাখার শামিল, তাতে ব্যক্তিত্বের গভীরতম ভিত্তিগুলোই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এমন বহু বয়ঃপ্রাপ্ত লোক আছে যারা, বলাই বাহুল্য, গৃহস্থালির সমস্ত সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করতে এবং এমনকি নিজের মোটর গাড়িও চালাতে পারে। কিন্তু তাদের চরিত্রেও জীবনের সামনে চিরকালের জন্য কী ধরনের এক অসহায়তা আর ভীরুতা থেকে যায়... এমনকি অতি সূক্ষ্মদর্শী ও অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীও সব সময় বুঝে উঠতে পারেন না, এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত চরিত্র গঠনে জন্মগত গুণাবলি, বিভিন্ন প্রভাব ও পরিস্থিতির অনুপাত এবং মা-বাবার অত্যধিক সতর্কতাজনিত দোষের পরিমাণ কীরূপ ছিল। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে 'অত্যধিক সতর্কতাও' একটা ভূমিকা পালন করেছে।

যে-আত্মনির্ভরতা সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো কথা বলা হয়, দুঃখের বিষয়, শৈশবে তার বিকাশ ঘটতে থাকে প্রায় সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

কোন্ বয়সে ও কীভাবে শিশুর খাদ্যের সঙ্গে ফল, ফলের রস, সবজি, স্যুপ ও ভিটামিন যুক্ত করতে হয় সে সম্পর্কে মা-বাবারা চিকিৎসকদের কাছে স্পষ্ট পরামর্শ পেয়ে থাকেন। কখন ও কীভাবে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রের বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষরের লেখন পদ্ধতি আয়ত্ত করা উচিত। কিন্তু প্রতিটি পরিবারে দৈনন্দিন জীবনে আত্মনির্ভরতার শিক্ষা শিশু লাভ করবে সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন সময়ে।

একটি দৃষ্টান্ত দিই। সতেরো বছর বয়সের মেয়েদের পনেরো জন মাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় কবে তাঁদের মেয়ে উনুন ব্যবহার করতে শিখেছিল, তখন মাত্র একজন মা-ই ঘটনাটি স্মরণ করতে ও স্পষ্ট জবাব দিতে পেরেছিলেন। 'সাত বছর বয়সে ইরিনা গ্যাসের উনুন ব্যবহার করতে শেখে, আর ন' বছর বয়স নাগাদ সে রান্না করতে শুরু করে।' বাকী মায়েদের মনেই ছিল না, কবে ও কীভাবে তা ঘটেছিল। তার মানে তাঁদের কোন পরিকল্পনা ছিল না, তাঁরা এ ব্যাপারে কোন লক্ষ্য রাখেন নি।

হালের বছরগুলোতে শিশুদের ট্রম্যাটিজম-এর প্রতিষেধ ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক বলাবলি হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্যরক্ষা সংস্থার তথ্য অনুসারে, বর্তমানে শিশু মৃত্যুর কারণগুলোর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে ট্রম্যাটিজম। কয়েক বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়নে শিশুদের জখম প্রতিষেধ সংক্রান্ত কয়েকটি কমিশন গঠিত হয়। তাতে অন্তর্ভুক্ত হন স্বাস্থ্যরক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা।

পরিসংখ্যান তথ্য থেকে জানা যায়: ৬০ শতাংশ জখমই শিশুরা পেয়ে থাকে বাড়িতে ও প্রাঙ্গণে। হ্যাঁ, বাড়িতে শিশুর জন্য বিপদ আছে অনেক। কিন্তু কী করা যায়?

একদা আমি নারীদের চিকিৎসা পরামর্শ কেন্দ্রে এক আলোচনায় উপস্থিত ছিলাম। ভাবী মায়েদের তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া হচ্ছিল। পরামর্শদাতা তাঁর বক্তব্য বিষয় থেকে খুঁটিনাটি কোনকিছুই বাদ দেন নি, — তিনি ভালো মতো প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। তাঁর খাতাটি শোককর ঘটনার উদাহরণে ভরে গিয়েছিল, এবং অনেক সাবধানবাণী আর উপদেশ নিঃসন্দেহেই ফল দিয়েছিল। তবে পরামর্শদাতার শেষ উপদেশটি আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হল। তিনি বললেন: 'এখন, আপনারা যখন সন্তানের অপেক্ষা করছেন, আপনাদের বাড়িগুলো পুরোপুরিভাবে নিরাপদ করে তুলতে হবে।'

ভাবী মায়েরা গভীর মনোযোগ সহকারে সব কথাই শুনল:

র‍্যাডিয়েটর-এর জন্য পর্দা চাই; শিশু যখন হাঁটতে শুরু করবে তখন মেঝেতে গালিচা বিছাতে হবে; রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও ঔষধপত্র শিশুর নাগালের বাইরে রাখা দরকার; ছুরি, কাঁচি, পেরেক, ছুঁচ, দিয়াশলাই— বিপজ্জনক সমস্তকিছু লুকিয়ে রাখতে হবে। ...কিন্তু কাঁহাতক? বাড়ি পুরোপুরিভাবে নিরাপদ রাখা সম্ভব কি? তার প্রয়োজন আছে কি? আমরা সুশৃঙ্খল, গোছানো বাড়ির পক্ষে।

এখানে তর্ক পরিভাষা নিয়ে নয়, বাস্তব সমস্যা নিয়ে। আমাদের উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত: শিশুর জন্য কৃত্রিমভাবে নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা, অথবা বিপদ আর ঝুঁকিযুক্ত গৃহের পরিবেশটি এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে শিশুকে বাড়ির চেয়েও জটিলতর পরিবেশের সঙ্গে — বহির্জগতের সঙ্গে আদানপ্রদানের ব্যাপারে প্রস্তুত করে তোলা সম্ভব হয়?

এক বার আমার বন্ধুরা আমায় কিছুক্ষণ তাঁদের সাত বছরের ছেলের সঙ্গে থাকতে অনুরোধ করলেন। সে দিন বিকালে ইলিয়ার মা'র কোথাও যাওয়ার কথা ছিল। ইলিয়ার সঙ্গে দু'টি ঘণ্টা মন্দ কাটল না। এক সময় আমাদের চা খাওয়ার ইচ্ছে হল। কিন্তু খেতে পারলাম না। দেখা গেল যে ইলিয়ার মা-বাবা কোথাও যেতে হলে গ্যাস বন্ধ করে দেন, আর চাবিটি কোন গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে রাখেন। তাঁরা আমায় এ সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে ভুলে গিয়েছিলেন এবং পরে সে জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন। কিন্তু কোন দিন যদি তাঁরা চাবিটি লুকিয়ে রাখতে ভুলে যান? তখন কী হবে? ইলিয়া হয়তো ঠিক ওই জিনিসটির প্রতিই আকৃষ্ট হবে যা সাধারণত তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকে। তবে অন্য পরিবারে অনুরূপ পরিস্থিতিতে ছ' বছর বয়সের কাতিয়া আমায় দেখিয়ে দিয়েছিল, তাকের উপর কোথায় দিয়াশলাই রয়েছে, এবং আমি যখন খাবার তৈরি করছিলাম সে আমায় উপদেশপূর্ণ ছোট্ট একটি লেকচার শুনিয়ে দিল। সে বলল, ছোট ছেলেমেয়েদের দিয়াশলাই জ্বালিয়ে উনুন ধরানো উচিত নয় — তাতে বিপদ হতে পারে। কাতিয়া আরও বলল, এক বছর পরে মা নিজের তত্ত্বাবধানে তাকে চায়ের জল বসাতে ও কাপড় ইস্ত্রি করতে দেবেন। এখন দেখতেই পাচ্ছেন কোথায় শিশুর নিরাপত্তার নিশ্চয়তাটা বেশি: উন্মুক্ত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কাতিয়ার দৃঢ় বিশ্বাসে অথবা 'সম্পূর্ণ নিরাপদ বাড়িতে'।

'সম্পূর্ণ নিরাপদ' পরিবেশ গড়ার ইচ্ছা অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারে। যেমন, কোন এক পাইওনিয়র শিবিরের কর্তৃপক্ষ জখমের এরূপ একটি প্রতিষেধমূলক পদ্ধতি প্রদর্শন করলেন। শিবিরের ভূখণ্ডে যত গাছ ছিল

ওগুলোর নিচের ডালগুলো কেটে ফেলা হয়। এই ভাবে আপাতদৃষ্টিতে গাছে উঠা এবং গাছ থেকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দূর করা হল। কিন্তু দেখা গেল যে ছেলেরা তাতে হতোদ্যম হল না — তারা শিবিরের বেড়ায় ছিদ্র ক'রে বনের 'অস্পৃষ্ট' অংশে গিয়ে মহা আনন্দে গাছে চড়তে শুরু করে দিল।

যাকিছু বলা হয়েছে তার মানে এ নয় যে শিশুর চারিদিকের পরিবেশটি বিশেষভাবে গুছিয়ে রাখা ও সময় সময় তার বসবাসের উপযোগী করে তোলা উচিত নয়। উল্লিখিত পাইওনিয়র শিবিরে পরিবেশ বিশ্রীভাবে ও নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। আর সেই প্রাঙ্গণে, যেখানে বারো বছরের কলিয়া গাছ থেকে তলার ধারাল ধাতু খণ্ডগুলোর উপর পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হয় (তার অভ্যন্তরীণ কিছু অঙ্গ বিকল হয়ে যায়), পরিবেশে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। তাছাড়া সাধারণ শৃঙ্খলা এবং সাধারণ সতর্কতা সম্পর্কে শিশুদেরও কোন জ্ঞান ছিল না। সর্বাগ্রে জীবনের প্রথম দিনগুলো থেকেই শিশুকে সর্বাধিক শৃঙ্খলার মধ্যে বড় হওয়া চাই। শৃঙ্খলানিষ্ঠতা, শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষমতা ও চাহিদা — এ হচ্ছে নিরাপত্তার নির্ভরযোগ্য নিশ্চয়তা।

বহু শিশুই চোট পায় বাড়িতে সাধারণ শৃঙ্খলার অভাব হেতু, মা-বাবার দায়িত্বহীনতা, অমনোযোগিতা আর অন্যমনস্কতার দরুন। এটা অবশ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অংশ নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সম্পর্কে কিছু বলা উচিত।

যারা হাসপাতালের রিভাইভেসেন্স বিভাগে দু' বছর বয়সের ওলেগের ছোট্ট নীলাভ-বিবর্ণ দেহটি দেখেছে — ওই দেহের সঙ্গে যুক্ত ছিল অনেকগুলো যন্ত্র যা শিশুর মধ্যে জীবনের শেষ ফুলকিটি জীইয়ে রেখেছিল — তাদের সম্ভবত চিরকাল মনে থাকবে: এমনকি সবচেয়ে 'নির্দোষ' ওষুধ, 'শান্তিদায়ক' পিল আর ভিটামিন টেবলেটও আলাদা কোন ব্যাগে বা বাক্সে বন্ধ করে রাখা উচিত, বিস্কুট আর লজেন্সের কাছে নয়।

অতি মারাত্মক একটি ভুল হচ্ছে — বিষাক্ত তরল পদার্থগুলো বিশেষ পাত্রে না রাখা। অনেক মা-বাবা পলিরল রাখেন তেলের বোতলে, ভিনিগার এসেন্স — কেলসিয়াম ক্লোরাইডের শিশিতে, হাইড্রোক্লোরিক এসিড — শিশু খাদ্যের দাগ-দেওয়া বোতলে... এর ফল হয় মর্মান্তিক।

আর দাহক্ষত... তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে মা-বাবার দোষে, তাঁদের অসাবধানতা আর অমনোযোগিতার দরুন।

বাড়িতে উৎসব। মা অতিথিদের নিয়ে ব্যস্ত, তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন, তামাসা করছেন এবং একই সঙ্গে তাঁদের খাওয়াচ্ছেন। তিনি হাসিখুশি, কিছুটা অন্যমনস্ক, এবং দু'-তিন গ্লাস মদ খেয়ে সম্ভবত একটু উত্তেজিত। রান্নাঘর থেকে গরম কেটলি নিয়ে এলেন। ওটা টেবিলের উপর না রেখে 'ঠিক এক মিনিটের জন্য' রাখলেন চেয়ারের উপর। আর এমন সময় দু' বছরের মেয়ে তানিয়া কারো কোল থেকে নেমে দৌড় দিতে গিয়ে চেয়ারটাতে একটা ধাক্কা খেল। তিন লিটার গরম জলের সবটাই তার গায়ে পড়ল। তারপর কয়েক মাস হাসপাতালে। স্কিন ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন। ক্ষতচিহ্ন। স্নায়বিক তোত্‌লামি।

ছোট ছোট ছেলেমেয়ের মা-বাবাদের নিজেদেরই আগে থেকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা উচিত: আজ আমাদের বাড়িতে লোকজন আসবে, কাজ অনেক বেড়ে যাবে, দৈনন্দিন নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ হবে। আর তার মানে, শিশুর নিরাপত্তার জন্য আজ আমাদের অধিক আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

শিক্ষাদীক্ষা শুরু হয় জীবনের প্রথম দিনগুলো থেকে — এ হচ্ছে স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিশুর জীবনের প্রথম মাসগুলোতে মা-বাবার প্রধান চিন্তা হওয়া উচিত কীভাবে আগে থেকেই বিপদ আঁচ করে তা এড়ানো যায়। প্রায়ই গুরুজনরা তা আঁচ করতে ও এড়াতে পারেন না। দু' মাসের ওলিয়া খাট থেকে পড়ে গিয়ে প্যারাইটেল অস্থিটি ভেঙে ফেলে, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়; তিন মাসের লেনা টেবিলের উপর থেকে পড়ে যায় — মাথার পশ্চাৎ ভাগের হাড়টি ভেঙে গেল; উল্টে-যাওয়া পাত্র থেকে গরম দুধ পড়লে ছ' মাসের সাশার সারা দেহ পুড়ে যায়। এখানে কথা হচ্ছে বড়দের শিক্ষার বিষয়ে আর সঠিকভাবে বললে, তাঁদের পুনর্শিক্ষার বিষয়ে, যাঁরা আগে মনোযোগিতা আর শৃঙ্খলা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা পান নি। কাজটি কঠিন।

এখানে দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে: মা-বাবাদের ভয় দেখানো উচিত কিংবা ভয় দেখানো উচিত নয়?

আমাদের মনে হয়, ভয় দেখানোই ভালো। শিশুদের ট্রমাটিজম-এর প্রতিষেধমূলক প্রচারে অতিরঞ্জন চলতে পারে। তাতে তরুণ মা-বাবারা সহজে অমঙ্গল কল্পনা করতে এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। তাতে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন যে এমনকি কাঁথাকম্বল দিয়ে মোড়া নবজাতকও একটি জীবন্ত প্রাণী, এটা আশা করা যায় না যে সে সর্বক্ষণ

পুতুলের মতো নিশ্চল অবস্থায় শুয়ে থাকবে; তাঁদের এটা মনে থাকে যে তাঁদের প্রতিটি চাল দাবাখেলার চালের মতোই সুবিবেচিত হতে হবে, তাঁরা আগে থেকে নিজেদের প্রতিটি সাধারণ কাজের পরিণাম আঁচ করতে সক্ষম হন; তাঁরা বুঝতে পারেন যে দিনে দিনে শিশু বদলাচ্ছে এবং প্রতিটি নতুন দিন তার চলাচল ক্ষমতা ও বিপদের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করছে। তাই শিশুর নিরাপত্তা বিধানের জন্য সময় মতো তার জীবনের পরিস্থিতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, মা-বাবারা প্রায়ই এ কাজটি করেন বিলম্বে।

একটি উদাহরণ দিই। মাশার বয়স আট মাস। সে এখনও হাঁটতে শেখে নি। সে তার ছোট খাটের পিঠটি ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলনাগুলো মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলছিল।

শেষ খেলনাটি ছিল সবুজ একটা তোতা। এবার আর ফেলার মতো কিছুই রইল না। মাশা তোতাটিকে তুলতে চায় এবং খাটের পিঠটির উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ার দরুন মেঝেতে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পায়, — মেঝেতে কোন গালিচাও ছিল না। মেয়ের চিৎকার শুনতে পেয়ে মা ছুটে এসে তাকে কোলে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। শিশু শান্ত হলে তাকে আবার খাটের উপর বসিয়ে রাখলেন এবং খেলনাগুলো তুলে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি ঘটল। কেবল তৃতীয় বার পড়ার পরই মা বুঝতে পারলেন যে খাটের তোষকটি কিছুটা নিচে নামিয়ে দিতে হবে যাতে রেলিঙগুলো মাশার কোমর বরাবর নয়, বুক বরাবর থাকে। মাশার কপালটি খুবই শক্ত ছিল, তাই মস্তিষ্কে আঘাত লাগে নি, সে অক্ষত থেকে যায়। কিন্তু মায়ের নির্বুদ্ধিতা শিশুর জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারত।

বিপদের বড় এক উৎস হচ্ছে — গৃহপালিত জীবজন্তু। আজকাল জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের মেলামেশার নৈতিক উপকারিতা সম্পর্কে, উৎকৃষ্ট ও মানবিক ব্যক্তিত্ব গঠনে এই মেলামেশার মহৎ ভূমিকা সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো প্রবন্ধ আর বই লেখা হচ্ছে। জীবজন্তুর সঙ্গে মেলামেশার উপকারিতা নিয়ে যেরূপ গৌরবগান হচ্ছে তাতে এই মেলামেশার সঙ্গে জড়িত বিপদগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হয়। অথচ স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এই সমস্ত বিপদ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার এবং আগে থেকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত। নিজেদের জানা

এবং শিশুদের বোঝানো উচিত যে জীবজন্তুর সঙ্গে সঠিকভাবে মেলামেশা না করতে পারলে বিভিন্ন রোগে — যেমন, খোসপাঁচড়া, ফেভাস, হেলমিনথিক ইনভেজন ইত্যাদিতে — আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দুঃখের বিষয়, পত্রপত্রিকা, বেতার আর টেলিভিশনে আপাতত কেবল জীবজন্তুদের ভালোবাসতে ও করুণা করতেই শেখানো হচ্ছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে কীভাবে মেলামেশা করলে ভালো হয় সে বিষয়ে কোন শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছে না। তাই এ ব্যাপারে নিজস্ব উদ্যোগ প্রয়োজন। যদি বাড়িতে কোন জন্তু পোষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাহলে আগে থেকে বিশেষ সাহিত্য পড়া দরকার এবং পশু-চিকিৎসকের কাছে জন্তুটি পোষার বৈশিষ্ট্য ও নিয়ম সম্পর্কে পরামর্শ নেওয়া উচিত।

বাড়ির সম্মুখস্থ রাস্তা। সকাল বেলা। খুবই সাধারণ সকাল, যখন হাতে মোটেই সময় থাকে না। ক্লাস শুরু হতে স্রেফ মিনিট কুড়ি বাকী আছে। ছেলে তাড়াতাড়ি মুখে কিছু একটা দিয়ে ছুটতে ছুটতে শার্টের বোতামগুলো বন্ধ করছে। এক্ষুনি সে বেরিয়ে যাবে, ধড়াম করে দরজা বন্ধ হবে। ঠিক তখনই মাথায় একটা দুশ্চিন্তা আসে: স্কুল তো কাছেই, কিন্তু স্কুল এবং বাড়ির মাঝখানে একটা রাস্তা যে রয়েছে... 'সাবধানে রাস্তা পার হবি!' প্রাত্যহিক এই সতর্কবাণী শিশুকে বিপদ এড়াতে সাহায্য করবে কি? তা তার মনে থাকবে কি অথবা ভুলে যাবে?

'অপ্রত্যাশিত ব্যাপার' — রাস্তার দুর্ঘটনা ও অন্যান্য দুর্ঘটনাকে সাধারণত এই নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু তা সত্যিই কি অপ্রত্যাশিত ব্যাপার? শিশুরা রাস্তাঘাটে যে-সমস্ত দুর্ঘটনায় পড়ে তা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে ওগুলোর একটা মাত্র অংশই ঘটে প্রকৃত বিরল পরিস্থিতিতে, যা আকস্মিক পরিস্থিতি বলে অভিহিত হতে পারে। বাকী দুর্ঘটনাগুলো ঘটে টিপিকেল পরিস্থিতিতে, যা সব সময়ই দেখা দেয়। এই সমস্ত পরিস্থিতি জানা, বোঝা এবং আগে থেকে আঁচ করতে শেখানো সম্ভব ছিল। আর তার মানে, দুর্ঘটনা এড়ানো যেত।

বেশির ভাগ রাস্তার দুর্ঘটনায়ই দেখা যায়, যে শিশু প্রথম মুহূর্তে রাস্তার পরিস্থিতি নিরাপদ বলে ধরে নেয়। আর এই বেঠিক মূল্যায়ন থেকেই বেঠিক পদক্ষেপের সূত্রপাত।

সবাই ভাবে যে শিশুরা রাস্তা চলার নিয়মগুলো মুখস্থ করে নিলেই

বিপদমুক্ত হতে পারে। সত্যিই ট্রাফিক নিয়ম জানা থাকলে — এবং আজকাল স্কুলে তা শেখানোও হচ্ছে — শিশুরা অনেকটা রক্ষা পায়। কিন্তু এটা ভাবলে ভুল হবে যে এই নিয়মগুলো রপ্ত করে নিলেই শিশু ও কিশোর পুরোপুরিভাবে বিপদমুক্ত হয়ে যাবে। না, নিয়ম জানা থাকলেও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। নিয়ম মেনে চলা — সে হচ্ছে বাধ্যতামূলক শর্ত, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। 'কেবল সবুজ আলোতে রাস্তা পার হবে' — নিয়ম তাই বলে। অথচ এ দিকে কেবল প্রায় পাঁচ শতাংশ দুর্ঘটনা ঘটে (যেগুলোতে শিশুরা আহত হয়) ট্রাফিক লাইটযুক্ত চৌরাস্তাগুলোতে। শিশুদের বলা হয়: 'রাস্তা পার হওয়ার সময় প্রথমে বাঁ দিকে, পরে ডান দিকে তাকাবে।' কিন্তু তাকানোই যথেষ্ট নয়, দেখতে এবং আগে থেকে অনুমান করতে পারাও প্রয়োজন।

রাস্তার সবচেয়ে পরিচিত পরিস্থিতিগুলোকে একটি গ্রুপে ফেলে এই ভাবে চিহ্নিত করা যায়: 'লুক্কায়িত বিপদ অনুমান করার অক্ষমতা'। শিশুরা অনেক সময় রাস্তার যানবাহন চলাচলের অংশে ছুটে যায় সম্মুখের দৃশ্য আড়াল-করে-রাখা জিনিসের পেছন থেকে। এই কারণে শিশুদের বেলা রাস্তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। সম্মুখস্থ দৃশ্য আড়াল-করে-রাখা জিনিসের পেছন থেকে রাস্তায় ছুটে যাওয়ার অভ্যাসটি শিশুদের মধ্যে গড়ে উঠে অলক্ষ্যে, একেবারে ছোটবেলা থেকে। বাড়িতে সে দরজার পেছন থেকে, আসবাবপত্রের পেছন থেকে, আড়াল থেকে ছুটে বেরয় — এবং মন্দ কিছু ঘটে না। এই ভাবেই গড়ে উঠে নেতিবাচক অভ্যাস। এই অভ্যাস নিয়েই সাত-আট বছর বয়সের পথচারী শহরের রাস্তায় স্বনির্ভরভাবে চলাচল করতে শুরু করে। নির্দিষ্ট দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে শিশুদের দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিন: রাস্তায় প্রধান বিপদ — খোদ কাছিয়ে-আসা গাড়িটি ততটা নয়, যতটা সেই জিনিসটি যা সময় মতো গাড়িটি লক্ষ্য করতে বাধা দেয় — দাঁড়িয়ে থাকা অথবা চলন্ত গাড়ি, ঝোপঝাড়, বেড়া ও অন্যান্য জিনিস।

...রাস্তা পার হওয়ার জায়গাটির দিকে ধীর গতিতে একখানি লরি আসছে। পথচারী সবকিছু বিচার ক'রে বুঝল যে রাস্তাটি নিশ্চিন্তে পার হতে পারবে। কিন্তু হঠাৎ লরির পেছন থেকে বেরিয়ে এল একখানি মোটর কার — ওটা দ্বিগুণ বেগে ছুটছিল! পথচারী 'ফাঁদে' পড়ল।

...রাস্তা পার হওয়ার আগে মেয়েটি একটি গাড়িকে যেতে দিল। তাকে সেই ভাবেই শেখানো হয়েছে, এবং সে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে থাকে

কখন এই ধীর গতি টিপ-আপ লরিটি চলে যাবে। লরিটি চলে যেতেই সে নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে রাস্তার দিকে পা বাড়াল। কিন্তু হঠাৎ চলে-যাওয়া গাড়ীটির পেছন থেকে অন্য একটি গাড়ি দেখা গেল, যা প্রথমটির দিকে যাচ্ছিল। তাই একখানি গাড়িকেই যেতে দেওয়া যথেষ্ট ছিল না, আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা উচিত ছিল কখন তা দূরে চলে যাবে এবং সম্মুখস্থ দৃশ্য দেখতে বাধা দেবে না।

অনুরূপ পরিস্থিতিগুলো একটি মনস্তাত্ত্বিক ফ্যাক্টরের দ্বারা যুক্ত: পথচারী (এবং প্রায়ই শিশু) লুক্কায়িত বিপদটি আগে থেকে আঁচ করতে পারে নি।

রাস্তার পরিস্থিতিসমূহের আরও একটি গ্রুপ আছে যা অন্য মনস্তাত্ত্বিক ফ্যাক্টরের দ্বারা যুক্ত — **বিক্ষিপ্ত মনোযোগ**। তা শিশুদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে বিশেষ সহজে। রাস্তার অন্য পাশে বাসটি এসে থেমেছে — 'ওটা ধরতে হবে!' অন্য পাশে ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর — 'আমায় ওখানেই তো যেতে হবে!' উল্টো দিকের ফুটপাথ থেকে বন্ধু ডাক দিল, অন্য পাশে মা, দিদিমা বা বোনকে দেখতে পেল... অনেক সময় মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয় রাস্তার মাঝখানে পড়ে থাকা জিনিসের দিকে — ওখানে গড়িয়ে আসা বল বা ছুটে আসা কুকুরের দিকে...

রাস্তার পরিস্থিতির অন্য একটি গ্রুপ এরূপ ফ্যাক্টরের দ্বারা যুক্ত: 'নির্জন রাস্তা'। দেখা যায় যে নির্জন রাস্তায়ই বিশেষ বিপদ থাকে। সতর্কতা কমে যায়, কল্পিত নিরাপত্তার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। রাস্তার পাশে বাচ্চারা খেলতে শুরু করে, এবং খেলতে খেলতে অনেক সময় রাস্তার মাঝখানে ছুটে যায়। ওখানে তো গাড়ি দেখা যায় ক্বচিৎ... নির্জন রাস্তা লোকে পার হয় কোন দিকে না তাকিয়ে, কোণাকুণিভাবে সেই রাস্তা ধরে চলে, — যেন ফুটপাথের উপর দিয়ে চলছে...

অনেকেই মনে করে: শিশুরা গাড়ি চাপা পড়ে এই জন্য যে তারা অমনোযোগী, অবাধ্য ও নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি উদাসীন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যাপারটি তা নয়। আসল কথা হচ্ছে — তারা তালিম পায় নি, তাদের সতর্কতা সম্পর্কে কোন জ্ঞান দেওয়া হয় নি।

শিশু নিজে থেকেই রাস্তায় চলার অভ্যাস ও নিয়ম রপ্ত করে নেবে — এমনটা আমরা আশা করতে পারি না। যথা সম্ভব অল্প বয়স থেকেই তাকে রাস্তার দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা উচিত; আমাদের সন্তানের স্কুলে, স্টেডিয়ামে, দিদিমার বাড়িতে যাওয়ার পথে যে-সমস্ত বাধাবিপত্তি

রয়েছে তা আগে থেকেই মনে মনে বিশ্লেষণ করতে হবে। এখানে কেবল কথা বললে, ব্যাখ্যা করলে ও তথ্য জোগালে কোন কাজ হবে না। এমনকি সবচেয়ে বোধগম্য তথ্য আর বিশদ আলোচনাও প্রয়োজনীয় ফল দেয় না। দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব একমাত্র তখনই, যখন পর্যবেক্ষণ ও চলাফেরার অভ্যাস পুরোপুরিভাবে স্বয়ংক্রিয়তা লাভ করে।

তা সম্ভব হয় নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলনের মাধ্যমে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে শিশুকে বলি: 'ওই দ্যাখ, বাসটি দাঁড়িয়ে আছে (অথবা আসছে)। মনে হচ্ছে ওটার পেছনে আর কোন গাড়ি নেই।' পরের মুহূর্তে: 'দ্যাখ্‌লি, বাসটার পেছন থেকে একখানি গাড়ি বেরিয়ে গেল, আগে ওটা চোখেই পড়ছিল না।' সঙ্গে সঙ্গেই তার কল্পনাকে কাজে লাগাই: 'যদি আমরা অপেক্ষা না ক'রে রাস্তা পার হতে শুরু করতাম, তাহলে...'। এরূপ অনুশীলন বহুবার পুনরাবৃত্তি করা দরকার। কল্পনায় উপলব্ধ বিপদ বাস্তব বিপদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে পারে।

এখানে মা-বাবার উদাহরণও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ট্রম্যাটিজমের প্রতিষেধ সম্পর্কে শিশুকে হাজার বার বলা যায়, এই উদ্দেশ্যে তার মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ ও কল্পনা শক্তিকেও কাজে লাগানো যায়। কিন্তু কখনও একবারও যদি আপনি শিশুকে নিয়ে নির্দিষ্ট বাস ধরার জন্য কোন দিকে না তাকিয়ে রাস্তা পার হন, তাহলে মনে রাখবেন যে এতকাল শিশুকে রাস্তার বিপদ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য আপনি যাকিছু করেছেন তা সম্পূর্ণ পণ্ড হয়ে যাবে।

গ্রীষ্মের ছুটি! নার্স আর ধাত্রীরা আন্দ্রেইকে চামচ দিয়ে খাওয়ায়, আর বইয়ের পাতা কীভাবে উল্টাতে হয় তা সে নিজেই শিখে নিয়েছে। তা সে উল্টায় চিবুক দিয়ে। গভীর মনোযোগ সহকারে গুপ্তচরদের বিষয়ে কীসব কাহিনী পড়ছে। ছেলেটির হাত দু'টি প্ল্যাস্টার করা — কনুইতে ও বাজুতে কয়েকটি ফ্র্যাকচার। তাকে জিজ্ঞেস করি: 'কি রে, আরও গাছে উঠবি?' সে ইতস্তত না করে সোজা জবাব দেয়: 'উঠব!' আর এ দিকে মা পাশের ঘরে বসে কাঁদছেন: 'দু'টো হাতই ভাঙল... ডাক্তাররা বলছেন, মারাত্মক ফ্র্যাকচার...'

গ্রীষ্মের ছুটি... সে আনন্দের সময়, তখন নিশ্চিন্তে থাকা যায়, স্কুলে যেতে হয় না, পড়া তৈরি করতে হয় না। তখন নদী-হ্রদে সাঁতার দেওয়ার সময়, ফুটবল খেলার সময়, সন্ধ্যায় ক্যাম্প ফায়ারের চারিদিকে বসে গান

গাওয়ার সময়। এবং হায়, তখন গ্রীষ্মকালীন জখমেরও সময়। সুখের বিষয় এই যে আনন্দের মধ্যে ও মঙ্গল মতো গ্রীষ্ম যাপনকারী শিশুদের সংখ্যার তুলনায় আহত ছেলেমেয়েদের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু এমনকি অতি ক্ষুদ্র সংখ্যার আড়ালেও রয়েছে শিশুরা, যাদের জন্য দীর্ঘপ্রত্যাশিত বিশ্রাম সমাপ্ত হয় শারীরিক যন্ত্রণায়, হাসপাতালের বিছানায়, বাধ্যতামূলক অচলাবস্থায় আর সুদীর্ঘ একঘেয়েমিতে। আর কখনও কখনও পরিণাম হয় তারও চেয়ে মারাত্মক।

বলাই বাহুল্য, শিশু — শিশুই। ওদের চার দেয়ালের মধ্যে ধরে রাখা সম্ভব নয়। আর সম্ভব হলেও তা হত নিতান্ত অনুচিত ও অন্যায় কাজ। শিশুদের দেখাশোনাকারী আর মা-বাবাদের কাছেও আমরা এরূপ দাবি হাজির করতে পারি না: 'একটা দুর্ঘটনাও যেন না ঘটে!' সে অসম্ভব ও অবাস্তব। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছেলেমেয়ে ও তাদের মা-বাবাদের সঙ্গে বহু আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়: জখমের পাঁচটি ঘটনার মধ্যে প্রায় চারটিই ঘটে আকস্মিকভাবে নয়, বড়দের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দোষে — অমনোযোগিতা, পূর্বানুমান, সুবিবেচনা আর সতর্কতার অভাবের দরুন।

ফুটবল। এ খেলায় ছেলেরা উত্তেজিত, ক্ষিপ্র ও মত্ত। ভাদিম ব্যাপারটি এভাবে ব্যাখ্যা করল: 'জোরে ছোটার সময় পড়ে গিয়েছিলাম। ব্যস, পাটি ভেঙে গেল।' আর অন্য খুদে খেলোয়াড়ের হাত ভেঙেছে: 'এক ছেলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। সবই তো ঘটে।' হ্যাঁ, সবই ঘটে। আমরা তো আর বলতে পারি না: 'ফুটবলের মাঠে ছোটাছুটি করিস না।' তবে বহু ক্ষেত্রে প্রায় সমান ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে: 'পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম। বৃষ্টির পর ঘাস ছিল ভেজা।' দেখাশোনাকারী এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনকারীরা কি আগে থেকে ভেজা ঘাসের উপর ফুটবল খেলার সম্ভাব্য পরিণাম আঁচ করতে পারেন নি? এটা কি বলা যায় যে এখানে ঝুঁকিটি প্রয়োজনীয় ও যুক্তিসঙ্গত ছিল?

দোলনা। লিদার হাতের কব্জিতে ফ্র্যাকচার। সে বলল: 'আমরা জোরে দুলছিলাম না। তবে আমি কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে হাত ছেড়ে দিই এবং পড়ে যাই।' হ্যাঁ, তা-ও ঘটে। মেয়েটিকে সঙ্গে সঙ্গেই তোলা হল এবং চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হল। সবই ঠিক, ঘটনাটির জন্য কাউকে দোষ দেওয়ার প্রয়োজন নেই, এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েকেও দোলনায় দোলার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করার দরকার নেই, যদিও এই আনন্দ উপভোগে কিছুটা

ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু নাদিয়ার কথা ধরুন। তার ভীত মুখটি শুকিয়ে গেছে। শক্ত বিছানায় একেবারে নিশ্চল অবস্থায় শুয়ে আছে: তার শিরদাঁড়া ভেঙেছে। ঘটনাটি এভাবে ঘটে: 'আমরা খুব জোরে দুলছিলাম। দুলতে দুলতে একেবারে বারের উপরে চলে যাই। এবং তখনই উল্টে পড়লাম...' দেখা গেল, মেয়েরা যেখানে দুলছিল সেখানে এমন কেউ ছিল না যে সময় মতো সতর্কতার কথা বিস্মৃত মেয়েদের থামাতে পারত। তাছাড়া দোলনাটিও ঠিক ছিল না। এই ঘটনা থেকে নিঃসন্দেহেই কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

একবার এক পরিবার গ্রীষ্ম যাপনের জন্য গ্রামাঞ্চলে একটি বাগান বাড়ি ভাড়া নিতে চেয়েছিল। মা বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন: 'এখানে আশেপাশে কোন নদী বা হ্রদ আছে?' — 'হ্যাঁ আছে, একেবারে কাছেই চমৎকার এক হ্রদ,' — আনন্দের সঙ্গে জানাল বাড়িওয়ালা। কিন্তু সেটাই ভদ্রমহিলা চান নি। 'কাছে হ্রদ! — দশ বছরের ছেলের মা'র মন খারাপ হয়ে গেল। — সেরিওজা এখানে দিদিমার সঙ্গে থাকবে। সে তাঁর কথা না-ও শুনতে পারে: একা বা অন্য ছেলেদের সঙ্গে স্নান করতে চলে যাবে। না, এ বাড়িতে ওর থাকা চলবে না।'

মায়ের ভয় অমূলক নয়। অনেক ছেলেমেয়েই জলে ডুবে মারা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিশুর বিশ্রামের জন্য নদী-পুকুরবিহীন জায়গা খোঁজার ব্যাপারে নিজের ভীরুতার কাছে আত্মসমর্পণের মাত্রা কতটা হওয়া উচিত!

তাহলে কী করা? প্রথমত, সেরিওজাকে বোঝাতে হবে যে মা-বাবার মানসিক শান্তির প্রতি তার উদাসীন হলে চলবে না। আমায় লোকে বলবে: 'আরে রাখুন, রাখুন, এসব কেবল বড় বড় কথা। জ্যান্ত বাচ্চারা তো আর দেবদূত নয়, ওরা আপনার কথায় কানই দেবে না।'

না, ব্যাপারটি ঠিক তা নয়। একটি ঘটনার কথা বলি। একবার মস্কোর এক পার্কে বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েরা জড় হয়েছিল। তারা সবাই ছিল প্রকৃতি-প্রেমিকদের চক্রের সদস্য। এই বড় দলটির সঙ্গে আমিও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলাম। ছেলেমেয়েরা ছিল সজীব, সক্রিয়, সাহসী ও স্বনির্ভর, আর তাদের পরিচালনায় ছিলেন সত্যিকার এক শিক্ষাবিদ মারিয়া ভাসিলেভনা মাম্‌কিনা, যিনি বর্তমানে পেন্সনে আছেন।

প্রথম দিকে আমি এমনকি অবাকই হয়েছিলাম। দিনটি ছিল ভীষণ গরম। বয়োজ্যেষ্ঠ, পনেরো বছরের ছেলেমেয়েরা কেয়ারিতে আগাছা সাফ

করছিল। পরে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ক'রে মারিয়া ভাসিলেভনার কাছে এসে বলল: 'আমরা স্নান করতে যেতে পারি? আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব।' পুকুর ছিল পার্কের কাছেই। আমি ভাবলাম: 'ওরা বড় ছেলেমেয়ে, এবং মারিয়া ভাসিলেভনার কাছে অনুমতি নিতে কেউ ওদের বাধ্যও করছে না।' 'হ্যাঁ, কেউ আমাদের বাধ্য করে নি,' — পরে একটা মেয়ে আমায় বুঝিয়ে বলল। — 'কিন্তু না বলে গেলে তিনি যদি চিন্তা করেন? আমরা এমনকি গাছের আড়ালে একটু দূরে চলে গেলেও তাঁকে বলে যাই।'

তারা কথা শোনে, আগে থেকে সতর্ক করে দেয় এবং 'রিপোর্ট পেশ করে' এই জন্য নয় যে তাদের কোনরূপ 'নির্দেশ' দেওয়া হয়েছে, তারা তা করে এই জন্য যে নিজের শিক্ষিকা ও বন্ধুকে তারা অনর্থক চিন্তায় ফেলতে চায় না। হ্যাঁ, শিক্ষাদীক্ষার উদ্দেশ্য কেবল শৃঙ্খলানিষ্ঠতা, নৈপুণ্য আর দক্ষতা বিকাশ করাই নয়, সহৃদয়তাও জাগিয়ে তোলা।

সেরিওজাকে দিদিমার সঙ্গে বাগান বাড়িতে গ্রীষ্ম কাটাতে হবে। তার আর কী প্রয়োজন? প্রথমে তার সাঁতার শেখা প্রয়োজন। অবশ্য দেখা গেছে যে মা-বাবারা এরূপ কঠোর ও অত্যন্ত স্বার্থপর দৃষ্টিভঙ্গিও পোষণ করেন: 'সাঁতার না শেখালেই বেশি নিরাপদে থাকা যায়। তারাই ডুবে যারা সাঁতার জানে। আমার খোকার পাড়ের কাছে ঝাঁপাঝাঁপি করলেই হবে।' সাঁতার-জানা লোকই যে কেবল ডুবে তাতে নিশ্চিত হওয়ার জন্য জাহাজ-ডুবি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা না ধরলেও চলবে। যেকোন আকস্মিক ঘটনাই সাঁতার-না-জানা ব্যক্তির পক্ষে সর্বনাশা হতে পারে। এরূপ লোকের শারীরিক অপ্রস্তুতির কথা আর না-ই বা বললাম। সাঁতার-না-জানা শিশুর মধ্যে, বিশেষকরে ছেলের মধ্যে যে অপকৃষ্টতা বোধ দেখা দেয় তার কথা আর না-ই বা বললাম।

সেরিওজার নিরাপত্তার জন্য আরও যা প্রয়োজন তা হল: ভালো ক'রে হ্রদটি দেখা, তার স্নানের জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বার করা, কোথাও কোন বিপদ আছে কি না এবং কোথায় কতটা গভীর তা পরখ করা।

কিন্তু সেরিওজার মাকে কিছুতেই সন্তুষ্ট করা গেল না। তিনি বলেন: 'আমাদের সেরিওজা উদার প্রকৃতির ছেলে, সে জেদী নয়। এবং, প্রসঙ্গত, আমরা তাকে সাঁতার শিখিয়েছি। আমরা অবশ্য ভালো ক'রে হ্রদটিও পরীক্ষা করতে পারি। কিন্তু এ সবকিছুতে কি পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা আছে?'

না, পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নেই। একমাত্র তারই মৃত্যু নেই যার জন্ম

হয় নি। এবং যে-মহিলারা ‘সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন মাতৃত্ব’ কামনা করেন, তাঁদের পক্ষে আগে থেকে মা না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়াই শ্রেয়।

দশ-এগারো বছর বয়স অবধি শিশুদের গুরুজন কিংবা বড় ছেলেমেয়েদের তত্ত্বাবধান ছাড়া স্নান করতে দেওয়া উচিত নয়। তাদের নিয়মিতভাবে স্থির, সতর্ক ও ধৈর্যশীল করে তোলা দরকার। তাদের কেবল সাঁতার দিতেই নয়, উদ্ধার করতেও শেখানো উচিত, অন্তত এই জন্য যে অনেক সময় লোকে ডুবে উদ্ধার কার্যে অনৈপুণ্যের দরুন।

‘কিশোর এবং সাইকেল’ — এই বিষয়টিতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। রাজপথে সাইকেল চড়া — গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে এ হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটি বিপদ। অনেকে ঠিকই বলেন যে ১৪-১৫ বছর বয়স অবধি কিশোরদের স্বনির্ভরভাবে শহরের রাস্তায় সাইকেল চড়তে দেওয়া উচিত নয়। দেশের অনেক অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রে শহরে সাইকেল চড়ার জন্য লাইসেন্স পেতে হয় আর সেই লাইসেন্স পেতে হলে বিশেষ পরীক্ষা দিতে হয়। এই অভিজ্ঞতাটি সর্বত্র কাজে লাগালে মন্দ হবে না।

মা-বাবাদের উদ্দেশে বলতে চাই: বারো-তেরো বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের এমনকি শহরের বাইরেও মোটর সড়কের উপর সাইকেল চড়তে দেবেন না, — তাদের সঙ্গে সর্বদা বড়রাও যেন থাকে। বড় রাস্তায় কিশোরদের সাইকেলের সামনে বা পেছনে ছোট খোকাখুকীদের বসাতে বারণ করবেন। দশ-এগারো বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিজেরাও সাইকেলে ক'রে ভ্রমণ করতে যাবেন, ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলানিষ্ঠতা, স্থৈর্য ও প্রতিক্রিয়ায় দ্রুততা গড়ে তুলবেন, রাজপথে যারা সাইকেল চালায় তাদের পক্ষে এই গুণগুলো অপরিহার্য।

মা-বাবার সঙ্গে পদব্রজে অভিযান এবং সাইকেলে বা অন্যান্য যানবাহনে ক'রে ভ্রমণ — এ হচ্ছে শিশুর প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার সবচেয়ে স্বাভাবিক উপায়। তা তাকে বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে তুলে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ‘জীবনের গভীরে’ নিয়ে যায় না, বরং স্বনির্ভরতার পথে তার নতুন পদক্ষেপ করার প্রস্তুতি পরীক্ষার মাধ্যমে তাকে ধীরে ধীরে সেই জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সাবধান, বিপদ! বলাই বাহুল্য, কেবল শিশুর জীবন আর স্বাস্থ্যই আমাদের মনোযোগ, সতর্কতা ও সাহসিকতা দাবি করে না। কিন্তু কিছুকাল

থেকে যখনই শিশুর মনকে আহত করার বিপদ সম্পর্কে কথা উঠে আমি প্রতি বারই চৌদ্দ বছর বয়সের এক মেয়ের কথা স্মরণ করি। মেয়েটি একবার গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সে ওখানে ছ' মাস থাকে। কিন্তু ওই ছ' মাসের মধ্যে একটি বারও তার সঙ্গীসাথীরা — যাদের সঙ্গে তার আশৈশব বন্ধুত্ব ছিল — তাকে হাসপাতালে দেখতে আসে নি। আমার মনে আছে, ব্যাপারটি কীভাবে আমার কাছে ব্যাখ্যা করা হয়: 'শিশুরা সহজাতিকভাবে নিজেদের দুঃখকষ্ট আর যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করে। তা বোধগম্য ও স্বাভাবিক। শিশুর উপর অন্যের বেদনা চাপিয়ে দিতে নেই। শিশুর মন সহজেই আহত হয়...' কথাগুলো ছিল মার্জিত, কিন্তু ওগুলোর সার অমার্জিত: 'পরের বিপদে দূরে থেঁকো।'

আর অচিরেই আমি মস্কোর উপকণ্ঠের একটি স্কুলে গেলাম।

ওখানে তখনও কারো সঙ্গে আমার আলাপ হয় নি, কাউকে কোনকিছু জিজ্ঞেসও করি নি, তবে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম: স্কুলটিতে বেশ চাক্‌চিক্য আছে। চৌকাঠ থেকেই চোখে পড়ে পরিপাটি ও ভালো রুচি বোধ — সর্বত্র ফুল আর সবুজ গাছপালা, প্রবেশ-কক্ষের দেয়ালগুলো মোজাইক চিত্র দিয়ে সজ্জিত। এ তো হল বাহ্যিক লক্ষণ। পরে শিক্ষক ও ছেলেমেয়েদের গল্পে আমার সামনে ফুটে উঠল ছাত্রদের চিত্তাকর্ষক ও বৈচিত্র্যময় জীবন: তারা থিয়েটার, মিউজিয়ম আর প্রদর্শনীতে যায়। তারা আমায় বিভিন্ন সান্ধ্যানুষ্ঠানের কথাও বলল। এই তো ষষ্ঠ শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা একটা আলোচনা-সভার আয়োজন করছে। আলোচ্য বিষয় — 'মানুষের মধ্যে সমস্তকিছুই সুন্দর হওয়া চাই।'

এবার আসল কথাটাই বলে ফেলি। সেরিওজা বেলোভের কথা এবং তার সঙ্গে যে-দুর্ঘটনা ঘটেছে সেটার কথা আমি জানতাম। সেই জন্যই আমার এই স্কুলে আসা।

দুর্ঘটনাটি ঘটে নববর্ষের উৎসবের সময়। তারাবাতি থেকে সেরিওজার ছদ্মবেশী নাচের পোশাকে আগুন লেগে যায়। হাসপাতালে জখমের পরিমাণ নির্ধারণ করা হল: ৩০ শতাংশ। আমি দেখেছিলাম সেরিওজার অপরিসীম যন্ত্রণাক্লিষ্ট চোখ এবং তার অগ্নিদগ্ধ হাত-পা। শিশুদের তা দেখতে দেওয়া যায় না। ডাক্তাররা অবশ্য ওদের তার কাছে যেতেও দিতেন না। দুর্ঘটনার কয়েক দিন পরে ক্লাসের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে সেরিওজার জন্য ছোট্ট একখানি চিঠি আর সামান্য ফল নিয়ে আসা হয়েছিল। তারপর থেকে সেরিওজা সব সময়ই জিজ্ঞেস করত: 'ক্লাসের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে

কোনকিছু নেই?' না, পরবর্তী চার মাসের মধ্যে তারা ছেলেটির আর কোন খবরই নেয় নি।

শিক্ষিকা আমায় বললেন: 'আগে সেরিওজার অবস্থা সংকটজনক ছিল, তার দু'টি অপারেশন হয়েছে, এখন সে সেরে উঠছে, এবং দিন কয়েকের মধ্যেই আমরা তাকে দেখতে যাচ্ছি।' আমি তাঁকে শুধরে দিলাম না, যদিও শুধরাতে পারতাম: সেরিওজার দেহে দু'টি নয়, ষোলোটি অপারেশন হয়েছে, এবং সে সেরে উঠছিল না, বরং তার অবস্থা আরও সংকটের দিকে যাচ্ছিল। পরে জানতে পারলাম যে এক রবিবারে শিক্ষিকা সত্যিই কিছু ছেলেমেয়েকে নিয়ে সেরিওজাকে দেখতে গিয়েছিলেন। ছেলেমেয়েরা হাসপাতালের নিচের তলায় অপেক্ষা করছিল, আর শিক্ষিকা উপরে গিয়ে তাদের তরফ থেকে সেরিওজাকে কিছু ফল এবং শুভেচ্ছা দিয়ে এলেন। কিন্তু কোন চিঠি — অন্ততপক্ষে একখানি চিটও লেখার কথা তাদের মনেও আসে নি। এবং কেউ তাদের তা করতে বলেও নি — না শিক্ষক, না মা-বাবা। কেন?

দুঃখের বিষয়, এরূপ ঘটনা কোন ব্যতিক্রম নয়। তা ঘটে প্রায়ই।

ক্লাসে একটি সিট খালি পড়ে আছে; কাতিয়া, সেরিওজা, আন্দ্রেই বাইরে খেলতে বেরচ্ছে না। মাসের পর মাস কেটে যায়। অনেক ছেলেমেয়ের জন্য তাদের অসুস্থ সাথী — স্রেফ একজন 'অনুপস্থিত' ব্যক্তি। আর এ দিকে শিশুদের জীবন তার আপন গতিতে চলতে থাকে, তা পরের দুঃখদুর্দশায় মোটেই বিঘ্নিত হচ্ছে না। কিন্তু এই সুস্থ ছেলেমেয়েরা সচ্ছল কেবল বাইরে বাইরেই। প্রকৃত পক্ষে ওই সময় তারাও অস্ত্রোপচারাধীন হয়, সে অস্ত্রোপচার রক্তহীন, বেদনাহীন, তবে অত্যন্ত মারাত্মক ও বিপজ্জনক। কোনরূপ হস্তক্ষেপ না ক'রে বড়রা তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে শিশুদের নির্দয় করে তুলে। ভালো, যদি পরে অন্য প্রভাব ও অন্য অভিজ্ঞতা তাদের এই নির্দয়তা থেকে মুক্ত করতে পারে।

শিশু হাসপাতালের ডাক্তার আর পালিকারা বলেন: 'এমনও দেখা যায় যখন অন্যান্য শহরের ছেলেমেয়েরা তাদের স্কুল থেকে চিঠিপত্র পায় ক্বচিৎ, বন্ধুবান্ধবরা অসুস্থ ছেলেমেয়েদের দেখতে আসে কালেভদ্রে।' বলা যেতে পারে, এ হয়তো নৈতিক শিক্ষায় কোন বিমূর্ত ধারারই ফল, যা আজকাল স্কুলে এবং পরিবারে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়? আমরা যদি সময় সময় আমাদের ছেলেমেয়েদের কবির সুন্দর কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দিতে পারি তাহলে মন্দ হয় না: 'সমগ্র মানবজাতিকে ভালোবাসা সহজ —

পড়শীকে ভালোবাসতে শেখো।' এবং কেবল স্মরণ করিয়ে দিলেই চলবে না — নিজের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে, নিজের পুরো আচরণ দিয়ে আপন জনের প্রতি, নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি সক্রিয় ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে হবে। আর এর জন্য তার বেদনার একটা অংশ নিজের উপর তুলে নিতে হয়, এর জন্য নিজের অন্তরকেও অনিবার্যভাবে জখম করতে হয়। কিন্তু বিকল্প হচ্ছে এরূপ: এই সমস্ত জখম ছাড়া খোদ অন্তরের অস্তিত্বই থাকতে পারে না।

'অসুস্থ সাথীর প্রতি শিশুদের মনোযোগ ও সহানুভূতি গড়ে তোলার দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের, তাদের মা-বাবাদের', — এ হচ্ছে শিশু চিকিৎসকদের মত।

শিশু হাসপাতালের ট্রম্যাটোলজি বিভাগে আমায় এক শিক্ষিকার কথা বলা হল। মারিনা বর্সোভাকে যখন হাসপাতালে আনা হয়েছিল, তখন তার অবস্থা ছিল অত্যন্ত সংকটজনক। বাঁচবে বলে মনে হচ্ছিল না। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে শিশুটিকে বাঁচাতে সাহায্য করেছে তার স্কুলের ছেলেমেয়েদের অসাধারণ মনোযোগ আর সহানুভূতি। বলাই বাহুল্য, তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা দেয় নি। এখানে শিক্ষিকার বড় এক অবদান রয়েছে।

... সে দিনকার মতো ক্লাস শেষ। কিন্তু নিনা সের্গেয়েভনা তার পরও ক্লাসে বসে রেজিস্টারি বইয়ে কীসব লেখালেখি করছিলেন। হঠাৎ ক্লাসের দরজা খুলে কে একজন চৌকাঠ থেকেই চেঁচিয়ে বলল: 'নিনা সের্গেয়েভনা, মারিনা গাড়ি চাপা পড়েছে!' যখন নিনা সের্গেয়েভনা হাসপাতালে এলেন, তাঁকে বলা হল যে মারিনা তখনও অজ্ঞান অবস্থায় আছে। প্রতীক্ষা কক্ষে তিনি মেয়ের আঘাতগ্রস্ত স্তম্ভিত মাকে দেখতে পেলেন। ওই মুহূর্ত থেকে এবং দীর্ঘ কালের জন্য তাঁর জীবনে ও তাঁর ছাত্রছাত্রীদের জীবনে মারিনার অদৃষ্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। হাসপাতালের চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্মীদের দৃষ্টিতে অচিরে শিক্ষিকা মায়েরই মতো মেয়ের একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হয়ে উঠলেন।

দিনের প্রথমাংশ নিনা সের্গেয়েভনা কাটাতেন হাসপাতালে, মারিনার কাছে। দ্বিতীয় শিফ্‌টে ক্লাসে যেতেন সরাসরি হাসপাতাল থেকে। মাঝেমধ্যে দেরি হয়ে যেত। ছেলেমেয়েরা উত্তেজনা নিয়ে অধীর হয়ে তাঁর অপেক্ষা করত। ক্লাসে পড়া শুরু হত মারিনার অবস্থার সংবাদ দিয়ে। শিশুদের কাছ থেকে অজস্র ধারায় হাসপাতালে আসতে লাগল খাদ্যদ্রব্য,

উপহার, চিঠি। আমায় মোটা একটি ফাইল দেখানো হল, আর মারিনা বলল যে ওগুলোর সংখ্যা 'আরও শতগুণ বেশি' ছিল। ফাইলে কী যে কেবল ছিল না — ধাঁধা, তামাসা, গণিতের অনুশীলন, অসংখ্য ছবি, স্কুলের খবর, আবহাওয়ার খবর। প্রতিটি চিঠিতে কত ভালোবাসা ও মায়া: 'আমি তোমার সুন্দর স্বাস্থ্য কামনা করি, ভালো ক'রে খাওয়া-দাওয়া করবে। ইউলিয়া'; 'ঠিক মতো খাওয়া-দাওয়া ক'রে সবল হয়ে উঠো। কলিয়া'; 'সমস্ত অপারেশনই তুই সইতে পারবি এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ক্লাসে ফিরে আসবি। ভিতিয়া'; 'শিগগির হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আয়। ভালিয়া'; 'মন খারাপ কোরো না, তোমার কথা আমরা সব সময় স্মরণ করি। পাভেল'; 'আমি এবং আমার ক্লাস অধীর হয়ে তোর অপেক্ষা করছি। তোর প্রতিবেশী দিমা।' আরও আছে অ্যাকুয়ারিয়ামের ছবি। তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে: জল, বালু, রাজ প্রাসাদ, সোনার মাছ। এবং এরূপ একখানি চিঠি: 'তুমি যেদিন আমাদের প্রথম চিঠিখানি লিখেছিলে, সে দিনটি আমাদের কাছে ছিল উৎসবের দিনের মতো।'

আর এখানে শিক্ষিকার চিঠি থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি:

'প্রিয় মারিনা, কেমন আছ? ডাক্তাররা তোমার খুব প্রশংসা করছেন, বলেছেন যে তুমি লক্ষ্মী মেয়ে। তোমায় খেলনা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, এবং আমি তোমার জন্য, আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলনাটি পাঠালাম। এটা সজারু — নাম তার ইয়েজ ইয়েজোভিচ। (দ্যাখলে তো, মাস্টাররাও খেলনা নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসে)। জানো মারিনা, এই খেলনাটি সাধারণ খেলনা নয়, যাদু-করা খেলনা। সে হচ্ছে আমাদের দূত, এবং সে দেখবে তুমি কীভাবে খাওয়া-দাওয়া কর। তোমার সেই খেলনা কারখানার কথা মনে আছে, যেখানে আমরা সবাই একবার গিয়েছিলাম। ওখানেই এই সজারুর জন্ম হয়েছে।' 'আমার একটি বেড়াল আছে। তার নাম — তিমোশা। আমরা দু'জনে একসঙ্গে বসে তোমায় চিঠি লিখছি। আমি যখন তোমাদের খাতা দেখি, সে সব সময় আমার পাশে বসে থাকে...' 'আদরের মারিনা, ক্লাসের ছেলেমেয়েদের তুমি এক চিঠিতেই জবাব দিও। তোমার ওই প্রথম চিঠিখানি আমরা সবাই একসঙ্গে পড়েছি। ওটা আমরা ক্লাসে কাঁচের তলায় রেখেছি।' দ্যাখলেন তো?..

হয়তো এই জন্যই তখনও একেবারে দুর্বল মারিনা গায়ের ব্যথা নিয়েও রঙীন পেন্সিল দিয়ে একটি খরগোশ আঁকার শক্তি খুঁজে পেয়েছিল, — ওটা ছিল বন্ধুদের জন্য তার উপহার। হয়তো এই জন্যই তার

দৃষ্টি এখন এত উজ্জ্বল। প্রায় এক বছর বাদে মারিনা যখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল, সে ওখানে রেখে গেল বন্ধুদের প্রেরিত বইয়ের পুরো একটা লাইব্রেরি, অসংখ্য পুতুল আর খেলনা। আর সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল মানুষের প্রতি অফুরন্ত বিশ্বাস যা দিয়ে তার দীর্ঘদিন কুলাবে।

কিন্তু এখানে কেবল মারিনার স্বাস্থ্য এবং জীবনের কথাই হচ্ছে না। কথা হচ্ছে সুস্থদের নিয়ে, তারা কী ধরনের মানুষ হবে সে বিষয়ে। এই বছরটি মারিনার সহপাঠীদের জন্য কী নিয়ে এল? এই বছরটির কথা তারা ভুলতে চাইবে কি, ভুলতে পারবে কি? হয়তো এক্ষুনি এ কথা বলা ঠিক হবে না যে এই বছরটি তাদের চিরকালের জন্য নির্দয়তা ও উদাসীনতা থেকে মুক্ত করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ হোক অথবা বহু বছর পরে হোক তার স্মৃতি তাদের মানস জগতে মাঝেমধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করবেই। যখনই তারা তাড়াহুড়োর মধ্যে অথবা সচ্ছলতা জনিত তৃপ্তির দরুন পরের দুঃখের পাশ দিয়ে চলে যেতে চাইবে তখনই তা তাদের থামিয়ে দেবে। আর হয়তো বা তা কাউকে মানুষের অযোগ্য অনুভূতি ও আচরণ থেকে রক্ষা করবে। যার শৈশব ও যৌবনের অনুরূপ স্মৃতি আছে, সে নিজের প্রতি এবং মানুষের প্রতি উচ্চ দায়িত্ব বোধের অধিকারী। মানুষের সঙ্গে একতার মহামূল্যবান অনুভূতিটি জন্ম লাভ করে যৌথ কাজে, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসের অভিন্নতায়। এবং যে-দুঃখের ভাগী হওয়া যায় তাতে। বিপদে-আপদে সাথীত্ব কেবল পরীক্ষিতই হয় না, সুদৃঢ়ও হয়ে উঠে।

নির্বিঘ্ন শৈশব... কিছু শিক্ষক এবং অনেক মা-বাবা ছেলেমেয়েদের জন্য এরূপ স্বর্গরাজ্য গড়ার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু বাস্তবে তা কি সম্ভব এবং শিশুদের তাতে প্রয়োজন আছে কি? আমরা যখন শিশুকে সযত্নে পরের দুঃখ থেকে দূরে সরিয়ে রাখি, তখন তার উপর কি স্বার্থপরতার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে না? সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক কাজ ও সবচেয়ে মজার মজার খেলা কি শিশুকে আবেগগত বধিরতা থেকে রক্ষা করতে পারবে, যদি সেই কাজ ও খেলা চলে কৃত্রিম নির্মেঘ আকাশের তলে? আর বীর ও শহীদদের সম্পর্কে বড় বড় কথা, — যে-শিশুকে বন্ধু, ভাই, মা ও বাবার দুঃখ বিস্মৃত হতে বাধ্য করা হয়েছে তার মুখে ওই কথাগুলো ধৃষ্টোক্তির মতো শোনাবে না?

আপনারা কি কখনও অপমানিত দাদ্ব-দিদিমাদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন?

আমরা পেয়েছি। এবং বহ্ব বার। শ্বনেছি নিজের বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের বির্বদ্ধে তাঁদের দ্বঃখভরা নালিশ: ওরা সন্তান লালনপালনের ব্যাপারে কিছ্বই ব্বঝে না, অথচ বড় বড় কথা বলে খ্বব... না জানি কী চায়...

— ওরা ভাবে, নিজের বাচ্চাটাকে বিশেষ ধরনে মান্বষ করছে। সেই জন্মের পর থেকেই আত্মনির্ভরতার কথা বলে আসছে: 'মা, ওর কাছে যেও না! ওকে কোলে নিও না! বাচ্চা নিজে নিজে ঘ্বমাতে শিখ্বক!.. স্কুলের পড়া তৈরি করতে সাহায্য কোরো না! নিজে নিজে পড়া তৈরি করতে শিখ্বক! ওর কাপ-প্লেট তোমার ধোওয়ার দরকার নেই। খাওয়ার পর নিজেই নিজের বাসন ধ্ববে...' নিজে, নিজে, নিজে... তা তোরা কি নিজেই সবকিছ্ব করতি? সব ব্যাপারেই তোদের সাহায্য করতে হত।

আর বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা বলে:

— মা আমাদের অবশ্যই বাঁচাচ্ছেন। তিনি সব সময় বাচ্চাগ্বলোর সঙ্গে, তাঁর কল্যাণে আমরা চাকরিও করতে পারছি, সময় সময় সিনেমা দেখতেও চলে যাই। তবে তিনি ওলিয়াকে ভীষণ লাই দেন! মেয়েটিকে গল্প না বললে খায় না, ঘ্বমায় না, নিজে কিছ্বই করতে পারে না। আমরা ওকে কোনকিছ্ব শেখাতে চেষ্টা করলে মা রাগ করেন। অথচ মেয়েটি বেশি আদর পেয়ে পেয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, একেবারে নিষ্কর্মা হয়ে উঠছে — পরে ওকে নিয়ে আমরাই যে বিপদে পড়ব! আমরা বলি, অন্বরোধ করি — মা, তুমি অন্তত একটি বার আমাদের কথা শোনো, আজকাল অন্যভাবে ছেলেমেয়ে মান্বষ করা হয়, কিন্তু উনি আমাদের কথায় কানই দেন না। কিছ্ব দিন পরেই ওলিয়া কিন্ডারগার্টেনে যাবে, অথচ এখনও ও নিজে খেতে জানে না, জামাকাপড় পরতে ও ছাড়তে পারে না...

এর্বপ পরিবার কমই আছে যেখানে সন্তান লালনপালনের প্রশ্নে প্রের্ণ ঐকমত্য বিরাজ করে। সর্বদাই সংঘর্ষ বাধে একটি ব্যাপারকে কেন্দ্র করে: জোয়ান মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের প্রতি কঠোর, আর দাদ্ব-দিদিমারা — স্নেহশীল, সমস্ত আবদার মানেন এবং সবকিছ্বতে নাতি-নাতনীদের 'প্রশ্রয় দেন'।

এই বিরোধটি কি মীমাংসার যোগ্য? ছেলেমেয়েদের উপর তা কীর্বপ প্রভাব ফেলে?

বলাই বাহুল্য, প্রতিটি পরিবার — এ হচ্ছে এক-একটি পৃথিবী, তাতে আছে নিজস্ব নিয়ম, নিজস্ব ঐতিহ্য, নিজস্ব সমস্যা, এবং এমন কোন পরামর্শ দেওয়া সম্ভব নয় যা পুরোপুরিভাবে সবার কাজে লাগতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ নিয়ে একটু আলোচনা করতে ক্ষতি নেই।

সর্বাগ্রে মা-বাবারাই সন্তান লালনপালনের দায়িত্ব বহন করেন। তাঁরা শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য, শিক্ষাদীক্ষার জন্য, আচরণের জন্য দায়ী। আধুনিক পরিবারের মতো জটিল এক সংগঠনে দাদু ও দিদিমাদের — তাঁদের যতই অভিজ্ঞতা থাকুক না কেন — বোধ হয় কেবল পরামর্শ দানেরই অধিকার আছে, নির্ধারিক ভোট দানের অধিকার নেই।

আমাদের মনে হয়, বাচ্চাদের প্রতি ভালোবাসা তাঁদের আচরণের এমন একটা ধারা খুঁজে পেতে সাহায্য করবে যা মা-বাবাদের সন্তুষ্ট করতে পারে।

সত্যিই, জোয়ান মা-বাবারা চান, তাঁদের সন্তান যেন অল্প বয়সে স্বনির্ভর হয়ে উঠে, তাহলে তাঁদেরই সুবিধা হয় এবং ভবিষ্যতে তা খোদ শিশুর জন্যও হিতকর হবে। ছোট্ট মানুষটি যত আগে নিজেই নিজের দেখাশোনা করতে শিখবে, যত আগে সে বুঝতে পারবে যে শৃঙ্খলা মেনে চললে সময় বাঁচে, শিশুদের মা-বাবাদের সঙ্গে বাস করতে ততই সহজ হবে।

তাই তত্ত্বগত দিক থেকে তরুণ মা-বাবারা উচিত কাজই করেন এবং নিজের ছেলেমেয়েদের স্বাবলম্বী করে তোলার প্রচেষ্টায় তাঁরা কালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলেন।

কিন্তু আসল মুশকিল হচ্ছে এই যে শিশুকে দিয়ে নিয়মিতভাবে — এক দিন বা এক সকালে খেলাচ্ছলে নয় — নির্দিষ্ট কাজ করানোর চেয়ে তার হয়ে সমস্তকিছু করা বস্তুত পক্ষে ঢের সহজ।

জোয়ান মা-বাবারা যা চান, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা হয়তো ঠিকই; কিন্তু অসম্ভব কঠিন! মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে কঠিন। যদি ধরা যায় যে মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 'ঘনিষ্ঠভাবে' মেলামেশা করেন কেবল ছুটির দিনে এবং কাজের পরে, — ওই সময়ও তাঁরা হাজার কাজে ব্যস্ত থাকেন, এবং মা-বাবারা এমনকি বাড়িতে থাকলেও দাদু-দিদিমারাই শিশুদের দেখাশোনা করেন, — তাহলে সহজেই বোঝা যাবে, দাদু ও দিদিমাদের ওই দায়িত্বটি পালন করতে কত কষ্টই হয়।

তরুণ মা-বাবারা যখন নিজেদের মা-বাবার বিরুদ্ধে, তাঁদের 'সেকেলে' লালনপালন পদ্ধতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তখন তাঁরা একটি জিনিস

ভুলে যান: যদি তাঁরা নিজেরা ছেলেমেয়েদের — এবং কেবল ছেলেমেয়েদের! — নিয়ে থাকতেন, তাহলে তাঁরাও যে-সমস্ত ভুলভ্রান্তি নিয়ে অভিযোগ করছেন তার অনেকগুলোই এড়াতে পারতেন না। তাঁদের ধৈর্যে ও স্থৈর্যে কুলাত না, এবং যে-স্বয়ংক্রিয়তা অর্জনের জন্য আমরা বহু বছর ব্যয় করি তা সঙ্গে সঙ্গে গড়ে তোলার পক্ষে দু'-তিন বার বলাই যথেষ্ট এই ভেবে তাঁরা শিশুদের কেবল বিরক্তই করতেন। মারধর আর চেঁচামেচি শুরু করতেন...

চেষ্টা করা উচিত যাতে ছেলেমেয়েরা গুরুজনদের মতভেদ দেখতে ও অনুভব করতে না পারে — অন্যথায় তারা খুব তাড়াতাড়ি সে মতভেদের সুযোগ নেবে:

— আমি তোকে হাজার বার বলেছি, তোর ওখানে যাওয়া বারণ!

— কিন্তু দিদিমা তো কখনও বারণ করেন না!

তদুপরি বাড়িতে দু'টি 'সম্প্রদায়ের' মধ্যে সংঘর্ষ লক্ষ্য করে চতুর শিশুরাও 'সামরিক ক্রিয়াকলাপে' অংশ নেওয়ার সুযোগ ছাড়বে না, তারা জানে যে এ থেকে কিছুটা মুনাফা উঠাতে পারবে। সেই জন্যই শিশুর উপস্থিতিতে কোনরূপ প্রশিক্ষণমূলক সংগ্রাম থেকে বিরত থাকা উচিত। শিশুর জানা থাকা উচিত যে কোন গুরুজন যদি তাকে কোনকিছু বলেন তাহলে বাকীরাও তা সমর্থন করবেন (পরে নিরালায় নিজেদের মধ্যে নির্দেশের যথাযথতা সম্পর্কে বড়রা তর্কও করতে পারেন!)।

দাদু-দিদিমার প্রতি ব্যবহার ভদ্র হতে হবে। আপনি যদি ছেলের উপস্থিতিতে (এবং এমনকি অনুপস্থিতিতেও) নিজের মা বা বাবার উপর গলা চড়ান, তাহলে মনে রাখবেন যে কোন একদিন আপনার ছেলেও আপনার উপর গলা চড়াবে। ছেলেমেয়েদের শিষ্টাচার শেখানোর একটি মাত্র উপায় আছে, এবং তা হল — প্রথমে নিজেদের শিষ্ট হতে হবে।

সময় সময় এরূপ কথাও শোনা যায়: 'আপনি যদি চান যে আপনার ছেলেমেয়েরা সভ্য ও মার্জিত হোক তাহলে ওদের দাদু-দিদিমার পাশ ঘেঁষতে দেবেন না।'

তা ঠিক নয়। বার্ধক্যের আছে নিজস্ব সৌন্দর্য, জীবন সায়াহ্নে মানুষ নম্র ও উদার হয়ে উঠে, এবং শিশুদের ওই মানবীয় ও মহৎ প্রভাব থেকে বঞ্চিত করা নিতান্তই অন্যায় ও অমানবিক। এটাও মনে রাখা উচিত যে তখন খোদ দাদু-দিদিমাদের জন্য নাতি-নাতনীরা হয়ে উঠে তাঁদের জীবনের অর্থ এবং বার্ধক্যের অলঙ্কার।

আমরা মনে করি যে পিতামাতার আচরণ মার্জিত হলে দাদু-দিদিমারা নবীন পরিবারের মঙ্গলে অনেককিছু করতে পারেন। তবে আসল কথা হচ্ছে — দাদু-দিদিমারা যেন বোঝেন যে তাঁরা অন্য এক সময় মা-বাবা ছিলেন এবং যেভাবে পেরেছেন সেই ভাবে এই ভূমিকাটি পালন করেছেন, তবে এবার — তাঁদের সন্তানদের পালা। নাতি-নাতনীদের লালনপালনের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা যায় (এবং উচিতও!), তর্কও করা সম্ভব এবং তর্কে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থনও করা যেতে পারে, তবে সর্বদা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকবে কেবল মা-বাবাদেরই। তা মানতেই হবে!

শৈশবের পরে...

— আচ্ছা, এই হচ্ছে ব্যাপার! তাহলে তুই কোথাও যেতে পারবি না!

— আমি যাবই!

— তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস? আমি যখন বারণ করছি, তখন তোর যাওয়া হবে না!

— তোমার বারণে আমার কিছু এসে যায় না!

ধড়াম করে দরজাটি বন্ধ হতেই কথা কাটাকাটি শেষ হয়ে গেল।

বিক্ষুব্ধ সাশা দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে রাস্তা ধরে বেগে ছুটতে লাগল।

'ঘৃণা করি! এ সব ঘৃণা করি! আমি এখন আর ছোট্ট বাচ্চা নই যে আমাকে মর্জি মাফিক হুকুম দেওয়া যাবে! ক্লাসের সবাই পিকনিকে যাচ্ছে, এবং সবাই একসঙ্গে ফিরবে। কেবল আমাকেই পাঁচটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে বলা হচ্ছে। তার মানে, আমায় একা ফিরতে হবে? কেন? আমি যদি একটু দেরি করে সবার সঙ্গে আসি, তাহলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? বাবা স্রেফ নিজের ক্ষমতা দেখাতে ও আমায় হীন করতে চায়! সব সময়ই তাই! আমি যদি সত্যিই দোষ করি — তাহলে কী হবে? আমায় কি মেরে ফেলবে? বাবা বুঝতেই পারছে না যে আমার আর সেই বয়স নেই যখন আমার উপর জোর খাটানো যেত!'

...বাবা ভীষণ ক্রোধে টেবিলে ঘুষি মারেন এবং অপলক দৃষ্টিতে এক দিকে তাকিয়ে ভাবেন:

'বাঁদরটার আস্পর্ধা তো কম নয়! ছেলে নয়, সাপ পুষছি! কিছু

বললেই ফোঁস ফোঁস করে! ও ভাবে, বেশি বোঝে! দশ বছরে যা, পনেরো বছরেও তা! কিন্তু এমনটা কেন হল? কী ছিল!'

ছিল ভালোবাসা। সাশা তখনও কথা বলতে পারত না। তাকে পেরাম্বুলেটারে ক'রে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হত। বাপকে দেখলেই সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করত। এর মানে ছিল এই যে এবার পেরাম্বুলেটার চালাবেন বাবা। বাবা চলে গেলে সে কে'দে কে'দে একেবারে অস্থির হয়ে যেত।

— বাবা! — সাশার মুখে উচ্চারিত প্রথম তিনটি শব্দের মধ্যে এটি ছিল একটি এবং সে অনতিবিলম্বেই শব্দটাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার প্রতিশব্দে পরিণত করে।

ছিল বন্ধুত্ব। ছুটির দিন পরিণত হত উৎসবের দিনে।

— কী রে, কাল স্কি করতে যাব? — আগের দিন বলতেন বাবা। আর ছেলে গভীর রাত অবধি জেগে স্কিগুলো ঝেড়ে মুছে তেল লাগিয়ে প্রস্তুত করে রাখত।

রবিবার সকালে তুষার-ভরা পার্কে স্কি খেলোয়াড়দের মধ্যে আরও দু'জন লোককে দেখা যেত — একজন লম্বা, বলিষ্ঠ, নীল পোশাক পরিহিত, অন্যজন ছোট, তার লাল পোশাকে শাদা শাদা ডোরা। উভয়ই অক্লান্ত ও নির্ভীক।

— নামব? — খাড়া টিলাটির উপর দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করতেন বাবা।

— নামব! — জবাব দিত ছেলে, এবং তার জবাবে কেউ-ই আত্মপ্রত্যয়হীনতা লক্ষ্য করতে পারত না, যদিও টিলাটি দেখে মনে মনে তার ভীষণ ভয় হত। কিন্তু বাবার সামনে কি নিজেকে কাপুরুষ প্রতিপন্ন করা যায়? কিছুতেই না! বাবা কী শিখিয়েছেন? স্কির উপর হাঁটুগুলো সামান্য ভেঙে দাঁড়িয়ে লাঠিগুলো পেছনের দিকে রাখতে হয়। বাঃ, চমৎকার নামল তো!

— সাবাস! — চে'চিয়ে উঠতেন বাবা। সাশা সুখে নিশ্বাস ফেলত। আর সে যদি পড়ে যেত, তাহলে পিঠচাপড়ানির সুরে বলতেন: 'কিছু হয় নি তো? তাহলে উঠে পড়! শুয়ে থেকে লাভ নেই!'

ছিল শ্রদ্ধা। বাবার কাছে সাশা যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাহিনী শুনত, তখন তার মন গর্বে ভরে উঠত। সে মনোযোগ দিয়ে বাবার গল্প শুনত, আনন্দিত হত ও যন্ত্রণা ভোগ করত, সময় সময় বাবার প্রশস্ত

ও বলিষ্ঠ হাতটি জড়িয়ে ধরত এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে দুঃসময় এখন চলে গেছে! বাবা এখানে, পাশেই রয়েছেন!

ছিল বাধ্যতা।

—আমি যেভাবে বলছি সেভাবে কোর!

মাঝেমধ্যে ছেলে আপত্তি করত। তবে তার আপত্তি ছিল যুক্তিসঙ্গত:

— বাবা, ওটা করতে আমার ইচ্ছে করছে না...

— সে আবার কী কথা! যা বলছি তা কোর!

এবং হঠাৎ — ছেলের দৃষ্টিতে, কণ্ঠে ও কথায় বিক্ষোভ, খোলাখুলি বিরোধিতা। যেন কোন এক কু-শক্তি তাঁদের সম্পর্কে ফাটল ধরিয়েছে। গোড়ার দিকে বাবা ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত হতেন: কী হল? তিনি সহজাতিকভাবে নিজের ক্ষমতার, নিজের পৃষ্ঠপোষকতার শক্তি বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করলেন — তা-ই এত বছর ছেলেকে বাধ্য রেখেছে। কিন্তু বাবা বুঝতে পারলেন যে তাতে ছেলে আরও বেশি দূরে সরে পড়ছে। তখন বাবা দিশেহারা হয়ে পড়লেন এবং অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেকে সমস্ত দায়িত্ব থেকে রেহাই দিলেন। এবার যা-ই ঘটুক না কেন অন্তত বলা যাবে: 'আমার কথা শুনতে চায় নি। ওরই দোষ!'

এই পরিবারটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে ওই সময়, যখন বাবা এবং সাশার মধ্যে 'যুদ্ধ-বিরতির' পর্ব চলছিল: তীব্র শত্রুতার ফাঁকে ফাঁকে পারস্পরিক উদাসীনতার পর্বও আসত। শত্রুতার সময় যেকোন ব্যাপারে বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি আর অশান্তি লেগেই থাকত। আর উদাসীনতার পর্বে বিরাজ করত বিষণ্ণ নীরবতা। মা উত্তেজনা প্রশমিত করতে চেষ্টা করতেন, কিন্তু ব্যর্থ হতেন। পিতার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে পারে সেই ভয়ে তাঁকে কোন দোষ দিতে পারতেন না, আর ছেলেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে গেলে বাবা ক্ষেপে যেতেন: 'হয়েছে, তোমার আর ওর পক্ষ নিতে হবে না!'

— একসঙ্গে একবার বসলেই হল: সামান্য সামান্য ব্যাপারে হয় ঝগড়া করবে, নয় চুপ করে বসে থাকবে! — ক্লান্ত কণ্ঠে অভিযোগ করেন স্ত্রী ওলগা ভিক্তরোভনা। — সে এক ট্র্যাজেডি!

এখনও ট্র্যাজেডি নয়! একেবারে নৈরাশ্যজনক ও সংশোধনাতীত কোনকিছু ঘটে নি। তবে তা ঘটতে পারে, যদি ব্যাখ্যাতীত পারিবারিক বিবাদ-বিসংবাদ এই কিছুকাল আগেও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ পিতা ও পুত্রকে পুরোপুরিভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

এমনও ঘটে থাকে: ছেলে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। বহু বছর বাদেও

প্রাপ্তবয়স্ক স্বনির্ভর লোকটি সযত্নে বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়িয়ে চলে। আর বৃদ্ধ বাপও আগের মতোই অপমানিত ও বিস্মিত: কী হল?

— কী হল? — আমিও জিজ্ঞেস করি।

ছেলে কেবল কাঁধ ঝাঁকাল।

চরিত্রে এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে মিলে নি!

বয়ঃপ্রাপ্ত লোকেদের চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি স্বভাবতই যথেষ্ট স্থির এবং সে স্থিরতা অনিবার্যরূপে প্রকাশ পায় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কে।

— প্রথমে শ্রদ্ধার যোগ্য হতে হয়! — গুরুত্ব সহকারে বলেন পিতা আলেক্সেই পেত্রভিচ। — আর সাশা এখনও শ্রদ্ধা লাভের যোগ্য হয় নি।

— কে তার অপমান করছে?! আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই! — রেগে যান আলেক্সেই পেত্রভিচ।

আর সাশা পথ চলতে চলতে স্মরণ করে:

— আমার ঘরে গ্রিশা আর লেনা বসে ছিল। এমন সময় বাবা ঘরে ঢুকেই শুরু করলেন: 'তোরা ওর ঝাঁকড়া চুলগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছিস?! চেহারাটা দেখতে কার মতো হয়েছে! ভূত একটা! তোরাও তো একটু বলে-কয়ে ওকে সেলুনে নিয়ে যেতে পারিস! এরূপ চেহারা নিয়ে চলা সমাজকে উপেক্ষা করার শামিল!'

— আমি তো ওর ভালোর জন্যই বলছি! আমি ওরই মঙ্গল চাই! — বলে যান আলেক্সেই পেত্রভিচ। — আসল ব্যাপার কি আমার সুরে? আপদ কি আর আমার কথার ধরনে?

হ্যাঁ, তাতেও। তবে অবশ্য একমাত্র তাতেই নয়। যে-প্রাত্যহিক অভিভাবকত্ব শৈশবে অনুমোদিত ও অপরিহার্য, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলে তা বিশেষ কাজ দেয় না, বরং তা তাদের উত্ত্যক্ত করে তুলে। এমনকি তাদের যদি কেবল মনেও হয় যে তারা বড় হয়ে গেছে সে ক্ষেত্রেও এরূপ অভিভাবকত্ব বিরক্তিকর। তা তাদের সতর্ক করে দেয়: প্রতিটি পদক্ষেপের দিকে নজর রাখছে — তার মানে বিশ্বাস করে না; সব সময় সাহায্য করতে চায় — তার মানে আমার শক্তিতে সন্দেহ আছে; সর্বদা জ্ঞান দিচ্ছে — তার মানে ভাবে যে আমি স্বনির্ভরতা লাভে সক্ষম নই। তরুণরা সহজে ক্রুদ্ধ হয় এবং তারা হামেশা চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

আমরা অবশ্য জানি যে এরূপ সিদ্ধান্ত কত অমূলক। কিন্তু ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কে সর্বদা একই পন্থা অনুসরণের অভ্যাস, এবং তা পরিত্যাগের অনিচ্ছা বা অক্ষমতা ক্ষতিসাধন করতে পারে।

অটলতা? হ্যাঁ, যদি ন্যায়নিষ্ঠতা, সততা এবং শ্রমের প্রতি সম্পর্কের ব্যাপার হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই অটল থাকতে হবে। মামুলি ব্যাপারাদিতে গা না করা? অবশ্যই, যদি তাতে কোনভাবে কিশোরের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বিকাশ লাভ করে তাহলে গা না করাই ভালো। নিজেরাই বুঝতে পারছেন, মদ্যপান ও ধূমপানকে এখানে মামুলি ব্যাপারাদির মধ্যে ধরা হচ্ছে না। যেমন, সাশার 'ঝাঁকড়া চুলের' কথাই বলি। ধরা যাক, ছেলের লম্বা চুল বাপের পছন্দ হচ্ছে না। তাঁর হাতে একাধিক উপায় আছে: তিনি ছেলেকে চুলগুলো কাটতে বলতে পারেন, পরিবারের গণ্ডিতে (হ্যাঁ, একমাত্র পরিবারের গণ্ডিতে!) তার 'জংলী' চেহারা নিয়ে হাসাহাসি করতে পারেন। তাতে কোন আপত্তি নেই! কিন্তু লম্বা চুলের জন্য বন্ধুবান্ধবদের সামনে ছেলেকে লজ্জা দেওয়া — তা নিতান্তই অনুচিত।

আমাদের ছেলেমেয়েদের আমরা পুরোপুরিভাবে বুঝতে চেষ্টা করি। বুঝতে পারলে খুবই সুখের কথা। আর না পারলে, সময় সময় তাদের বিশ্বাস করা উচিত।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে মা-বাবারাও বড় হন; হ্যাঁ বড় হন, বৃদ্ধ হন না। বড় হওয়া উচিতও, তাহলেই সেই সময়ের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানো সম্ভব হবে যখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়ন শুরু হয়।

'তুমি আমায় ও রকম হতে বলছ, কিন্তু তুমি নিজে কী রকম লোক?' মা-বাবার ক্ষমতার প্রভাব শেষ হয়ে যায়। এবার কাজ করবে মানবীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাব। একমাত্র তা। আর তার মানে, এমন এক সময় এসেছে যখন সম্পর্ক পুনর্গঠন করতে হয়। নিজেকেও পুনর্গঠিত হতে হয়। সর্বদাই তাই ঘটে, এবং ওই সময় কোন মতেই হতবুদ্ধি হওয়া উচিত নয়।

যখন মা-বাবারা দায়ী

সবাই বলে যে শিশুরা হচ্ছে পরিবারের দর্পণ, এবং শিশুদের মধ্যে, তাদের সমস্ত ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও, প্রতিফলিত হয় পরিবারের চরিত্র।

পারিবারিক জগৎ... এ কেবল চার দেয়াল আর মস্তকোপরি ছাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোন জগৎ নয়। এ হচ্ছে প্রথম আনন্দ, প্রথম অপমান আর

প্রথম অনুভূতির জগৎ। এ হচ্ছে সেই জগৎ যেখানে আমরা ঘুমাই, পড়ি, কথা বলি, ভাবি, যেখান থেকে আমরা চলে যাই এবং যেখানে আমরা আবার ফিরে আসি। এ হচ্ছে সেই জগৎ, যেখানে বাস করেন মা-বাবা, ভাইবোন। পরিবার — সে হচ্ছে ক্ষুদ্র এক সমাজ। পারিবারিক জগতের মাধ্যমে জানা যায় বৃহৎ বিশ্বকে। জীবন বৈচিত্র্যময়, এবং শিশু তাতে ভালোমন্দ অনেককিছুই দেখতে পায়: মহত্ত্ব ও ঔদার্য, সূক্ষ্মানুভূতি ও নিঃসঙ্গতা, অশিষ্টতা ও অসভ্যতা...

মানুষের বিকাশ — সে এক জটিল ও শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া। এখানে খুঁটিনাটি বলতে কিছু নেই। এখানে সমস্তকিছুই গুরুত্বপূর্ণ, সমস্তকিছুই কোন-না-কোন ছাপ রেখে যায়। সামান্যতম ভুল হলেই মানুষ বিপথগামী হয়। যতই সময় যায়, জীবনে সুখকর ও আনন্দদায়ক সমস্তকিছু থেকে মানুষকে যে-খাদটি বিচ্ছিন্ন করে রাখে তা ততই গভীর হতে থাকে। এরূপ মানুষ সাধারণত নিজের অপকারিতা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করে, এবং তা তাকে বদরাগী ও অত্যন্ত নির্দয় করে তুলে।

যে-পরিবারে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থা আছে, লোকে খাটতে জানে ও ভালোবাসে, প্রত্যেকের দায়িত্ববোধ আছে, সেই পরিবারেই দৃঢ় প্রত্যয়ী মানুষ গড়ে উঠে যে নিজের ভালো কিংবা মন্দ সমস্ত কাজের জন্য 'নিজেই' দায়ী হয়।

দায়িত্ব — এ কোন সাধারণ ও বিমূর্ত ধারণা নয়। মানুষের দায়িত্ব থাকতে পারে নিজের প্রতি, নিজের বিবেকের প্রতি, নিজের পিতামাতার প্রতি। সমাজের প্রতি দায়িত্ব — সে হচ্ছে তাতে নির্ধারিত নিয়ম ও নীতিসমূহ অক্ষরে অক্ষরে পালন। তা লঙ্ঘন করলে নৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক কিংবা আইন-সঙ্গত ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়।

— তরুণ ছেলেমেয়েদের নির্দিষ্ট নৈতিক আদর্শ থাকা চাই — অন্যথায় তারা সহজেই সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে...

— মানুষ সারা জীবন 'সত্যের পথ' খোঁজে, নিজের জন্য সঠিক নৈতিক আদর্শ অনুসন্ধান করে। সমস্ত ব্যাপারে অসন্দিহান ব্যক্তির বিশ্বাস প্রায়ই সংশয়ের দ্বারা পরীক্ষিত বিশ্বাসের চেয়ে অধিকতর নড়বড়ে হয়ে থাকে...

এ বিষয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মা-বাবাদের কথা বলা উচিত কি? অবশ্যই উচিত।

আচরণের নিয়মসমূহের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে উঠতে হবে পরিবারেই।

এ ব্যাপারে শিশুর জন্য প্রথম শিক্ষক ও আদর্শ হচ্ছেন মা ও বাবা — নিজের কাজের প্রতি, প্রতিশ্রুতির প্রতি ও দায়দায়িত্বের প্রতি তাঁদের মনোভাব। পরিবারেই শিশুকে নীতিনিষ্ঠতা ও উচ্চ দায়িত্ববোধের শিক্ষা দান করতে হয়।

শিশুরা যখন ছোট, তখন তাদের অনেকটা সময় মা-বাবার সঙ্গে কাটে। ঠিক ওই সময়েই তাদের সরাসরিভাবে ও জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে এই জিনিসগুলো শেখানোর অনেক সুযোগ থাকে: রাস্তাঘাটে কীভাবে নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়, থিয়েটারে, প্রদর্শনীতে, বাসে-ট্রামে কীরূপ আচরণ করতে হয়, কীভাবে গাছপালা এবং জাতীয় সম্পদ রক্ষা করতে হয়, অসুস্থ ও বৃদ্ধ লোকেদের সাহায্য করতে হয়।

আমরা জানি যে মা-বাবার ভালোবাসার কোন তুলনা হয় না। মা-বাবার ভালোবাসা সন্তানকে উদার, স্নেহশীল ও অমায়িক করে তুলে। এই ভালোবাসা শিশুর মধ্যে মমতা ও মহত্ত্ব গড়ে তুলে। তবে সবচেয়ে স্নেহশীল মা-বাবাদেরও মাত্রাজ্ঞান থাকা উচিত, অন্যথায় বেশি আদর-যত্ন পেয়ে তাঁদের সন্তান সহজ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে, তার চাওয়ার শেষ থাকবে না এবং নিজের চাহিদা পূরণে সে কোন বাধানিষেধ মানবে না। তার জীবনের মূলমন্ত্র হবে: 'চাই! দাও!' আর এরূপ ছেলেমেয়েদের বাঞ্ছা অপূরণীয় হলে তারা অনেক সময় গায়ের জোরে তা পূরণ করায়। তারা নিজেদের ইচ্ছা পূরণের জন্য আইন ভঙ্গ করতেও প্রস্তুত।

সময় সময় বোঝা কঠিন, কী কারণে কিশোররা আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এটা ঠিক যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ হচ্ছে তত্ত্বাবধানহীনতার ফল। শিক্ষাদীক্ষা এবং তত্ত্বাবধান — দুটি বিভিন্ন জিনিস, যদিও তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষাদীক্ষা সর্বদা সক্রিয়, তবে এ জিনিসটাকে বিরক্তিকর অভিভাবকত্বে পরিণত করা উচিত নয়। বড়দের কর্তব্য হচ্ছে — শিশুর জীবনের প্রতি উদাসীন থাকা নয়, সে জীবনের প্রতি মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে নজর রাখা, এবং কেবল তখনই হস্তক্ষেপ করা যখন তার প্রয়োজন দেখা দেয়। এটাই হচ্ছে প্রশিক্ষণমূলক তত্ত্বাবধান। তাতে শিশুদের প্রয়োজন আছে। তারা জীবনের এমন বহু পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত নয় যেগুলোতে তাদের জন্য বিপদের সম্ভাবনা থাকে। কিশোরদের জন্য এই সমস্ত বিপদ ভয়ানক নয়, তবে তাদের জন্য অন্যান্য, অধিকতর জটিল বিপদ ওঁৎ পেতে থাকে: সময় সময় বয়োজ্যেষ্ঠ ছেলেদের সন্দেহজনক 'বীরত্ব' অনুকরণ, অ্যাডভেঞ্চারের বাসনা ইত্যাদি। কিশোরের

জীবনের দিকে নজর না রেখে গুরুজনরা কঠিন মুহূর্তে, জটিল পরিস্থিতিতে তাকে সময়োচিত সহায়তা দানের সুযোগ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেন। আর এ দিকে কিশোর নিজের উপর বড়দের নিয়ন্ত্রণ অনুভব না ক'রে 'মিথ্যা স্বাধীনতার' মোহে পড়ে। সে নিজের কাজ ও আচরণের জন্য কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। সে সহজেই পরের প্রভাবাধীন হয়। যেই কিশোর তার পথে এমন কোন লোকের সাক্ষাৎ পায় যে তাকে আগ্রহান্বিত করতে পারে, অমনি সে বদলাতে থাকে: সুবোধ ছেলে জেলে যায়, আর 'কঠিন', বখাটে, অমনোযোগী ছেলে লক্ষ্যনিষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়। আসল কথা হচ্ছে কে তাকে আগ্রহান্বিত ও প্রভাবিত করেছে।

তত্ত্বাবধানহীনতা ও 'মুক্ত জীবন' কেবল ছেলেমেয়েদের দৈনন্দিন জীবন ধারাই নষ্ট করে না, কেবল তাদের স্কুল থেকেই বিচ্ছিন্ন করে না, তাদের জাহান্নামের পথেও নিয়ে যায়, তাদের গুণ্ডা আর চোর বানিয়ে ছাড়ে। খোদ তত্ত্বাবধানহীনতা বিপজ্জনক তো বটেই, তবে তা আরও বেশি বিপজ্জনক এই জন্য যে কিছু কিছু কিশোর নৈতিক পঙ্গুতা নিয়ে জীবনের পথে পা দেয়।

মা-বাবারা প্রায়ই বলেন যে তাঁরা সর্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকেন। হ্যাঁ, সত্যিই আমাদের সময়ের অভাব আছে। কিন্তু কাজ তো করে সবাই, এবং তা সত্ত্বেও বেশির ভাগ পরিবারেই লোকে — এবং তা হয়তো কঠোর শৃঙ্খলা মানার কল্যাণেই — ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এমনভাবে তাদের সম্পর্ক গড়তে সক্ষম হয় যাতে মা-বাবার নির্ধারিত নিয়ম সম্মানিত ও পালিত হয়।

প্রায়শই তথাকথিত ব্যস্ততাকে আত্মসমর্থনের উপায় হিশেবে ব্যবহার করা হয়, এবং তা করা হয় সেখানে, যেখানে ছেলেমেয়েরা বড়দের জীবনে বাধা বলে গণ্য হয়।

...গতকাল ছেলেটি খারাপ ব্যবহার করেছে, অশ্লীল ভাষায় কথা বলেছে... আজ সকালে দিদিমার সঙ্গে রাগারাগি করেছে। কাল ছোটটির সঙ্গে ঝগড়া করবে, দুর্বলের গায়ে হাত তুলবে... বাড়িতে নিষ্ঠুর একটি লোক বেড়ে উঠছে যার কোন হিতাহিত জ্ঞান নেই। তা খুবই ভয়ঙ্কর।

আপনার সন্তানের মধ্যে যদি মন্দ কিছু — যেমন স্বার্থপরতা, আলসেমি, মিথ্যা কথা বলার প্রবণতা — লক্ষ্য করেন, তাহলে আশঙ্কার কারণ থাকা

উচিত। এরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থেকে নির্দয়তা অবধি দূরত্ব মাত্র এক পা। নির্দয়তা পরিণত হয় নিষ্ঠুরতায়।

সোভিয়েত আইন মা-বাবার উপর ছেলেমেয়ে মানুষ করার দায়িত্ব অর্পণ করে। দায়িত্ববোধ মা-বাবাদের সময় মতো অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদের পরামর্শ নিতে ও প্রশিক্ষণমূলক সাহিত্য পড়তে বাধ্য করে।

ছেলেমেয়েরা যত বড় হয়, তাদের জ্ঞান, যোগাযোগ ও পরিচয়ের পরিধিও তত বেশি বিস্তার লাভ করে, এবং তা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। 'ছোট ছেলেমেয়ে — ছোট চিন্তা, বড় ছেলেমেয়ে — বড় চিন্তা,' — প্রবচনটি যে কত সত্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

ছেলেমেয়েদের স্বার্থ সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে এবং তাদের শিক্ষকশিক্ষিকা, বন্ধুবান্ধব ও বন্ধুবান্ধবদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিলে মা-বাবারা সর্বদা তাঁদের সন্তানের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারেন। এ ব্যাপারে সহায়তা করবে নিজস্ব পরিবারে মৈত্রী ও আস্থার পরিবেশ, শিশুকাল থেকে গড়ে তোলা অভ্যাস — নিয়মশৃঙ্খলা মানার অভ্যাস। আন্তন মাকারেঙ্কো বলেছেন: '...ছেলে বা মেয়ে যদি যখন ইচ্ছা ঘুমাতে যায় ও শয্যা ত্যাগ করে, যদি রাত্রিবেলা তারা যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়, কিংবা রাত কাটায় 'বন্ধু' অথবা 'বান্ধবীর' বাড়িতে যাদের ঠিকানা ও পারিবারিক অবস্থা আমাদের অজ্ঞাত, এমতাবস্থায় শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে কোন কথাই উঠতে পারে না। একেবারে অল্প বয়স থেকেই ছেলেমেয়েদের সঠিক সময় এবং আচরণের সঠিক সীমা সম্পর্কে সচেতন করে তোল্য উচিত...' মহান শিক্ষাবিদের এই সতর্কবাণীটি মা-বাবাদের ভুললে চলবে না।

আমরা ছেলেমেয়েদের ভুলভ্রান্তি থেকে রক্ষা করতে চাই। তাদের চারিপাশে এমন প্রাচীর গড়ে তুলতে চাই যার ভেতর দিয়ে অন্যায় ও অবিচার প্রবেশ করতে পারবে না। সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের জীবনটি প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ভালোবাসার সঙ্গে সুসংগঠিত করে দিতে চাই। এ হচ্ছে পিতামাতার স্বাভাবিক প্রয়াস। তা করা কি সম্ভব? প্রয়োজন আছে কি? অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব, তবে সব ক্ষেত্রে নয়।

প্রত্যেকে নিজের মতো ক'রে জীবনের সংস্পর্শে আসে। তা এড়ানোর কোন উপায় নেই। এখানে থাকতে পারে অবমাননা, অকৃতকার্যতা, হতাশা। কাউকে কাউকে তা ঘোড়ার উপর থেকে মাটিতে ফেলে দেয়, একেবারে হতোদ্যম করে দেয়। ১৮-২০ বছর বয়সেই তারা অপমানিত, হতাশাগ্রস্ত,

খিটখিটে বৃদ্ধদের মতো আচরণ করে। অন্যদের অকৃতকার্যতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে, মনোবল জোগায়, সাহসী হতে শেখায় এবং মানুষের মতো মানুষ করে তুলে। এই ধরনের লোকেরা জীবনে বাধাবিপত্তিকে ভয় করে না। তারা নির্ভীক। তারা অটল। পরিবারেই তাদের এভাবে মানুষ করেছে।

আমাদের ছেলেমেয়েরা — আমাদের ভবিষ্যৎ। আমাদের আগামী দিনের জন্য আজ সর্বাগ্রে আমরাই দায়ী।

তৃতীয় অধ্যায়

যৌবন

আমাদের ছেলেমেয়েরা সাবালক হয়ে উঠছে

শতাব্দীর ছেলেমেয়ে। তারা কী রকম, আমাদের ছেলেমেয়েরা?

বলা যেতে পারে — বুদ্ধিমান, নিপুণ, লক্ষ্যনিষ্ঠ, পরিশ্রমী, অনেককিছু জানে, বোঝে ও পারে। এবং তা বললে সত্যের অপলাপ হবে না।

বলা যেতে পারে — একরোখা, আত্মাভিমানী, স্পর্শকাতর, অবাধ্য, জেদী, দামাল, অবিবেচিত কাজের দিকে তাদের ঝোঁক থাকে, তারা সহজেই দুঃখ পায় এবং সর্বদাই বড়দের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। এবং এটাও সত্যি কথা।

কারণ, তারা বিভিন্ন রকমের, সব সময় বদলাচ্ছে, প্রতি দিন নিজেদের সবেমাত্র গঠনরত অদৃঢ় চরিত্রগুলোর নতুন নতুন দিক আবিষ্কার করছে।

এই দ্রুত বিকাশমান বংশধরদের মধ্যে সমস্তকিছু আমাদের মনঃপূত নয়। তারা যেন আমাদের ফিরিয়ে দেয় আমাদেরই অতীতের ভুলগুলো, বেঠিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলো, তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো, অবিবেচিত শিক্ষা পদ্ধতিগুলো — মানুষ হচ্ছে আমাদের শিক্ষাদীক্ষার ফল, এবং ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিবর্তনের অনেক আগে তারা নিজেরাই মা-বাবা হয়ে যায়। তবে এই সমস্ত ভুলভ্রান্তির জন্য কেবল শিক্ষাদানকারীরাই দায়ী নন। নিজের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য খোদ তরুণরাও যথেষ্ট দায়ী। এবং আমরা তাদের কাছে হাজির করি কঠোর দাবি, কেননা আমরা তাদের হাতে তুলে দিই ঐতিহ্যের অনির্বাণ অগ্নিশিক্ষা এবং আমাদের করা সবকিছু।

আমাদের সাবালক ছেলেমেয়েদের কীভাবে বোঝা যায়? কীভাবে তাদের বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব?

তারা নিজেদের কীরূপ দেখে?

কৈশোর ও যৌবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে — আত্মচেতনার বিকাশ, নিজের 'অহং' আবিষ্কার। নিজের প্রতি কিশোরের আগ্রহ বর্ধিত হয় যৌন পরিণতির প্রক্রিয়াসমূহের দ্বারা এবং তার সঙ্গে জড়িত মনস্তাত্ত্বিক-শারীরিক পরিবর্তনসমূহের দ্বারা।

যৌবনের শুরুতে মেলামেশা ও ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র দ্রুত প্রসারিত ও পুনর্গঠিত হয়। শিশুর জন্য তথ্য, প্রভাব ও আবেগগত সমর্থন লাভের প্রধান উৎস সাধারণত মা-বাবা ও অন্যান্য গুরুজনরা। বড় হয়ে শিশু ধীরে ধীরে বড়দের উপর নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক পুনর্গঠিত করতে থাকে।

যৌবন — সে হচ্ছে এমন এক সময় যখন মানুষ শৈশবকে বিদায় জানায়, অথচ তখনও সে পুরোপুরি যুবক নয়। কিশোর এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে: সে কে, তার কী মূল্য আছে, সে কী করতে সক্ষম, তার বাস্তব ও সম্ভাব্য সঙ্গীতি কীরূপ। আত্মমূল্যায়নের উপায় আছে দু'টি। প্রথমটি হচ্ছে — অর্জিত ফলের সঙ্গে নিজের দাবি-দাওয়ার মানের তুলনা করা। কঠিন পরিস্থিতিতে আমি হাল ছেড়ে দিই নি, — তার মানে আমি কাপুরুষ নই; কঠিন কাজে হাত দিয়ে আমি সে কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছি, — তার মানে আমার দক্ষতা আছে এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে সমস্ত গুণ অনুরূপ উপায়ে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করা যায় না। তাছাড়া কিশোরের জীবনের অভিজ্ঞতার স্বল্পতা এরূপ পরীক্ষামূলক যাচাই কর্মে বাধা দেয়। বড়দের দৃষ্টিতে বিপজ্জনক দুষ্টুমি, বেপরোয়াই ও এমনকি গুণ্ডামির মতো বহু অযৌক্তিক কাজের মাধ্যমে কিশোর কেবল অন্যদের চোখে বিশিষ্টই হতে চায় না, কেবল সমবয়সীদের কাছে জনপ্রিয়তাই অর্জন করতে চায় না, — যদিও সেটাও অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে বেশির ভাগ সময় সে নিজের দৃঢ়তা, সাহসিকতা আর নির্ভীকতাও পরীক্ষা করতে চায়। আত্মমূল্যায়নের দ্বিতীয় উপায়টি হচ্ছে — নিজের সম্পর্কে চারিপাশের লোকজনের মতামত তুলনা। 'অহং' সম্পর্কে শিশুর ধারণা

প্রায় পুরোপুরিভাবে গড়ে উঠে বাইরের লোকেদের মতামতের ভিত্তিতে। যে-কিশোর নিজের সম্পর্কে মানুষের মতামতের প্রতি সংবেদনশীল, সে অচিরেই লক্ষ্য করে যে কেবল বিভিন্ন লোকের ব্যক্তিগত মূল্যায়নই নয়, সেই মূল্যায়নের খোদ মানদণ্ডও বিভিন্ন রকমের। তা তাকে নির্বাচন, পরীক্ষা ও স্বনির্ভর চিন্তাভাবনার পথে চালিত করে।

স্বনির্ভরতা হচ্ছে — বাইরের শাসন থেকে স্বায়ত্তশাসনে উৎক্রমণ। যেকোন শাসন শাসনাধীন ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য ও সংবাদ দাবি করে। কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের পরিস্থিতিতে সেটা হচ্ছে মানুষের নিজের সম্পর্কে নিজেরই তথ্য, অর্থাৎ আত্মচেতনা।

— আত্মবিশ্লেষণ অনেক প্রতিভাবান মানুষের জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে। তা মানুষের মধ্যে সক্রিয়তা ও দক্ষতায় অচলতা এনে দেয়। আত্মবিশ্লেষণ — এক ব্যাধি। শিশুর মধ্যে এই ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম করা উচিত।

— কিন্তু আত্মবিশ্লেষণ ব্যতিরেকে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব কি? আমি যদি জানি না, আমার মধ্যে খারাপ কী আছে, তাহলে আমি ভালো হতে পারব কী ক'রে? যদি নিজের কাজ, আচরণ ও তার হেতু বিশ্লেষণ করতে জানি না? না, সুকর্মের প্রতি যার প্রবণতা আছে, তার নিজের কাজ ও আচরণ বিশ্লেষণ করতে পারা চাই। এ হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশের অপরিহার্য শর্ত।

প্রথম যৌবনের প্রধান মনস্তাত্ত্বিক উপার্জনটি হচ্ছে — নিজের অন্তর্জগৎ আবিষ্কার। নিজের অন্তর্জগৎ আবিষ্কার — সে হচ্ছে অতি গুরুত্বপূর্ণ, আনন্দদায়ক ও চাঞ্চল্যকর এক ঘটনা, তবে তা অনেক আশঙ্কাজনক আর নাটকীয় অনুভূতিরও উদ্রেক করে। সর্বাগ্রে দেখা দেয় অভ্যন্তরীণ 'অহং' এবং আচরণের সমস্যা।

নিজের অদ্বিতীয়তা, অতুলনীয়তা ও অন্যের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যের চেতনার সঙ্গে সঙ্গে নিঃসঙ্গতা বোধও আসে। তারুণ্যের 'অহং' তখনও অতি অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট, সম্পৃক্ত, এবং তা প্রায়ই উপলব্ধ হয় অস্পষ্ট উৎকণ্ঠা হিশেবে, অভ্যন্তরীণ শূন্যতার অনুভূতি হিশেবে, যে-শূন্যতা কিছু একটা দিয়ে পূরণ করা প্রয়োজন। এ থেকেই বৃদ্ধি পায় মেলামেশার চাহিদা এবং একই সঙ্গে বেড়ে যায় সঙ্গী বাছার প্রবণতা ও বিচ্ছিন্নতার মনোভাব, দেখা দেয় নিঃসঙ্গতার চাহিদা, প্রকৃতির নিস্তব্ধতায় থাকার চাহিদা, নীরব থাকার চাহিদা যাতে নিজের অভ্যন্তরীণ কণ্ঠটি শোনা যায়। তবে স্বেচ্ছামূলক বিচ্ছিন্নতা সহজেই পরিণত হয় যন্ত্রণাদায়ক নিঃসঙ্গতায়, নিজের পরিত্যক্ততা বোধে।

নিজের অদ্বিতীয়তা ও অন্যের সঙ্গে নিজের বৈসাদৃশ্যকে বাড়িয়ে দেখলে তা প্রায়ই উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে লাজুকতার জন্ম দেয় এবং তাদের মনে হাস্যাস্পদ হওয়ার ও মেলামেশার ক্ষেত্রে 'নিজেকে হারিয়ে ফেলার' ভয় সঞ্চারিত করে। এ থেকেই — অন্তরঙ্গতার অদম্য চাহিদা, মন খুলে কথা বলার বাসনা এবং একই সঙ্গে মেলামেশার বর্তমান উপায়গুলো নিয়ে অসন্তোষ।

যৌবন — সে হচ্ছে চিন্তাহীন, অন্যের উপর নির্ভরশীল শৈশব থেকে বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষের দায়িত্বপূর্ণ ও জটিল জীবনে উৎক্রমণের বয়স। তখন তরুণ ভবিষ্যতের চিন্তা ও স্বপ্নে বিভোর থাকে।

শিশুর মতো তরুণও নিজের মৃত্যুর কথা ভাবতে পারে না — তা মেনে নিতে তার কষ্টই হয়। তবে শিশু যেখানে নিজের অমরত্বে বিশ্বাস করে ('সবাই মরে যাবে, আর আমি বেঁচে থাকব'), সেখানে তরুণ মৃত্যুর অনিবার্যতা স্বীকার করে নেয় এবং এই জিনিসটাই তাকে জীবনের অর্থ সম্পর্কে ও কীভাবে বেঁচে থাকলে ভালো হয় সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করে। যে অমর তার তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই, তার আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই, অনন্ত জীবনের নির্দিষ্ট কোন মূল্য থাকে না।

বদলাচ্ছে কেবল পারিপার্শ্বিক জগৎই নয়, সে নিজেও বদলাচ্ছে — এই চেতনাটি তরুণের সামনে একটি প্রশ্ন হাজির করে: আমি কী করতে পেরেছি এবং আমায় আর কী করতে হবে। এই ধরনের চিন্তা প্রায়ই বিষণ্ণ হয়ে থাকে। নবম শ্রেণীর এক ছাত্রী লিখেছে, 'আমার বয়স ১৫ বছর। এই বয়সে কবি মিখাইল লেরমন্তভ তাঁর প্রথম কবিতাগুলো রচনা করে ফেলেছিলেন। নিকোলো পাগানিনি বেহালা বাজিয়ে দুনিয়াকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। এভারিস্ত গ্যালুয়া তাঁর প্রথম সূত্রটি আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। অথচ আমি কী করলাম? আমি কোন সূত্র আবিষ্কার করি নি, বেহালায় সঙ্গীতের সুন্দর সুর বাজিয়ে দুনিয়াকে মুগ্ধ করতে পারি নি। আমি কিছুই না। আমি মৃত্যুকে খুব ভয় করি।' তবে এই কথাগুলোতে কাজে নেমে পড়ার আহ্বানও রয়েছে। চারিপাশের লোকজনের সঙ্গে নিজেকে তুলনার মাধ্যমে যে আত্মউপলব্ধি আসে তা আত্মনির্ধারণের একটি অংশ হয়ে উঠে, আর 'আমি কী রূপ?' প্রশ্নটি পরিণত হয় 'আমি কীভাবে ও কীসের জন্য বেঁচে থাকব?' প্রশ্নটির একটি অংশে।

'আত্মসন্ধানের' বাসনা, 'স্বস্থান লাভের' স্পৃহা — সে হচ্ছে যৌবনের

স্বাভাবিক চাহিদা। আত্মসন্ধান — তার মানে জীবনে নিজের স্থান খুঁজে পাওয়া, ক্রিয়াকলাপের অসংখ্য সম্ভাবনা ও ধরনের ভেতর থেকে কেবল সেগুলোই বেছে নেওয়া যা সর্বাধিক মাত্রায় নিজের প্রবণতা ও নিজের বৈশিষ্ট্যের উপযোগী।

'আমি কে?' — এরূপ প্রশ্ন করার সময় মানুষ স্রেফ নিজের ব্যক্তিগত গুণ কিংবা তার সামাজিক অবস্থা বর্ণনার কথা ভাবে না। সে জিজ্ঞেস করে: 'আমি কী হতে পারি এবং আমার কী হওয়া উচিত, আমার সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ কীরূপ, আমি কী করলাম এবং জীবনে আর কী করতে পারি?'

— অদ্ভুত ব্যাপার — ছেলেটি যখন ছোট ছিল তখন সে যথেষ্ট সুস্থ মস্তিষ্কে নিজের ও নিজের সম্ভাবনার মূল্যায়ন করত। আর এখন সে কখনও নিজেকে প্রতিভা ভাবে, কখনও একেবারে তুচ্ছ প্রাণী বলে গণ্য করে।

— কিন্তু আগে তো সে পৃথিবীকে ও নিজেকে দেখত আপনার চোখ দিয়ে, আর এখন সে সমস্তকিছু নিজে নিজে বুঝতে চেষ্টা করছে। এ কাজটি অনেক কঠিন, তদুপরি তার জীবনের অভিজ্ঞতা কম।

বিকশিত আত্মচেতনা অবশ্যই বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে যুক্ত (আত্মনির্ধারণ হচ্ছে পৃথিবীতে নিজের স্থান নিরূপণ), আর বিশ্ববীক্ষা অবশ্যই প্রতিসৃত হয় আত্মচেতনার মধ্য দিয়ে (কারণ তা বিশ্বের প্রতি আমার মনোভাব প্রকাশ করে)।

বলাই বাহুল্য, তরুণ তার আত্মনির্ধারণ সম্পাদন করে একা নয়, এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেন মা-বাবা ও স্কুল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ প্রক্রিয়াটি অতি জটিল। সমস্ত ধরনের ক্রিয়াকলাপ 'চেখে দেখা' সম্ভব নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের দক্ষতা ও প্রতিভা থাকতে পারে। যেমন, জার্মান সুরকার ভাগ্‌নের একই সঙ্গে সঙ্গীত ও সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, রুশ কবি পুশকিন ও ইউক্রেনীয় কবি শেভচেঙ্কো একই সঙ্গে ছিলেন অসাধারণ চিত্রশিল্পী, আর রুশ সুরকার বরোদিন ছিলেন একজন বিশিষ্ট রসায়নবিদ। কীভাবে বাছা যায়? এমনকি বহু মহামানবও সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারেন নি।

তদুপরি আত্মনির্ধারণ একই সঙ্গে আত্মসীমিতকরণও। পেশার ক্ষেত্রে স্কুল-ছাত্র এখনও কেউ নয়, 'নিছক সম্ভাবনা' মাত্র। সে ফিটার মিস্ত্রিও হতে পারে, ডাক্তারও হতে পারে, মহাকাশচরও হতে পারে। পেশা নির্বাচন

ক'রে মানুষ ক্রিয়াকলাপের নির্দিষ্ট একটি ক্ষেত্র লাভ করে, যেখানে বিষয়গতভাবে তার শক্তি ও দক্ষতা কাজে লাগে। কিন্তু এর জন্য অন্যান্য বহু ধরনের ক্রিয়াকলাপ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে হয়। এই দায়িত্বপূর্ণ ও আত্মসীমিতকারী নির্বাচনটি আদৌ কোন সহজ কাজ নয়।

এই সমস্ত চিন্তাভাবনার সবচেয়ে সাধারণ ও দার্শনিক রূপ হচ্ছে জীবনের অর্থ সম্পর্কিত প্রশ্নটি। তরুণ এমন এক সূত্র খোঁজে, যা তাকে তৎক্ষণাৎ নিজের অস্তিত্ব এবং সমাজ বিকাশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম করে তুলবে।

এখানে প্রশ্ন কেবল কী হওয়া উচিত (পেশা নির্বাচন) তা নয়, কীরূপ হওয়া উচিত (নৈতিক আত্মনির্ধারণ) তা-ও। প্রথম দিকে তরুণের চেতনায় এই সমস্ত প্রশ্ন আসে খুবই সাধারণ ও অবিচ্ছিন্ন আকারে। 'কত প্রশ্ন, কত সমস্যা আমায় উদ্বিগ্ন করছে ও জ্বালিয়ে মারছে, — লিখেছে অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রী। — কীসের জন্য আমার দরকার আছে? কীসের জন্য আমি জন্মেছি? কীসের জন্য বেঁচে আছি? একেবারে ছোটবেলা থেকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমার কাছে স্পষ্ট ছিল: পরের উপকার করার জন্য। কিন্তু এখন ভাবি: 'উপকার করা' কথাটির মানে কী? 'নিজে জ্বলে অন্যদের আলো দান।' নিঃসন্দেহেই এখানে প্রশ্নের জবাব রয়েছে। মানুষের উদ্দেশ্য: অন্যদের আলো দান। সে নিজের জীবন উৎসর্গ করে কাজের জন্য, ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের জন্য। মানুষে মানুষের প্রয়োজন আছে, সে মিছেই এ পৃথিবীতে বাস করছে না।' মেয়েটি লক্ষ্য করছে না যে এই সমস্ত বিচার-বিবেচনায় সে বস্তুতপক্ষে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে না: 'অন্যদের আলো দানের' নীতিটি তেমনই বিমূর্ত, যেমন 'পরের উপকার করার' বাসনা।

মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে ছোট ছেলেমেয়েরা যখন তাদের ভবিষ্যতের কথা বলে তখন তারা প্রধানত নিজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথাই ভাবে, কিন্তু বড় ছেলেমেয়েরা তা করে না — তারা সামাজিক ও বিশ্ব সমস্যাবলি নিয়ে সক্রিয় আলোচনা চালায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাব্য এবং বাঞ্ছিতের মধ্যে সীমা নির্ধারণের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৫-১৬ বছর বয়সে প্রায়ই বাস্তবতা বোধের অভাব থাকে। তরুণ ছেলে বড় কোনকিছুর স্বপ্ন দেখতে পারে, বিরাট বিরাট পরিকল্পনা গড়তে পারে... এবং তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কিছুই করবে

না। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররা সর্বদা অতি ঝাপসা সব কল্পনা ও স্বপ্নকে জীবনের পরিকল্পনা বলে বর্ণনা করে থাকে; তাদের বাস্তব ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে ওগুলোর কোন সম্পর্কই থাকে না।

তরুণের আত্মচেতনা সর্বদা ভবিষ্যমুখী (সেই থেকেই জীবনের পরিকল্পনাও)। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রকে বোঝার জন্য যা জানা অতি গুরুত্বপূর্ণ তা হল — প্রথমত, সে কি নিজের ভবিষ্যৎকে বর্তমানের স্বাভাবিক পূর্বানুবর্তন হিশেবে বিবেচনা করে অথবা বর্তমানের পূর্বানুবর্তন হিশেবে বিবেচনা না ক'রে সেই ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনকিছু বলে গণ্য করে, এবং দ্বিতীয়ত — সে কি ভবিষ্যতে নিজস্ব প্রয়াসের ফল দেখে কিংবা এমন কোনকিছু দেখে (ভালো অথবা খারাপ যা-ই হোক তাতে কিছু এসে যায় না) যা 'আপনা থেকেই আসবে'। সাধারণত অনুপলব্ধ এই সমস্ত উদ্দেশ্যের পেছনে অনেকগুলো মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা থাকে। আমরা ভালোই জানি, মানুষ যদি কেবল বর্তমানকে নিয়ে থাকে তাহলে তাতে মন্দই হয়: ভবিষ্যতের অনুপস্থিতি তার জীবনকে অসার করে তুলে। কিন্তু কেবল এক ভবিষ্যৎকে নিয়ে বাঁচার মধ্যেও কোন আনন্দ নেই।

— নিজেকে নিয়ে এই সমস্ত ঘাঁটাঘাঁটির ফল কিন্তু ভালো হয় না। মানুষকে সক্রিয় ও প্রাণোচ্ছল হতে হবে, নিজের মধ্যে ডুবে থাকলে চলবে না।

— জীবনের অর্থ নিয়ে ভাবা দরকার?

— অবশ্যই।

— কিন্তু তরুণ তো নিজের জীবনের অর্থ কী সে কথাই ভাবছে। তাছাড়া আত্মবিশ্লেষণ ব্যতিরেকে আত্মশিক্ষা কী ক'রে সম্ভব হবে? আমার মনে হয়, ছেলেমেয়েরা আত্মবিশ্লেষণের ব্যাপারে খুব একটা মনোযোগী নয়। অথচ তা ব্যতিরেকে আশাবাদের বিশেষ মূল্য নেই।

যৌবনে যে এক ধরনের আত্মচেতনা গড়ে উঠে তা ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে স্থায়ী গুণসমূহের একটি। বলাই বাহুল্য, এখানে ব্যক্তিগত আত্মমূল্যায়নের কথা হচ্ছে না। ব্যক্তিগত আত্মমূল্যায়ন মানুষের গুণাবলি সম্পর্কে পূর্ণ ও সুস্পষ্ট কোন ধারণা দিতে পারে না। ব্যক্তিগত আত্মমূল্যায়ন অনেক, এবং তার সবগুলোই আপেক্ষিক, কেননা ওগুলোর প্রতিটির পেছনে থাকে নির্দিষ্ট — এবং তা হতে পারে অনুপলব্ধ — কিছু দাবি-দাওয়া।

আত্মমূল্যায়ন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এটা মনে রাখা উচিত যে বিভিন্ন

গুণ মানুষের জন্য সমান তাৎপর্য বহন না-ও করতে পারে। যেমন, উচ্চ শ্রেণীর কোন ছাত্র নিজেকে কান্তিগত দিক থেকে অবিকশিত বলে গণ্য করতে পারে, তবে এই স্বীকৃতিটি তার সাধারণ আত্মবোধকে বিগড়ে দেয় না, কারণ সে এই গুণটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে না। এবং তার বিপরীতে: কোন ব্যক্তি নিজেকে প্রতিভাধর পদার্থবিদ বলে গণ্য করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার আত্মমর্যাদা অত্যন্ত কম, কেননা তা প্রতিষ্ঠিত থাকে মেধাগত গুণের উপর নয়, কীসব অন্যান্য (যেমন, নৈতিক) গুণের উপর।

তাই মনোবিজ্ঞানীরা স্বতন্ত্র ও নির্দিষ্ট আত্মমূল্যায়ন বিশ্লেষণ করার চেয়ে আত্মমর্যাদা বিশ্লেষণ করতেই বেশি পছন্দ করেন। আত্মমর্যাদা — এ হচ্ছে নিজের প্রতি মানুষের সাধারণীকৃত মনোভাব, ব্যক্তি হিশেবে নিজেকে 'গ্রহণ' অথবা 'প্রত্যাখ্যানের' মাত্রা। কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ সর্বদা নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় বলে জ্ঞান করে, আর কোন কোন ক্ষেত্রে সে নিজেকে অন্যের চেয়ে ছোট ভাবে। আত্মমর্যাদা হচ্ছে এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী তুলনারই এক ধরনের যোগফল। উচ্চ আত্মমর্যাদা বোধের মানে এ নয় যে কোন ব্যক্তি নিজেকে বাদবাকি সবার চেয়ে বড় ভাবে, নিজের দোষত্রুটি দেখে না কিংবা নিজেকে সম্পূর্ণ নিখুঁত ব্যক্তি বলে গণ্য করে; তার মানে হচ্ছে কেবল এই যে মানুষ নিজেকে গ্রহণ ও শ্রদ্ধা করে, ব্যক্তি হিশেবে নিজের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে। অপর দিকে, নিচু আত্মমর্যাদা বোধের মানে হচ্ছে নিজেতে অসন্তোষ, নিজের প্রতি ঘৃণা, আপন ব্যক্তিত্বের নেতিবাচক মূল্যায়ন।

অন্যদের সঙ্গে মেলামেশার সময় এ ধরনের লোকেরা অস্বস্তি বোধ করে, আগে থেকেই জানে যে চারিপাশের লোকজন তাদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করে না। নিচু আত্মমর্যাদা বোধ এবং মেলামেশায় অসুবিধা ব্যক্তির সামাজিক সক্রিয়তাও হ্রাস করে। পেশা নির্বাচনের সময় এই ধরনের লোকেরা পরিচালনা করা অথবা অধীন হওয়ার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে জড়িত বৃত্তিগুলো এড়িয়ে চলে। প্রতিযোগিতামূলক পেশার প্রতিও তারা অনীহ। নিজের সামনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকলেও তারা সাফল্য লাভের ব্যাপারে বিশেষ একটা আশা রাখে না, — তারা মনে করে যে এর জন্য প্রয়োজনীয় গুণ ও দক্ষতা তাদের নেই।

আত্মমর্যাদার ভিত্তিগুলো গড়ে উঠতে থাকে একেবারে ছোটবেলা থেকে। তা সর্বাগ্রে নির্ভর করে পরিবারে এবং স্কুলে শিক্ষাদীক্ষা ও সম্পর্কের

উপর, যা শিশুর মধ্যে আত্মমর্যাদা ও আত্মনির্ভরতা বোধ সুদৃঢ়ও করতে পারে, দমিতও করতে পারে। তবে নিউরাসথেনিক-এর নিচু আত্মমর্যাদাকে সৃজনশীল ব্যক্তির স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ আত্মসমালোচনা ক্ষমতা থেকে পৃথক করতে পারা চাই।

এ ব্যাপারটা আত্মবিশ্লেষণের উপকারিতা ও অপকারিতার প্রশ্নের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আত্মবিশ্লেষণে পরাঙ্মুখ ব্যক্তি কখনও আত্মশিক্ষা আর আত্মসমালোচনায় সক্ষম নয়। আর যে ব্যক্তি সব সময় নিজের বিষয়ে ভাবে সে ক্রিয়াকলাপে অক্ষম।

— সৃজনশীল ব্যক্তি কী কী গুণের অধিকারী!

— সৃজনশীল ব্যক্তি — সর্বাগ্রে এ হচ্ছে সক্রিয় ব্যক্তি। সব মানুষ যে-সমস্ত গুণের অধিকারী, তারও সেই সমস্ত গুণ আছে, তবে গুণগুলো হতে পারে অপেক্ষাকৃত বেশি প্রকাশিত। এ হল অটলতা, শ্রমশীলতা, লক্ষ্যনিষ্ঠতা, অনুসন্ধিৎসা, স্পর্ধিত চিন্তা (যা নতুন ও অসাধারণ কোনকিছু ভয় করে না), প্রামাণ্য ব্যক্তিদের প্রতি অন্ধ ভক্তির অনুপস্থিতি।

আত্মবিশ্লেষণের প্রবণতা সর্বপ্রথম দেখা দেয় কৈশোরে এবং এই প্রবণতা সাধারণত সারা জীবন মানুষের মধ্যে থেকে যায়। তা কি হিতকর?

যৌবনের হতাশা খুবই তীব্র ও পীড়াদায়ক, তবে এই বয়সে যে-দৃঢ়তা থাকে তা সেই হতাশা অনেকটা উপশমিত করে। আর নিজের প্রতি এবং বিশ্বের প্রতি অধিকতর সুস্থ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি শেষ বিচারে হিতকরই হয়।

পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব থেকে দেখা গেছে যে বিভিন্ন ধরনের আত্মবিশ্লেষণ রয়েছে। এক মেরুতে — নিজের 'অহং' নিয়ে নিউরোটিক বিভোরতা, যা বাস্তব জগতের সঙ্গে ব্যক্তির পূর্ণ 'বিচ্ছেদ' ঘটায়, আর অন্য মেরুতে — শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অতি বিকশিত আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষামূলক গবেষণা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে অধিকতর সৃজনশীল ব্যক্তিরা সাধারণত বিপুল আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী এবং তারা অধিকতর স্বনির্ভর ক্রিয়াকলাপে প্রয়াসী, — এমনকি 'অহং' শক্তিটিই সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের অন্যতম লক্ষণ হিশেবে বিবেচিত হয়। তবে পরীক্ষানিরীক্ষা পরিচালনার প্রতি ভালোবাসাও — যা সৃজনমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত — আত্মসমালোচনার মনোভাব ও নিজেতে অসন্তোষ থেকে মানুষকে রেহাই দেয় না। মেধাবী

কিশোর আর যুবকদের মধ্যে আত্মসমালোচনার মাত্রাটি মাঝারি দক্ষতাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি। কৈশোরে ও যৌবনে তাদের কাছে বাস্তব এবং আদর্শ 'অহং'-এর মধ্যে প্রভেদটি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে: ক্রমবর্ধমান দাবি-দাওয়ার মধ্যে নিজের 'অহং'টিকে অসন্তোষজনক মনে হয়, আর তা আত্মমূল্যায়নে দোদুল্যমানতা সৃষ্টি করে এবং সহজে মানসিক আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। সৃজনশীল ব্যক্তির নিজের প্রতি অসন্তোষ তাকে ক্রিয়াকলাপে ও বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে প্রেরণা জোগায়। তবে নিউরোটিকের স্বল্প আত্মমর্যাদা বোধ তার নিষ্ক্রিয়তা ও উদ্যমহীনতার মনস্তাত্ত্বিক আত্মসমর্থনের কাজে লাগে এবং সেই জন্যই তার এরূপ আত্মমর্যাদা বোধ হচ্ছে এক স্থায়ী ব্যাপার।

নিষ্ক্রিয় আত্মানুধ্যান (অথবা আত্মমুগ্ধতা বা আত্ম-অবমাননা — যা-ই হোক না কেন), 'ব্যক্তির কেবল নিজের প্রিয় বৈশিষ্ট্যগুলো আত্মতুষ্টির সঙ্গে প্রতিপালন' এবং নিজের সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করার পূর্ণ অনিচ্ছা সমানভাবেই মারাত্মক। তাই ছেলেমেয়েদের সমালোচনামূলক আত্মবিশ্লেষণের কাজটি রপ্ত করতে শেখানো উচিত — তা নিজের দোষত্রুটি দেখতে ও দূর করতে সাহায্য করে।

আপন 'অহং'-এর রূপ এবং বাহ্যিক চেহারা

বৈষয়িক জগতের প্রতি (শিক্ষা, শ্রম, শিল্পকলা), জীবন্ত সমস্তকিছুর প্রতি এবং সর্বাগ্রে মানুষের প্রতি শিশুর সম্পর্কের বিষয়ে আমরা অনেককিছু বলে থাকি। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা দেওয়ার সময় আমরা খোদ নিজের প্রতি বর্ধমান মানুষটির সম্পর্কের কথা — অর্থাৎ ব্যক্তির আত্ম-চেতনার কথা — সর্বদা ভাবি না।

কী দিয়ে আত্মচেতনা শুরু হয়? কোথায় তার সীমানা? এই অদ্বিতীয় মানবীয় 'আত্মটি' কীভাবে বিকাশ করা যায়: আত্মশৃঙ্খলা, আত্মমূল্যায়ন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মশিক্ষা, আত্মবিকাশ?

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে আত্মচেতনা বিকশিত হয় ধীরে ধীরে এবং খুব সম্ভবত তা শুরু হয় আপন দেহের সীমানা নির্ধারণ দিয়ে। তারপর শিশু বিভিন্ন সামাজিক অধীনতা, অধিকার, দায়িত্ব, নিয়ম আর দাবি-দাওয়ার মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করে।

শিশু তার দেহকে সামাজিক দাবি-দাওয়া ও দায়দায়িত্ব থেকে আলাদা না ক'রে নিজেকে পুরোপুরিভাবে অনুভব করে।

আমরা বড়রা ভাবি, নিজের সন্তানকে তার বিকাশে, লেখাপড়ায় কীভাবে সাহায্য করব; আর সে ভাবিত সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার নিয়ে: নিজের লম্বাই, ওজন, মুখের রঙ তাকে চিন্তিত করছে।

এমন কোন শিশু নেই যে নিজের বাহ্যিক চেহারার প্রতি উদাসীন। আত্মচেতনা শিশুর আত্মবোধে অনেককিছু নির্ধারণ করে, সুতরাং তার মেধাগত এবং আত্মিক বিকাশেও এর বিপুল ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কিশোরের আত্মচেতনা বিকাশের সবচেয়ে টিপিক্যাল কয়েকটি দিক বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যাক এবং প্রতিটি আলাদা ক্ষেত্রে কীরূপ আচরণ করা উচিত সে বিষয়েও ভাবা যাক।

লম্বাইয়ের সমস্যা। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীটি লম্বায় ১৭১ সেণ্টিমিটার। সেই জন্য তার মনে শান্তি নেই। ক্লাসে সে সবার চেয়ে লম্বা। যখন বোর্ডের কাছে যায় তখন সামনের দিকে একটু নুইয়ে থাকে। কুঁজো হয়ে চলে। বোর্ডের কাছে যেতে হলেই সে ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করে। তাই সময় সময় যায়-ই না। সে ভাবে, 'আরও একবার অপমানিত হওয়ার চেয়ে গোল্লা পাওয়াই ভালো।' সমবয়সীর মন্তব্যটিও তার ভালো মনে আছে: 'এই, টাওয়ার!', শিক্ষকের উক্তিটিও তাকে ভীত করে: 'কেন তুই ও রকম অস্বস্তি বোধ করছিস?', এবং মায়ের স্নেহভরা অনুরোধও সে ভুলে না: 'ও রকম কুঁজো হয়ে চলিস না মা, কাঁধগুলো সোজা কোর!'

আর এ দিকে একটি ছেলেকেও তার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু ছেলেটি তার চেয়ে অনেক বেঁটে। আর মা সব সময় হাই হিলের জুতো কেনেন, কেননা কেউ এখন নিচু হিলের জুতো পরে না। মা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মেয়েকে বোঝান যে হাই হিল জুতো পরলে মেয়েদের সুন্দর ও সুঠাম দেখায়। আর বাপ কোন্ এক ক্ল্যাসিকেল ও নিখুঁত দেহের তত্ত্ব বিকশিত করেন: এই দেহে পাগুলো ধড়ের চেয়ে প্রায় তিনগুণ লম্বা হয়। এই সমস্ত কথাবার্তা মেয়েকে বিরক্ত করে, তার মনে আঘাত দেয়। কেউ তাকে বোঝে না।

তীব্র সংঘর্ষ বাধে।

মেয়ে। আমি মুচিকে দিয়ে হিলগুলো কাটিয়ে নেব...

মা। তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে: নতুন জুতো জোড়া যে নষ্ট হয়ে যাবে...

মেয়ে। এই জুতো পরে আমি স্কুলে যাব না!

মা। বাজে কথা বলিস না। এই জুতো পরেই এক্ষুনি তোকে স্কুলে যেতে হবে!

মেয়ে। বলছি যাব না — ব্যস চুপ থাকো!

মা। কী, তুই আমার সঙ্গে কীভাবে কথা বলছিস?!

মেয়ে। তুমি যদি আমায় একদম বোঝ না তাহলে তোমার সঙ্গে কীভাবে কথা বলব?

হ্যাঁ, মা জানেন যে তাঁর মেয়েটি নিজের লম্বাই নিয়ে ভীষণ চিন্তিত এবং তিনি কোন-না-কোন ভাবে তার মর্মপীড়ার তীব্রতা হ্রাস করতে চেষ্টা করছেন: চিন্তার কী আছে, ও এমন কিছু না, মামুলি ব্যাপার। কিন্তু মা শিশু মনের সেই সমস্ত গুপ্ত আশঙ্কা আর প্রত্যাশার কথা ভাবেন না, যখন শিশুর কল্পনা 'তার বিপদকে' অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। এবং বলতে পারেন, এই 'বিপদ' শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, পরিণত হয় স্থায়ী চিন্তাভাবনা ও তুলনার বিষয়ে। মেয়েটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে হিসাব করতে থাকে: 'আমি যদি বছরে এমনকি ২ সেণ্টিমিটার ক'রেও বাড়ি (আর এতকাল বেড়েছি ৪ সেণ্টিমিটার ক'রে!), তাহলে ৯ বছরে আমি ১৮ সেণ্টিমিটার বাড়ব, আর তা নিয়ে হবে প্রায় ১৯০ সেণ্টিমিটার... আর যদি বছরে ৩ সেণ্টিমিটার ক'রে বাড়ি, তাহলে ২ মিটারেরও বেশি হয়ে যাবে...' এবং মেয়েটি আরও ভাবল: 'হয়তো এমন কোন পিল আছে যা খেলে অত বেশি বাড়ব না?' সে মাকে তা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু মা হেসে ফেললেন। অথচ কালই ক্লাসের সবাই আবার তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। কয়েক দিন পরেই ক্লাসের একটি সান্ধ্যানুষ্ঠান হবে, এবং কেউ তার সঙ্গে নাচবে না... 'যদি ব্যাপার-স্যাপার এত খারাপ হয়ে থাকে, যদি এত লম্বা শরীর নিয়ে বাঁচা না যায়, তাহলে পরীক্ষায় এত ভালো ভালো নম্বর দিয়ে হবেটা কী?..'

মা এ সমস্তকিছু জানেন না। কেউ-ই জানে না।

আশা — এ হচ্ছে সেই সূত্রটি যা ধরে শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে, আর সঠিকভাবে বললে, আত্মশিক্ষার ক্ষেত্রে এগুতে হবে।

বাড়িতে অবশ্যই প্রতিরক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার। অবশ্যই শিশুর মিত্র হওয়া উচিত। 'তুই হিলগুলো কেটে ফেলতে বলছিস? ঠিক আছে, চেষ্টা করা যাক! তবে আয় একটু ভেবে দেখি, তাতে আমাদের লাভটা কী হবে। আচ্ছা, তিন সেণ্টিমিটার কমে যাবে। চমৎকার।'

শিশুর সঙ্গে আত্মিক সান্নিধ্যের চেয়ে হিলটি, তিন সেণ্টিমিটার উ'চু কঠিন পদার্থটি কি বেশি প্রিয়? তাতে অবশ্য ঝামেলা বেড়ে যায়! কিন্তু অন্যভাবে তো আর আশার দিকে এগুনো সম্ভব নয়। শিশুর আনন্দের সেই মুহূর্তটি কী সুন্দর যখন সে অপ্রয়োজনীয় উচ্চতাটি 'কেটে ফেলার' জন্য মুচির কাছে ছুটে, যখন তার চোখের সামনে ভেসে উঠে তার 'অহং'-এর ভিন্ন, চিত্তাকর্ষক একটি রূপ।

হিলগুলো কেটে ফেলাতে জুতো জোড়া নতুন মনে হচ্ছে। তিন সেণ্টিমিটার যেন ছিলই না।

মা। এত চমৎকার বুদ্ধি তোর মাথায় কোত্থেকে এল? এখন ব্যাপারই একেবারে আলাদা!

মেয়ে। তা তুমি বলছ, ভালো হয়েছে!

মা। তোর রুচিবোধ কিন্তু ভালো! আচ্ছা বল তো, ওগুলো পরতে তো তোর কোন অসুবিধা হচ্ছে না?

মেয়ে। না, ভীষণ আরাম!

বাবা, দিদিমা ও দাদুর সঙ্গেও যদি এরূপ ব্যাপার ঘটে, তাহলে তাতে লাভ বই ক্ষতি হবে না: শিশুর 'অহং'-এর নতুন রূপ গঠনের প্রক্রিয়াটি সুদীর্ঘ। শিশুকে এই জিনিসটি বিশ্বাস করতে হবে যে বেশি লম্বা হওয়াটা কোন ট্র্যাজেডি নয়, হতে পারে না। তদুপরি, লম্বা হওয়ার মধ্যে ভালোও অনেককিছু আছে। এই ভালো দিকগুলোর কথা তাকে বলা উচিত। এ সম্পর্কে তাকে সচেতন করে তোলা উচিত। তাহলে সে সম্ভব মতো তা কাজে লাগতে পারবে। ভলিবল অথবা বাস্কেটবল খেলতে আরম্ভ করবে। আর তখন শিশুর সামনে কত নতুন সম্ভাবনা দেখা দেয়। লম্বা মেয়ে একই রকমের লম্বা ছেলেমেয়েদের মধ্যে পড়ে নিজেকে সম্পূর্ণ অন্য রকম অনুভব করতে শুরু করে। নিজের সম্পর্কে তার ধারণা তখন সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। 'অহং'-এর নতুন রূপের খুঁটিনাটি সমস্ত ব্যাপার সে ভিন্নভাবে বুঝতে আরম্ভ করে।

বাহ্যিক চেহারার সমস্যা। ১৪-১৫ বছর বয়সে শিশুর পক্ষে আয়নার তাৎপর্য অনেক বেড়ে যায়। আগে 'অহং'-এর রূপের বহিঃরেখা ছিল খুবই সাধারণ: হাত, পা, মাথা; কিন্তু এখন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খুঁটিনাটি সমস্তকিছুও দৃষ্ট হচ্ছে: চোখ, কান, মুখ, মুখের রঙ, ছায়া, অক্ষিপক্ষ্ম, চুল, মাথা ঘুরানো, হাসি, স্মিত হাসি, প্রায় অদৃশ্য অধর সঞ্চালন, সামান্য কুঞ্চিত চোখ — এবং প্রতিবার নতুন চেহারা, নতুন চরিত্র। নিজের

অনুসন্ধানে কেটে যায় দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। কিছু একটা বদলায়, কিছু একটা পুনর্গঠিত হয়। কানগুলো ঝুলছে: চুলগুলো একটু লম্বা রাখতে হবে। ঠোঁটগুলো সরু: টেনে লম্বা করা উচিত নয়।

এখানেও যন্ত্রণা কম নয়। স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের থাকে নিজস্ব ধারণা। এরূপ বহু সুশ্রী ছেলে ও মেয়ে আছে যারা নিজেকে কুৎসিত ভাবে কেবল এই কারণে যে তারা, তাদেরই মতে, স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু এই স্ট্যান্ডার্ড আসে কোত্থেকে? সিনেমা, ছবি, কার্ড ইত্যাদি থেকে।

কিশোর যদি আধুনিক সৌন্দর্যের কেবল বাহ্যিক দিকগুলো রপ্ত করে তাহলে নৈতিক ক্ষতি অনিবার্য।

কর্মরত একটি লোকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বাবা ছেলেকে বললেন:

— কী অপূর্ব চেহারা! প্রাজ্ঞ ও অনুপ্রাণিত... (অথচ এই লোকটির মুখাবয়ব ঠিক ছিল না এবং সে ছিল বেঁটে)।

— ওর মধ্যে অপূর্ব কী-ই বা আছে? — অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে ছেলে।

— তুই কি সত্যিই তার গতির সমগ্র সৌন্দর্যটি অনুভব করতে পারছিস না? আর এই অপলক দৃষ্টি, আর দৃষ্টিতে এই ঔজ্জ্বল্য। আর এই শক্তি! প্রকৃত পুরুষের সৌন্দর্য!

ছেলেকে পুরুষের প্রকৃত সৌন্দর্য সম্পর্কে বলা উচিত। সে বুঝুক যে পুরুষের মুখটি যদি বুদ্ধি, শক্তি আর উদারতার আলোয় দীপ্ত থাকে তাহলে সে সত্যিই সুন্দর। এই চিন্তাটি নিজেকে সৃষ্টির পথে তাকে নতুন প্রেরণা দিক!

আপনি বুঝতে চেষ্টা করুন, আপনার সন্তান নিজের প্রতি কীরূপ মনোভাব ও অনুভূতি পোষণ করে।

— আচ্ছা মা, বল তো: আমি সুন্দর?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় বিভিন্নভাবে।

— তুই আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে! তুই আমার চোখের মণি! এক্ষুনি তোমায় নতুন জুতো, নতুন জামা পরিয়ে দেব — এবং আমার খুকী দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে হয়ে যাবে! (এরূপ বলা হয় ভালোবাসার উচ্ছ্বাসের মধ্যে, এবং তাতে শিক্ষামূলক কোন উপাদান থাকে না)।

— হুঁ, আর কী বলবে! এই বয়স থেকেই আয়নার সামনে ঘোরা হচ্ছে! তুই একবার নিজের ছিরিটা দ্যাখ না: নাকটা বোতামের মতো, কান দু'টো কুলোর মতো, আর ভুরু নেই বললেই চলে। বলার কিছু নেই — রূপসী বটে! (এরূপ বলা হচ্ছে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, যাতে মেয়েটি লঘুচিত্ত ছলাকলাময়ী হয়ে না উঠে)।

— মা, একটা জিনিস সব সময় মনে রাখিস: সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মানুষ যেন বুদ্ধিমান, উদার ও সৎ হয়। আর সে সুন্দর অথবা কুৎসিত — তাতে কিছু যায় আসে না। (এ কথা বলার পেছনে সুদূরপ্রসারী শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য রয়েছে: মেয়েটি যেন গুরুত্বমনা লোক হয়ে উঠে এবং তুচ্ছ ব্যাপারে যেন মাথা না ঘামায়)।

কল্পনা করা যাক, শিশু যাদের ঘৃণা করে তাদের প্রতি তার অকপট মনোভাবটি কীরূপ। এরূপ ব্যক্তির কোন নির্দেশই শিশু সম্ভবত ভালো মনে পালন করবে না। তার অধিকাংশ উপদেশ অথবা নির্দেশ শিশু উপেক্ষা করবে, তদুপরি তা নিয়ে হাসাহাসি করবে। এমনকি এই ঘৃণিত ব্যক্তি যদি সদুপদেশও দেয় এবং কাজের কথাও বলে, তা সত্ত্বেও তার প্রতি শিশুর মনোভাব নেতিবাচক হবে।

অন্য দিকে, শিশু যদি কোন ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করে, তাহলে সে ওই ব্যক্তির অধিকাংশ নির্দেশই পালন করবে।

এবার এমন এক শিশুর কথা ধরা যাক যে নিজেকে ঘৃণা করে: নিজের চেহারা তার পছন্দ নয়, নিজের দক্ষতা সইতে পারে না, — এক কথায়, নিজেকে নিয়ে তার যন্ত্রণার শেষ নেই। নিজের প্রতি এরূপ নেতিবাচক মনোভাব কোন বিরল ব্যাপার নয়। এরূপ মনোভাবের উৎস — নিজের প্রতি অসন্তোষে।

কিশোর এবং এমনকি তরুণ প্রায়ই নিজের ইচ্ছা ও অনুভূতি বুঝতে সক্ষম নয়। আর ইত্যবসরে ব্যক্তির আত্মমূল্যায়ন গড়ে উঠে শিশু সম্পর্কে অন্যদের ব্যক্ত মতামত আর চিন্তাধারার ভিত্তিতে।

'আর আমি কীরূপ?' — কিশোরের পক্ষে নিজেকে এ প্রশ্নটি করা কেন যেন সহজ নয়: লাজুকতা এবং বিদ্রূপের ভয় বাধা দেয়। তাছাড়া বড়রাও কেন যেন শিশুদের ভালো গুণগুলোর বিষয়ে বলতে ভয় পান। তাঁরা খুঁত লক্ষ্য করেন বেশি: 'তোর সবকিছুই আলাদা... তোর সমস্তকিছু অন্যদের মতো নয়...' ইত্যাদি। এরূপ নেতিবাচক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই গড়ে উঠে ব্যক্তিত্বের নেতিবাচক মডেল, যা শিশু ঘৃণা করতে আরম্ভ করে। তবে এই ঘৃণা নিজেতে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা যেহেতু এক সক্রিয় অনুভূতি সেই হেতু তা কোন-না-কোনভাবে তাদেরই বিরুদ্ধে যায় যাদের

সঙ্গে বাস্তব জীবনে শিশুর যোগাযোগ রয়েছে। নিজেকে ঘৃণা করতে গিয়ে সে অন্যদেরও ঘৃণার চোখে দেখে, এমনকি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরও। এই ভাবে, নেতিবাচক আত্মচেতনা নেতিবাচক নৈতিক গুণাবলি গড়ে তুলে, যা কোন-না-কোনভাবে মেলামেশার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করে।

শিশুকে তার সদ্‌গুণ সম্পর্কে বলতে আমরা ভয় পাই কেন? তার মধ্যে শিশুসুলভ আত্মগরিমা ও আত্মতুষ্টি দেখা দেবে — এই কথা ভেবে? সম্ভবত তাই।

কিন্তু এমতাবস্থায় হয়তো আপোসমূলক কোন সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। শিক্ষাদানের বাস্তব অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। সেরিওজা শিক্ষকের মতামত শোনার অপেক্ষায় ছিল। এখানে বলে রাখি যে সে তখন তার মর্মপীড়ার সেই তীব্রতার মধ্যে ছিল যা দেখা দেয় কিশোরের চরমপন্থার দরুন। সে ব্যক্তি হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, এবং এ ব্যাপারটি তাকে গুপ্ত আনন্দ দিচ্ছিল।

সে আপন 'অহং'-এর নতুন একটি মডেল গড়ছিল, এবং ঠিক এরূপ আত্মপ্রত্যাখ্যানে তার প্রয়োজন ছিল। তাকে বোঝানো উচিত ছিল, প্রত্যাখ্যানের এই প্রক্রিয়াটি কতটা মারাত্মক। তরুণ বয়সে প্রত্যাখ্যানের শক্তি যেমন সৃজনাত্মক, তেমনি ধ্বংসাত্মক। এই বিপদ সম্পর্কে কিশোরকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত।

নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আলোচনায় জটিলতা আছে। খেয়াল রাখতে হবে, আপনার কথাবার্তা যেন এরূপ গতি না নেয়: 'তুই অন্যদের গালাগালি করিস, আর নিজে তুই কীরূপ? অন্যদের সমালোচনা করার নৈতিক অধিকার তোর আছে কি?' এরূপ অবস্থান অবশ্য নেওয়া যায়, কিন্তু তা সবচেয়ে ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয় না, কেননা এরূপ মতাবস্থান কিশোরের মধ্যে মূল্যবান যাকিছু দেখা দিয়েছে তা ধ্বংস করে দিতে পারে। সেই জন্যই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শিক্ষকের ঝুঁকি নেওয়ার অধিকার নেই। উপায় কেবল একটি: প্রাণের সেই শক্তিশালী আবেগগত অবস্থাটিকে প্রকাশিত হতে দেওয়া, যা কিশোরকে নিজস্ব অনেকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হতে সাহায্য করবে।

শিক্ষক সেরিওজাকে জিজ্ঞেস করেন:

— তুই অন্যদের কাছে কঠোর দাবি হাজির করিস, এবং তা ভালো। কিন্তু তা হয়তো সহজ নয়... তোকে হয়তো তা করতে বেগ পেতে হয়?

— বুঝলাম না, — বলে সেরিওজা।

— আমার মনে হয়, তুই নিজের মধ্যে অনেককিছুকে ঘৃণা করিস এবং এই ঘৃণা তোর মধ্যেকার ভালো গুণগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে: বস্তুনিষ্ঠতা, বিচক্ষণতা এবং তোর সমস্ত দক্ষতা। তুই যদি নিজের মধ্যে সেরা সমস্তকিছু ধ্বংস করে দিস, তাহলে কী নিয়ে তুই আপন আদর্শে গিয়ে পৌঁছবি?

— বুঝলাম না, — শিক্ষকের চিন্তাধারার অসাধারণ গতিতে কৌতূহলী হয়ে উঠে আবার বলল সেরিওজা।

এই ভাবে শুরু হয় সেই আলোচনাটি যার মধ্য দিয়ে সেরিওজার বোঝা দরকার ছিল, মানুষ যদি নিজেকে সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত করতে পারে, যদি উচ্চ মানবীয় আদর্শ অর্জনে তার প্রবল বাসনা থাকে তাহলে তার সম্ভাবনা কী অপরিসীম।

একটি বার ভেবে দ্যাখুন, আপনার সন্তান বড় হয়ে আপনাকে কীসে অভিযুক্ত করতে পারে। আত্মচেতনার উচ্চ মান থাকলে আত্মপ্রতিষ্ঠারও উচ্চ মান থাকতে হবে। প্রায়ই আমরা এরূপ অবস্থা লক্ষ্য করি যখন শিশু সমস্তকিছু বোঝে, অথবা, সঠিকভাবে বললে, অনেককিছু সম্পর্কে যথেষ্ট সঠিক ধারণা রাখে, কিন্তু এই উপলব্ধ সঠিকতাকে সে অনেক কারণে কাজে লাগাতে সক্ষম নয়। প্রধান কারণটি — নিয়মিত শ্রমাভ্যাসের অভাব।

সমস্যা দেখা দেয়: কীভাবে শিশুর মধ্যে সর্বদা পরিশ্রম করার, সর্বদা নিজেকে নিয়ে খাটার অভ্যাস গড়ে তোলা যায়।

...কিশোর দু' সপ্তাহ প্রায় কিছুই করছে না। স্কুল থেকে ফেরার পর কখনও এ কাজে, কখনও সে কাজে হাত দেয়, কিন্তু পড়ার কাজে মোটেই মন নেই। তখন সে বিভিন্ন ধরনের অজুহাত দেখায়, হরেক রকমের টালবাহানা খাটায়: মাথা ধরেছে, পেট ব্যথা করছে, দিদিমণি পড়া দেন নি। এবং অবশেষে, সবচেয়ে প্রধান যুক্তি: 'আমি গোল্লা পাচ্ছি না!'

শিশুর সত্যিই এরূপ অবস্থা দেখা দেয় যখন সে ক্লান্ত হয়ে উঠে, যখন পড়াশোনার চাপ হঠাৎ পড়াশোনা করার অক্ষমতায় পর্যবসিত হয়। এ ধরনের অক্ষমতার আলস্যে পরিণত হওয়ার প্রবণতা থাকে। আর এটা হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক জিনিস। আলস্য বদ্ধমূল অভ্যাসে পরিণত হয়ে শিশুর জন্য স্থায়ী বিপদ ডেকে আনে। আজ অথবা কাল আপনাদের সন্তান অন্যান্য পরিশ্রমী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাজে পাল্লা দিতে না পেরে আপনাদেরই দোষ দেবে, শিক্ষাদানের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শনের জন্য আপনাদেরই অভিযুক্ত করবে। এ বিষয়ে এখনই তাকে বলা উচিত। বলা

উচিত বিনা শর্তে: 'আমি চাই না যে তোমায় মানুষ করার ব্যাপারে কঠোর না হওয়ার জন্য তুমি কোনদিন আমাদের অভিযুক্ত কর। আমি চাই না, তুমি নিজের কুঁড়েমির জন্য কষ্ট পাও। তাই উঠো এবং কাজ কোরো...'

নিজের সিদ্ধান্তে অবশ্যই অটল থাকতে হবে। শিশুর সঙ্গে অবশ্যই এমনভাবে কথা বলতে হবে যাতে আপনার কণ্ঠে আপনি যে উচিত কাজ করছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ অনুভূত না হয়। যুক্তিসঙ্গত দাবিতে শিশু মন সর্বদাই সাড়া দেবে। তার জানা উচিত যে জীবনে এমনকিছু নিয়ম আছে যা পালন করতে হয় বিনা শর্তে। এরূপই একটি নিয়ম হচ্ছে — নিয়মিত দৈনন্দিন শ্রম। মানুষের পক্ষে শ্রম খাদ্যের মতো, নিদ্রার মতো প্রয়োজনীয়, যাতে সে এ পৃথিবীতে বাস করতে পারে, যাতে সে তার মানবীয় সম্ভাবনাসমূহ কাজে লাগাতে পারে।

পরিশ্রম করার এই দাবিটিতেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত মানবিক শিক্ষার কার্যকর দিকটি।

মেয়ে এবং ছেলে

মেয়েদের বিষয়ে। মেয়ের মা-বাবা হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। আমরা মায়েরাও তো এক কালে ছোট ছোট মেয়ে ছিলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক সময় নিজের মেয়েকে বুঝতে খুব কষ্ট হয়। মেয়ের বয়স ষোলো বছর, তার কীসব বান্ধবী জুটেছে যাদের বিশ্বাস করা যায় না, সে সিগারেট খেতে শুরু করেছে, দু'বার বাড়িতে রাত কাটায় নি — বুদ্ধিহারা হওয়ার জন্য মা'র পক্ষে এই-ই যথেষ্ট। এবং তিনি বুদ্ধিহারা হলেনও। কিন্তু এমনকি বুদ্ধি হারিয়েও আমাদের চেতনা শক্তি টিকিয়ে রাখা উচিত।

আমরা মতিচ্ছন্ন মায়েদের অদম্য সক্রিয়তার বিরুদ্ধে। সবই ঘটে থাকে। ব্যাপার-স্যাপার অনেক সময় যা ভাবা হয় এমনকি তার চেয়েও অনেক মারাত্মক রূপ নেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মায়েদের মাথা ঠিক রাখা উচিত। তাঁদের চেতনা শক্তি লোপ পেলে চলবে না।

সময় সময় অতি শান্ত ও সরল মেয়ে হঠাৎ এত রহস্যময়ী হয়ে উঠে যে বড়রা কিছুতেই তার মনের কথা বুঝতে পারে না।

বছর কয়েক আগে উচ্চ শ্রেণীর কিছু ছাত্রী চোখ, ভুরু আর ঠোঁটে রঙ

লাগাতে শুরু করল। সে ছিল মহামারীর মতো ব্যাপার। মেয়েদের কত বোঝানো হল, তাদের কীর্তিকলাপ নিয়ে কত হাসাহাসি করা হল, কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। ক্লাস টিচার একদিন এক মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, কীসের জন্য সে চোখে, ভুরুতে ও ঠোঁটে রঙ লাগায়। তখন ছাত্রীটির মনে দেখা দিল মেয়েসুলভ আশংকা: পরিচিত ছেলেটির বয়স আঠারো বছর, আর তার নিজের বয়স পনেরো, তার বেণী আছে, সব সময় ভালো নম্বর পেয়ে আসছে, তার চোখগুলো একেবারে সাধারণ — সে আয়তলোচনা নয়; এবং ছেলেটি তার দিকে তাকায় না, আর তার মনে হয় যে একমাত্র এই ভাবে ছেলেটিকে আকৃষ্ট করা সম্ভব। মেয়েটি ঠিক সে কথাই বলল: 'ওর তা পছন্দ হয়।'

তারপর ঘণ্টা দুয়েকের মতো মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্তা হয়। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হল, ছেলেটির মন কাড়ার জন্য তাকে যদি মদ্যপান করতে হয়, সিগারেট টানতে ও অন্য কোন কুকাজ করতে হয় তাহলে সে কী করবে। প্রশ্নটি শুনে তরুণী একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তখনই তাকে বোঝানো হল যে পরের রুচির কাছে কখনও আত্মসমর্পণ করতে নেই, ব্যক্তি হিশেবে আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা উচিত এবং নিজের প্রতি নারীর শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন।

— ছেলেমেয়েদের মঙ্গলের জন্য আমরা সবকিছু করতে রাজী আছি।

— হ্যাঁ ঠিক কথাই বলেছেন, তবে অনেক সময় এই মঙ্গলের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে আমরা নিজের এবং আমাদের সন্তানের মধ্যেকার সেতুগুলো জ্বালিয়ে দিই। আর আমাদের কর্তব্য হচ্ছে — এই সেতুগুলো গড়া। তা গড়া উচিত সর্বদা, নিরবচ্ছিন্নভাবে।

...ক্লাস টেস্টের পরে শিক্ষিকা মেঝে থেকে ধামসানো একটুকরো কাগজ তুললেন এবং ওটা নকল ভেবে পড়তে লাগলেন। কিন্তু তা ছিল চিঠি — অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্র একটা মেয়েকে লিখেছে। ১৬ বছর বয়সী এই ডন জুয়ান ১৫ বছর বয়সী মেয়েকে তার সনাম চিঠিতে সযত্নে যাকিছু লিখেছে তা বলার অযোগ্য। তবে চিঠির বিষয়বস্তু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা জানত, কারণ এক সারি থেকে অন্য সারিতে ডাক পাঠানোর সময় পত্রালাপের গোপনীয়তা বজায় থাকে না।

ক্লাসের পরে ছেলেমেয়েরা একটি মিটিং ডাকল। তারা খুব তর্কাতর্কি করল, এমনকি একেবারে শান্ত ছেলেরাও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। মেয়েদের মধ্য

থেকে কেউ একজন পত্র-লেখককে জিজ্ঞেস করল: 'তোর বোনকে যদি কেউ এরূপ চিঠি লিখত তাহলে তুই কী করতি?' ছেলেটিকে বলা হল যে ছেলে হয়ে, পুরুষ হয়ে তার এরূপ জঘন্য কথা লেখা উচিত হয় নি, তদ্দ্বারা সে যাকে লিখেছে কেবল তাকেই অপমানিত করছে না, নিজের মা ও বোনকে, তার যেকোন প্রিয় মহিলাকেও অপমানিত করতে দিচ্ছে।

আর সেই মেয়েটি — যার নামে চিঠিখানা লেখা হয়েছিল — বেশ শান্তভাবেই বসে ছিল। তার মুখের ভাবটি দেখে মনে হল, একটু গ্রহণযোগ্য আকারে লিখিত হলে সে অনুরূপ প্রস্তাবে কোন আপত্তি করত না। মিটিং যখন শেষ হল শ্রেণী শিক্ষিকা মেয়েদের একটু থাকতে বললেন। তখন আলাপ শুরু হল নারীর মর্যাদা ও গর্ব নিয়ে, ছেলেদের কাছে সাফল্য এবং লভ্যতার মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে সে বিষয়ে। কেবল তখনই তার এরূপ ভীতি ও লজ্জা হল যে তাকে সবাই বিশ্বাস করে ফেলে — সে বুঝল যে সে অপমানিত, এবং এই অপমানের কথা অনেক দিন তার মনে থাকবে।

পছন্দ হওয়ার বাসনা— সে হচ্ছে নারীদের অন্যতম প্রধান ও চিরন্তন গুণ, তা তাদের যেকোন পরিস্থিতিতে হীন ও রুক্ষ না হতে সাহায্য করে। মেয়েদের অনেক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে এই বাসনাটিই থাকে, কিন্তু প্রায়ই তারা তাতে মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে বসে। আর যখন জীবনে কোন ব্যাপারে গভীর কোন আকর্ষণ নেই, তখন এই বাসনা সেই সমস্ত শোচনীয় পরিণাম ডেকে আনে যা আমাদের এত আশঙ্কিত করে। যৌবন থেকেই মর্যাদা রক্ষা করতে হয় — ১৬ বছর বয়সে ছেলেমেয়েরা এ নিয়ে তেমন গভীর চিন্তা করে না। ১৬ বছর বয়সে প্রায়ই মনে হয় যে আজ যদি, এক্ষুনি যদি সাফল্য ও সুখ না আসে, তাহলে আর কখনই আসবে না, এবং সেই জন্যই তা অনতিবিলম্বে অর্জন করা উচিত। ঠিক তখনই সবচেয়ে দুর্বলদের কাছে সমস্ত উপায়ই ভালো বলে মনে হয়। মেয়েরা ভাবতেও পারে না যে ছেলেরা পুরুষ হয়ে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে সাধারণত সেই সব তরুণীদেরই বিয়ে করে, যারা কম দৃশ্যমান ও দুর্লভ।

ভণ্ড হওয়ার দরকার নেই। এমনও ঘটে থাকে। কোন নারী অসফল প্রেমের জন্য কোন তরুণীকে দোষ দেবে না, পরে তার যতই কষ্ট হোক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কষ্ট ভোগ করতে হয় প্রেমের দরুন নয়, উদ্দেশ্যহীন কৌতূহলের জন্য, পরে দেরি হয়ে যাবে এই ভয়ে আগেই অনেককিছু জানার প্রচেষ্টার দরুন। কিন্তু প্রায়ই

তরুণী লক্ষ্য করে না যে সে খারাপ লোককে ভালোবাসে, তার কল্পনায় প্রিয় মানুষটি সেই সমস্ত গুণের অধিকারী হয়ে উঠে যা থেকে সে বঞ্চিত। অবশেষে ভালো ও বুদ্ধিমতী এক তরুণী প্রিয় মানুষটিকে সংশোধন করতে না পেরে ও নিজের কাছে ধরে রাখতে না পেরে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। 'আমায় কেবল বলবেন না যে ও খারাপ। সবাই তা বলছে, আর আমি ওকে ভালোবাসি। আমি সমস্তকিছু ক্ষমা করতে প্রস্তুত। ও কেবল আমার কাছে আসুক। আমার সঙ্গে ও সুখে থাকবে।'

এরূপও ঘটে। এখানে বলার কী আছে? তরুণীটি তাকে শোধরাতে তো পারবেই না, বরং নিজেকেই হীন করবে।

সর্বকালে সর্বদেশে ভালোবাসা হচ্ছে নারীর জীবনে সবচেয়ে বড় জিনিস। ভালোবাসা তার অস্তিত্বকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলে। তবে নারীর জীবনে এমনও মুহূর্ত আসে যখন সে বুঝতে পারে যে সে অন্যের অপ্রিয়। তখন সমস্তকিছু ছিন্ন ক'রে এবং কেবল নিজের মর্যাদা বোধ বাঁচিয়ে রেখে তার চলে যাওয়া উচিত। মেয়েদের এটা জানা থাকা দরকার। তাহলে যৌবনে ট্র্যাজেডি কম হবে। যখন অন্যকে বেশি পছন্দ করা হয়, তখনও তরুণীকে মানুষ থাকতে, তার মনুষ্যত্ব বজায় রাখতে পারা চাই। কিন্তু আমরা বাড়ি বা স্কুলে আমাদের মেয়েদের তা শেখাই না।

আজ যখন কেউ কেউ নারীদের অবলা বলে অভিহিত করে তখন হাসি পায়। কেবল শক্তি আর গর্ববোধ, যেকোন পরিস্থিতিতে মানুষ থাকতে পারার ক্ষমতাই নারীকে সুন্দরী করে তুলে। মেয়েদের জানা উচিত যে নারী হওয়া কত ভালো।

আমাদের মনে হয় যে সবচেয়ে কঠিন কলাটি হচ্ছে — মেয়ের বন্ধু হয়ে থাকা। বান্ধবী নয়, ঠিক বন্ধু। আর মেয়েরা যাতে আমাদের বিশ্বাস করে তার জন্য এমনকি মনে মনেও ভাবা উচিত নয় যে তারা আমাদের চেয়ে খারাপ। তারা ভিন্ন, তারা অন্য কালের, তারা যাতে আমাদের দশম শ্রেণীতে বিশ্বাস করে সেই জন্য তাদের প্রথম শ্রেণীতে বুঝতে পারা উচিত। তাদের প্রতি সম্পর্কে অলঘুচিত্ত হতে হবে। কীভাবে নারী হওয়া যায় — এ হচ্ছে বিরাট এক বিজ্ঞান। তা অধ্যয়নের পক্ষে সময় সময় পুরো একটি মানব জীবনও যথেষ্ট নয়। তাই, মায়েরা, আসুন, নিজের মেয়েদের সঙ্গে, প্রতিবার নতুন ক'রে আমরা এই বিজ্ঞানটি রপ্ত করি এবং নিরালায় ঘন ঘন সেই সময়টির কথা স্মরণ করি, যখন আমরাও মেয়ে ছিলাম।

ছেলেরা। আপনি কি কখনও ভেবেছেন যে আগে হোক অথবা পরে হোক

আপনার ছেলেকে একদিন পুরুষ হতে হবে, তাকে সেই ব্যক্তি হতে হবে যাকে প্রাচীন কালে মানবকুলের শক্তিশালী অংশ এবং এমনকি জাতির শ্রেষ্ঠাংশ বলে অভিহিত করা হত?

এ কোন আলঙ্কারিক কথা নয়, সম্পূর্ণ বাস্তব প্রশ্ন।

একবার আমরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভ্রমণাভিযানে গিয়েছিলাম। অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখি, অনেক ভালো ভালো লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। এক কথায়, প্রায় সবকিছুই ভালো চলছিল। প্রায় সবকিছু, তবে সমস্তকিছু নয়।

...একদিন আমরা পর্যটন শিবির থেকে দূরযাত্রার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা আগুপিছু না ভেবে সবচেয়ে লম্বা পথটি ধরলাম, এবং সাধারণ হিসাব অনুযায়ী, সে দিন আমরা প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার হেঁটেছি। আমরা যে কী ক্লান্ত হয়েছিলাম সে কথা না বললেই চলে। আমরা গ্রামে পৌঁছেছিলাম কোন মতে, কেবল এক অভিমানের জোরে। ফেরার পথে, যখন আমাদের মেয়েদের শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছিল, ছেলেরা পুরুষের মতো জোর কদমে পথ চলতে থাকে এবং আমাদের সবাইকে পেছনে রেখে আগে গ্রামে ফিরে যায়। এ কথাটি তাদের মাথায়ও আসে নি যে অভিযানের সময় তামাসা, হাসিঠাট্টা, এমনকি পাশে চলা নীরব একটি ছেলেও কত বড় সমর্থন, মেয়েদের এবং তাদের নিজেদেরও তাতে কত প্রয়োজন! কিন্তু তারা চলছিল পেছন পানে না তাকিয়ে। তাদের দৃষ্টি ছিল কেবল সামনের দিকে। কিন্তু তা যে কত অন্যায় সেটা ছেলেরা বুঝে নি, বুঝতে পারে নি।

— আসল সুখ তো তখন, যখন আমায় কেউ বোঝে। ছেলেমেয়েদের আমাদেরকে বোঝা উচিত, তাদের বোঝা উচিত আমাদের ক্লান্তি, তাদের নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা।

— সুখ মেলে তখনই যখন আপনায় কেউ বোঝে? সত্যি কথা, তবে প্রকৃত সুখ কেবল পারস্পরিকতায়, আর তার মানে আমাদেরও ছেলেমেয়েদেরকে বুঝতে হবে।

মায়েরা ছেলেদের জন্ম দেন, এবং তাদের অনেকে একদিন পুরুষ হবে, শক্তিশালী, সাহসী ও দায়িত্বশীল লোক হবে, যারা নিজের পরিবার, নিজের মাতৃভূমি রক্ষা করবে, যারা সত্যিই হচ্ছে জাতির শক্তি ও গৌরব, আর অনেকে আবার বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুই থেকে যাবে — যারা আত্মবিশ্বাসহীন, নিজের দুর্বলতা ভালোবাসে এবং এই দুর্বলতার দরুন হামেশা নিজের

অসুখী বান্ধবী, স্ত্রী, মা ও মেয়েদের আপন পৌরুষিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পুরুষোচিত গুণাবলিকে অনেকেই আজ সেকেলে কোনকিছু বলে গণ্য করে, তা দেখলে লজ্জাবোধ করে।

পূর্বোক্ত অভিযানে ছেলেদের আচরণ নিয়ে তর্ক শুরু হলে ছেলেরা আমাদের বলল যে কঠিন মুহূর্তে, প্রকৃত অগ্নিপরীক্ষার সময় তারা কাউকে ত্যাগ করবে না। কিন্তু অগ্নিপরীক্ষার সময়টি না-ও তো আসতে পারে, এবং তা যাতে কখনও না আসে তার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। প্রাত্যহিক জীবন গঠিত হয় খুঁটিনাটি ব্যাপার দিয়ে, এবং খুঁটিনাটি ব্যাপারেই প্রকটিত হয় চরিত্রের বীরত্বপূর্ণ ও স্বার্থপর দিকগুলো। আমরা যদি চূড়ান্ত মুহূর্তের জন্য নিজেদের সেরা গুণাবলি রেখে দিয়ে বর্তমানে কোন রকমে বেঁচে থাকি, তাহলে আমরা চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌঁছব শূন্য হাতে। জীবন — এ কোন রচনা নয়, তাতে কাটাকুটি করা পাণ্ডুলিপির কোন স্থান নেই।

পেশা নির্বাচন

মানুষ গৃহীত শত শত, হাজার হাজার সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনটিরই আপন তাৎপর্য, ভূমিকা আর অদৃষ্টের উপর প্রভাবের বিচারে এই সিদ্ধান্তটির সঙ্গে কোন তুলনা হয় না: কী হব, কোন্ পথে চলব, কোন্ ক্ষেত্রে থেকে মানুষের সেবা করব।

দক্ষতার উৎপত্তির সঙ্গে জড়িত জটিল প্রশ্নাদির গভীরে যাব না। আমরা কেবল বাস্তবতার দিকেই দৃষ্টি রাখব, যার সঙ্গে মা-বাবা ও প্রত্যেক শিক্ষক সুপরিচিত। অষ্টম বা দশম শ্রেণীর স্কুল শেষ করা ছেলেমেয়েদের মধ্যে একেবারে এক রকমের এমনকি দু' জনও হয় না। প্রত্যেকের আছে নিজস্ব ঝোঁক, প্রবণতা, দক্ষতা, আর সময় সময় মেধা ও কখনও কখনও প্রতিভা। জীবনের পথ নির্বাচিত হওয়া উচিত সর্বাগ্রে এগুলো দিয়ে।

পেশাগত, প্রযুক্তিগত

'কারখানার জন্য চাই: ফিটার মিস্ত্রি, টার্নার, মিলিং মেশিন অপারেটর, গ্রাইন্ডার...' 'নির্মাণ ক্ষেত্রে ক্রেন-চালক, ফিটার আর কংক্রিট ওয়ার্কার-এর দরকার আছে...' সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু শহরেই এরূপ বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত বিপ্লব বদলে দিয়েছে খোদ শ্রমের চরিত্র। প্রতি বছর শত শত পুরনো পেশার বিলোপ ঘটে এবং দেখা দেয় শত শত নতুন পেশা। অতি প্রাচীন ও প্রচলিত পেশাগুলো নতুন সারে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে।

দেশে প্রচুর সংখ্যক সমর্থ ও দক্ষহস্ত শ্রমিকের প্রয়োজন আছে।

তবে আধুনিক উৎপাদন ৪ বা ৫ ক্লাস শেষ করা লোককে কাজ দিতে পারে না। শ্রমের উৎপাদনশীলতা সরাসরিভাবে নির্ভর করে কর্মরত জনসংখ্যার প্রধান অংশটির শিক্ষার মানের উপর। মাধ্যমিক শিক্ষাসম্পন্ন শ্রমিক ২ গুণ দ্রুত গতিতে তার দক্ষতা বৃদ্ধি করে, ৫ গুণ বেশি র‍্যাশনালিজেশন প্রস্তাব দেয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত জ্ঞান এবং বৈষয়িক উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় সে জ্ঞান সৃজনমূলকভাবে প্রয়োগ করতে পারার ক্ষমতা — এ দুই-ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। নতুন প্রযুক্তি উন্নত ও বিকশিত হচ্ছে কেবল ইঞ্জিনিয়র আর ডিজাইনারদের মেধাগত প্রয়াসের কল্যাণেই নয়, কোটি কোটি শিক্ষিত শ্রমিকের সমষ্টিগত বুদ্ধির কল্যাণেও।

যে-কাজে চিন্তা ও বুদ্ধির দরকার হয় না, শিক্ষিত কোন ব্যক্তি সে-কাজ ক'রে তৃপ্তি লাভ করে কচিৎ। কেবল নিজের জ্ঞানের সৃজনমূলক প্রয়োগের প্রক্রিয়ায়ই সে নৈতিক পরিতৃপ্তি পায়, আত্মিক দিক থেকে বিকশিত হয় এবং আনন্দপূর্ণ জীবন যাপন করে।

সুতরাং তরুণ শ্রমিকদের সাধারণ শিক্ষার উচ্চ মান — এ হচ্ছে তাদের প্রেরণাপ্রাপ্ত সৃজনশীল শ্রম, তাদের সর্বাঙ্গীণ ও সঙ্গতিপূর্ণ বিকাশ এবং তাদের নৈতিক সংস্কৃতির উচ্চ মানের প্রধান শর্ত।

সোভিয়েত স্কুল মানুষকে তার শিক্ষাকার্য অব্যাহত রাখার প্রতি প্রবণ করে তুলে তার জ্ঞান পিপাসা বৃদ্ধি করে, সাংস্কৃতিক চাহিদা গড়ে তুলে। কেবল জ্ঞানার্জনে প্রয়াসী ব্যক্তিই সর্বাঙ্গীণ ও সঙ্গতিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে এবং সমাজের সবচেয়ে বেশি উপকার করতে পারে।

আজ সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতীয় অর্থনীতির জন্য দক্ষ শ্রমিক গড়ার কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করছে পেশা ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ব্যবস্থা। দেশে আছে অনেক পেশা ও প্রযুক্তিগত স্কুল, ওগুলোতে ছয় সহস্রাধিক রকমের শিক্ষা দান করা হয়। প্রতি বছর এই সমস্ত স্কুল সমাপ্ত করে ২০ লক্ষাধিক তরুণ-তরুণী। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ত্রিবার্ষিক এবং এমনকি চতুর্বার্ষিক শিক্ষার মাধ্যমিক পেশা ও প্রযুক্তিগত স্কুলের সংখ্যা নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ওগুলোর পাঠ্য ও বৈষয়িক ভিত্তি সাধারণত খুবই মজবুত, ওখানে শিক্ষকতা করেন সুদক্ষ শিক্ষক আর ইঞ্জিনিয়ররা। স্কুলগুলো পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষাসম্পন্ন শ্রমিক, দক্ষ শ্রমিক প্রস্তুত করে, এবং এদের শ্রম বস্তুতপক্ষে ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তিগত কর্মীদের শ্রমের চরিত্র গ্রহণ করে।

আধুনিক পেশা ও প্রযুক্তিগত স্কুল — এ হচ্ছে টেকনিকেল কলেজের মতো, অর্থাৎ বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো স্কুল। তাই মাধ্যমিক পেশা ও প্রযুক্তিগত স্কুলের ১০ শতাংশ সেরা স্নাতককে প্রতি বছর উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়ে থাকে তরুণ-তরুণীদের নৈতিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাদির দিকে। খোদ মানুষের সংস্কৃতি, তার শিক্ষার মান, কর্মিদলের প্রতি তার মনোভাব — এ জিনিসগুলোর দিকে নজর না দিয়ে মাধ্যমিক পেশা ও প্রযুক্তিগত স্কুলগুলোতে তরুণ শ্রমিক গড়ার কাজ চালানো অসম্ভব।

ওরা হবে মা-বাবা

বহু কাল থেকেই তর্ক চলছে: শিশু — কিশোর — তরুণকে পারিবারিক জীবনের জন্য প্রস্তুত করা উচিত কি উচিত নয়? কেউ কেউ বলে: আপনারা স্রেফ ভালো, উদার, প্রাণোচ্ছল মানুষ গড়ুন, যার থাকেবে উচ্চ দায়িত্ব বোধ — এবং এরূপ লোকেই আদর্শ স্বামী হবে। অন্যরা আপত্তি করে: তা আপনারা আদালতে, বিবাহ বিচ্ছেদের প্রক্রিয়ায় এরূপ ভালো ও বুদ্ধিমান লোক কি কম দেখেছেন? না, অন্যান্য সমস্তকিছু ছাড়া মানুষের মধ্যে সেই সব গুণও গড়ে তোলা উচিত যা বিবাহে, পারিবারিক জীবনে খুবই প্রয়োজনীয়। তখন বিরোধীরা বলে: কিশোরের কাছে, তরুণের কাছে আগে থেকেই বড়দের জগৎটি খুলে লাভ কী? তারা তা নিজেই খুলুক! বিশেষ পারিবারিক জীবনের জন্য প্রস্তুতির পক্ষ সমর্থকরা বলে: তারা যদি অন্ধের মতো এই জগতে প্রবেশ করে, জীবনের বই পড়ার বদলে তারা যদি সেখানে বর্ণমালা শেখার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তাহলে লাভটা কী হবে?

এবং আমরা, বলাই বাহুল্য, তাদের দলের লোক।

কিন্তু এর মানেটা কী — তরুণ-তরুণীদের ভালো স্বামী-স্ত্রী করে তোলা, তাদের পারিবারিক জীবনের জন্য প্রস্তুত করে তোলা? শুরুতে এরূপ একটা সংজ্ঞা নেওয়া যাক: 'তথাকথিত 'যৌন শিক্ষা' পরিভাষাটির সবচেয়ে পূর্ণ ও গভীর অর্থে — এ হচ্ছে সর্বাগ্রে মানুষের অনুভূতি, অভিপ্রায় আর আচরণের সংস্কৃতি গঠন, ব্যক্তির নৈতিক ও কান্তিগত ভিত্তি নির্মাণ। তা শুরু হওয়া উচিত শিশুর জীবনের প্রথম বছরগুলো থেকে...'

তার মানে, পারিবারিক শিক্ষা ('ভাবী সংসারী লোক গড়া' কথাটি বোঝানোর জন্য আমরা এই পরিভাষাটিই ব্যবহার করব) শুরু করা দরকার প্রাক্‌স্কুল বয়সে? বেশি আগে হয়ে যাচ্ছে না? না, আগে নয়। কারণ পারিবারিক জীবনের জন্য প্রস্তুত করা মানে হচ্ছে সর্বাগ্রে উদার ও হিতৈষী করে তোলা, সাথীত্বের অনুভূতি গড়ে তোলা।

কোন এক পরিবারের কথা ধরা যাক। স্বামী, স্ত্রী, দুই সন্তান। তাদের জীবনটি সুশৃঙ্খল, প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। বাড়ি সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সমস্তকিছু গোছানো। লোকজন এলে আদর-আপ্যায়নে কোন ত্রুটি হয় না। তারা সানন্দে ও সাগ্রহে অতিথিদের বরণ করে... কিন্তু তা সত্ত্বেও এই লোকেদের কাছে ঘন ঘন যেতে ইচ্ছে করে না। তার কারণ, অভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় আধ ঘণ্টা যেতে না যেতেই শুরু হয় পারস্পরিক নিন্দা আর বিদ্রূপ, ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য। পরস্পরের বিষয়ে অশ্রদ্ধা ও অবহেলার সঙ্গে কথা বলে তারা যেন আনন্দ লাভ করে। তখন তারা সাধারণত কারো নাম নেয় না, কেবল সর্বনাম ব্যবহার করে: সে, ও। এরূপ সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে বহুকাল আগেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে, এবং এটাকে তারা পারিবারিক গরমিল ও অশান্তির লক্ষণ বলে গণ্য করে না। পরস্পরকে খোঁটা দেওয়া, অপমানকর কথা শোনানো — এ ব্যাপারগুলো তাদের সম্পর্কের, তাদের জীবনের নিয়মে পরিণত হয়েছে। সেই জন্যই এই 'আরামদায়ক', অতিথিপরায়ণ বাড়িটিতে যেতে ইচ্ছে করে না।

তাদের বাড়িতে কি সর্বদাই এরূপ অস্বস্তিকর পরিবেশ ছিল অথবা তা কাল প্রবাহে গড়ে উঠেছে? সম্ভবত এরূপ পারস্পরিক অশ্রদ্ধার কারণটি হচ্ছে এই যে ছোটবেলায় স্বামী-স্ত্রী দু'জনের কাউকেই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক কী জিনিস তা শেখানো হয় নি।

ছেলে ও মেয়েদের, তরুণ ও তরুণীদের পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে শেখানো উচিত। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমাদের সন্তানদের মধ্যে প্রকৃত সৌহার্দ্য বোধ গড়ে তোলা, এবং তা পরবর্তী কালে স্বাভাবিক পারিবারিক পরিবেশের জন্য দৃঢ় ভিত্তি গড়ে দেবে।

— আপনার কি মনে হয় না যে আজকালকার কিশোর-কিশোরীরা আগে প্রেমে পড়ে, আগে থেকে যৌন সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত প্রশ্নাদি নিয়ে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করে?

— অবশ্যই। অন্য রকম হতেও পারে না। অ্যাক্‌সেলেরাশন মানেই হচ্ছে সমস্ত ফলাফল সহ যৌন পরিণতি দ্রুতকরণ।

— তাহলে কী করা?

— সত্যকে স্বীকার করা এবং আধুনিক ছেলেমেয়েরা যেমনটি আছে, ঠিক সেই ভাবেই তাদের গ্রহণ করা! আপনি তাদের যে রূপে দেখতে চান সেভাবে গ্রহণ করলে চলবে না। পারিবারিক জীবনের জন্য প্রস্তুতি — এ শ্রমের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে কোন অংশেই কম কঠিন ও কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়।

...ছোট্ট ছেলেটি দুঃখ পেয়েছে কাঁদছে। 'কি রে তোর হলটা কী, মেয়েলোকের মতো কাঁদছিস যে!' — বলেন বাবা। তিনি — পুরুষ, স্বামী ও পিতা — একটি ভুল পদক্ষেপ করলেন: নারীর প্রতি — মা ও স্ত্রীর প্রতি অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন। এরূপ তরুণ কি সহৃদয় স্বামী হতে পারে?

...মা, বাবা ও ছোট ছেলে। তিনজনই রাস্তা দিয়ে চলছে, হাসছে। পরে ছেলেটি কী যেন চাইল, জেদ করতে লাগল। মা তাকে আঙুল দেখিয়ে হুমকি দেন। ছেলে ঘুষি পাকায়। আর বাবা? এক্ষুনি হাত ধরে ওকে থামাবেন... কিন্তু থামালেন না।

...একটা মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে সাইকেল কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে। তার খুবই কষ্ট হচ্ছে। পাশ দিয়ে যাচ্ছে একটি ছেলে। সাহায্য করা তো দূরের কথা, সে এমনকি ফিরেও তাকাল না। মনে মনে সব ছেলেই বীর পুরুষ। যদি তারা সবাই বীর হয়ে না উঠে, তাহলে সেজন্য আমরা বড়রাই দায়ী।

বিখ্যাত পোলিশ শিক্ষাবিদ ইয়ানুশ কর্চাক তাঁর 'প্রেম' নামক প্রশিক্ষণমূলক গল্পটিতে এক মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বলছেন: 'তুই মিছেই ছেলেদের ঘৃণা করিস, মিছেই তুই ভাবছিস যে তারা সবাই রুক্ষ, কর্কশ ও নির্দয়। তারাও তো ভাবে যে সব মেয়েরা নিন্দুক, বাচাল আর মুখ ভেংচাতে ওস্তাদ।' এবং অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ তাঁর বক্তব্যটি শেষ করেন এরূপ উপদেশমূলক তামাসা দিয়ে: 'ওরা খারাপ নয়, ওরা স্রেফ অন্য রকম।'

এই পারস্পরিক সতর্কতা নিয়ে হাসাহাসি করা যায়, এই উদাসীনতার প্রতি উদাসীন থাকা যায়। কিন্তু তা কি এরূপ এক বিচ্ছিন্নতার মনোভাব গড়ে তুলবে না যা পরে দূর করা খুবই কঠিন হবে?

...ভ্রমণাভিযান, স্নান-সাঁতার, জলের নীলিমা, তৃণের সৌরভ। এবং অবশ্যই ক্যাম্প ফায়ার, সামান্য রান্নাবান্না, গিটার বাজিয়ে গান, ফুটবল খেলা। নতুন নতুন স্থান ও সুন্দর সুন্দর ভূদৃশ্য দর্শনের পর প্রভাবের তীব্রতা। ঠাট্টা-তামাসা, হাসি, আনন্দফুর্তি। তা মৈত্রী আর সৌহার্দ্য না গড়ে পারে কি? এরূপ সম্পর্ক একবার গড়ে উঠলে তা সম্ভবত সুদীর্ঘ কাল টিকে থাকবে।

এই শিশুসুলভ মৈত্রীতে স্রেফ বাহ্যিক লক্ষণ জনিত প্রেমাসক্তি যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়, সত্যকে বোঝার সেই ক্ষমতা গড়ে উঠে যা পরে তাদের ব্যক্তিগত জীবনে খুব কাজে লাগবে।

ফিল্ম বা নাটক দেখার পর তর্কবিতর্ক ও প্রেমের অর্থ সম্পর্কে, দু'জনের সম্পর্কের বিষয়ে, পারিবারিক জীবনের নিয়ম ও নীতি সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনার সুপরিবেশ সৃষ্টি করে।

কিশোরদের আচরণের সংস্কৃতি নিঃসন্দেহেই ভাবী বর-কনে আর স্বামী-স্ত্রীর জন্য অনেককিছু নির্ধারণ করে।

আলাপ করতে পারা, কথা বলতে পারা, কথাবার্তা বলার সময় অস্বস্তি বোধ না করা ও মুখ না বাঁকানো, স্বচ্ছন্দে ও মর্যাদার সঙ্গে মনের ভাব প্রকাশ করা — শিশু কাল থেকে এই শিক্ষাটি রপ্ত করতে পারলে তরুণ-তরুণীরা বড়দের কাছে কত কৃতজ্ঞ থাকবে!

নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে, বিবাহ ও পরিবারের বিষয়ে তরুণদের দৃষ্টিভঙ্গি গবেষণা ক'রে সমাজবিজ্ঞানীরা বেশকিছু চিত্তাকর্ষক তথ্য লাভ করেছেন। তাঁরা দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে তরুণদের তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন।

প্রথম টাইপ — সঙ্গতিপরায়ণ। এদের থাকে সুগঠিত নৈতিক ধারণা, বিকশিত বোধের-সংস্কৃতি, যুক্তিসিদ্ধ আচরণ। এবং এর ফল স্বরূপ — প্রেমের প্রতি, তরুণের (অথবা তরুণীর) প্রতি, ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবনের প্রতি স্বাভাবিক মনোভাব।

দ্বিতীয় টাইপ — অতিশয় রোমাণ্টিক বা কল্পনা বিলাসী। এদের থাকে আদর্শায়িত ধারণা, 'পুঁথিগত' ধারণা, বাস্তব জীবনের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। এই ধরনের তরুণ বা তরুণীরা প্রায়ই বাস্তব পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে অক্ষম, তখন তারা তাদের বদ্ধমূল ধারণা আর বাস্তবতার মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের কেউ কেউ এক চরমাবস্থা থেকে সঙ্গে সঙ্গে অন্য চরমাবস্থায় পতিত হয়: এত কাল যে সুন্দর ও উদাত্ত প্রেমে বিশ্বাস করেছে হঠাৎ তাতে পূর্ণ অবিশ্বাস দেখা দেয়।

তৃতীয় টাইপ — আত্মিক দিক থেকে নিঃস্ব। এদের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পর্কে সরলীকৃত ধারণা লক্ষ্য করা যায়। তরুণ-তরুণীরা (এবং বিশেষত তরুণরা) এই সম্পর্কে কেবল এক দৈহিক আকর্ষণ অনুভব করে, শারীরিক চাহিদা পূরণের উপায় দেখতে পায়।

প্রথম ক্ষেত্রে শিক্ষকের কাজটি খুবই সহজ: যুবক বা যুবতী যদি নৈতিক পরিণতি লাভ করে থাকে এবং নির্ভুল ধারণার অধিকারী হয়, তাহলে তাকে কেবল এটাই বোঝানো দরকার যে তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই, প্রেম-ভালোবাসা অবশ্যই আসবে, আসল কথা হচ্ছে সে যেন তার নীতিগুলোর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে, এবং তখনই প্রকৃত ও গভীর অনুভূতি দেখা দেবে।

অবশ্য এখানে সবকিছু তেমন সহজ নয়। সর্বদা সঙ্গে সঙ্গেই ভালোবাসার যোগ্য লোকের সাক্ষাৎ ঘটে না। অনেক সময় নিরাশও হতে হয়, যন্ত্রণাও ভোগ করতে হয়। এমনও ঘটে যে অযোগ্য লোকের সংস্পর্শে এসে অথবা প্রতিকূল পরিস্থিতি হেতু ধারণার সঙ্গতি নষ্ট হয়ে যায়, ধারণা বিকৃত আকার ধারণ করে। এমতাবস্থায় শিক্ষক ও মা-বাবাদের প্রচুর খাটতে হয়: তখন তরুণ বা তরুণীর পূর্বেকার দৃষ্টিভঙ্গিতে আবার বিশ্বাস জাগানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। আগের দৃষ্টিভঙ্গির সুদৃঢ় ভিত্তি থাকলে তরুণ প্রায়ই প্রেমের প্রতি, পারিবারিক জীবনের প্রতি ফের স্বাভাবিক মনোভাব পোষণ করার শক্তি খুঁজে পায়।

'ভাববাদীদের' ক্ষেত্রে ব্যাপারটি কিন্তু অনেক জটিল। এদের ধ্যানধারণায় বাস্তবতার উপাদান ঢোকাতে হয়। প্রেমের জটিলতা সম্পর্কে, পারিবারিক জীবনের কষ্টকাঠিন্য সম্পর্কে এদের সঙ্গে হয়তো অন্যদের চেয়ে বেশিই বলা উচিত। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে এ কাজটি সময় মতো না করলে পরে তরুণ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জীবন দুর্বিষহ করে তুলতে পারে। একেবারে তরুণ বয়সে অধিক সংখ্যক বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে ঠিক এই কারণেই — আদর্শ এবং বাস্তবতার মধ্যে বৈসাদৃশ্য হেতু।

তা সাধারণত এই ভাবে ঘটে। শুরুতে তরুণ দম্পতি মহাসুখে পারিবারিক জীবনের নতুন নতুন মাধুর্য আবিষ্কার করে। কিন্তু যেই পারিবারিক সুখের সমস্ত দিক আবিষ্কৃত হয়ে যায়, অমনি দাম্পত্য জীবনের নতুনত্ব ধীরে ধীরে অপসৃত হতে আরম্ভ করে। তখনই সমস্ত দোষত্রুটি আর খুঁত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে যা সৌহার্দ্যের সময় চোখে পড়ে নি। জীবন হচ্ছে জীবন। মানুষ দোষত্রুটি আর দুর্বলতা নিয়ে গঠিত। তার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

যাদের শিক্ষা দেওয়া, আর সঠিকভাবে বললে পুনর্শিক্ষা দেওয়া সবচেয়ে কঠিন, তারা হল সেই 'বাস্তববাদীরা' যারা আত্মিকতাকে মোটেই নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্পর্কের অপরিহার্য উপাদান বলে গণ্য করে না।

'রোমাণ্টিককে' জীবন অবশেষে বাঞ্ছিত ও বাস্তবের মধ্যে সঙ্গতি রাখতে শিখিয়েও দিতে পারে, কিন্তু রোমাণ্টিজম থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি কখনও সেই সমস্ত সমৃদ্ধ অনুভূতির আস্বাদই পাবে না যা জোগাতে পারে কেবল অনুপ্রাণিত বোধ শক্তি।

জীবনে প্রায়ই এরূপ ঘটে: কেউ কেউ ভালোবাসে প্রবলভাবে, আন্তরিকভাবে, মনপ্রাণ দিয়ে, নিজের চারিদিকে আবেগময় একটি জগৎ গড়ে তুলে, এবং এই জগতে গাইতে, হাসতে, ঠাট্টাতামাসা করতে ইচ্ছে করে। অন্যরাও ভালোবাসে। কিন্তু সে ভালোবাসা কীরূপ? বিরক্তিকর। অনুজ্জ্বল। নীরস। তা জ্বলে না, কোন মতে মিট মিট করে। কিন্তু তা-ও ভালোবাসা, তবে তার পাশে আরাম নেই, শীত শীত করে। অনুভূতি কোত্থেকে আসে? অবশ্যই এখানে মানুষ অনেককিছুই পায় প্রকৃতির কাছ থেকে। তবে মনস্তত্ত্ববিদ আর শিক্ষাবিদদের অসংখ্য গবেষণা এবং খোদ প্রাত্যহিক জীবন দেখিয়ে দিয়েছে যে আবেগের অঙ্কুরগুলো বিকশিত করা যায়। একেবারে শৈশবে তা করতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়।

শিশু ভালোবাসার পিয়াসী। মা-বাবার স্নেহমমতা ও সুন্দর হাসি — এ সবই হচ্ছে ভালোবাসার পাঠশালা। মা ও বাবাকে পরস্পরের সঙ্গে বন্ধনকারী অনুভূতিগুলোই শিশুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মা-বাবারা ছেলেমেয়ের সামনে এই সমস্ত অনুভূতি প্রকাশ করতে প্রায়ই কেন যেন লজ্জাবোধ করেন। এমনও দেখা যায় যে স্বামী স্ত্রীকে আলিঙ্গন করছেন, তাঁকে চুমু দিতে চাইছেন, কিন্তু স্ত্রী স্তম্ভিত হয়ে সরে পড়েন: 'তুমি কী করছ? এখানে বাচ্চাগুলো যে রয়েছে।' কিন্তু তাতে হল কী? এরূপ খোলাখুলি ভালোবাসা কি শিশুদের জন্য চমৎকার এক উদাহরণ হবে না?

শিশুর ব্যক্তিত্ব সর্বাগ্রে গড়ে উঠে দাম্পত্য জীবন সৃষ্ট মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশে। এই পরিবেশ হচ্ছে পারিবারিক সচ্ছলতার প্রথম আবেগগত বুনিয়াদ। এখানে কথা হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের বিষয়ে, দু'জনের ভালোবাসার বিষয়ে।

— আচ্ছা বল্ তো মা, তোর এ সবে কী দরকার?
— মা-মণি, আমি যে ওকে ভালোবাসি...
— ক্লাস নাইনে থাকতেই?!
— কিন্তু আমরা তো এমন কোনকিছু করছি না...
— তা হলেও...

— আচ্ছা মা বলো তো দেখি, কেবল সত্যি ক'রে বলো, কবে তুমি আর বাবা চুমো খাওয়া-খাওয়ি শুরু করেছিলে? তোমার বয়স তখন কত বছর ছিল?

— যত সব আজেবাজে কথা জিজ্ঞেস করছিস...

— মা-মণি, তবুও বলো না! সত্যি ক'রে বলো!..

— এই ধর, বছর ষোলো হয়েছিল... কিন্তু সে যে অন্য সময় ছিল, বুঝলি?

— বুঝলাম: তোমাদের প্রেম করার ইচ্ছে ছিল, তোমাদের প্রিয়ের সঙ্গে চুমু খাওয়ার ইচ্ছে হত, আর আমাদের কিনা ওসবে দরকার নেই? আমাদের কেবল পড়াশোনা নিয়ে থাকতে হবে!

সন্তানের প্রতি নতুন ভালোবাসার আবির্ভাব ঘটার পরও এই ভালোবাসাটি টিকিয়ে রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ! প্রায়ই এমনটিও দেখা যায়। স্নেহভরা কথা, মুগ্ধ দৃষ্টি, অনুভূতির তীব্রতা — এ সমস্তকিছু প্রথম সন্তানের জন্মের পূর্ব মুহূর্ত অবধিই টিকে থাকে। আর পরে সমস্ত মনোযোগ, চিন্তা, স্নেহমমতা -- কেবল তার জন্য। অনেক স্বামী-স্ত্রী ঠিক এরূপই ভাবেন যে নারী ও পুরুষের ভালোবাসা স্বাভাবিকভাবে রূপান্তরিত হয় সন্তানের প্রতি উভয়ের ভালোবাসায়। না, তা ঠিক নয়। যখন মা ও বাবা পরস্পরকে ভালোবাসেন, তখন শিশু যেন তাঁদের ভালোবাসা শুষে নেয়, সে আপন অন্তরে ওই ভালোবাসা ধারণ করে। কিন্তু যখনই পিতামাতার পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে অনুভূতি চলে যায়, তখন কেবল বড়দের জন্যই নয়, শিশুদের জন্যও পৃথিবী ম্লান হয়ে আসে। কেবল কাগজে-পত্রে বিদ্যমান এরূপ পরিবারে শিশুর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর পরিবেশ বিরাজ করে, — সে হচ্ছে বিদ্বেষের পরিবেশ, পারস্পরিক বিরক্তি আর অনাস্থার পরিবেশ, — এবং তা শিশুর মনপ্রাণকে বিষাক্ত করে তুলে। মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের কাছে তাঁদের সম্পর্কের প্রকৃত অবস্থাটি গোপন রাখার যত চেষ্টাই করুন না কেন ছেলেমেয়েরা কিন্তু তা ঠিকই টের পায়।

প্রকৃত ভালোবাসা সর্বদা পরিবারের জীবনী শক্তি বৃদ্ধি করে, আনন্দের অনুভূতি জাগিয়ে তুলে। তা হচ্ছে শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য, তার নৈতিক শিক্ষার জন্য সবচেয়ে সুস্থ পরিবেশ। তাছাড়া মা-বাবার প্রকৃত ভালোবাসা — সে হচ্ছে ভবিষ্যতের সংসারী ব্যক্তির পক্ষে অনুকরণোপযোগী উৎকৃষ্ট এক উদাহরণ।

তবে এটাও ঠিক যে পরিবার কেবল অনুভূতির জগৎই নয়। এ হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনের নানা চিন্তা আর ঝামেলার ক্ষেত্রও। আমরা যদি আমাদের

ছেলেমেয়েদের দ্রুত, যান্ত্রিকভাবে, অতিরিক্ত শক্তি ব্যয় না ক'রে অন্তত সংসারের কিছুটা কাজেরও দায়িত্ব নিতে শিখিয়ে দিই, তাহলে তাতে ভবিষ্যতে তাদের দৈনন্দিন জীবন অনেকটা সহজই হবে।

আমাদের সন্তান-সন্ততিরাও, আমাদের ছেলেমেয়েরাও — যাদের আজ আমরা মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, যাদের আজ আমাদের স্নেহমমতা আর উপদেশের প্রয়োজন আছে — অল্প কাল পরেই, দেখতে না দেখতেই পিতামাতা হবে। আর তার মানে, এক্ষুনি আমাদের সেই অদূর ভবিষ্যতের কথা ভাবা উচিত।

স্কুলের উচ্চ শ্রেণীগুলোতে বিতর্ক সভায় সুখের বিষয়ে, চিত্তাকর্ষক পেশার বিষয়ে, প্রিয় কাজের বিষয়ে, ভ্রমণের বিষয়ে, ভালো বন্ধুদের বিষয়ে, প্রেমের বিষয়ে কত কথাই শোনা যায়। কিন্তু সন্তান-সন্ততিরা যে সুখের অপরিহার্য এক উপাদান সে বিষয়ে কখনও কোন আলোচনা শোনা যায় না।

ব্যাপারটি সময়ের উপর ছেড়ে দিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ না করলেও চলত: ও কিছু না, মাতৃত্ব বোধ, পিতৃত্ব বোধ এখনও আসবে। আমরা জানি, যে-সমস্ত লোকের এখনও কোন সন্তান হয় নি তারা কত ক'রে একটি সন্তান কামনা করে, — নারীরা তিরিশ বছর নাগাদ, আর পুরুষরা সামান্য পরে। কিন্তু আসল ব্যাপারটিই হচ্ছে এই যে বেশির ভাগ লোকই মা-বাবা হয় তিরিশ বছর নাগাদ নয়, কুড়ি বছরের আগে বা পরে। তাদের মধ্যে, এবং বিশেষত ছেলেদের মধ্যে, মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব বোধ তখনও বিকশিত নয়। এর মানে হচ্ছে এই যে, তাদের চিন্তাধারা ওই গতিতে চালিত করা উচিত আমাদেরই। আমাদেরই তাদের এমনভাবে মানুষ করতে হবে যাতে পরে তারা স্নেহশীল পিতামাতা হয়।

ভাবী পিতামাতাদের শিক্ষা শুরু করা উচিত যথা সম্ভব অল্প বয়সে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে মেয়ের শিক্ষা, ভবিষ্যৎ মায়ের শিক্ষা তেমন কোন জটিল ব্যাপার নয়। শিশু কালেই মেয়ের মধ্যে মাতৃত্ব বোধ দেখা দেয়, যখন সে পুতুল নিয়ে খেলে — ওগুলোকে ঘুম পাড়ায়, খাওয়ায়, 'মানুষ করে'। হ্যাঁ, কথাটি সত্যিই। কেবল পুতুল নিয়েই নয়, বান্ধবীর সঙ্গেও সে 'মা-ঝি' খেলতে খুব ভালোবাসে। কিন্তু এমন এক সময় আসে যখন পুতুলগুলো মেয়েকে আর খুশি করতে পারে না, — আমরা নিজেরাই এ ব্যাপারে বড় একটা ভূমিকা পালন করি, বাঁকা হাসি হেসে বলি: 'তুই এখনও পুতুলগুলো নিয়ে খেলছিস, কিন্তু এখন তুই তো আর ছোট্ট খুকী

নস!' কিশোরী মেয়ে তার এই স্বাভাবিক চাহিদার কথা — সেবাযত্ন করা, স্নেহ করা, আদর করা ও ঘুম পাড়ানোর চাহিদার কথা ভুলে যায়। তারপর বছর দুই বাদে স্কুল শেষ ক'রে (বা এমনকি ৩-৪ বছর বাদেও হতে পারে) সে মা হয়, এবং... প্রায়ই এই আনন্দের ব্যাপারটি বিভ্রান্তির দরুন নিরানন্দ হয়ে উঠে। কিছু কিছু তরুণী মা দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক মিনিটের জন্যও 'আপনার সন্তান' নামক বইখানি হাতছাড়া করে না: ওটা তারা পড়ে বাচ্চাকে কাপড় পরানোর আগে, খাওয়ানোর আগে, স্নান করানোর আগে। এতে খারাপ কিছু নেই, তবে একটু হাসি পায় এবং সামান্য দুঃখও হয়: নবজাতকের সেবাযত্ন আর লালনপালনের বিষয়ে জ্ঞান সন্তান জন্মের আগেই অর্জন করা সম্ভব ছিল।

তবে আসল ব্যাপারটি জ্ঞানে নয়। আমরা আগেই বলেছি, শিশুর আবেগগত জগৎ, তার অনুভূতি ও তার মানসিক অবস্থার উপর মায়ের প্রভাব কী বিপুল। তার মানে, ভাবী মায়ের ব্যক্তিত্ব গঠন করতে গিয়ে তার মধ্যে আন্তরিকতা, উদারতা, নম্রতা ও অমায়িকতা বিকশিত করার ব্যাপারে আমাদের বিশেষ যত্নশীল হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয়, আধুনিক তরুণীদের চেহারা ও চালচলনে প্রায়ই রুক্ষতা, শীতলতা, এক ধরনের অভিপ্রেত পুরুষতুল্যতা লক্ষ্য করা যায়। মুখে সিগারেট, অট্টহাসি, অত্যধিক স্বাধীন হস্ত-সঞ্চালন... এ সমস্তকিছু হয়তো কেবল একটি আবরণ যার আড়ালে লুকিয়ে আছে স্নেহমমতা আর অনুভূতির গভীরতা। কিন্তু, প্রথমত, এরূপ আবরণের কী দরকার? তা তো তরুণীকে পরিবার গড়তে সাহায্য করে না, বরং বাধাই দেয়। আর, দ্বিতীয়ত, আমরা জানি যে বাহ্যিক চেহারা প্রায়ই আমাদের অন্তর্জগৎকেও প্রভাবিত করে। সুদীর্ঘ কাল ধরে যদি 'শাশ্বত নারীত্বকে' লুকিয়ে রাখা হয় তাহলে এমনও হতে পারে যে হৃদয় কঠোর হয়ে উঠবে, কণ্ঠ মিষ্টি কথা উচ্চারণ করতে অক্ষম হয়ে পড়বে আর চোখগুলো স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি ফেলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে... আমরা এমন বহু তরুণী মাকে দেখেছি যারা ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলে কঠোর ও কর্কশ কণ্ঠে, আর কখনও কখনও কথাই বলে না, স্রেফ কড়া হুকুম দেয়: 'জলদি কাপড় পর!', 'তাড়াতাড়ি ঘুমা!', 'খা বলছি!' সমস্তকিছু গলাতে সক্ষম ভালোবাসার পরিবর্তে এই কর্কশতা, রুক্ষতা আর ব্যস্ততা কেন (বেশির ভাগ সময় প্রথম ক্ষেত্রেও ভালোবাসা আছে, কেবল তা বাইরে প্রকাশিত হয় না)? এই জন্য যে আমরা আমাদের মেয়েদের, ভবিষ্যৎ মায়েদের, কোমল ও স্নেহশীল হতে শেখাই নি।

বাপেদের ব্যাপার-স্যাপার আরও জটিল। সন্তানের প্রতি তাঁদের সম্পর্কে অচেতন আবেগপ্রবণতা কম, যুক্তিসঙ্গত স্নেহই বেশি। তবে এ কথা বলার প্রয়োজন নেই যে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের উপরেই পিতার প্রভাব অপরিসীম। ছেলে বাপের মধ্যে অনুকরণীয় আদর্শ দেখতে পায়: বুদ্ধিমান, উদার, শক্তিশালী, মনোযোগী। বড় হয়ে, নিজে বাপ হয়ে সে অবশ্যই তাঁর মতো হতে চেষ্টা করবে।

আগেকার দিনের পিতৃ-প্রধান পরিবারে বাপের প্রভাবকে ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাভাবিক কোন ব্যাপার বলে গণ্য করা হত। তবে এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবারের সদস্যদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে হয়। আর এ কাজটি মোটেই সহজ নয়। পরিবারের কর্তা যদি প্রযুক্তির বিষয়ে, খেলাধুলার বিষয়ে, বর্তমান রাজনীতির বিষয়ে ছেলের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন... যদি শান্ত ও স্থির কণ্ঠের পরিবর্তে বাড়িতে সর্বদা তাঁর কর্কশ গলা শোনা যায়... স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা যদি তাঁর ইতরামি ও স্বার্থপরতার জন্য কষ্ট পায়... এরূপ পিতার কোন প্রভাব ও মর্যাদা থাকতে পারে না। সবচেয়ে বড় কথা — পরিবারে তিনি মুখ্য ভূমিকা দাবি করতে পারেন না। কারণ পরিবারের সাংস্কৃতিক চাহিদা, শিক্ষালাভের প্রয়াস, বই পড়ার প্রতি ভালোবাসা, শিল্পকলা বোঝার ক্ষমতা — এ সমস্তকিছুই অনেকাংশে নির্ভর করে স্বামীর, পিতার এই গুণাবলি বিকাশের মানের উপর।

এ ছাড়া গৃহকর্তাকে হতে হবে সংগঠিত, কর্মঠ, সুশৃঙ্খল যাতে তিনি পরিবারে সুষ্ঠু ও মৈত্রীপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। সেই সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের কাজকর্ম এবং মনমেজাজের প্রতিও তাঁকে মনোযোগী আর সংবেদনশীল হতে হবে। অন্যথায় তিনি তাদের প্রকৃত বন্ধু হতে পারবেন না।

ছেলে যত আগে তার ভবিষ্যৎ দায়িত্বটি — পরিবারে স্বামী ও পিতার দায়িত্বটি উপলব্ধি করবে, ততই ভালো। বলাই বাহুল্য, ছেলে ও মেয়েদের সমমাত্রায়ই মানুষের এই মহান ও সুন্দর লক্ষ্যের জন্য — পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।

পারিবারিক জীবনের জন্য মানুষকে প্রস্তুত করা — এ কেবল তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞান দান করাই নয়। কাজটি তার চেয়ে অনেক জটিল: আমাদের ছেলে ও মেয়েদের এই শিক্ষা দিতে হবে যে বিবাহ এবং পরিবার মানুষের কাছে গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হাজির করে। লক্ষ্য রাখতে হবে, তাদের অনুভূতি যেন পরিপক্ক হয় এবং এই অনুভূতি যেন তাদের

সঠিক নির্বাচনে সহায়তা করে ও তাদের গড়া জোটটি যেন অক্ষুণ্ণ রাখে। আমরা যেন তাদের মধ্যে নিজের প্রতি, স্বামী অথবা স্ত্রীর প্রতি, সন্তানদের প্রতি সচেতন দায়িত্ব বোধ গড়ে তুলি। স্কুলে এবং বাড়িতে ঠিক এরূপ সুচিন্তিত ও সুসংগঠিত পারিবারিক শিক্ষায়ই আমরা দেখতে পাই পরিবারের প্রকৃত দৃঢ়তা, স্থিরতা আর শক্তির প্রতিভূ।

আমাদের ছেলেমেয়েদের কীভাবে সুখী করা যায় সারা বইটি জুড়ে আমরা সে বিষয়েই আলোচনা করেছি। উপসংহারে পাঠককে আন্তন মাকারেঙ্কোর বহু বার উচ্চারিত কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই: কেবল সুখী পিতামাতার সন্তানরাই সুখী হয়। শিক্ষাকার্য যদি শিক্ষাদাতা ও শিক্ষার্থীর আনন্দ ধ্বংস করে দেয় তাহলে সেরূপ শিক্ষাকার্যে কোন ফল হয় না। সেই জন্যই এই বইয়ের লেখকরা জোর দিয়ে বলছেন যে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা হচ্ছে অতি আনন্দদায়ক ও প্রয়োজনীয় এক কাজ। এতেই নিহিত রয়েছে মানবীয় মেলামেশার প্রকৃত সুখের, প্রতিটি শিশুর প্রকৃত সুখের উৎস! শৈশবের এই অপূর্ব মুহূর্তগুলোই হচ্ছে ব্যক্তিত্বের সুসমঞ্জস বিকাশের ভিত্তি।

মানুষকে শিক্ষা দেয় সমগ্র জীবন, এবং অনেককিছুই নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর। তবে তারও চেয়ে বেশি নির্ভর করে খোদ মানুষের উপর। মানুষ তার নৈতিক গুণাবলি বিকাশ করবে যেকোন পরিস্থিতিতে, সে নিজেকে যোগ্যভাবে প্রকাশ করবে যেকোন পরিবেশে, এবং এখানেই রয়েছে ব্যক্তিত্বের আসল মূল্য।

যথেষ্ট পরিমাণে শিশু নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে। এবং গুরুজনদের কর্তব্যটি হচ্ছে — তার দক্ষতার পূর্ণ বিকাশ সাধনে তাকে সাহায্য করা।

শিশুর অন্তর্জগৎ গঠনের প্রক্রিয়াটি খুবই সূক্ষ্ম এবং তা বড়দের কাছে যথেষ্ট নমনীয়তা দাবি করে। বিশেষ করে ব্যাপার যখন শিশুর অনুভূতির সঙ্গে, তার ব্যক্তিগত অনুরাগের সঙ্গে জড়িত থাকে।

শৈশব হচ্ছে সেই বিশেষ মানসিক অবস্থা, যাতে অনুভূতি আর চেতনা শক্তি পরস্পর সম্পৃক্ত থাকে: নিরবচ্ছিন্ন আবিষ্কার, অদম্য শক্তি, কষ্ট

সহ্য করার প্রস্তুতি। সিদ্ধান্ত আসে মুহূর্তের মধ্যে, আবিষ্কার সম্পন্ন হয় পদে পদে। ব্যক্তির গঠন প্রক্রিয়া অনেকটা বসন্ত কালে পাখির উড্ডয়নের মতো: কোন্ দিকে উড়ছে তা জানে, এবং একই সঙ্গে আবার জানেও না — কখনও খুব উপরে গিয়ে পাথরের মতো নিচের দিকে পড়তে থাকে, আর কখনও দ্রুত গতিতে চলে যায় মেঘের ভেতরে। সে অপরিসীম আনন্দ, উদ্দাম শক্তি আর উদ্যমের বিস্ময়কর এক মিলন!

আপনি যদি শিশুর সান্নিধ্য লাভ করতে ও তাকে হিতকর কাজ শেখাতে চান, তাহলে নিজের বয়সের গরিমা ছেড়ে দিন, — অন্যথায় শিশু ভয় পাবে, সে দূরে সরে যাবে।

সময় সময় আমরা নিজেদের শৈশব, কৈশোর আর যৌবনের কথা ভুলে যাই এবং সেই জন্যই ছেলেমেয়েদের বুঝি না। আর ছেলেমেয়েরাও আমাদের বুঝতে পারে না। আমাদের উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা আমাদের অছিগিরি নয়, বন্ধুত্বপূর্ণ উপদেশ, সুবিবেচিত নেতৃত্ব, তাদের চাই আত্মিক সমর্থন। কিন্তু আত্মিক সমর্থন জোগানো সহজ কাজ নয়: এর জন্য নিজের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা থাকা চাই। নিজের সন্তানদের জন্য নিজেকে চিত্তাকর্ষক হতে হবে। তাদের প্রতি আমাদের সহায়তা হতে হবে আন্তরিক, উপদেশ হতে হবে সৌহার্দ্যপূর্ণ।

সারা জীবন আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিই, এবং ছেলেমেয়েরাও আমাদের শিক্ষা দেয়। আর সঠিকভাবে বললে, আমাদের ছেলেমেয়েদের প্রভাবে পড়ে আমরা নিজেরাই নিজেকে শিক্ষিত করে তুলি। এবং তার একমাত্র উদ্দেশ্য — আমরা যেন সর্বদা তাদের কাজে লাগি: বড় হয়ে তারা আমাদের কাছে লাভ করবে সহমর্মিতা, প্রাজ্ঞতা, আত্মিক সান্নিধ্য...

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভ্‌স্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

প্রগতি প্রকাশন

প্রকাশিত হল

আ. লুনাচারস্কি ॥ শিক্ষা।

А. Луначарский. О воспитании и образовании.

আনাতোলি ভাসিলিয়েভিচ লুনাচারস্কি (১৮৭৫-১৯৩৩) সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রখ্যাত কর্মী, সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষা বিষয়ক প্রথম গণ-কমিসার। ভ. ই. লেনিনের নেতৃত্বে তিনি সোভিয়েত স্কুলের তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে, সোভিয়েত ইউনিয়নের গণ-শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় মূলনীতিগুলি প্রণয়ন করেন।

বইটি লুনাচারস্কির শিক্ষা-বিষয়ক উত্তরাধিকারের — যেখানে শিশুদের শ্রম-শিক্ষায় বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে — সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত হতে সহায়তা করবে। লেখক দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলেন যে সঠিকভাবে সংগঠিত স্কুল শ্রম-জীবনে ভালভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার গ্যারাণ্টি দেয়।

বইটি সাধারণ পাঠকদের জন্য।

প্রগতি প্রকাশন

প্রকাশিত হল

আ. ভলোদিন, ইয়ে. প্লিমাক ॥

সমাজ বিকাশের ধারা।

А. Володин, Е. Плимак. **Как развивается общество.**

বইটি বোধগম্যের জন্য অতি জটিল ঘটনাগুলির অন্যতম — সমাজ জীবনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে।

লেখকরা মার্কসীয় গবেষণার ভিত্তিতে সমাজ বিকাশের জটিল ও আশু সমস্যাদি পাঠকদের সামনে তুলে ধরছেন। প্রশ্নগুলি হল: সমাজ জীবনের বৈষয়িক ভিত্তি, যুক্তিবিদ্যা ও ইতিহাস, ঐতিহাসিক গতির বিধান, মানবজাতির বিপ্লব অভিজ্ঞতা, মানবজাতির প্রগতি, প্রগতির নতুন রূপ, তৃতীয় সহস্রবছরের সন্ধিক্ষণে বিশ্ব, ইত্যাদি।

বইটিতে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি ও লেখায় প্রাবন্ধিক দিকটাও বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

বইটি সাধারণ পাঠকদের জন্য লেখা হয়েছে।

ছেলেমেয়ে মানুষ করা প্রসঙ্গে

ছেলেমেয়ে মানুষ করা প্রসঙ্গে

মা-বাবার বই

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো